গল্পগুচ্ছ

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত ঈগল

প ত্র ভা র তী • PATRA BHARATI

১৯৬৪

দেশের মানুষকে যারা ভালবাসে
ভালবাসে দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষকে,
এ বই তাদের হাতে তুলে দিলাম।

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখকের প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য কিছু বই

ভয়ংকরের জীবন-কথা

কালের জয়ডংকা বাজে

নীল ঘূর্ণি

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র

অথ ভারত-কথকতা

নাম তার ভাবা

ভবঘুরের ডায়েরী :
মেরু থেকে মরু

দিগন্তপারের স্বপ্ন

স্বীকৃতি

ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস 'দুরন্ত ঈগল'-এর মাল-মসলা সংগ্রহের জন্য বহুবিধ গ্রন্থের সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে, ঘাঁটতে হয়েছে প্রামাণ্য নানা পুঁথিপত্র। তন্মধ্যে মূল কাঠামো ও ঘটনাস্রোতের বিন্যাসে যে গ্রন্থখানির ওপর সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতে হয়েছে, তা হলো জর্জি তাসখ্যানের লেখা 'দ্যা হাণ্টার অব্‌ দ্যা পামীর্‌স্‌'। বলা বাহুল্য, 'দুরন্ত ঈগল'-রচনায় এই গ্রন্থখানিই আমাকে সবিশেষ উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই অন্যান্য গ্রন্থকারের কাছে যেমন, তেমনি জর্জি তাসখ্যানের কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করছি।

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পটভূমি

ভারতের সর্বোত্তরে কাশ্মীর। কাশ্মীরের উত্তরে পাঁচটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সীমান্তরেখা এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে।

এই সেই পামীর, যেখানে মিলিত হয়েছে পৃথিবীর কতকগুলি আকাশছোঁয়া মহা-বিশাল গিরিশ্রেণী—হিন্দুকুশ, সুলেমান, তিয়েনশান, কিউনলুন, আলতিন তাগ, কারাকোরাম, হিমালয় প্রভৃতি। পৃথিবীর উচ্চতম মালভূমি এই পামীর—চিরন্তন তুষার ও বরফের রাজ্য। চিরতুষারে ঢাকা অসংখ্য পর্বতশ্রেণীর আদিঅন্তহীন কুন্ডলী ও গোলকধাঁধা যেন। মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য এ দেশ। কোন কোন এলাকায় এখানে-ওখানে কিছু বসতি চোখে পড়লেও, তা এত বিরল ও দূরে দূরে ছড়ানো যে দেশটাকে প্রায় বিজন বলা চলে।

বিষম দুর্গম, ভয়ংকর ও পর্বতসংকুল এই এলাকা, তেমনি আবার অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণও বটে।

আলোচ্য উপন্যাস 'দুরন্ত ঈগল' শুরু হয়েছে এই পামীরের এক দুরধিগম্য বিজন অঞ্চলে।

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় যে বিপ্লব ঘটে, তাতে জারের শাসন লোপ পায়, জার-সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে ওঠে প্রথম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র।

বিপ্লবের আগে থেকেই জার-সাম্রাজ্যের সর্বত্র, বিশেষ করে তার মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলছিল বিশৃংখলা, অরাজকতা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব। ছোট-বড় বহু ডাকাত দলের ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন জায়গায়। গঞ্জে, জনপদে ও বর্ধিষ্ণু জনবহুল এলাকায় তারা লুটপাট, খুনজখম ও রাহাজানি করে ফিরতো। তাদের বলা হতো বাসমাচি। এইসব বাসমাচি দলের মধ্যে এমন দলও অনেক ছিল, যারা জনবল, অর্থবল ও অস্ত্রবলে ছিল যথেষ্ট বড়, সংগঠিত ও বেশ শক্তিশালী।

বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য ভেতরের ও বাইরের বহু বিদেশী শক্তি গোপনে ও প্রকাশ্যে জোট বেঁধে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে এবং এই সব বাসমাচি দলের অধিকাংশই তখন বাঁচার তাগিদে স্বভাবতঃই হাত মেলায় তাদের সঙ্গে।

এ সবই আজ ইতিহাস।

এই সময়কার সংঘাতবহুল রোমাঞ্চকর ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস 'দুরন্ত ঈগল'।

উপন্যাসে যেসব স্থান ও লোকজনের দেখা মিলবে, তাদের সঙ্গে ভারতবাসী হিসাবে আমাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুদীর্ঘকালের যোগাযোগ ও লেনদেনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এই ঘনিষ্ঠতা। তাই সেখানকার বাসিন্দাদের কখনও বিদেশী অপরিচিত বলে মনে হয় না। মনে হয় যেন কত কালের কাছের মানুষ।

উপন্যাসে মাঝে মাঝে এসেছে ভারতবর্ষের কথা।

প্রথম মহাযুদ্ধকালে ইংরেজ দাসত্ব মোচনের জন্য ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লবের যে চেষ্টা হয়েছিল, তা এ সময় ব্যর্থ হয়ে গেছে। অন্য দিকে সফল বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভারতীয় বিপ্লবের একদল মুক্তিপাগল দামাল ছেলে এই সময় উত্তরের আকাশছোঁয়া তুষারমৌলী পর্বতশ্রেণীর দুর্লঙ্ঘ্য মহাপ্রাচীর ডিঙিয়ে ও অন্যান্য পথে গোপনে পালিয়ে যান সুদূর সোভিয়েত রাষ্ট্রে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন পথে ভারতীয় বিপ্লব সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলেছে। এক দিকে দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন বিপ্লববিরোধী শক্তি একজোট হয়ে উন্মাদের মতো চেষ্টা করছে ভেতর ও বাইরে থেকে আঘাতের পর আঘাত হেনে প্রথম বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে দিতে, অন্য দিকে তাদের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছে ও জীবনপণ লড়াই করে চলেছে সোভিয়েত দেশের শ্রমজীবী জনসাধারণ ও তাদের লালফৌজ এবং জনগণের পার্টিজান বাহিনী বা গণফৌজ।

এই সর্বাত্মক যুদ্ধে লালফৌজ ও পার্টিজান বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেন ভারতবর্ষের অনেক বিপ্লবী সন্তান। এ উপন্যাসে তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রেরও সাক্ষাৎ মিলবে।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পর্ব ১

দুর্লঙ্ঘ্য ভয়াল পামীর। লোকে বলে দুনিয়ার ছাদ।

পামীরের বুকে রাত্রি নেমেছে। হিমশীতল ঠান্ডা রাত্রি। রক্ত-জমাট-করা শীতে যেন অসাড় হয়ে আছে।

যে দিকে তাকানো যায়, চোখে পড়ে শুধু তুষার ও বরফের পুরু সাদা আস্তরণ, আর পর্বতের তরঙ্গ ও শিখরমালা—অগুনতি অগণন। তুষার ও বরফের বর্ম পরে শিখরগুলো সব দাঁড়িয়ে আছে মৌন গম্ভীর ভয়ঙ্কর। মেঘলোক পার হয়ে ধাপে ধাপে দূর আকাশে উঠে গেছে একের পর এক।

স্তব্ধ নিথর পর্বতরাজ্য।

আকাশে নিঃসঙ্গ চাঁদ। জ্যোৎস্নার প্লাবন নেমেছে শিখরে, পর্বতে, গিরিখাতে ও বরফ-প্রান্তরে। তরল রুপোর ঢল নেমেছে যেন।

উঁচু এক পর্বতেব খাড়া পাশ থেকে খানিকটা অংশ তাক বা পাটাতনের মতো সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে—ঝুঁকে আছে যেন। তার একেবারে কিনারায় ছোট্ট এক-খানা গ্রাম। গাঁয়ে পাঁচখানা মাত্র কুঠি। জরাজীর্ণ ভাঙাচোরা। গায়ে গায়ে জড়া-জড়ি করে তারা শীতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে যেন। তুষারে ডুবে গেছে তাদের ছাদ পর্যন্ত।

জনহীন পামীরের দুর্গম অভ্যন্তরে এ ধরনের কোন নিরালা বসতি থাকতে পারে, তা বুঝি ধারণাতীত। এবং এমন জায়গায় রয়েছে গ্রামখানা যে, চাঁদের আলোতেও তার অস্তিত্ব টের পাওয়া দুষ্কর।

গাঁয়ের লোকসংখ্যা খুবই কম। বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা বর্তমানে তিনজনে এসে ঠেকেছে।

গ্রামখানা ঘুমিয়ে আছে।

হঠাৎ গভীর রাত্রির নৈঃশব্দ্য ভেঙে সর্দারের গলা শোনা গেল। সে আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় জুরার।

সর্দারের বড় ভয় অন্ধকারকে। ঘরের বাতি নিবে গেছে। ঝাঁঝালো গলায় সর্দার জিজ্ঞেস করছে মেয়েদের,—ঘরে বাতি জ্বলছে না কেন?

ঘুমজড়ানো গলায় মেয়েরা জবাব দেয়,—তেল নেই।

বট্টে!—আবার শোনা যায় সর্দারের তিক্ত কণ্ঠ : তা এত ঠাণ্ডা কেন? অ্যাঁ, চুল্লিও দেখছি নিবে গেছে! কয়লাও কি নেই? কুচাক বুঝি কয়লা আনে নি? ঈহ্, কী ঠান্ডা! হতভাগা কুড়ের বাদশাটা আবারও দেখছি বেগার দিয়েছে!

নিজের কুঠরির মেঝেয় নিস্পন্দ বসে আছে কুচাক। গোল কাঁধের দু পাশ থেকে রোমশ দুই হাত নেমে এসেছে। ধোঁয়া বেরোবার ফাঁক দিয়ে সে তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে। এমনি ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বসে থাকতে পারে।

পর দিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই জুরা উঠে দাঁড়ায়। দীর্ঘ বলিষ্ঠদেহী তরুণ সে। তীক্ষ্ন বাঁকা নাক তার ঈগলের মতো আর লেপার্ড বা চিতাবাঘের মতো অন্তর্ভেদী ধারালো চোখের দৃষ্টি। সোজা সে এল কুচাকের কাছে, বললে,—ওঠ, বেরোতে হবে।

কুচাকের নড়ার ইচ্ছে নেই। তেমনি বসে থেকে সে কেঁউ কেঁউ করে উঠলো,—না, আমি বেরোতে পারবো না। তবিয়ৎ ভাল নেই।

ক্রুদ্ধ নিষ্পলক চোখে কয়েক মুহূর্ত জুরা তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারপর কঠিন কণ্ঠে বললে,—বটে! বয়সের মরদ তুমি, মেয়েরা যা পারে, তাও করতে চাও না। শুধুই ফাঁকি! কয়লাটা পর্যন্ত আনতে পার না। আচ্ছা দাঁড়াও, শরীর যাতে ভাল হয়, তার ব্যবস্থা করছি।

সঙ্গে সঙ্গে কুচাক উঠে দাঁড়ালো। জুরার মেজাজ ও রাগকে সে চেনে। বললে,—থাক্ থাক্, আর ব্যবস্থার দরকার নেই। শরীরটা এখন বেশ ভালই ঠেকছে। চল্।

দুজনে বেরিয়ে পড়ে।

উঁচু খাড়া এক পর্বত, ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে একেবারেই ন্যাড়া। তার এক ফাটল দিয়ে অবিরাম 'তেল' চুইয়ে পড়ছে—তেল অর্থাৎ পেট্রোল। জুরা ও কুচাক সংকীর্ণ গিরিখাত বেয়ে ওপরে উঠে ফাটলটার নীচে এক চামড়ার থলি পাতলে।

তেল ভর্তি হতে, থলিটা নিয়ে তারা নেমে এল।

অল্প দূরে এক পর্বত-ঢালের নীচে মাটির তলা থেকে কয়লা ওপরে উঠে এসেছে। গাঁইতি দিয়ে তারা ছোট খাদটা থেকে কিছু কয়লা কেটে তুললো। মেয়েরা এসে তা ঘরে নিয়ে গেল।

সাংসারিক কাজ শেষ হতে, জুরা এবার এসে ঢুকলো নিজের ছোট্ট কামারশালায়। সঙ্গে কুচাক। দিনের বাকী সময়টা তাদের প্রায় সেখানেই কেটে যায়।

এক খণ্ড লোহা দিয়ে জুরা ছোরা তৈরি করছে। কুচাক হাপর টেনে চুল্লির আগুনে বাতাস দিচ্ছে, আর আগুনের মতো টকটকে লাল ছোরাটায় কারুকাজ করছে জুরা।

কুচাকের মেজাজ ভাল থাকার কথা নয়। কোথায় সে বসে বসে আয়েশ করবে, তা নয় এই ভূতের খাটুনি!

ছাড়া পাওয়ার জন্য সে আঁকুপাঁকু কম করেনি। নানা মতলবও ভেজেছে। ফন্দি-ফিকিরও কম খাটায় নি। কিন্তু সবই ভেস্তে গেছে।

হাপর টানতে টানতে একসময় সে খেঁকিয়ে উঠলো,—কি হচ্ছে বলতে পারিস? এত কারুকাজ কিসের জন্যে?

জুরা বললে,—কেন নয়? ইর-মানাসও তো সব সময় কারুকাজ-করা ছোরা ব্যবহার করতেন।

—ফুঃ, ইর-মানাসের সঙ্গে তুলনা! কোথায় ইর-মানাস আর কোথায় তুই! ইর-মানাস তো খুব বড় বীর যোদ্ধা ছিলেন। আর তুই?

আমিও তাই।—ভারিক্কি গলায় জুরা জবাব দেয়ঃ এক হাত দিয়েই তোমায় আমি পেড়ে ফেলতে পারি। টকানো দুধের কৌমিস আর মাংস খেতে পারি সবার চেয়ে বেশী। তা ছাড়া সবাই আমায় ভয় আর সমীহ করে চলে।

কুচাক মাথা নাড়ে, নিজের চোপসানো পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলে,—উঁহু, আমার ধারণা, তোর চেয়ে আমি বেশী খেতে পারি। কিন্তু সে কথা থাক্, তা এ পর্যন্ত কতজন দুশমনকে তুই ঘায়েল করেছিস শুনি?

করিনি, করবো।—রাগতকণ্ঠে জুরা বললে।

দেখতে দেখতে তর্ক বেধে গেল দুজনার মধ্যে। উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি চলেছে, এমন সময় কুচাক হঠাৎ জুরার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো বাবুর দিকে। বললে,—দ্যাখ্ দ্যাখ্!

শিকারী মাদী কুকুর বাবু—আকারে প্রকান্ড, রঙ কালো। বলের মতো গোল হয়ে শুয়ে আছে। কাটা লেজের গোড়াটা বারবার উঠছে, শক্ত হচ্ছে। বাবু ঝিমোচ্ছে। হঠাৎ তার কান দুটো খাড়া হয়ে উঠলো। উঠে বসলো সে।

কামারশালার বাইরের দিকের দেয়ালটা এক তুষার-ঢিবির গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাবু সেদিকে ঘাড় ফেরায়। রাগে ও উত্তেজনায় তার ওপরের ঠোঁট গুটিয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো সে।

জুরা ও কুচাক অবাক।

কী ব্যাপার! ও কি কোন দুশমনের গন্ধ পেয়েছে?

বাবু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। এক লাফে সে দেয়ালের ওপর উঠে মাথা নীচু করে কি যেন শোনবার চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে সমানে চলে তার মৃদু গর্‌গর্‌ গর্জন।

গর্জন অতি মৃদু ও অস্পষ্ট হলেও তা গাঁয়ের আর সব কুকুরের কানে যায়। শুরু হয় তাদের ক্রুদ্ধ বেপরোয়া চিৎকার।

জুরা সচকিত। সন্দেহজনক কোন শব্দ আসে কিনা, ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু না, কোন কিছুই কানে আসছে না।

তবু সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এমন অনেক শব্দ আছে, যা মানুষের কান এড়িয়ে গেলেও, বাবুর মতো কুকুরের কানকে ফাঁকি দিতে পারে না। তাড়াতাড়ি সে ছাদে গিয়ে উঠলো, তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকালো বাইরের দিকে।

সব দিকেই আকাশছোঁয়া পর্বতশ্রেণী—তুষারমৌলী সুউচ্চ গিরিপ্রাচীর। গাঁয়ে আসার পথ দুটো। একটা পশ্চিম থেকে—পর্বতের খাড়া দেয়ালে ফাটলের মাঝে মাঝে কাঠ আর পাথর দিয়ে সেটা তৈরী। সে পথে আসতে হলে খাড়া দেয়ালে বুক লাগিয়ে, দেয়াল থেকে যেসব পাথর বা কাঠ বেরিয়ে আছে সেগুলো আঁকড়ে ধরে ধরে উপরে উঠে আসতে হয়। দ্বিতীয় পথটা দক্ষিণ থেকে—খাড়াইয়ের ওপারে গিরিখাত ধরে।

তুষার ঢাকা পথ দুটোয় জনমানবের চিহ্ন নেই।

জুরার সঙ্গে বাবুও ছাদে উঠে এসেছিল। বাবুকে লক্ষ্য করে নীচু গলায় সে বললে,—দূর হতভাগী! মিছামিছি বিপদের সঙ্কেত দিয়েছিস্।

বাবুর কিন্তু সেদিকে গ্রাহ্য নেই। কান খাড়া করে সে তখন উত্তর দিকে তাকিয়ে আছে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে উত্তর দিকে তাকাতেই জুরা ভীষণ চমকে উঠলো: এ কী! গ্রামের প্রান্তে যে পর্বতশ্রেণী, যার তলায় আসার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে উত্তরের দুর্লঙ্ঘ্য খাড়াই, তার নীচে কালো কালো কতকগুলো বিন্দু নড়াচড়া করছে।

কি করে সম্ভব হলো এটা?

স্তম্ভিত জুরা। পরক্ষণে তার মনে পড়ে, মাসখানেক আগে যে হিমানী-সম্প্রপাত ঘটেছিল, তুষার ও বরফের যে প্রচন্ড ধস নেমেছিল, তাতে তুষারের একটা সেতু

তৈরী হয়েছিল খাড়াইয়ের ওপর দিয়ে, আর তার ফলে উত্তর থেকে গাঁয়ে ঢোকার ঐ পথটা তৈরী হয়েছে।

সবচেয়ে কাছের কুঠরিটার ধোঁয়া বেরোবার পথ দিয়ে জুরা তীব্রকণ্ঠে হাঁক ছাড়লে : হুশিয়ার! হুশিয়ার!

মুহূর্তে সারা গাঁ সচকিত হয়ে উঠলো।

সবচেয়ে উদ্বিগ্ন হয় বুড়ো সর্দার। শীতের সময় আজ অবধি কেউ কখনো এ গাঁয়ে আসেনি। অসংখ্য দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালা গ্রামখানাকে বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

কুকুরের চিৎকার থামতে, জুরা সর্দারের সম্মতি নিয়ে পুরনো এক ম্যাচলক গাদা বন্দুক হাতে রওনা হলো উত্তরের পর্বতের দিকে। সঙ্গে বাবু। পর্বতটাকে বলা হয় 'বরফমুকুট'। আগন্তুকেরা তারই তলার দিকে আসছে।

সূর্য ডুবতে খুব বেশী দেরি নেই।

জুরা প্রথমে ভেবেছিল, সোজা যাবে আগন্তুকদের দিকে। কিন্তু শিকারীর সহজাত বুদ্ধি তাকে সতর্ক করে দেয়। সে ঠিক করলে, লুকিয়ে থেকে আগন্তুকদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখবে। বরফমুকুটের পায়ের কাছে অপেক্ষাকৃত ছোট চুড়োটার দিকে সে রওনা হয়। চুড়োটার মাথায় যে সব টিলা ও পাথরঢিবি আছে, তার পেছনে লুকিয়ে থেকে সে রবাহূত লোকগুলোর ওপর নজর রাখবে।

বাবু নীরবে আগে আগে উঠছে, মনিবের জন্য থামছে মাঝে মাঝে, আর কাটা লেজটা নাড়ছে অধীর আগ্রহে। তার যেন তর সইছে না।

জুরাকে উঠতে হচ্ছে অতি সাবধানে। একটি মাত্র অসতর্ক পদক্ষেপ মানে খতম—অতলস্পর্শী খাদে গিয়ে শেষ শয্যাগ্রহণ।

এক পা এক পা করে শেষ পর্যন্ত সে মাথায় গিয়ে উঠলো।

চুড়োর মাথায় টিলা ও ঢিবিগুলো থামের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পেছনে গা ঢাকা দিয়ে সে তুষারের ওপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায়। এমন একটা জায়গা বেছে নিতে হবে, যেখান থেকে সব দিকে নজর রাখা ও ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

হঠাৎ বাবু পিছু হটে এল। ক্ষিপ্র বেগে ডান দিকে ঘাড় ফিরিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লো নিশ্চলের মতো।

জুরা অবাক : কি ব্যাপার! লোকগুলো এর মধ্যেই পর্বতের মাথায় উঠবে, এটা কখনই সম্ভব নয়।

পর্বতটা বেড় দিয়ে বাঁ দিকে যাবার জন্য সে রওনা হয়। কিন্তু চুড়োর উত্তর দিকে কেবল গিয়ে পৌঁছেচে, হঠাৎ নীচে বরফমুকুটের তলা থেকে ভেসে এল এক অপরিচিত কুকুরের ক্রুদ্ধ চিৎকার।

জুরা ঘুরে তাকায়। নীচে পর্বতটার পাশে পাঁচজন লোক—কালো বিন্দুগুলোকে সে প্রথম যেখানে দেখেছিল, তার থেকে বেশী দূরে নয়। গাঁটরি থেকে তারা চটপট রাইফেল বের করছে।

জুরা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করলে। কিন্তু ওরা তাকে দেখে ফেলেছে।

জুরা তাকায় বাবুর দিকে : ওর ব্যাপারটা কি? এখনো সে একদৃষ্টে উল্টো দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এর অর্থ বুঝতে জুরার কষ্ট হয় না। অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়—বিপদ দু দিকেই। লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়ে সে বন্দুকের পলতেয় আগুন দেয়।

রক্তলাল পশ্চিম দিগন্ত। গিরিশ্রেণীর আড়ালে সূর্য অস্ত গেছে। অন্ধকার এসে দ্রুত গ্রাস করছে পর্বত-রাজ্য।

দূর থেকে এক অপরিচিত কন্ঠস্বর ভেসে এল,—হেই, কে রে তুই ওখানে?

—আমি জুরা, শিকারী।

নেমে আয়, নয়তো গুলি করবো।—দলের একজন খেঁকিয়ে উঠলো।

আকাশস্পর্শী এই পর্বতরাজ্যে বাতাস খুব সূক্ষ্ম—পাতলা ও হালকা। লোক-গুলো জুরাকে, বলতে গেলে, দেখতেই পাচ্ছে না, কিন্তু সুউচ্চ পর্বত-এলাকার অনুভূত সূক্ষ্ম বাতাসে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তাদের কণ্ঠস্বর।

তোমরা কারা?—জুরা জিজ্ঞেস করলে।

—দোস্ত, দোস্ত! অত জেরা কেন রে আকাট গোরু? জলদি নেমে আয় বলছি, নয়তো তোর লাশ কিন্তু নেকড়ের পেটে যাবে।

এতগুলো অপরিচিত লোক জুরা আগে কখনো দেখেনি। তাতে সে অবশ্য ভয় পায়নি, বরং উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বন্দুক উঁচিয়ে সে চাপা কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লে, —জুরা তোদের পরোয়া করে না!

লোকগুলোকে সে একের পর এক অনায়াসে গুলি করে মারতে পারে, আশ্রয় নেবার মতো কোন আড়াল তাদের নেই।

কিন্তু সে যেখানে আছে, সেখান থেকে বন্দুক ছোড়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাহলে হিমানী-সম্প্রপাত থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব হবে। এখানে আসবার সময় একাধিক-বার সে দম বন্ধ করে, হাঁচি-কাশি চেপে নিঃশব্দে ছায়ার মতো খাড়াইগুলোর তলদেশ পার হয়ে এসেছে। খাড়াইগুলোর ওপর থেকে তুষার ও বরফের বিশাল বিশাল রাক্ষুসে স্তূপ সব শূন্যে ঝুলে আছে নীচের দিকে। বাতাসে বিন্দুমাত্র আলোড়ন ঘটলেই সেগুলো সোজা নীচে ভেঙে পড়বে।

বন্দুকের পলতের আগুন সে নিভিয়ে ফেলে।

বাবু রাগে গরগর করছে। তার দিকে ফিরতেই জুরা চমকে উঠলো। খাড়া পর্বত-টার ঢিবিগুলোর পেছন থেকে বন্দুক হাতে বেরিয়ে এসেছে আরো দুজন লোক!

জুরার মাথায় দ্রুত চিন্তার স্রোত চলে ঃ এরা আবার কারা? নীচের ঐ পাঁচজন যে বাসমাচি, তা বোঝা যায়। এরাও কি তাই? হ্যাঁ, নির্ঘাৎ তাই হবে। তবে ঐ দলটা থেকে এরা আলাদা। কিন্তু সে যাই হোক, পিছু হটার পথ যে বন্ধ, তাতে সন্দেহ নেই। তাহলে?

নীচে থেকে আবার কতকগুলো খনখনে শুকনো গলার ঐকতান ভেসে এল,—এই শুনছিস, কি হলো রে? তোর জন্যে আমরা কি জিন্দিগি ভর বসে থাকবো?

জুরা ইতিমধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। দু পক্ষের কাছ থেকে সরে গিয়ে তাকে গা ঢাকা দিতে হবে।

শিস দিয়ে সে সংকেত করে বাবুকে। পরক্ষণে বন্দুক পিঠে ফেলে ইয়াকের লোমশ চামড়ার লম্বা কোটের দুই প্রান্তভাগ জড়িয়ে নিয়ে সে বসলো শক্ত তুষারের ওপর। তারপরেই বাসমাচি থেকে দূরে উল্টো দিকের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করলে—প্রথমে ধীরে, তারপর জোরে, তারপর আরো আরো জোরে।

ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে জুরা নেমে চলে। মৃদু খস্‌খস্‌ শব্দ হচ্ছে শুধু।

তুষারে ঢাকা ঢালু দিকটা অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত।

গড়াতে গড়াতে জুরা যত নামছে, ততই বাড়ছে গতিবেগ—তীব্র থেকে তীব্র-

তর, তারপর তীব্রতম। ধাক্কা খেতে খেতে, পাক খেতে খেতে দুরন্ত বেগে গড়িয়ে নামছে সে নীচের দিকে। কানের মধ্যে বাতাসের শব্দ হচ্ছে বাঁশীর মতো। দম যেন আটকে আসতে চায়।

হঠাৎ তার খেয়াল হলো,—সর্বনাশ! সে যে ডান দিকে নামছে, যে দিকে বাস-মাচিরা আছে! অথচ তাকে যেতে হবে বাঁ দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে, বাঁ দিকে মোড় নেবার জন্যে সে শক্ত তুষারের মধ্যে জোরে গোড়ালি বসিয়ে দিলে। আর তারপরেই ওপর থেকে ভীমবেগে নেমে এল তুষারের পর তুষারের বিরাট বিরাট স্তূপ। তাদের মধ্যে পড়ে ঘূর্ণির মধ্যে ধূলোকণার মতো পাক খেতে খেতে জুরা গড়িয়ে চললো নীচের দিকে।

জুরার মাথায় এখন একমাত্র চিন্তা—শেষে তুষারের তলায় কবর না যেতে হয়। দুহাত ছুড়তে থাকে সে, তুষারস্তূপকে যেন ঠেলে ফেলতে চায়। কানের মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে গর্জন।

শেষে একসময় ধাক্কা খেয়ে তার গতিরোধ হলো।

ধস-নামা তুষারের এক বিরাট ঢিবির মধ্যে কিছুক্ষণ সে পড়ে রইল আচ্ছন্নের মতো। অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ধীরে ধীরে আবার তাতে একসময় সাড়া ফিরে আসে। সে উঠে বসে এবং দুই বাহু দ্রুত ভাঁজ ও সোজা করতে থাকে বারবার।

তারপর টলতে টলতে একসময় সে উঠে দাঁড়ালো।

বাসমাচিরা তাকে গড়িয়ে পড়তে দেখেছিল। ধরে নিয়েছিল, পা ফসকে নীচে পড়ে সে মারা গেছে।

চাঁদ উঠলো এই সময়। জ্যোৎস্নায় ঝলমল করে উঠলো গিরিশিখর।

বাসমাচিরা দেখলে, অক্ষতদেহে জুরা এক তুষার-ঢিবির ওপর বসে আছে। জুরার সঙ্গে ছোটখাট যে হিমানী-সম্প্রপাত বা তুষার-ধস নেমেছিল, তারই ফলে তৈরী হয়েছে ঢিবিটা।

রাইফেল উঁচিয়ে বাসমাচিরা আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলো,—জলদি নেমে আয় বলছি, নয়তো...

জুরা ছুটলো টিলাগুলোর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বাসমাচিদের রাইফেল গর্জন করে উঠলো। এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ছে তারা।

নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে জুরা তখন ছুটছে পাগলের মতো আর নিজের মনে বিড়বিড় করছে,—সর্বনাশ! সর্বনাশ! কী সাঙ্ঘাতিক কান্ড!...

তারপর!

তার পরেই তুষারমৌলী হিমগিরি যেন ভ্রূকুটি করে উঠলো। গিরিচূড়ায় ঘনিয়ে এল অন্ধকার। তুষারের মেঘ উঠলো বাতাসে। সেই সঙ্গে শুরু হলো গুড়্গুড়্ গর্জন। আর তার পরেই অকল্পনীয় এক বজ্রনির্ঘোষ। দুরন্ত ঝঞ্ঝার এক নিদারুণ ঝাপ্টা এসে জুরাকে পালকের মতো ছুড়ে ফেললে এক দিকে।

পরক্ষণে হিমগিরি থেকে নেমে এল মহাভয়ঙ্কর এক হিমানী-সম্প্রপাত, তুষার-পর্বতের মহাধস যেন। নামাব পথে সবকিছু চুরমার করে নিশ্চিহ্ন করতে করতে সোজা তা ভেঙে পড়লো আতঙ্ক-বিহ্বল দিশেহারা বাসমাচিদের ওপর।

তারপর...

জুরা ফিরে চললো গাঁয়ের দিকে।

প্রথম পর্ব ২

আতঙ্কে ও দুর্ভাবনায় বোবা গাঁখানা যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অপরিচিত লোকগুলোর খবর আনার জন্যে জুরা সেই কখন বেরিয়ে গেছে। তারপর সূর্য ডুবলো, সন্ধ্যা হলো, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতও বাড়ছে। কিন্তু জুরার পাত্তা নেই।

সবচেয়ে বড় কুঠরিটার ছাদ থেকে তুষার সাফ করে ফেলা হয়েছে। সেখানে চিতা-বাঘের ছালের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে বৃদ্ধ সর্দার ইস্কান্দার। গায়ে তার আর-মিনের লোমশ চামড়ার গরম কোট। পাশে প্রকান্ড দুই শিকারী কুকুর।

সর্দার নিশ্চল নিশ্চুপ।

রাত্রি নিস্তব্ধ নিথর।

তারায় ঝলোমলো আকাশ। চাঁদ ওঠে নি এখনো।

আকাশে উল্কাপাত ঘটছে। উল্কার ঝাঁক জ্বলন্ত বাঁকা তরোয়ালের মতো ছুটে যাচ্ছে আকাশ-পথে। কুঠিগুলো চকিতে এক-একবার দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

সর্দার হঠাৎ চমকে উঠলো। বহুদূরে পর্বতশ্রেণী থেকে ভেসে এল ভয়ঙ্কর এক কড়্‌কড়্‌ গর্জন। কুকুর দুটো সচকিত হয়ে উঠে বসলো কান খাড়া করে।

চোখ কুঁচকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সর্দার তাকায় দূর পর্বতশ্রেণীর দিকে। সেখানে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

কিন্তু না, আর কোন শব্দ নেই। আবার সব চুপ।

সর্দার কোটটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নেয়। বয়স তার একশো দশ বছর। এ বয়সে এ সময় বাইরে এসে বসার কথা নয়, ঘরে বসে আরাম করে আগুন পোয়ানোর কথা। কিন্তু ওই অজ্ঞাত-পরিচয় লোকগুলোর আকস্মিক আবির্ভাবে সবই ওলট-পালট হয়ে গেছে। এই দুর্গম পার্বত্য গাঁয়ে ওটা এমনই একটি ঘটনা, যাতে বিষম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে গাঁয়ের বাসিন্দারা। আর সর্দারকেও তাই বাধ্য হয়ে ছাদে এসে বসতে হয়েছে।

'এক-চোখো' শিকারী কুকুরটা ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠছে। হিমকণায় তার সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন। গায়ের লোম ঝাড়তে ঝাড়তে থাবা দিয়ে সে ছাদ আঁচড়াতে শুরু করে।

পর্বতের পেছন থেকে চাঁদ ওঠার আর দেরি নেই। পর্বতগুলো এত উঁচু যে, মেঘ খুব কমই তাদের ডিঙিয়ে যেতে পারে। পশ্চিম থেকে সার বেঁধে মেঘের দল ভেসে আসে অন্তহীন স্রোতের মতো। কিন্তু পর্বতে আটকে তারা জমে তুষার হয়ে যায়, স্তরে স্তরে জমা হতে থাকে পর্বতের মাথায়, শেষে জমাট বেঁধে তুষার-স্রোত বা হিম-বাহে পরিণত হয়। হিমবাহগুলোকে দেখতে হয় বরফের তৈরী ঝুলন্ত গম্বুজের মতো।

গ্রামখানা এখানে আছে বহুকাল ধরে। বাইরের দুনিয়া ছোট্ট এই পার্বত্য গ্রাম 'মিন-আরখার'-এর কোন খবরই জানে না। জানে শুধু জনা দুয়েক চীনা ব্যাপারী আর তাদের গুটি কয়েক সাঙ্গোপাঙ্গ। 'মিন-আরখার'-এর গোপন খবর একমাত্র এই ব্যাপারীদের মধ্যেই চলে আসছে বংশপরম্পরায়।

পামীরের অন্তর্গত পার্বত্য জেলা সারিকল। সারিকলের পশ্চিম অংশ পড়েছে সোভিয়েত পামীরে, আর পূব অংশ চীনের সিংকিয়াং প্রদেশের কাশগড়িয়ায়। কাশগড়িয়ার সারিকল অংশ থেকে দু বছর অন্তর শুধু গ্রীষ্মকালেই একবার ঐ চীনা ব্যাপারীদের একজন আসে মিন-আরখারে। বাসিন্দাদের তারা ময়দা ও তামাক দিয়ে তার বিনিময়ে নিয়ে যায় মূল্যবান পশুর লোমশ চামড়া আর সোনার গুঁড়ো।

ব্যাপারীরা এলে গাঁয়ে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। গাঁয়ের জীবনে সে এক মস্ত বড় ঘটনা। কর্মব্যস্ত চঞ্চলতার মধ্য দিয়ে কাটে কয়েকটা দিন। তারপর ব্যাপারীরা চলে যেতেই আবার শুরু হয় সেই নিরানন্দ পুরনো একঘেয়ে জীবন। গড়িয়ে চলে নিস্তরঙ্গ সময়ের স্রোত।

শুধু এই বিনিময়-ব্যবসাটুকু করেই কিন্তু ব্যাপারীরা ক্ষান্ত থাকে না। আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ তারা করে যায়। মিন-আরখার গাঁয়ের বাসিন্দারা যাতে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে কখনো যোগাযোগ করার কথা কল্পনাও করতে না পারে, তারও ব্যবস্থা তারা করে যায়।

যাবার আগে প্রতিবারই তারা বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে সর্দারকে গল্পচ্ছলে বলে যায় এমন সব বিচিত্র কাহিনী, যার প্রভাব হয় সাংঘাতিক। বহু-বহু দূরে আর অসংখ্য গিরিশ্রেণীর ওপারে বহু নীচে আছে যে সমতল দেশ, সেখানে গেলে কি সব অনাসৃষ্টি কান্ড ঘটতে পারে এবং কত রকমের ভয়ংকর সব বিপদ সেখানে পদে পদে ওৎ পেতে আছে, তারই নানা আজগুবী গল্পের লম্বা ফিরিস্তি তারা শুনিয়ে যায় সর্দারকে।

এ কাজটা তারা করে প্রাণের তাগিদে—নিজেদের কারবারের স্বার্থে। নয়তো মহামূল্যবান সোনার গুঁড়ো আর পশমের চামড়া প্রায় মুফতে আত্মসাৎ করার পথ যে বন্ধ হয়ে যেতে পারে চিরতরে!

দুরধিগম্য অগুনতি পর্বতশ্রেণীর ওপারে মহাবিশাল যে কর্মচঞ্চল দুনিয়া পড়ে আছে, তার সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই সর্দারের বা গাঁয়ের আর সব বাসিন্দার। তাদের মনে শুধু কঠিন বরফের মতো জমাট বেঁধে আছে যুগ-যুগান্তের বদ্ধমূল বিশ্বাস ও কুসংস্কার। তাই ব্যাপারীদের গল্প শুনতে শুনতে আতঙ্কে তারা শিউরে ওঠে বারবার।

এই অবস্থায় হঠাৎ এই শীতকালে অজানা ঐ লোকগুলোকে দেখা গেছে হিমবাহের তলায়—উত্তরের পর্বতশ্রেণীর ঢালু অংশে। তারা কারা, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে, কি-ই বা তাদের মতলব—কেউ জানে না। সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কথা, শীতকালে পথঘাট যখন দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গম, তখন বিনা কারণে বা বিশেষ কারণ ছাড়া এই ভয়ংকর পর্বত-এলাকায় কারো আসার কথা নয়। অদ্যাবধি স্মরণকালের মধ্যেও কেউ আসে নি।

দুশ্চিন্তায় তাই সর্দারের মন অন্ধকার। জুরার প্রতীক্ষায় সে ছাদে বসে আছে সেই কখন থেকে। আগন্তুকদের খবর নিয়ে এতক্ষণে তার ফেরার কথা। জুরা নির্ভীক দুঃসাহসী সন্দেহ নেই, ওস্তাদ শিকারীও বটে। কিন্তু বয়সে সে তরুণ, কতটুকুই বা তার অভিজ্ঞতা! কি যে করছে ছেলেটা কে জানে!

তারাগুলো ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। শেষে একসময় অন্ধকার আকাশ-দিগন্তে ওরা অদৃশ্য হলো। আর পরক্ষণেই রামধনু রঙের ঝলমলো আলোর ফুলকির এক দুরন্ত বন্যা ছিটকে বেরিয়ে এল ঝুলন্ত হিমবাহের পেছন থেকে। হিমবাহকে এখন দেখাচ্ছে বহুকোণা-বিশিষ্ট সুবিশাল এক প্রদীপ্ত হীরকখণ্ডের মতো।

চাঁদ উঠছে। কালো কালো ছায়াগুলো গুড়ি মেরে সরে যাচ্ছে গভীর গিরিখাতের দিকে।

নিস্তব্ধ রাত্রি—কি এক আতঙ্কে যেন নিথর হয়ে আছে......

হঠাৎ দূরে থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে ছাদ থেকে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়লো কুকুর দুটো, গোঁ গোঁ করতে করতে ধেয়ে গেল কোন্ এক অদৃশ্য শত্রুকে উদ্দেশ করে।

বন্দুকের আওয়াজ হতেই চন্দ্রালোকিত দীপ্ত শিখরগুলো যেন ভ্রূকুটি করে উঠলো। সেখানে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার।

পরক্ষণে উঠলো তুষার-ঝড়। পর্বতের শিখরে শিখরে আর নীচে মেঘের মধ্যে শুরু হলো ঝড়ের সে কী দাপাদাপি আর মত্তমাতন! সেই সঙ্গে চলে এক গম্ভীর ভয়ঙ্কর গুড়্গুড়্ গর্জন। দশ দিক তোলপাড় করে, দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে গর্জন বাড়ছে, দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে মহাভয়ঙ্কর বজ্রনির্ঘোষের মতো।

গিরিশ্রেণী দুলছে। সর্দার যে কুঠুরীটার ওপর বসে আছে, সেটাও ঝাঁকছে প্রচন্ডভাবে।

ভয়াবহ হিমানী-সম্প্রপাত বা তুষার-ধস নেমেছে দূরের কোন পর্বত থেকে। পাথরের বিরাট বিরাট চ্যাংড়া, টিলা-পাহাড়, গাছপালা, যা কিছু সামনে পড়েছে, সব ভেঙে চুরে ঠেলে নিয়ে বরফ ও তুষারের মহাভয়ঙ্কর সে ধস ভীমবেগে নেমেছে নীচের দিকে।

হঠাৎ অন্ধকার থেকে কুকুর দুটো ছুটে এসে এক লাফে ছাদে গিয়ে উঠলো। আতঙ্কে লেজ তাদের পেটের নীচে সেঁধিয়ে গেছে।

বুড়ো সর্দার কাঁপছে ঠকঠক করে। সর্দার চিৎকার করতে গেল। কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোলো না। বরফ-জলে চুবিয়ে ধরলে যেরকম হয়, তেমনি অবস্থা। সে পালাতেও পারে না। পা দুটো অবশ, পেরেক দিয়ে তাদের যেন ছাদের সঙ্গে এঁটে দেওয়া হয়েছে।

ঝঞ্ঝা আসছে ঝাপ্টার পর ঝাপ্টা।

সর্দারের মাথা থেকে শেয়াল-লোমের টুপিটা উল্টে গেল। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কুকুর দুটোর গায়ের লোম। তুষার কণা তুমুল বেগে পাক খেতে খেতে সর্দারের চোখেমুখে এসে বিঁধছে ছুঁচের মতো আর সাদা আস্তরণে ঢেকে ফেলছে সব কিছু.....

কিছুক্ষণ পরে তুষার-ঝঞ্ঝা ও গর্জন ধীরে ধীরে কমে আসে, থেমে যায় একসময়।

গর্জন কমে আসতেই কুঠুরীগুলোর ধোঁয়া বেরোবার সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে ভেসে এল ভেতরের মেয়েদের চেঁচামেচি আর কুকুরদের সম্মিলিত চিৎকার। আতঙ্কে হাউমাউ করছে তারা।

ধোঁয়া বেরোবার এইসব সুড়ঙ্গকে শীতকালে বাইরে বেরোবার পথ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এমনি এক পথ দিয়ে আয়েশা বুড়ীর মাথা বেরিয়ে এল। মাথার চুল তার পেকে সাদা হয়ে গেছে। আর্তকণ্ঠে সে গোঙিয়ে উঠলো,—ওগো বাঁচাও, বাঁচাও! আমরা যে মারা গেলাম!

সর্দার ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। কান ঢেকে টুপিটা মাথায় ঠিক করে বসাতে বসাতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে ধমকে উঠলো,—হেই, থামবে তোমরা!

সঙ্গে সঙ্গে আয়েশার মাথা অদৃশ্য হলো।

শান্ত নিঝুম প্রকৃতি।

কুঁড়ের ভেতর থেকে ভেসে আসছে বাসিন্দাদের চাপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

শেষ দিককার কুঁড়েয় বসে ছেলের শোকে আয়েশা কাঁদছে। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, হিমানী-সম্প্রপাতে জুরা মারা পড়েছে। মাথার চুল ছিঁড়ে আকুল হয়ে

আয়েশা কাঁদছে—ওরে আমার জুরা, বাপ আমার, হায় হায়, আমি কি করবো রে!' ওরে আমার বীরের বেটা, জুরা বাপ আমার, তুই কোথায় গেলি রে...

অন্য মেয়েরাও যোগ দেয় তার সংগে। তারা কাঁদে পুরনো শোকের ব্যথায়—সেই তিনজন রোজগেরে জোয়ান মরদের শোকে, গত হেমন্তে সৌক্সাই নদীতে যারা প্রাণ হারিয়েছে।

সর্দার ইস্কান্দার তেমনি ছাদে বসে আছে। দুঃখে আর দুশ্চিন্তায় মন তার ভারাক্রান্ত। মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। ভাবছে সে,—জুরা গেল খবর আনার জন্যে, সত্যিই কি সে হিমানী-সম্প্রপাতে মারা পড়লো? কি করে তার খোঁজ পাওয়া যায়? আচ্ছা, কুচাককে পাঠালে কেমন হয়?

কিন্তু কুচাকের কথা মনে হতেই বিতৃষ্ণায় সর্দার থুথু ফেলে,—ধুৎ ধুৎ! ওটা কি মানুষ! মাথায় চাটি মারলেও যে হতভাগা রা কাড়ে না, সে মানুষ, না অন্য কিছু! ওকে পাঠানোও যা, না পাঠানোও তাই।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সর্দার নিজেই শিকারে বের হতো। সৌক্সাইয়ের তীরে সোনার গুঁড়ো কুড়তো, বিক্রি করতো চীনাদের কাছে। কিন্তু এখন আর পারে না। বত্রিশটা দাঁতই তার পড়ে গেছে, নীচের চোয়ালটা ঝুলে পড়েছে। ঘোড়ার চুল আর রেশমের ফিতে দিয়ে সেটা বেঁধে রাখতে হয়।

চাঁদ উঠেছে। নানা তিক্ত চিন্তায় ইস্কান্দার আনমনা। হঠাৎ সে চমকে উঠলো,—আরে আরে, এ কি!

কোথাকার এক জানোয়ার এসে তার ওপর লাফিয়ে পড়েছে।

কিন্তু না,—পরক্ষণে সর্দার আশ্বস্ত হয়ঃ জুরার শিকারী কুকুর 'বাবু'! হঠাৎ কোথা থেকে এসে হতভাগীটা তার হাঁটুর ওপর উঠে নাক চেটে দিয়েছে! দূর দূর!

বাবুকে সে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলে। কিন্তু বাবুর সেদিকে গ্রাহ্যই নেই। সমানে লেজ নেড়ে চলেছে।

এর অর্থ সর্দার বুঝতে পারে, মন তার উৎফুল্ল হয়ে ওঠেঃ বেঁচে আছে—জুরা বেঁচে আছে! কিন্তু কোথায় সে?

ক্ষণকাল পরেই দূর থেকে ভেসে এল এক গানের সুর। জুরার গলা। খোশ মেজাজে গানের সুর ভাজতে ভাজতে সে আসছে।

কিন্তু ছাদের ওপর সর্দারকে দেখেই সে গান বন্ধ করে। বয়স্ক ভারিক্কি লোকের পক্ষে চ্যাংড়া ছোঁড়ার মতো গান করা সাজে না।

দুজনে একত্রে কামরায় ঢুকলো। কেটলির পাশে শোকার্ত আয়েশা বসে আছে। হঠাৎ ছেলেকে দেখেই সে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো।

কিন্তু ইস্কান্দারের তখন তর সইছে না। খবর জানার জন্যে আর উদ্বেগ-আশঙ্কায় ভেতরে ভেতরে সে ফুটছে টগবগ করে। কামরায় ঢুকেই জুরার কোট চেপে ধরে রুদ্ধশ্বাসে সে বললে,—এবার বল্ কি হলো? কি কি ঘটেছে সব খুলে বল্।

জুরার চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক খেলে যায়। সর্দারের বর্তমান মানসিক অবস্থাটা সে বেশ আন্দাজ করতে পারে। তাই কামরায় ঢুকতে ঢুকতে সে মতলব ঠিক করে ফেলেছে। চোখ কুঁচকে বললে,—আদবকায়দা কি ভুলে গেলেন, সর্দার? আগে চা, তার পরে তো কথা!

নিরুপায় সর্দার। চায়ের ব্যবস্থা করতে হয়।

জুরা চা শেষ করে চলে কাপের পর কাপ। আস্তে আস্তে একটু একটু করে পরম তৃপ্তির সংগে খাচ্ছে সে। দুর্লভ এ সুখ—কদাচিৎ কপালে জোটে। কিন্তু ইস্কান্দারের

তখন ফেটে পড়ার মতো অবস্থা। জুরা একবার করে কাপ শেষ করে, আর উদ্বেগ-উত্তেজনায় ছটফটিয়ে ওঠে সর্দার,—আচ্ছা, এইবার বল্ ঘটনাটা। লোকগুলো কি ধরনের, কোথা থেকে এসেছে, জানতে পেরেছিস কিছু?

কিন্তু জুরার তাড়া নেই। খালি কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে ধীরেসুস্থে বলে,—অত ব্যস্ত কিসে? চা-টা আগে শেষ করি!

কুচাক পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। সম্পর্কে সে জুরার খুড়ো। ক্ষুধিত সতৃষ্ণ চোখে সে জুরার চেখে চেখে আরাম করে চা খাওয়া দেখছে। সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই, খানিকটা চা জুরা এগিয়ে দিলে তার দিকে।

উদ্বেগ-উত্তেজনায় সর্দারের চোখে তখন জল এসে গেছে। চায়ের পাট কখন চুকবে, তারই প্রতীক্ষায় সে যেন দম আটকে আছে।

কিন্তু জুরা নির্বিকার। চা খাওয়া শেষ হতেই, সে হঠাৎ দুম্ করে বলে বসলো,—বড্ড খিদে পেয়েছে। কিছু না খেলে চলছে না। মাংসের ব্যবস্থা হোক, সর্দার!

সর্দার বিষম চমকে উঠলো ঃ অ্যাঁ, বলে কি! মাংস! ছোঁড়াটা শেষতক কিনা মাংসও চেয়ে বসলো!!

রাগে গরগর করে উঠলো সে। খেঁকিয়ে উঠতে যাবে, কিন্তু সামলে নিলে সঙ্গে সঙ্গে। জুরা যেরকম জেদী ও একগুঁয়ে, তাতে চোটপাট করলে কোন কাজ তো হবেই না, বরং উল্টো বিপত্তি ঘটতে পারে—হয়তো কিছুই বলবে না।

নিজের মাংসের ভাগ সর্দার নিজের কাছেই রাখে এবং স্বভাবতঃই নেয় সিংহভাগটা। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে একটা খণ্ড সে মেয়েদের বের করে দিলে রান্না করতে।

রান্না চলেছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসে আছে জুরা। বাইরে সে গম্ভীর, কিন্তু মনে মনে আমোদ বোধ করছে সর্দারের মেজাজটা কল্পনা করে। মাংস খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে মুখ খুললে চলবে না। লোভী কিপ্টে বুড়োকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। ঘটনাটা বুড়ো যদি তার মাংস খাওয়ার আগে জানতে পারে, তাহলে কি করবে, সে জানে—খেতে দেওয়া তো দূরের কথা, মাংসের দিকে তাকাতেও দেবে না।

গাঁয়ে বিষম আকাল চলেছে। কোথাও একদানা খাবার নেই। পর্বতের এখানে-ওখানে পাওয়া যায় শুধু গুলজান শেকড়। কিছুকাল যাবৎ আর সবার মতো জুরাকেও ওই দুর্গন্ধ বিশ্রী গুলজানের ময়দা খেয়ে বাঁচতে হচ্ছে।

তাই ভারিক্কি শিকারীসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে সে চুপচাপ বসে রইল। অবশ্য নিজের বিস্ময়কর অভিযানের কাহিনী বলার জন্যে ভেতরে ভেতরে সে-ও টগবগ করে ফুটছে।

মাংস রান্না হলো। মাংসের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে চর্বিমাখা হাত দুখানা ট্রাউজারের নীচের দিকে পুছতে পুছতে, জুরা সশব্দে তৃপ্তির ঢেকুর ছাড়ে, সর্দারকে বুঝিয়ে দেয়, ভোজনটা বেশ ভালই হয়েছে।

ইস্কান্দার রাগে গর্‌গর্ করে উঠলো।

জুরার এক-একবার ইচ্ছে হয়, সব কিছু বিস্তারিতভাবে খুলে বলে। কিন্তু শিকারীর কখনো বুড়ীদের মতো বাচাল হওয়া সাজে না। তাই শেষ পর্যন্ত সে বললে, —বাসমাচি ছিল পাঁচজন, দুটো ইয়াক অর্থাৎ চমর ষাঁড় আর একটা কুকুর। হিমানী-সম্প্রপাতে সবাই খতম হয়ে গেছে।

খতম! সবাই খতম হয়ে গেছে বলছিস?—দারুণ উৎকণ্ঠায় সর্দারের মুখ দিয়ে যেন কথা সরছে না, সে হাঁসফাঁস করে উঠলো ঃ নিজের চোখে দেখেছিস? আর কেউ —আর কেউ ছিল না?

আর কেউ!—জুরার চোখে ভ্রূকুটি দেখা দেয়। দুজন সশস্ত্র লোকের চেহারা তার

চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চাঁদের আলোয় তাদের সে স্পষ্ট দেখেছিল। তাদের কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কিছু দূরে আর এক পর্বতে তারা দাঁড়িয়ে ছিল।

কিন্তু সে কথা জানিয়ে বুড়োকে দুশ্চিন্তায় ফেলে কি লাভ? তাছাড়া ওরাও কি আর বেঁচে আছে? নিশ্চয়ই খতম হয়ে গেছে। তাই সে বললে,—না, বিলকুল সবাই খতম হয়ে গেছে।

বটে বটে! সবই খতম!—উদ্বেগব্যাকুল কণ্ঠে সর্দার আবার যেন গোঙিয়ে ওঠে : কিন্তু কথা কি জানিস? বিপদ কখনো একলা আসে না। কি ঘটবে, কে জানে!

জুরার চোখে তখনো ভ্রূকুটি। কারা ওই রহস্যময় সশস্ত্র লোক দুটো, সে ভেবে পায় না। ওদের সে স্পষ্ট দেখেছিল আর এক পর্বতের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে। ওরা কারা? হিমানী-সম্প্রপাতে সত্যিই কি ওরা মারা পড়েছে?

প্রথম পর্ব ৩

পাথরের মতো শুকনো কঠিন দিগন্তবিসারী মহাপ্রান্তর। উত্তরের পামীর-তিয়েন-শান গিরিশ্রেণীর নীচে থেকে তার শুরু। লোকে বলে ক্ষুধিত তেপান্তর। ক্ষুধিত তেপান্তর দক্ষিণে যেখানে শেষ হয়েছে, তার পর থেকে উর্বর ফেরগানা উপত্যকার শুরু।

দূর থেকে উপত্যকাটিকে পপলার গাছের অরণ্য বলে মনে হয়। ঝোড়ো বাতাসের দাপট রোধ করার জন্য ফসলের ক্ষেত, দ্রাক্ষাকুঞ্জ ও বাগান-বাগিচা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে পপলারের ঘন অরণ্য। পপলারের রুপোলী পাতার ছায়ায় মানুষের ঘরবাড়ি বসতি।

হেমন্তের শেষ। পর্বতে তুষার জমতে শুরু করেছে। সেখানে দুরন্ত শীত। কিন্তু ফেরগানা উপত্যকায় এখনো গ্রীষ্মের মতোই গরম—রোদের প্রচণ্ড দাপট।

উচ্-কুরগান গ্রামের ওপর ধুলো জমে আছে ঝাপসা পর্দার মতো। পথের দু ধারে রোদে-পোড়া নিস্তেজ পপলারের সারি। তার রুপোলী পাতার রঙ ধুলো জমে দেখাচ্ছে লালচে-বাদামী।

দুপুরের গরমে বাজার নিস্তব্ধ জনহীন। পথ জনশূন্য। মাঝে মাঝে তুলো-বোঝাই উটের কাফিলা চলেছে ধুলো উড়িয়ে। ধীরে ধীরে চলেছে তারা। টুং-টাং টুং-টাং—একটানা বাজছে তাদের গলার ঘণ্টা।

দূরে দেখা যায় কিজিল-কী খনি। প্রকাণ্ড খাদ থেকে আকাশে মাথা তুলেছে লম্বা চিমনী একটা। উচ্-কুরগান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। খনি থেকে কয়লা বোঝাই করে ট্রেনগুলো গরম ধোঁয়া ছেড়ে সশব্দে ছুটছে ফসল-ক্ষেতের পাশ দিয়ে ফলের বাগান পেছনে ফেলে।

খনির তিন দিকে লাল পাথরের অনুর্বর পাহাড়। চিমনীর কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে তাদের ওপর।

লতাপাতা আর কাঁটা আগাছার ঝোপজঙ্গলে ভরা পাহাড়গুলো কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। পাহাড়গুলোর মাথায় অনেক পরিখা কাটা। কাঁটা তারে মরচে পড়েছে।

বেড়া ভেঙে পড়ছে। পরিখাগুলোও জায়গায় জায়গায় মাটি ধসে প্রায় বুজে যাবার মতো। পাহাড়ের মাথায় দুটো পুরনো কামান। তাদের মুখে পাখি বাসা বেঁধেছে।

দুপুরের এই প্রচণ্ড গরমে কুকুরগুলোও যখন ছায়ায় গিয়ে ধুঁকছে, পাহাড়ের মাথায় পরিখার মধ্যে তখন একদল কিশোর ছেলে বিষম কর্মব্যস্ত। তারা পরিখা, বেড়া ও খুঁটি মেরামত করছে। কামান দুটো সাফ করছে। সারা মুখ তাদের ঘামে ও ধুলোয় একাকার। হাত-পা ছড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়।

কিন্তু সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা আজ এখানে সমবেত হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে—বিপ্লবের সেই ভয়ঙ্কর অতীত দিনগুলোর কাহিনী শোনার জন্যে।

ছেলেদের দলে পাণ্ডা দুজন—লিওস্কা আর ট্যাগ। লিওস্কা মজুর-পল্লীর ছেলেদের মোড়ল। আর ট্যাগ—ঢ্যাঙা তার চেহারা—এককালে ছিল অনাথ আশ্রয়-হীন, সারা গায়ে তার হলদে হলদে ফুট্‌কি দাগ, আশপাশের সব গাঁয়ের ছেলেদের সে পান্ডা। তার হাতে একটা খাঁটি বাসমাচী চাবুক। চাবুকটার হাড়ের হাতলে তামার কারুকাজকরা। ঢ্যাঙা ট্যাগ যখন বাতাসে চাবুক মারে, তখন তার থেকে আওয়াজ বেরোয় তীক্ষ্ন গুলির আওয়াজের মতো। ট্যাগ ছাড়া আর কোন ছেলে চাবুকে এত জোরে আওয়াজ তুলতে পারে না।

হঠাৎ কলিয়ারীর ভোঁ বেজে উঠলো। এবার শিফট বদল হবে।

পরিখার পাঁচিলের ওপর ছেলেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। কয়লা-খাদের অন্ধকার গর্ত থেকে খনি-মজুরেরা বেরিয়ে আসছে।

তাদের একজন এগিয়ে আসছে পাহাড়ে ছেলেদের দিকে। ছেলেরা হৈ-হৈ করে উঠলো।

'সেলাম আলেকুম, ইভাস্কো!' 'আসুন, ইভাস্কো, আসুন!' 'ইভাস্কো জিন্দাবাদ!' ইত্যাকার নানা কন্ঠে তারা স্বাগত ও অভ্যর্থনা জানায় আগন্তুককে।

খনি-মজুরটি যুবক। সারা মুখ কয়লায় কালো। শুধু চোখ দুটো আর সাদা দাঁতের পাটি দুষ্টুমিতে চকচক করছে। ডজন ডজন হাত তার দিকে এগিয়ে এসেছে কর-মর্দনের জন্য। তিন-চারটে হাত এক-একবারে সাপটে ধরতে ধরতে সে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে একটা কামানের ওপর বসলো। বললে,—বাব্বা! স্নানটা সেরে আসবো সে সবুরও সইছে না। কুছ পরোয়া নেই, এবার তাহলে শুরু করা যাক।

ছেলের দল আরো ঘন হয়ে তাকে ঘিরে বসলো গোল হয়ে।

ইভাস্কো শুরু করে ঃ

কয়েক বছর আগে, আমার বয়েস তখন তোমাদেরই মতো, বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। কিজিল-কী'র খনিমজুরেরা নিজেদের লাল বলশেভিক বলে ঘোষণা করলো। ফলে, লাল কিজিল-কী'র লড়াই বেধে গেল বাসমাচিদের সঙ্গে।

বাসমাচি-মোড়লেরা আমাদের সমানে শাসাতে লাগলো,—আত্মসমর্পণ করো, কিচ্ছু বলবো না। নইলে সব্বাইকে খতম করবো।

ছেলেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো,—কিন্তু খনিমজুরেরা তা গ্রাহ্যও করে নি। তারা জিতেছিল।

ইভাস্কো থামিয়ে দিয়ে বললে,—তা ঠিক। কিন্তু নরকের অবস্থা তখন। এক ঘণ্টা কয়লা কাটছি তো, পরের ঘণ্টায় লড়াই করছি—এমনি ছিল রোজকার অবস্থা। বিরাম-বিশ্রাম ছিল না ফেরগানা শহর, কোকন্দ, এমন কি ঐ উচ্‌-কুরগান, এমনি চারদিককার সব এলাকাই বাসমাচিরা দখল করে নিয়েছিল। একমাত্র আমাদের এই লাল খনি-অঞ্চলটাই তাদের কাছে ছিল চোখের ভেতরকার কুটোর মতো। কিজিল-কী

প্রজাতন্ত্র খতম করবে বলে ডাকাত সর্দারদের তখন সে কী আস্ফালন! বেশী আস্ফালন করতো তাগাই আর মান্দামিন-বে...

আর মুয়েদিন ও আজিম।—লিওস্কা সোৎসাহে যোগ করে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ,——ইভাস্কো বাধা দেয় ঃ নামের ফর্দ থাক্। মোদ্দা কথা হলো, ওদের গোটা দলবলকে আমাদের এই ছোট্ট কিজিল-কী প্রজাতন্ত্র গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছিল। চাষীরা আমাদের ঘোড়া জোগাত। বাসমাচিদের তাড়া করতে করতে ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়লে, চাষীরা আবার নতুন ঘোড়া এনে দিত। তাদের কাছ থেকে সাহায্যের আবেদন নিয়ে কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে এলেই কিজিল-কী'তে বেজে উঠতো বিপদের ঘণ্টা। আর অমনি খনিমজুরেরা রাইফেল হাতে বেরিয়ে আসতো, ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠতো। তার পরের ঘটনা বুঝতেই পারছো? বাসমাচিদের দফা রফা করতে বিশেষ সময় লাগতো না।

ঢ্যাঙা ট্যাগ এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে,—কিন্তু এ সবই তো আমাদের জানা। এসব বলার জন্যে আপনাকে আমরা ডাকি নি। আমাদের বলুন, বাসমাচিরা কিভাবে লড়াই করতো, কিভাবে তারা লুকিয়ে থাকতো; আর খনিমজুররাই বা কিভাবে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতো। তা ছাড়া চাষীদের দূত বাসমাচিদের ভেতর দিয়ে কিভাবে গলে আসতো, তা-ও বলুন আমাদের। আমার দলটাই যে খনিমজুর, তা বোধহয় বুঝতে পারছেন।

অ্যাঁ, ক্-কি। কী!—লিওস্কা গর্জে লাফিয়ে উঠলো ঃ কক্‌খনো না! কক্‌খনো না! আমরাই খনিমজুর, তোরা নোস্। তোরা বাসমাচি!

তুমুল ঝগড়া বেধে গেল ট্যাগ ও লিওস্কার মধ্যে। উত্তেজিত লিওস্কা হঠাৎ পকেট থেকে পুরনো একটা 'বুলডগ' রিভলবার বের করে শূন্যে ফাঁকা আওয়াজ করলে। ট্যাগও শুরু করে বাতাসে চাবুক চালাতে। ইভাস্কো তাড়াতাড়ি ট্যাগের হাত চেপে ধরলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে, দূরে যেখানে পথ গেছে ফলবাগিচাগুলোর ভেতর দিয়ে, সে দিকে নজর পড়তেই সে চেঁচিয়ে উঠলো,—আরে দ্যাখ, দ্যাখ, জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে একজন উজবেক।

সচকিত চোখে ছেলেরা তাকায় সেদিকে ঃ সত্যিই তো, খনির দিকে যে পথ গেছে, সেই পথ ধরে তাদের দিকে তীরের মতো ছুটে আসছে একখানা ধুলোর মেঘ। মেঘটা রাস্তার ওপর শূন্যে ভাসছে ধুলোর পরদার মতো। ঘোড়াটা প্রাণপণে ছুটছে, সওয়ারের তবু চাবুক মাবার বিরাম নেই। স্পষ্ট বোঝা যায়, লোকটার তাড়া খুব।

ইভাস্কো বললে,—বাসমাচিদের সময় সাহায্যের আবেদন নিয়ে যেসব দূত আসতো, তারা কিন্তু কক্‌খনো ঘুব পথে আসতো না। বাঁক নিয়ে সোজা চলে আসতো। ওই যে ওখানে রাস্তার পাশে পপলার গাছটা দেখছো, ওই যে লোকটা যে গাছটার দিকে আসছে...

হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।—সমস্বরে ট্যাগ ও লিওস্কা বললে।

—ঐ ওখানে ওই পপলার গাছের পাশ দিয়ে এইসব পাহাড় ও খনির দিকে আসার পুরনো একটা পথ আছে। এখন সেটা ঝোপজঙ্গলে ঢেকে গেছে, কেউ আর ব্যবহার করে না। কিন্তু সেই পুরনো দিনে...

লোকটা যে ঐ পথেই বাঁক নিলে!—তারস্বরে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো ছেলের দল। ইভাস্কোও লাফিয়ে পড়লো কামান থেকে।

ঝোপজঙ্গল-আগাছায় ভরা খাড়া উঁচু পথে সওয়ার ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছে। চাবুক চালাচ্ছে অবিরাম।

ছেলের দল হঠাৎ 'বাসমাচি! বাসমাচি!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে পাহাড় থেকে ছুটলো নীচে উঠোনের দিকে। তারপর এক পপলার গাছে পুরনো এক ঘণ্টা বেঁধে প্রাণপণে শুরু করলো বাজাতে।

অফিসের সামনে এসে ঘোড়সওয়ার যখন থামলো, ততক্ষণে বহু খনিমজুর এসে উপস্থিত হয়েছে। বুড়ো এক খনিমজুর—নাম প্যানভ, কপালে তরোয়ালের এক পুরনো ক্ষতচিহ্ন—আগন্তুককে জিজ্ঞেস করলে,—বাসমাচি! কোথায় বাসমাচি?

হাতের খামটা নাড়তে নাড়তে উত্তেজিত কণ্ঠে ঘোড়সওয়ার বললে,—ইস্‌ফাইরাম নদী বরাবর যে নলখাগড়ার জঙ্গল আছে, সেখানে ওরা আস্তানা গেড়েছে। তাগাইয়ের ডাকাত দলের কথা মনে পড়ে? সেই যে বদমাশটা, যে আমাদের তিনখানা গ্রাম ছারখার করেছিল, চাষীদের সর্বকিছু লুটপাট করতো, মেয়েদেরও খুন করতো, কিজিল-কী প্রজাতন্ত্রের আমলে যার বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠানো হয়েছিল, সেই ফৌজের উপরও যে চড়াও হয়েছিল—মনে পড়ে?

বলতে বলতে লোকটা অফিস-ঘরের দিকে এগিয়ে গেল, স্থানীয় পার্টি-সেক্রেটারী ডানিলীচকে দিলে খামটা।

হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে কে একজন বলে উঠলো,—যাও, যে যার রাইফেল নিয়ে এস।

না!—ডানিলীচ চেঁচিয়ে বললেন : আঞ্চলিক বিভাগের ফৌজদার কুজমিন পনেরো জন ভলাণ্টিয়ার পাঠানোর জন্যে লিখেছেন। কে কে যাবে, বলো।

খনিমজুরদের মধ্যে সমস্বরে চিৎকার উঠলো,—আমি! আমি! আমি!..

একজন বললে,—ওরা সব্বাই যেতে চাইছে।

কোন দরকার নেই!—ডানিলীচ বললেন : দরকার মাত্র পনেরো জনের। তাগাইয়ের দলে আর মাত্র জনাকয়েক অবশিষ্ট আছে। পুরো দলবল নিয়ে সে কাশগড়িয়ায় পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের সীমান্ত-রক্ষীরা তার অবস্থা সেখানে রীতিমতো কাহিল করে ছেড়েছে, লেজ বাঁচিয়ে কোনক্রমে সে পালিয়ে আসতে পেরেছে। তারপর সে পর্বতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সীমান্ত-রক্ষীরা সেখান থেকেও তাকে তাড়িয়ে বের করেছে। এখন সে এসেছে আমাদের এখানে। গিরিপথ পার হয়ে নাগালের বাইরে পামীরে পালানোই তার মতলব। আঞ্চলিক রক্ষী বাহিনীকে গোপনে জমায়েত করা হয়েছে বটে, তবু তাগাই যাতে কোন ভাবেই পালাতে না পারে, তার জন্যে কুজমিন আমাদের কাছে পনেরো জন লোকের সাহায্য চেয়েছেন। এখানেও তাহলে কাজের কোন ক্ষতি হবে না।

এবার শুরু হয় নাম লেখানো।

সেই যে খনিমজুর, কপালে যার জখমের চিহ্ন, সে বললে,—আমার নামটা লিখে নাও, স্যাভেলি প্যানভ। আমার ছেলে মিশার খুনের বদলা নেবার জন্যে তাগাইয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাই।

এমনি করে সবাই একের পর এক চিৎকার করে যে যার নাম বলে গেল।

হঠাৎ পেছন থেকে এক উৎফুল্ল তরুণকণ্ঠ কানে আসে,—সরে যান, সরে যান।

ভিড় ঠেলে সেক্রেটারীর কাছে এগিয়ে এল ইভাস্কো। তার পেছনে একদল যুবক।

সেক্রেটারীর কানের কাছে মুখ নিয়ে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে ইভাস্কো বললে,—শুনুন ডানিলীচ, যে ধরনের লোক আপনার দরকার, তাদের কথাই বলতে এসেছি। তারা

কমসোমল—যুবসংঘের সভ্য। ঝড় জল আগুন, কোন কিছুকেই তারা পরোয়া করে না, খাঁটি জোয়ান ঈগল। তারাই এ কাজের উপযুক্ত।

প্যানভ খেঁকিয়ে ওঠে,—যেসব ঈগল কখনো আগুনে পড়েনি, তারা মুরগীরও অধম!

থামুন, থামুন!—ইভাস্কো বলে : বন্দুক ধরার দিন আপনাদের ফুরিয়ে গেছে, এখন অবসর নেবার সময়।

কী!—দুরন্ত রাগে প্যানভ ফেটে পড়লো। ভিড় ঠেলে ইভাস্কোর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তীব্র কন্ঠে বললে,—কী! কি বললে? অবসর নেবার সময়? বুঝলে হে আনাড়ী ছোকরা, তোমার বাবাকে গিয়ে বলো এসব কথা! তোমার বাবা কোথায়?

গাড়িবারান্দা থেকে শক্ত মজবুত চেহারার এক খনিমজুর জবাব দিলে,—এই যে এখানে।

প্যানভ জিজ্ঞেস করে,—শুনলে, ও কি বললে?

—শুনেছি। তা আমার কি মনে হয়, জানো? আমাদের লড়াই তো আমরা করলাম। এখন এইসব ছেলে-ছোকরাদের সুযোগ দেওয়া উচিত। ওরা দেখাক, ওদের হিম্মত কতখানি, আমাদের জায়গা পূরণ করার মতো হিম্মত আছে কিনা। কি বলো তোমরা সবাই, ঠিক বলছি তো?

যুবকের দল কলরব করে ওঠে,—ঠিক, ঠিকই বলেছেন।

গোঁফ জোড়ায় প্যানভ ভয়ংকর এক মোচড় মারলে। ইভাস্কোর দিকে ফিরে শাসানির সুরে বললে,—বুঝলে হে ছোকরা, মনে রেখ, কিজিল-কী প্রজাতন্ত্র কেউ কোন দিন দখল করতে পারে নি। একশো তেত্রিশটা লড়াইয়ে আমি ছিলাম—

বলতে বলতে সগর্বে সে চারপাশে তাকায়, কেউ তার কথার প্রতিবাদ করে নি, তবু সে আবার বলে,—হ্যাঁ, একশো তেত্রিশটা! ফি বার আমরাই ওদের বেদম ধোলাই দিয়েছি, ওরা কিন্তু আমাদের একবারও হটাতে পারে নি। আমরা ছিলাম দুর্জয়, বুঝলে হে বাপু।

বুড়োরা ঘাড় নাড়ে,—সাচ্চা বাত!

বলিষ্ঠ যুবক ইভাস্কো। সুদর্শন সুকেশ। কমনীয় মুখশ্রী। নীল চোখ দুটো দুষ্টুমিতে মিট মিট করছে। বললে,—অতীতে আপনারা ঠেঙিয়েছেন, এবার আমরা ঠেঙাব।

আধ ঘণ্টা পরে ইভাস্কোর ভলান্টিয়ার বাহিনী রাইফেল ও গ্রেনেডে সজ্জিত হয়ে রওনা হয়ে গেল।

পপলার সারির পেছনে তারা অদৃশ্য হতেই, সবার অলক্ষ্যে গাছপালার আড়ালে আড়ালে গুড়ি মেরে তাদের অনুসরণ করলো বয়স্ক দশটি কিশোর ছেলে। লিওস্কা ও ট্যাগ তাদের সর্দার।

ইভাস্কোদের সংগে তারাও যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের কথায় কেউ আমলই দেয় নি। শুধু কি তাই! ডানিলীচ তো মহাখাপ্পা যখন শুনলেন যে, ওরাই প্রথম 'বাসমাচি' বলে চিৎকার ছেড়েছিল আর পপলার গাছে ঘণ্টা বেঁধে লোকদের কাজ থেকে টেনে এনেছিল। লিওস্কার এত সাধের 'বুলডগ' রিভলবারটা পর্যন্ত কেড়ে নেবার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি। ইভাস্কোর উপস্থিত বুদ্ধিতেই শুধু ফাঁড়াটা কেটে গেছে।

তাই এই চুপি চুপি গা ঢাকা দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?

চেকিস্ট কুর্জামিন একটা পপলার গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে শরবনের ওপর নজর রাখছেন। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে ইভাস্কো এসে হাজির। তার ডান হাতে গ্রেনেড, বাঁ হাতে রাইফেল। সারা মুখ কয়লায় কালো। দাঁত দুপাটি আর চোখ দুটো শুধু ঝকঝক করছে।

গ্রেনেডটা বাগিয়ে ধরে সে হাঁক ছাড়লে,—কই, কোথায় তারা?

আঃ চেঁচিও না!—চাপা গলায় কুর্জামিন ধমকে ওঠেন ঃ তুলো ক্ষেতটা ঘুরে তোমাদের সঙ্গীদের নিয়ে ওপারে বাঁয়ে ঐ পাহাড়টায় যাও, ঐ যে পপলার গাছগুলো দেখছো, ওখানে। কিন্তু খবরদার! আমি গুলি না ছোড়া পর্যন্ত কক্খনো গুলি ছুড়বে না, বুঝলে?

ইভাস্কোর কোমরের বেল্ট থেকে রিভলবার ঝুলছে। বেল্টটা ঠিক করতে করতে শুকনো ভারী গলায় সে 'হুম্' করে উঠলো।

পপলার শ্রেণীর পাশে গিয়ে খনিমজুরেরা গা ঢাকা দেয়। মাথার ওপর প্রচণ্ড সূর্যের তাপ। হল্‌দে ধুলোয় বাতাস ভারী। তারা অস্বস্তি বোধ করছে।

এমন সময় হঠাৎ ছোট পাহাড়টার কাছে ঘাসবন নড়ে উঠলো। পরক্ষণে ট্যাগ আর লিওস্কা গুড়ি মেরে উঠে এল ইভাস্কোর কাছে।

শরবনের দিকে আঙুল উঁচিয়ে লিওস্কা ফিসফিস করে বললে,—ঐ ওখানে আছে বাসমাচিরা। ঐ যে ওখানে।

ট্যাগ সায় দেয়,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারা ছুটছে। ছোট পাহাড়টার ওপর থেকে আমরা সব দেখেছি।

ওদের সেখানে লুকিয়ে থাকতে বলে ইভাস্কো ঝোপঝাড়ের পেছনে গা ঢাকা দিয়ে ঢুকে পড়ে শরবনের মধ্যে। ছোট পাহাড়টা বেয়ে ওপরে উঠে পাথর-ঢিবির আড়ালে আড়ালে সে গুড়ি মেরে এগিয়ে গেল। তারপর সন্তর্পণে এক সময় মাথা তুলতেই সামনে দেখতে পেল বাসমাচিদের।

ছোট পাহাড়গুলোর দিকে এবং যেসব ঝোপে খনিমজুরেরা লুকিয়ে আছে, সেই দিকেই বাসমাচিরা কুঁজো হয়ে জোরে ছুটছে।

বাসমাচিদের দেখেই দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো ইভাস্কো, বেমালুম ভুলে গেল কুর্জামিনের হুকুম। সোজা উঠে দাঁড়িয়ে গ্রেনেড ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে চিৎকার করে উঠলো,—একশো শয়তানকেও পরোয়া করি নে!

গ্রেনেডের সবুজ ধোঁয়া মিলিয়ে যেতে না যেতেই, এক হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে সে রাইফেল চালাতে শুরু করলো বাসমাচিদের ওপর।

বাসমাচিরা কিন্তু থামে না। পাল্টা জবাবও দেয় না। অন্য দিকে ঘুরে আরো জোরে ছুটতে শুরু করে।

কুর্জামিনের মশার বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়। ডান দিক থেকেও বন্দুকের আওয়াজ আসছে। বাঁ দিক থেকে গুলি ছুড়ছে খনিমজুরেরা।

একটু পরেই ছুটতে ছুটতে কুর্জামিন এসে উপস্থিত।

ইভাস্কোর গুলিতে একজন বাসমাচি মারা পড়েছে। সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে খুশিতে উপচে পড়ে ইভাস্কো,—কাজটা কিরকম চমৎকার হয়েছে দেখুন!

রাগে ফেটে পড়লেন কুর্জামিন,—তোমায় আমি গ্রেপ্তার করলাম!

অ্যাঁ গ্রেপ্তার!—ইভান্কো হকচকিয়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বললে ঃ গ্রেপ্তার! কেন? নিজের জীবনের পরোয়া করি নি, তার বকশিস নাকি?

গর্জে উঠলেন কুর্জমিন,—চোপ্‌ রও হাঁদারাম! তোমার এই হঠকারিতার ফলে তাগাই পর্বত-এলাকায় পালিয়ে যেতে পারলো—বুঝতে পারছো, আকাট?

অ্যাঁ! কি বলছেন?—ইভান্কো যেন আর্তনাদ করে উঠলো। তার চোখে ভ্রূকুটি।

ঠিকই বলছি।—গালাগাল করে ইভান্কোর ভূত ভাগাতে ভাগাতে কুর্জমিন বললেন ঃ সব ভেস্তে গেল! তাগাই পালিয়ে গেছে। আগামী বসন্তের মধ্যে আবার সে একটা দল খাড়া করবে, আবার শুরু করবে হামলা লুটপাট ডাকাতি। বুঝলে আনাড়ী হতচ্ছাড়া?

বজ্রাহত ইভান্কো। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে কুর্জমিনের দিকে। তার কানে বাজছে বুড়ো প্যানভের কথাগুলো ঃ যেসব ঈগল কখনো আগুনে পড়ে নি, তারা মুরগীরও অধম!

প্রথম পর্ব ৪

নিজের কৃতকর্মের ভয়ঙ্কর পরিণাম ইভান্কো যেন মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পায়। ভয়ঙ্কর এই সর্বনাশা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিবিধানের দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। এ থেকে পিছু হটার পথ নেই। দরকার হলে সে একাই যাবে তাগাইয়ের পেছনে।

ঘণ্টাখানেক বাদে চারজন সঙ্গী নিয়ে ইভান্কো ঘোড়ার পিঠে রওনা হলো তাগাই-য়ের অনুসরণে। কুর্জমিনের বারণ বা হুঁশিয়ারি কিছুই কানে তুললো না। সমস্ত বিপদের ঝুঁকি তাদের।

দুরন্ত ইস্‌ফাইরাম নদী পার হয়ে, পাথরের টিলা, ঢিবি আর পাহাড়ের মাঝ দিয়ে তারা এগোয় পর্বত-এলাকার দিকে। পথ এত সরু যে, দুজন লোকও ঠিক-মতো পাশাপাশি চলতে পারে না। অথচ এ ছাড়া পথও নেই।

সন্ধ্যা নামছে। ভীষণ কঠিন দুর্গম পথ। তবু তারা থামে না।

হঠাৎ সন্ধ্যার দিকে বাসমাচিদের প্রায় ঘাড়ের ওপর তারা এসে পড়লো। টিলা ও পাহাড়ের পেছনে গা ঢাকা দিয়ে বাসমাচিরা ওত পেতে ছিল।

সে রাত ও ভোরের দিন থেমে থেমে বন্দুকের লড়াই চললো দু পক্ষে।

ইভান্কোর সঙ্গীদের তিনজন জখম হলো। বাসমাচিদেরও একজন মারা পড়েছে। তারা পিছু হটলো।

ইভান্কোর সঙ্গী আছে আর মাত্র একজন। তাকে নিয়েই সে আবার পশ্চাদ্ধাবন করলো বাসমাচিদের। আহত সঙ্গী তিনজন ফিরে গেল।

উচ্‌-কুরগানে এখন শরতের গরম। কিন্তু পর্বত-রাজ্যের যত ওপরে তারা উঠছে, ততই বাড়ছে ঠান্ডা।

বরফ—জমাট বরফ সর্বত্র, আর তেমনি শীত। ঘোড়াকে জল খাওয়ানোর জন্যেও বরফ ভাঙতে হচ্ছে। দারুণ শীতে তাদের নিজেদের অবস্থাও অত্যন্ত কাহিল। এত কাহিল যে, তাদের হাতে যে বাসমাচিটা মারা পড়েছিল, শেষ পর্যন্ত তার গা থেকে গরম জামাকাপড় খুলে নিয়ে নিজেদের গায়ে চাপাতে হয়েছে।

তাগাইয়ের দল এক সময় কামেন্নী গিরিপথে এসে পেঁছিলো। দলে পনেরোজনের মধ্যে আর মাত্র সাতজন বাকী। কিন্তু ওপক্ষে ইভাস্কোর সঙ্গীও হঠাৎ মারা পড়লো মাথায় গুলি লেগে।

সাতজনের বিরুদ্ধে ইভাস্কো একা। নিজের মনে সে বিড়বিড় করে,—একশো শয়তানকেও আমি পরোয়া করি নে!

বাসমাচিরা পর্বতশ্রেণী পার হয়ে গেল। আর মৃত বন্ধুকে কবর দেবার জন্যে ইভাস্কো রয়ে গেল পেছনে।

কামেন্নী গিরিপথে তুষার-ঝঞ্ঝার মাতামাতি চলেছে। প্রচণ্ড তুষারপাতে বাসমাচি-দের চলার পথের সমস্ত চিহ্ন মুছে যায়। ইভাস্কো পথ হারালো। শিকারীদের এক পরিত্যক্ত আস্তানায় পুরো একটা দিন কাটাতে হলো তাকে।

গিরিশ্রেণী পার হয়ে তাগাই তখন দারাউত-কুরঘান বেড় দিয়ে পূব দিকে চলেছে। সীমান্ত পেরিয়ে আবার একবার কাশগড়িয়ায় পালানোর চেষ্টা করাই তার মতলব। কিন্তু হঠাৎ আবার এক পার্টিজান বাহিনীর বন্দুকের পাল্লার মধ্যে তারা এসে পড়লো।

তাগাই আবার পিছু হটলো। এবার সোজা ফিরলো দক্ষিণমুখো—দুর্লঙ্ঘ্য ভয়ঙ্কর পামীরের দিকে।

বাসমাচিদের চলার পথের নিশানা হারিয়ে তুষারাচ্ছন্ন ক্লান্ত অবসন্ন ঘোড়ার পিঠে ইভাস্কো দারাউত-কুরঘানে এসে পেঁছিলো একদিন পরে। তার নিজেরও কাহিল অবস্থা—আপাদমস্তক তুষারে আচ্ছন্ন। টলতে টলতে সে গিয়ে ঢুকলো গ্রামীণ সোভিয়েতের সভাপতির ঘরে।

মৌজ করে সভাপতি বসে আছেন। তাঁকে দেখেই সে খেঁকিয়ে উঠলো,—কী ব্যাপার! বাসমাচিরা এত কাছে এসে পড়েছে, আর আপনি কিনা বসে আছেন?

আকস্মিক রবাহূত আক্রমণে সভাপতি হকচকিয়ে যান। আগন্তুকের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন,—বসো, বসো। আগে এক কাপ চা হোক।

কিন্তু ইভাস্কোর তেমনি তিরিক্ষে মেজাজ,—অ্যাঁ, চা? মানে? মৌজ করে চা খাওয়ার সময় এখন? বাসমাচিদের এক্ষুণি পাকড়াও করা দরকার।

আগন্তুকের রোখরাখ দেখে সভাপতি বিব্রত বোধ করেন। চোখ কুঁচকে তিনি তাকালেন ইভাস্কোর দিকে। শেষে সংযত মোলায়েম কণ্ঠে আবার বললেন,—তা অত চিল্লাচ্ছ কেন? সব কিছুই আমরা জানি। শুনবে?

তাঁর কাছ থেকে ইভাস্কো শুনলো, কুজমিনের নির্দেশে কয়েকটি পার্টিজান দলকে আগেই পাঠানো হয়েছে তাগাইকে পাকড়াও করার জন্যে। তার আসার আগেই ওরা পেঁছে গেছে।

তাগাই শেষ পর্যন্ত কিভাবে নিষ্প্রাণ জনহীন ভয়ঙ্কর পামীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, সে কথাও জানালেন সভাপতি। শেষে বললেন,—তাগাই যেখানে গেছে, সেখানে না আছে রাস্তাঘাট, না আছে জনপ্রাণী, বসতি। শিকারীরা পর্যন্ত সে এলাকায় আজো ঢুকতে পারেনি।

সবিস্ময়ে ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে,—কোথায় তা?

দেয়ালে টাঙানো একটা মানচিত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন সভাপতি। তার একটা ফাঁকা জায়গায় টোকা মেরে বললেন,—এই এখানে।

কিন্তু জায়গাটা তো সাদা ফাঁকা দেখছি!—হতভম্ব ইভাস্কো প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, তাই।—নির্লিপ্ত কণ্ঠে সভাপতি বললেন ঃ একমাত্র বরফ আর তুষার, মৃত্যু আর হিমেল ঠাণ্ডা ছাড়া আর কিছুই নেই ওখানে।

আর কিছু নেই!—বিমূঢ় ইভাস্কো ঃ আপনি কি করে জানলেন, আর কিছু নেই? ঐ পথেই বাসমাচিরা যদি চীনে পাড়ি দেয়......

বলতে বলতে একটু ইতস্তত করে সে, তারপর আবার বলে,—নাঃ, এসব কোন কাজের কথা নয়! যেভাবে হোক ওদের পাকড়াতেই হবে।

কোন দরকার নেই। ওদের মৃত্যু নির্ঘাত।—নিরুত্তাপ কণ্ঠ সভাপতির।

ইভাস্কো ততক্ষণে মন স্থির করে ফেলেছে। সে চটে উঠলো,—কিন্তু মনে করুন, তা যদি না হয়? নিশ্চয় করে আপনি কিছুই বলতে পারেন না।

বলতে বলতে সে এগিয়ে গেল সভাপতির কাছে, নীচু নিরুত্তাপ গলায় বললে,—শুনুন, কুর্জমিনের কাছে আমি হলপ করেছি, তাগাইকে জ্যান্ত বা মরা যে কোন অবস্থায় ধরে আনবোই। বুঝলেন?

বু-ঝে-ছি!—টেনে টেনে সভাপতি উচ্চারণ করেন কথাটা। তারপর ছেলেকে ডেকে বললেন ঃ আইভ্যানকে খবর দে তো। বইপত্র মানচিত্র সব নিয়ে আসতে বলিস্।

ঘরের এক দিকে মোটা পশমের পরদা ঝুলছে, দরজা হিসেবে সেটা ব্যবহার করা হয়। তার পেছনে ছেলেটা অদৃশ্য হলো।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইভাস্কো তাকায় সভাপতির দিকে। তার চোখে চোখ পড়তে সভাপতি বললেন,—কি, আইভ্যানের পরিচয় জানতে চাইছো? আইভ্যান এখানকার কো-অপারেটিভের হিসাবরক্ষক। পামীর সম্বন্ধে তার জ্ঞান যথেষ্ট। সব জায়গায় সে গেছে, দেখেছেও সব কিছু। তার সাহায্যেই বাসমাচিদের তিনটে বড় দলকে একসময় আমরা পাকড়াও করেছিলাম।

হিসাবরক্ষক!—ইভাস্কো যেন আকাশ থেকে পড়ে। উত্তেজনায় ঘরময় পায়চারি করতে করতে শেষে বললে,—তার মানে, আপনি কি বলতে চান যে, এই ধরনের কাজ-কর্মে আপনাকে সাহায্য করছে একজন হিসাবরক্ষক?

সভাপতি এড়িয়ে যান কথাটা।

বাইরে ঘোড়ার খুরের খটাখট্ আওয়াজ শোনা গেল।

একটু পরেই ঘরে ঢুকলো বেঁটে শীর্ণকায় একজন লোক। তার কাঁধ থেকে একটা ব্যাগ ঝুলছে। ইভাস্কোর আপাদমস্তক সে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়।

সভাপতি এককাপ চা বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে।

কিন্তু ইভাস্কোর তখন তর সইছে না। হিসাবরক্ষক কাপটা নেবার জন্যে হাত বাড়াতেই, ইভাস্কো হঠাৎ ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলে কাপটা।

সভাপতি প্রথমে হতভম্ব, তার পরেই রাগে ফেটে পড়লেন,—অ্যাঁ, এটা কি হলো? এ কী ধরনের বেয়াদপি! এর মানে কি?

'মানে' নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই ইভাস্কোর। আদবকায়দার দিকে নজর দেবার ফুরসুতেরও একান্ত অভাব। উত্তেজনায় টগবগ করতে করতে সে জবাব দেয়,—এখন চা খাওয়ার সময় নয়!

বলতে বলতে আইভ্যান হিসাবরক্ষকের কাঁধ সজোরে চেপে ধরে সে বললে,—খুবই জরুরী ব্যাপার, বুঝলেন! জলদি বলুন, কোথায় কিভাবে বাসমাচিদের নাগাল পাওয়া যায়!

ধাক্কা মেরে ইভাস্কোর হাত সরিয়ে দিলে আইভ্যান। তার যা চেহারা, তাতে অত জোর কিন্তু তার কাছ থেকে আশা করা যায় না। ইভাস্কো একটু থতমত খেয়ে যায়।

নীরবে আইভ্যান ব্যাগ থেকে বের করলো জীর্ণ দুখানা বই আর কয়েকখানা ম্যাপ। জলবাতাসের স্যাঁতসেঁতে দাগ বই ও ম্যাপগুলোর সর্বাঙ্গে।

পশমের দরজার গায়ে একখানা ম্যাপ টাঙিয়ে, সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ধীরে সুস্থে আইভ্যান বললে,—বাসমাচিরা যেতে পারে দু পথে। হয়, তাদের সোজা পর্বত-এলাকায় ঢুকতে হবে, কিন্তু সেখানে না আছে বসতি, না আছে কোন জনপ্রাণী, এমন কি ঘোড়াকে খাওয়ানোর মতো দানাপানিও নেই; তাই মৃত্যু সেখানে অবধারিত। আর না হয়তো তাদের ফিরতে হবে সেখান থেকে এবং গিয়ে পড়তে হবে পার্টিজানদের হাতে।

কিন্তু আপনি কি করে জানলেন, ওখানে ঐ পর্বত-এলাকায় জনমানব নেই?—ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে।

একখানা বইয়ের ওপর টোকা মারতে মারতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হিসাবরক্ষক বললে,—এই বইতে লেখা আছে পামীর সম্বন্ধে। সুদূর অতীতে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের কয়েকটা অগ্রগামী বাহিনী ওখান পর্যন্ত গিয়েছিল, কিন্তু মারা পড়েছিল সবাই।

নির্লিপ্ত উদাসীন কন্ঠ হিসাবরক্ষকের। চিবিয়ে চিবিয়ে থেমে থেমে সে বলে চলেছে।

ইভাস্কো তাড়া দেয়,—তারপর?

—আলেকজাণ্ডারের বহু শতাব্দী পরে ভিনিসীয় বণিক মার্কো পোলো অনেক কষ্টে ঐ পর্বত এলাকা পার হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পার হলেও, তাঁর কাফেলার একটা অংশ ধ্বংস হয়েছিল। মার্কো পোলোই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ঐ অঞ্চল সম্পর্কে কিছু লিখে গেছেন। তাঁর লেখা থেকে পড়ে শোনাচ্ছি।

বইখানা খুলে হিসাবরক্ষক পড়তে শুরু করে,—সেখানে, ঐ পর্বত-অঞ্চলে দু-চারটে কুড়েঘর এখানে ওখানে দেখা যায়। একদল বুনো পৌত্তলিক সেখানে বাস করে। তারা অত্যন্ত বর্বর। শিকারই তাদের একমাত্র জীবিকা। কাপড়ের বদলে তারা পরে বুনো পশুর চামড়া..... পুবে পথ চলে গেছে পর্বত থেকে পর্বতে। পর্বতের পর পর্বতশ্রেণী। অসংখ্য—আকাশ-ছোঁয়া—ভয়ঙ্কর। যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে মনে হবে, চারপাশের গিরিচুড়োগুলোই বুঝি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু চুড়ো।

আরো পড়ার ইচ্ছে ছিল হিসাবরক্ষকের। কিন্তু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বাধা দিলে ইভাস্কো,—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু আপনি নিজে কখনো গেছেন সেখানে?

না।—আইভ্যান বললে ঃ সেখানে যাইনি বটে, তবে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছি বেশ কয়েকবার।

আচ্ছা, আচ্ছা! তারপর?—ইভাস্কো উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে বললে।

—সেখানে মানুষ থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আগেকার বাসিন্দারা মনে হয় অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। বহুকাল পামীর এলাকায় কাজ করেছি। সে সময় এমন একজন লোকেব সন্ধান পাই নি, যে ওখান থেকে এসেছে বা ওখানে ঢুকতে পেরেছে। জনপ্রাণীহীন ভয়ঙ্কর ও জায়গা। লোকে বলে, ওখানে গার্মো নামে এক ধরনের পর্বতশ্রেণী আছে, বাসমাচিরা সেখানে ঢুকলে নির্ঘাত মারা পড়বে।

আইভ্যান থামতেই শুকনো ভাঙা গলায় ইভাস্কো বললে,—দেখুন হিসাবরক্ষক মশাই, আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না। জায়গাটা যে ভয়ঙ্কর তাতে সন্দেহ নেই। তবু বলছি কি, চলুন না আমরা দুজনে একসঙ্গে আবার যাই ওখানে, আবার একবার যাচাই করে দেখা যাক না! বরাত হয়তো খুললেও খুলে যেতে পারে। যাবেন? কোন কাজ একবার হাতে নিলে আমি আবার শেষ না দেখে ছাড়তে পারি নে।

আইভ্যান মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয়, সে রাজী নয়। নীরবে ম্যাপগুলো ভাঁজ করে থলি কাঁধে ফেলে ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আর ইভাস্কো নির্বাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সভাপতির দিকে।

সভাপতি চিন্তিত। তাঁর কপালের ভাঁজগুলো আরো গভীর হয়ে উঠেছে। শেষে ভ্রূ কুঁচকে নিজের মনে বিড়বিড় করে তিনি বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে ঠিক তোমারই মতো আর একজন আছে এখানে।

ছেলেকে তিনি বললেন মুসাকে ডেকে আনতে।

একটাকে তো দেখলাম। এটি আবার কোন্ ধরনের?—ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে।

—কোজুবে'র বাহিনীর একজন পার্টিজান। জখম হয়ে এখানে চিকিৎসার জন্যে এসেছিল। এখন সুস্থ। কয়েক দিনের মধ্যেই আবার নিজের ফৌজে ফিরে যাবে। পার্টিজানরা তাকে বলে 'পাগলা'। কোন কিছুতেই ভয়ডর নেই, জানেরও পরোয়া করে না, যাকে বলে বেপরোয়া। তেমনি আবার ওস্তাদ ঘোড়সওয়ারও বটে।

মিনিট দশেক পরে দীর্ঘকায় এক কিরঘিজ যুবক ঘরে ঢুকলো। একটা কাঁধ সামনের দিকে বাড়িয়ে এমনভাবে ঢুকলো, যেন ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসছে। গায়ে তার ইয়াক বা চমর গরুর হলদে চামড়ার পোশাক, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বুঝি বর্ম পরে আছে। মুখে ছোট্ট একটুখানি কালো দাড়ি আর গোঁফ, আর তার ফলে চেহারায় ভারিক্কী ভাবটা বেশ প্রকট। ডান হাতে কারুকাজ করা কাঠের হাতলওলা চাবুক একখানা। ওটা তার সর্বসময়ের সঙ্গী।

সভাপতি তাকে ডাকার কারণ খুলে বললেন।

মুসা সঙ্গে সঙ্গে রাজী। বললে,—ঠিক আছে, আমি যাব। কিন্তু আমিই হবো দলের নেতা।

তার হাবভাব কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইভাস্কো কি বলবে, না বলবে; সেদিকে আমল দেবার দরকার আছে বলে সে মনে করে না।

ভ্রূকুটি করে ইভাস্কো বললে,—কুজমিনের নির্দেশে আমি কাজ করছি। সুতরাং আমিই হবো নেতা।

মুসা নির্বাক, নির্বিকার। চোখের পাতাটা পর্যন্ত নড়ছে না।

একটু অপেক্ষা করে ইভাস্কো বললে,—কি, জবাব দিচ্ছ না যে! তোমার শেষ কথা শুনতে চাই।

পরক্ষণে জবাবের অপেক্ষা না করেই সে টিপ্পনী কাটলে,—অবশ্যি ভয় পেয়ে থাক তো অন্য কথা।

এবারও মুসা নির্বিকার, একবার শুধু নীরব দৃষ্টিতে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ইভাস্কোর আপাদমস্তক যাচাই করে নিলে।

শেষ পর্যন্ত ইভাস্কো বললে,—ঠিক আছে, আমি একাই যাব।

লম্বাচওড়া বুলি বা বেশী কথা মুসা পছন্দ করে না। ইভাস্কোর দিকে ফিরে সে বললে,—বেশ, আমি যাব তোমার সঙ্গে। কিন্তু কথা রইল, কেউ কারো ওপর মাতব্বরি ফলাতে পারবো না।

বেশ, ভাল কথা।—ইভাস্কো রাজী হয়। দুজনে করমর্দন করে অন্তরঙ্গভাবে।

এবার রওনা হবার ব্যবস্থা। মুসা কি যেন ভাবলে ক্ষণকাল, তারপর বললে,—শুনুন সভাপতিমশাই, আপনি বেশ জানেন যে, ঘোড়ার পিঠে জাল্লাই পর্বতশ্রেণী পর্যন্তও যাওয়া সম্ভব নয়। এ জন্যে দরকার ইয়াক—সবচেয়ে ভাল দুটো ইয়াক। এ

রকম দুটো ইয়াক আছে আপনার এখানে। কালো শিংভাঙা ষাঁড় একটা, অন্যটাও ষাঁড়—গায়ে ছিটছিট দাগ, নাকচেরা। ঐ দুটো আমাদের দিতে হবে।

কক্‌খনো না!—সভাপতি যেন আর্তনাদ করে উঠলেন ঃ অসম্ভব কথা! সারা উপত্যকায় ওরাই সবচেয়ে সেরা ষাঁড়, কিছু দিন আগে সেই মুরগাব থেকে আনা হয়েছে। তোমাদের দিলে হয়তো মারাই পড়বে। আর তার জন্যে কৈফিয়ৎ দিয়ে মরতে হবে......

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন সভাপতি, ইভাস্কো বাধা দিলে,—আপনি তাহলে ধরে নিয়েছেন, আমরা মারা পড়বো, অর্থাৎ আগেভাগেই আপনি আমাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রাখছেন!

বিদ্রূপ ও রাগ ইভাস্কোর কণ্ঠে।

ইভাস্কোকে চোখ টিপে ইশারা করে কৌতুকতরল কণ্ঠে মুসা বললে,—আরে না না, তুমি জান না, সভাপতিমশাই আমাদের সঙ্গে মস্করা করছেন। উনি ভাল করেই জানেন যে, বাকী জীবনটা ওঁকে শান্তিতে কাটাতে হলে ষাঁড় দুটো না দিয়ে উপায় নেই, নয়তো এমন গুরুতর ফ্যাসাদে ও'কে পড়তে হবে যে, শান্তি বলে কোন বস্তু আর জীবনে থাকবে না। এ ইয়াক দুটো যতদূর যেতে পারবে, অন্যগুলো যে তা কখনই পারবে না, তাও ও'র বিলক্ষণ জানা আছে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সভাপতি হাত নেড়ে মুসাকে থামিয়ে দিয়ে নাচার কণ্ঠে বললেন, —হয়েছে হয়েছে! থাম বাপ! ক্ষ্যান্ত দাও এবারের মতো। লোকদের বলে দিচ্ছি, ইয়াক দুটোকে ভাল করে বিচালি-ভুসি দিতে আর জিন পরিয়ে রাখতে। এখন যাও, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো গে। আজই মনে হয় শেষ রাত, যার পর তোমরা বোধহয় আর শান্তিতে ঘুমুতে পারবে না।

পর দিন। ভোরের আলো ফুটতেই ঘোড়ার বদলে ইয়াকে চড়ে ইভাস্কো মুসাকে নিয়ে রওনা হলো বাসমাচিদের পেছনে। এই প্রথম তার ইয়াকের পিঠে চাপা। ভারী তাজ্জব ঠেকছে। তার সামনে প্রকাণ্ড এক জোড়া শিং। লাগামের বদলে একটা দড়ি ধরে জানোয়ারটাকে চালাতে হচ্ছে। দড়িটা গেছে ওর নাকের ভেতর দিয়ে। একই রকমের সুপুষ্ট প্রকাণ্ড আর একটা ষাঁড়ের পিঠে মুসা চলেছে আগে আগে।

ক্রমে ক্রমে তারা আলাই উপত্যকার গভীর তুষার পার হলো। দূরে দেখা যায় জালাই পর্বতশ্রেণী। সেই দিকেই তারা চলেছে। পামীর এলাকা সম্পর্কে মুসা অভিজ্ঞ। কিন্তু ইভাস্কো যে অঞ্চলে চলেছে, সেখানকার পথঘাট তার কাছেও অজানা—সম্পূর্ণ নতুন।

তারা স্থির করেছে, জালাই পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত গিয়ে তুজ্‌-সু নদীর কাছে বাসমাচিদের পথের নিশানা খুঁজে দেখবে।

প্রথম পর্ব ৫

তাগাই ও তার দল শেষ গ্রামখানা পেছনে ফেলে এসেছে অনেক দিন আগে। পামীরের জালাই পর্বতশ্রেণীর ভেতর দিয়ে চলেছে বেশ কিছুকাল। পথঘাটের চিহ্নও নেই। ইয়াকের ঘ্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে তারা যাচ্ছে দক্ষিণমুখো।

দুর্লঙ্ঘ্যপ্রায় উত্তুংগ পর্বতরাজ্য। মৃত্যুপুরীর মতো তুষারশীতল—নিস্তব্ধ নির্জন।

আকাশছোঁয়া এইসব গিরিশ্রেণীর গোলকধাঁধার মাঝে কোথায় যেন আছে সেই নিঃসংগ গ্রাম মিন-আরখার, তাগাই তাকে খুঁজে ফিরছে। ফার ও সোনার গুঁড়ো সংগ্রহের জন্যে সেখানে সে বেশ বছর কয়েক আগে গিয়েছিল বাবার সংগে। বাইরের দুনিয়া সে গ্রামের কোন খবর জানে না।

ব্যবসায়ীর ছেলে হয়েও তাগাই ব্যবসায়ী নয়। ওসব ব্যবসাপত্র হিসেবনিকেশ কোন কালেই তার ধাতে সয় না। ও ধরনের নিরামিষ দিন গুজরান অসহ্য তার কাছে। তাই সে নিয়েছে ভিন্ন পথ এবং নিজেকে তৈরিও করেছে সেইভাবে।

দিনের পর দিন দলবল নিয়ে সে ক্রমেই ওপরে উঠেছে—উঁচু থেকে আরো উঁচুতে। শেষে একসময় চিরন্তন তুষারের দুনিয়ায় গিয়ে হাজির হলো তারা। পাতলা ভিজে তুষার এখানে, পোষাকপরিচ্ছদে জমাট বেঁধে যায়,—চলতে ফিরতে বিষম কষ্ট।

কোঁকড়া-কড়া-লোমওলা একটা ইয়াক চলেছে দলের আগে আগে। তাগাই একটা কুকুর কোলে নিয়ে তার পিঠে বসে আছে। তার পেছনে আসছে আর একটা ইয়াক। তুষার-প্রদাহে অসাড় একজন বাসমাচি তার পিঠে। দলের লোকদের রাইফেলগুলোও সব ঐ ইয়াকের পিঠে চাপানো। দুঃসহ ঠাণ্ডায় অসাড় হাত লোকগুলোর, রাইফেল ধরার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে।

দলে এখন সবসুদ্ধ মাত্র পাঁচজন লোক। বলশেভিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাওয়ায় তাগাই দুজনকে গুলি করে মেরেছে। বাকী বাসমাচি তিনজন ইয়াকের পেছনে আসছে ধুঁকতে ধুঁকতে। নিদারুণ অবসাদে টলছে তারা।

নরম পুরু তুষার ঠেলে এগোনো দুষ্কর। প্রতিটি পদক্ষেপ যন্ত্রণাদায়ক। মাছের মতো হাঁ করে খাবি খাচ্ছে লোকগুলো, তবু শ্বাস নেবার মতো যথেষ্ট বাতাস মিলছে না। পিপাসার কষ্টও নিদারুণ। ঠাণ্ডায় জিভ ফুলে কালো হয়ে গেছে. তবু দুঃসহ পিপাসায় বরফ পর্যন্ত গিলতে হচ্ছে।

কুকুরটাকে ইয়াক থেকে ফেলে দেবার জন্য তাগাইয়ের কাছে তারা একসময় কাকুতি-মিনতি করেছিল, বলেছিল,—কুকুরটার বদলে আমাদের এক-একজনকে পালা করে ইয়াকের পিঠে বিশ্রাম করার সুযোগ দেওয়া হোক।

তাগাই রাগে খেঁকিয়ে উঠেছিল,—তাহলে পাহারা দেবে কে?

এর ওপর আর কথা চলে না। নিজের লোকদের ওপরও তাগাইয়ের এখন আর আস্থা নেই।

দুদিনের পথ পেছনে বাসমাচিদের পথের নিশানা ধরে ইয়াকের পিঠে আসছে ইভাস্কো আর মুসা।

এ পর্যন্ত তারা দিনের বেলায়ই পথ চলেছে। পথে একের পর এক চারটে মরা ঘোড়া পড়েছে। তা নিয়ে তারা অবশ্য বিশেষ মাথা ঘামায় নি। কারণ তাগাই যাচ্ছে ইয়াকের পিঠে। কিন্তু এবার পাঁচবারের বার যে মরা ঘোড়াটা পড়লো, তার গা থেকে সদ্য সদ্য সমস্ত মাংস কেটে নেওয়া হয়েছে দেখে, তারা চমকে উঠলো। বুঝলো, তাগাই আর খুব বেশী দূরে নেই। দিনের বেলায় পথ চলা তাই আর নিরাপদ নয়, বাসমাচিদের নজরে পড়তে পারে।

এখন থেকে রাতে পথ চলবে ঠিক করে, তারা নেমে পড়ে ইয়াক থেকে।

ইয়াক দুটো ছাড়া পেতেই পায়ের খুর দিয়ে তুষার আঁচড়াতে লেগে যায়। সুউচ্চ পার্বত্য তুন্দ্রার তুষার-চাপা শুকনো ঘাস আর জমে-যাওয়া শৈবাল খুঁড়ে বের করার চেষ্টা করছে তারা খাওয়ার জন্যে।

সওয়ার দুজনও শক্ত পাঁউরুটি আর শুঁটকী মাংসের পাতলা-করে-কাটা টুকরো দিয়ে খাওয়া শেষ করলো।

মুসা অবসন্ন হয়ে পড়ছে। একবার সে ফিরে যাবার প্রস্তাবও করেছিল। কিন্তু ইভাস্কো আমল দেয় নি। ক্লান্ত অবশ্য সে-ও কম নয়। কিন্তু প্রতিজ্ঞা-রক্ষার দৃঢ়তায় সে অবিচল। সেই মনের জোরই তাকে খাড়া রেখেছে। দৃঢ়কণ্ঠে সে বলেছিল,— সরীসৃপগুলোকে আগে খতম করতে হবে, তারপর ঘরে ফেরার কথা।

এক দিন সকালে হঠাৎ তারা দেখে, দূরে এক তুষার-ঢাকা পর্বতচূড়োর কাছে কালো কালো কয়েকটা বিন্দু বরফের ওপর দিয়ে ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। কোন জন্তু-জানোয়ারের সেখানে থাকা সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই ওরা বাসমাচি।

মুসা সব কাজে প্রথম হতে চায়। তক্ষুণি সে গুলি ছুড়তে গেল। ইভাস্কো বাধা দিয়ে বললে,—উঁহু এটা ঠিক হবে না। রাইফেলের পাল্লা থেকে ওরা এত দূরে আছে যে, গুলি লাগবে কিনা সন্দেহ। উল্টে, গুলির আওয়াজে ওরা সতর্ক হয়ে যাবে।

দুদিন পরে তারা বাসমাচিদের নাগাল ধরে ফেললে। তখন আঁধার ঘনিয়ে আসছে। দলটা থেমেছে রাতের বিশ্রামের জন্যে।

ইভাস্কো ও মুসা পরামর্শ করে নিজেদের মধ্যে।

অন্ধকার গাঢ় হতেই ইভাস্কো কয়েকটা গ্রেনেড নিয়ে শক্ত বরফের ওপর দিয়ে সংগোপনে এগিয়ে গেল বাসমাচিদের তাঁবুর দিকে।

ধীরে ধীরে সে এগোয়। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নেয় কিছুক্ষণ। দূরত্ব আর অল্পই বাকি, হঠাৎ একটা কুকুর ডাকতে শুরু করলে।

কুকুর! থমকে গেল ইভাস্কো। মনে মনে বললে,—ধূর্ত শয়তান! চৌকি দেবার জন্যে কুকুরও একটা সঙ্গে রেখেছে!

আর এগোনো চলে না। তুষার-ঢিবির পেছনে ছায়ায় ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে সে ফিরে এল।

পেছন থেকে এভাবে এগোনো যে সম্ভব নয়, তা স্পষ্ট। তাই তারা স্থির করে, বেড় দিয়ে ঘুরে সামনে গিয়ে বাসমাচিদের জন্যে ওত পেতে থাকবে।

পরিষ্কার রাত্রি। ঝির ঝির তুষার পড়ছে। ঝুলন্ত হিমবাহের পেছন থেকে চাঁদ উঠলো। হাজার হাজার পাতলা তুষার-ফলক ঝলমল করে উঠলো আগুনের মতো।

এই সেই পর্বত আর এই তার সেই দীপ্ত ঝুলন্ত হিমবাহ, যার থেকে কিছু দূরে রয়েছে সেই ভুলে-যাওয়া নিঃসঙ্গ গ্রাম মিন-আরখার, চাঁদের আলোতেও যার অস্তিত্ব টের পাওয়া দুষ্কর। এরই অদূরে ইভাস্কো আর মুসা গা ঢাকা দিয়ে থাকবে, ঠিক করলে।

ইভাস্কো আর মুসাই সেই দুই রহস্যময় পুরুষ, জুরা যাদের আর একটা পর্বতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল।

নষ্ট করার মতো তাদের সময় নেই। খাদ্যের মজুত শেষ হয়ে আসছে। দিন দিন রোগা আর অবসন্ন হয়ে পড়ছে ইয়াক দুটো। তারা নিজেরাও এত ক্লান্ত যে, সারাক্ষণ শুধু ঘুমুতে ইচ্ছে হয়। পালা করে ঘুমোয় তারা। ঘুমের মাঝে তুষারে জমে যেতে পারে, সেই ভয়ে একে অপরকে প্রায়ই ঘুম থেকে টেনে তোলে।

প্রথম পর্ব ৬

গা ঢাকা দিয়ে আছে ইভান্কো ও মুসা, হঠাৎ বাসমাচিদের গলা শুনে সচকিত হয়ে উঠলো।

বাসমাচিরা কাকে যেন জিজ্ঞেস করছে,—হেই, কে রে তুই ওখানে?

পরক্ষণে পাশের পর্বত থেকে কানে এল এক পুরুষ কণ্ঠ: আমি জুরা, শিকারী।

কী ব্যাপার! ইভান্কো ও মুসা হকচকিয়ে যায়: কে এই জুরা?

হাতিয়ারপত্রে সজ্জিত হয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যেতেই তারা অদূরবর্তী পর্বতের টিলা-ঢিবির আড়ালে দেখতে পেল জুরা ও বাবুকে।

বিস্মিত হতভম্ব তারা। কে এই তরুণ, 'জুরা শিকারী' বলে যে নিজের পরিচয় দিচ্ছে? কোথা থেকেই বা এল? দুরধিগম্য এই আকাশস্পর্শী সুদূর পর্বত-মুলুক কি তাহলে জনহীন নয়? এখানেও বাস করে—মানুষ!

বাসমাচিদের সঙ্গে শিকারী জুরার কথা কাটাকাটি তারা স্পষ্ট শুনতে পায়। তার-পরেই ঘটলো শিকারীর অন্তর্ধান।

চাঁদও উঠলো এই সময়। শিকারীকে দেখা গেল, একটা তুষার-ঢিবির ওপর অক্ষত দেহে বসে আছে।

তাকে দেখে বাসমাচিরা চিৎকার করে গুলি ছুড়তে শুরু করতেই পর্বত-রাজ্যে দেখা দিল সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ড। চোখের পলকে সাংঘাতিক বজ্র-নির্ঘোষের সঙ্গে ওপর থেকে ভেঙে পড়লো তুষার, বরফ ও পাথরের প্রচণ্ড ধস ও প্লাবন। মহাভয়ঙ্কর হিমানী-সম্প্রপাত শুরু হলো।

আতঙ্কে দিশেহারা মুসা ও ইভান্কো—বলতে গেলে কিছু না বুঝেই শুয়ে পড়লো উপুড় হয়ে।

তারপর একসময় হিমানী-সম্প্রপাতের গর্জন থামতে পর্বতের মাথায় যে তুষারের গাদা জমেছিল, সেটা নড়ে উঠলো। পরক্ষণে ইভান্কো বেরিয়ে এল তার নীচে থেকে।

পাশের তুষারের গাদায় ঠেলা মেরে সে হাঁক ছাড়লে,—ওঠ হে, যাওয়া যাক!

মুসা বেরিয়ে এল। গা ঝাড়তে ঝাড়তে চোখের ওপর থেকে তুষার সরিয়ে সে বললে,—তারপর?

ইভান্কো বললে,—জোর বরাত যে, মূল হিমানী-সম্প্রপাত যেখানে ঘটেছে, আমরা তার বাইরে ছিলাম। আগে সেখানে যাওয়া যাক, কি বলো?

হিমবাহ থেকে যে প্রচণ্ড পরিমাণ তুষার নেমেছিল, ইতিমধ্যে তা বিরাট বিরাট বরফের চাংড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢিবির আকারে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে স্তূপাকার হয়ে।

ঢিবিগুলোর ভেতর দিয়ে তারা এগোয়। হঠাৎ একটা কুকুরের কেঁউ-কেঁউ ডাক কানে এল। এক ঢিবির ওদিকে কুকুরটা বসে আছে। তার গায়ের লোম লাল, মাঝে মাঝে সাদা সাদা ছিট। গলার দড়ি ভারী এক বরফের চাংড়ার নীচে আটকে গেছে। মুসা দড়িটা কেটে দিতেই কুকুরটা একলাফে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল, অথচ একটু আগেও ওদের ওপর তার হম্বিতম্বির অন্ত ছিল না।

যেদিকে তাকানো যায়, শুধু বরফ—নিস্তব্ধ প্রাণহীন। হিমকণার মেঘ পর্দার মতো বাতাসে ঝুলছে, দূরে নজর যায় না। ইভাস্কো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে : যাক্, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, হিমানী-সম্প্রপাতেই খতম হয়েছে বাসমাচিরা।

তারা ফিরে এল ইয়াক দুটোর কাছে। স্থির করলো, তরুণ শিকারীটি যেদিকে গেছে, সেদিকেই যাবে।

এ ছাড়া উপায়ই বা কি?

তারা রওনা হয়।

অবসন্ন ইয়াক দুটো থেকে থেকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে, ফোঁস ফোঁস আওয়াজ ছাড়ছে নাক দিয়ে। দুই চোখ রক্তলাল।

পুরু তুষারেব ওপর কোন পথ নেই। জানোয়ার দুটো সহজাত সংস্কারের বলে পথ করে নিয়ে চোখ পাকাতে পাকাতে এগিয়ে চললো।

বাসমাচিরা মারা পড়েছে ধারণা হতেই, নিদারুণ অবসাদ এসে ইভাস্কোকে যেন চেপে ধরেছে। অজানা এই পর্বত-মুল্লুকের আকস্মিক বিপদ-আপদ সম্বন্ধেও সে এখন উদাসীন।

বাসমাচি কুকুরটা হঠাৎ ডেকে উঠলো। কাছাকাছি কোথাও সে বোধহয় জীবন্ত কোন কিছুর অস্তিত্ব টের পেয়েছে। ইয়াক দুটোও বাঁক নিয়ে আরো জোরে ছুটতে শুরু করেছে।

দূরে তুষারের ওপর একটা কালো বিন্দু নড়ছে মনে হলো।

ভল্লুক!—শুকনো গলায় মুসা বললে।

ক্লান্ত অবশ হাতে তারা রাইফেল টেনে নেয়। কিন্তু কিছুটা যেতেই চমকে উঠলো : কয়েকটা ছোট ছোট কুঠি! তাদের ছাদ দেখা যাচ্ছে।

গ্রাম! স্তব্ধ বিস্ময়ে ওরা তাকায় পরস্পরের দিকে। এত উঁচুতে দুর্লঙ্ঘ্য এই পর্বত-রাজ্যের সুদূর নিভৃত কোণে কোথা থেকে এল এই নিঃসঙ্গ গ্রাম! মানুষ বাস করে নিশ্চয়ই! দূর থেকে গাঁয়ের ধোঁয়াবেই তারা কালো বিন্দু বলে মনে করেছিল।

পরনের ট্রাউজার তুষারে জমে জিনের সংগে সেঁটে গেছে। অতি কষ্টে ট্রাউজার ছাড়িয়ে তারা নেমে পড়লো। ইয়াক দুটোও সংগে সংগে শুয়ে পড়লো বিশ্রামের জন্যে।

পা দুটো অবশ। এখন কি করণীয়? চোখের ইশারায় নিঃশব্দে কর্তব্য স্থির করে হোঁচট খেতে খেতে তারা কোন রকমে একটা কুঠুরীর ছাদে গিয়ে উঠলো, ছিদ্র-পথে তাকালো ভেতরের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই হটে এল—বিজাতীয় উৎকট দুর্গন্ধে দম যেন আটকে আসে।

ওরা হকচকিয়ে যায়। মুসা ফিসফিস করে বললে,—গুলজান!

অনেকগুলো কুকুরের মিলিত চিৎকার কানে আসছে। অজানা দেশ। কুঠিগুলো কাদের জানা নেই। হতভাগ্য বাসমাচিরা হয়তো এখানে থাকতো। কিংবা অসভ্য বর্বরদের আস্তানাও হতে পারে। আজ রাতে তাদের হাতেই হয়তো ওদের প্রাণ যাবে।

কিন্তু পেছোবারও তো পথ নেই। কোথায় যাবে? হয় নিশ্চিত মৃত্যুর মাঝে ফিরে যেতে হবে, সেখানে আছে তুষার, বরফ, হিমশীতল ঠাণ্ডা আর অনাহার, আর নয়তো ঐ কুঠুরীতে ঢুকতে হবে। তারা তাকায় চারদিকে। হিমাচ্ছন্ন নীল রাত্রির আকাশে বাতাসে অজানা বিপদ আর মৃত্যু যেন ওত পেতে আছে।

শেষ পর্যন্ত ইয়াকের লেজের লোমে তৈরী দড়ির একটা মই বেয়ে ইভাস্কো কামরার মধ্যে নামতে শুরু করে। ভেতরটা বেশ গরম।

এই, কে আছ ভেতরে?—সে হাঁক ছাড়লে।

জবাবে ফিরে এল ক্ষিপ্ত একপাল কুকুরের মিলিত চিৎকার। কুকুরগুলো মইয়ের তলায় এসে জড়ো হয়েছে। তীক্ষ্ন শব্দ উঠছে তাদের দাঁতে দাঁত লেগে। শরীরের ভেতরকার পাঁজরাগুলো দেখাচ্ছে বাঁকা ধনুকের মতো—যেন স্পষ্ট গোনা যায়। চাপ-বাঁধা গায়ের লোম চকচক করছে মরা জোছনায়।

মইয়ের ওপর দোল খেতে খেতে রিভলবার উঁচিয়ে ইভাস্কো আবার চেঁচিয়ে উঠলো,—এ-ই! কে আছ এখানে?

কিন্তু ক্ষুধার্ত কুকুরদের উন্মত্ত চিৎকারে তার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। সযত্নলালিত সুপুষ্ট এক অপরিচিত কুকুর বাইরে উপস্থিত টের পেয়ে, ওরা যেন রাগে ক্ষেপে উঠেছে।

নিরুপায় অবস্থা। ধোঁয়া বেরোবার পথ দিয়ে ইভাস্কো রিভলবারের ফাঁকা আওয়াজ করলে। সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ। সেই ফাঁকে মুসা কামরার বাসিন্দাদের উদ্দেশে কিরঘিজ ভাষায় কথা বলতে শুরু করে।

একটু পরেই কামরার ভেতরকার চুল্লির আগুন জোরে জ্বলে উঠলো। কে একজন তাড়িয়ে দিলে কুকুরগুলোকে।

রিভলবার হাতে মেঝেতে লাফিয়ে পড়েই ইভাস্কো একটা গ্রেনেড টেনে বের করলে।

পেছনে পেছনে মুসা নেমে এল কুকুরটাকে নিয়ে। ইভাস্কোর হাত চেপে ধরে বললে,—ঘাবড়াও মাৎ! হাতিয়ার সব সরিয়ে নাও। বাসমাচিরাও যদি এখানে থাকে, নিজের আস্তানায় তারা আমাদের গায়ে হাত তুলবে না। এটা মুসলমানী আইন—শরীয়তের নির্দেশ।

অন্ধকারের ভেতর থেকে বাসিন্দারা সাবধানে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। চুল্লিতে আগুনের শিখা বাতাসে কাঁপছে। ঘরের ঝুলকালিভরা নোংরা থামগুলোর গায়ে দেখা যায় আলো-ছায়ার খেলা—নানা ছবির আনাগোনা।

গাঁয়ের প্রতিটি বাসিন্দার বুকে ভূতপ্রেত তাড়ানোর তাবিজ। জুরার মা আয়েশা বুড়ি মন্ত্র আওড়াচ্ছে ফিসফিস করে। আগন্তুকদের দুর্বোধ্য কথাবার্তা তার কানে ঠেকছে জাদুমন্ত্রের মতো। ওরা কারা কে জানে! হয়তো সত্যিকারের মানুষই নয়, হয়তো জিন বা খবিশ!

ইভাস্কো ঠকঠক করে শীতে কাঁপছে. যে থামে সে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কাঁপছে সেটাও। মুসার কথা বা শরীয়তী আইনের ওপর তার আস্থা নেই। রিভলবার চেপে ধরে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। লোকগুলো অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে তাকে দারুণ উত্তেজিত করে তুলছে।

সাহসে ভর করে পায়ে পায়ে আয়েশা বুড়ি এগিয়ে এল। প্রতি পদক্ষেপে সে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে আগন্তুকদের। কামরার ভেতর ক্রমেই বাড়ছে গোলমাল।

ইভাস্কোর আর সহ্য হলো না। হঠাৎ চুল্লি টপকে অন্ধকারের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে সে রুক্ষ্ম কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো,—একশো শয়তানকেও আমি পরোয়া করি নে! মাতব্বর কোথায়? এগিয়ে আসুক!

কিরঘিজ ভাষায় শোনা গেল মুসার কণ্ঠ,—খবরদার! কেউ বেরোবে না! নড়বেও না!

বাসিন্দারা ভয়ে বেসামাল। কী সর্বনাশ! চুল্লি টপকে কাফেরটা আগুন অশুদ্ধ করলো! তারা হাউমাউ করে উঠলো,—সর্দার, সর্দার, জলদি আসুন, জলদি আসুন! বাঁচান আমাদের! শীগ্‌গীর, সর্দার, শীগ্‌গীর!

হৈ-হল্লার মধ্যে মুসা চকিতে এক ফাঁকে কুঁজো হয়ে খানকয়েক জ্বালানি ছুড়ে

দিলে চুল্লিতে। জোরে আগুন জ্বলে উঠতেই ভয়ে পিছিয়ে গেল বাসিন্দারা। পেছনে পড়ে রইল একটা বাচ্চা মেয়ে। ভয়ে সে কাঁদতে শুরু করে।

ভাপে সেদ্ধ হবার মতো গরম এখন কুঠরির মধ্যে। পার্টিজানদের কাপড়চোপড়ের তুষার গলতে শুরু করেছে। সশব্দে মেঝেয় পড়ছে তুষারের খণ্ডগুলো।

দেওয়ালের গায়ে এক অন্ধকার বড় ফোঁকর। একটু পরেই সেখান দিয়ে ঘরে ঢুকলো বৃদ্ধ সর্দার ইস্কান্দার। মোটা হাঁসের মতো হেলে দুলে হাঁসফাঁস করতে করতে এক পা এক পা করে সর্দার এগিয়ে আসে আগুনের দিকে। তার গায়ে সোনালী রঙের ড্রাগন-আঁকা নীল রেশমের একটা পুরনো চীনা কোট। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এই ধরনের জমকালো পোশাকই পরে সর্দার।

বাচ্চা মেয়েটার কান্না থেমে গেছলো। কিন্তু অদ্ভুত বিচিত্র সাজসজ্জায় প্রপিতা-মহকে চিনতে না পেরে আবার সে কান্না জুড়ে দিলে।

আত্মরক্ষার তাগিদে ইভাস্কো ইতিমধ্যে আবার রিভলবার তুলে নিয়েছে। ওটা সে তাক করলো বুড়োর দিকে।

ধীর পদক্ষেপে সর্দার এগিয়ে আসছে। ভেতরের আতঙ্ক যাতে বাইরে প্রকাশ না পায়, তার জন্যে বাইরের হাবভাব যথাসাধ্য স্বাভাবিক রাখতে সে প্রাণপণে সচেষ্ট। আর মনে মনে আকুল হয়ে ডাকছে কুলদেবতাকে,—হে আর্বাখি, আমায় রক্ষা করো! হাত ধরে নিয়ে চলো দেবতা!

সর্দারের পেছনে আসছে জুরা ও কুচাক। জুরা তার বাঁ কনুই ধরে আছে, কুচাক ধরে আছে ডান কনুই। সর্দারকে তারা আগুনের ধারে এনে সন্তর্পণে বসিয়ে দিলে।

সর্দার কাতরাচ্ছে—আগন্তুকদের সহানুভূতি পাওযার জন্যে দুর্বল ও অসহায়ের ভান করছে মনে হয়।

কপালের ঘাম মুছে ইভাস্কো চুল্লির পাশে বসে পড়লো।

ক্ষীণ কণ্ঠে সর্দার বললে,—মুসাফিরদের চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হোক।

কুচাক ডাকলে,—জয়নাব!

ত্বরিতপদে ঘরে ঢুকলো সতেরো-আঠারো বছরের এক তরুণী—অনিন্দ্যসুন্দরী। লোহার তিনটে লম্বা চায়ের কেটলি নিয়ে সে আগুনের ওপর বসিয়ে দিলে।

মুসা ঢুলতে শুরু করেছে। তাকে আস্তে ঠেলা মেরে ইভাস্কো বললে,—জিজ্ঞেস করো, ওরা কারা।

চা পান শেষ না করে জিজ্ঞাসাবাদ করা বেআদবি।—ঢুলতে ঢুলতেই মুসা জবাব দেয়।

নিস্তব্ধ ঘর। কেটলিতে জল ফুটছে। জয়নাব চীনামাটির কয়েকটা কাপ এনে গরম জলে ধুয়ে আলগোছে সর্দারের সামনে রাখলে। সর্দার নিজের লম্বা রেশমী কোমরবন্ধ খুলে ফেলে। কোমরবন্ধের ভাঁজ থেকে এক-এক টিপ চা নিয়ে সে ফেলে দেয় কাপের মধ্যে।

জুরার মা আয়েশা বুড়ি ঘরে ঢুকলো। লালপাথরের ভাবী একটা কাপ তার হাতে। কাপটার ধার বেশ মোটা। কাপটা ধুয়ে সর্দার কয়েক ফোঁটা চা ঢেলে দিলে তার মধ্যে। কাপের তলাটা ভরতেই সেটা সে এগিয়ে দেয় ইভাস্কোর দিকে।

বিরক্তিতে ইভাস্কো গজগজ করে উঠলো,—অ্যাঁ, ব্যাপার কি? একটুকু চা কেন? কাপের তলাটাও ভিজেছে কিনা সন্দেহ। ভরতি করে দিতে বলো, মুসা। পুরো কাপ না হলে...

মুসা তাড়াতাড়ি বাধা দেয়,—নিয়ে নাও, নিয়ে নাও! চা যত কম হবে, সম্মানের বহরটা বুঝবে ততই বেশী।

চা খাওয়া শেষ করে ইভাস্কো আলোচনা শুরু করে। জিভ এত ফুলে গেছে যে, কথা বলা কষ্ট। ইভাস্কো আর সর্দারের মধ্যে দোভাষীর কাজ করে মুসা।

ভ্রূ কুঁচকে সর্দার বললে,—সৈনিক বাহাদুর যে ভাবে হাতিয়ার তাক করে আছেন, তাতে সর্দারের অস্বস্তি বোধ করা স্বাভাবিক।

ইভাস্কো রিভলবার সরিয়ে নিলে। উৎকট ঝাঁঝালো ধোঁয়ায় ঘর ভরতি। চোখে জল এসে যায়। তারা হাঁচতে শুরু করে।

একে একে গাঁয়ের বাসিন্দারা এসে সব জড়ো হচ্ছে। পশুর লোমশ চামড়া গায়ে চারপাশের দেয়াল ঘিরে মেঝেতে বসেছে তারা। তাজিক জাতের মানুষ তাদের চোখে এই প্রথম। কৌতূহলী উদ্‌গ্রীব চোখে তারা তাকিয়ে আছে।

দেয়ালের বাইরে থেকে ইয়াকের ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ কানে এল। ইভাস্কো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে—যাক্, গৃহপালিত জানোয়ার তাহলে আছে কিছু। অর্থাৎ গুল-জান খেতে হলেও গাঁয়ে এখনো চূড়ান্ত আকাল দেখা দেয় নি।

ইতিমধ্যে চা-পান শেষ হয়। দুজনের কিছু খাওয়া দরকার। পেটের মধ্যে যেন খাণ্ডবদাহন চলেছে। ব্যাগের ভেতরকার চিনি, মাংস, পাঁউরুটি সব ঠাণ্ডায় জমে দলা পাকিয়ে গেছে। ছোরাগুলো পর্যন্ত এমন এঁটে গেছে যে, খাপ থেকে বেরোতে চায় না।

আগুনে সেঁকে ছোরাগুলো তারা বের করলে খাপ থেকে। হাতখানেক করে লম্বা সেগুলো। জমে-যাওয়া পাঁউরুটিগুলো কেটে তারা অর্ধেক দিলে সর্দারকে।

ইভাস্কো গাঁ সম্পর্কে সর্দারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জানতে চায়, গাঁয়ে বাসিন্দা কত জন? ক জন পুরুষ?

কথায় কথায় জানা গেল, সারা গাঁয়ে বন্দুক মাত্র একটা—একটাই মাত্র ম্যাচলক গাদাবন্দুক।

ওদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সর্দার সব কিছু প্রকাশ করতে নারাজ। যেটুকু না বললে নয়, সেটুকুই সে শুধু বলছে—তাও অস্পষ্ট ক্ষীণকণ্ঠে।

মুসা মারফৎ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে ইভাস্কো।

শেষ পর্যন্ত সর্দার বললে,—অনেক কাল আগের কথা, সুদূর অতীত যুগের কাহিনী......সারসেরা তখন ফৌজের নেতৃত্ব করতো, আর ধড়িবাজ শেয়াল সিংহের মন পাবার জন্যে বনের জানোয়ারদের বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করতো......

ইভাস্কো ও মুসার প্রথমে মনে হয়, রূপকথা বলে বুড়ো এক অলৌকিক আব-হাওয়া সৃষ্টি করতে চাইছে।

কিন্তু না, থেমে থেমে বুড়ো বলে চললে নিজেদের গোষ্ঠীর পুরনো গরিমা আর শৌর্যবীর্যের কথা—সেই সে কালের কথা, যখন তার কিরঘিজ পূর্বপুরুষেরা ইয়েনেসী নদীর ওপর অংশ থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত এক সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলে-ছিল।

কিভাবে এখন গাঁয়ের জীবনযাত্রা চলে, বুড়ো তাও জানায় কিছুটা। বলে, সারা গাঁয়ের লোক একই পরিবারের মতো বাস করে, একসঙ্গে পশু চরায়, মিলেমিশে শিকার করে। তারা কোথাও যায় না, তাদের কাছেও কেউ আসে না......

বলতে বলতে বুড়োর গলা ধরে এল, শেষে বিষণ্ণ করুণ কণ্ঠে বললে,—কিন্তু আজ অবস্থা বড়ই কাহিল। আমরা উপোস করছি, গুলজান খেয়ে টিঁকে আছি। গত হেমন্তে

বুনো ছাগল-ভেড়ার পাল কোথায় যে উধাও হয়েছে, কেউ জানে না। পোষা জানোয়ার গুলোকে প্রায় খেয়ে শেষ করেছি। বাচ্চা দেবার জন্যে গাঁয়ের এখন শেষ সম্বল একটা করে মদ্দা ও মাদী ইয়াক আর একটা ছাগ ও ছাগী।

ইভাস্কো হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, বললে,—কামরাগুলো একবার দেখতে চাই।

বিড় বিড় করে সর্দার বললে,—দেখিয়ে আন।

বড় একটা বাতি নিয়ে কুচাক আগে আগে চললো। বাতিতে পেট্রল জ্বলছে। জুরাও সঙ্গে যায়।

কুঠরি মোট পাঁচটা। একই দৃশ্য সব কটিতে। নিরাভরণ নোংরা দেয়াল। আসবাব বলতে মেঝেতে খানকয়েক চামড়া ও বালিশ, একটা করে কেটলি আর কয়েকটা কাপ—ব্যস্।

কিন্তু হঠাৎ—ও কী! কুঠরির এক অন্ধকার কোণে আয়েশা বুড়ি চটপট কি যেন লুকোবার চেষ্টা করছে না? কোন অস্ত্রশস্ত্র নয় তো!

ইভাস্কোর সন্দেহ হয়। সে ছুটে গেল আয়েশার দিকে। বুড়ি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো একটা বান্ডিল বুকে চেপে ধরে।

জুরা ধমকে উঠলো,—কি আছে, দেখাও!

বান্ডিলের ভেতর থেকে বেরোলো শুধু ন্যাকড়া—ছেঁড়া কাপড়-চোপড়।

ইভাস্কো অবাক, মুসাকে জিজ্ঞেস করলে,—এগুলো ও লুকোচ্ছিল কেন?

—আমাদের ওরা চোর-ডাকাত ধরে নিয়েছে।

তুষার-ঢিবির ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে কুঠরি থেকে কুঠরিতে যাতায়াতের পথ। ইভাস্কোর খনির কথা মনে পড়ে। একমাত্র সর্দারের কুঠরি ছাড়া সর্বত্র অনাহার ও নিদারুণ অভাবের দৃশ্য।

তল্লাশি সেরে আবার তারা সর্দারের কামরায় ফিরে এল। বাসমাচি বা হাতিয়ার-পত্র কোথাও কিছু নেই—সে বিষয়ে ওরা নিশ্চিত।

চুল্লিতে সশব্দে কাঠ পুড়ছে। আগুনের ফুলকি উড়ছে বাতাসে। বুড়ো ইস্কান্দারের গোঙানি ও কাতরানির যেন বিরাম নেই। কাতরাতে কাতরাতে মাঝে মাঝে সে ইভাস্কোর হাঁটুর ওপর থেকে ফুলকির ঝুলকালি সাফ করে দিচ্ছে। মেহমানদের খিদমতের জন্যে সে কিরকম তৎপর, সেটাই বোধহয় দেখাতে চায়।

মুসার পাশে জুরা বসে আছে। আদরের টোকা মারছে মুসার রাইফেলের কুঁদোয়। মনে মনে তার সঙ্কল্প স্থির, রাতে লোক দুটোকে খুন করে রাইফেল দুটো সে হস্তগত করবে।

ইভাস্কো হঠাৎ জুরাকে জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা, এ অঞ্চলে কোন হ্রদ আছে?

জুরা ঘাড় নাড়ে,—হ্যাঁ, আছে। বড় বড়—কয়েকটা। এত বড় যে, এপার থেকে ওপার প্রায় দেখাই যায় না।

—কোন রাস্তাঘাট?

—আছে কিছু কিছু, কিন্তু সবার জন্যে নয়। পর্বতে পর্বতে বরফের পর বরফ-এলাকা যারা কিভাবে পার হতে হয় জানে, যারা বুনো পাহাড়ী ছাগল-ভেড়ার টাটকা রক্ত খায়, আর পাতাল-ছোঁয়া খাদ আর গহ্বর পার হবার সময় পর্বতের দেবতারা যাদের রক্ষা করেন, তারাই শুধু সেসব পথে চলতে পারে।

ইভাস্কো মুখের ওপর দিয়ে একবাব হাত বুলিয়ে নিয়ে আবার প্রশ্ন করলে,—নদীটদি কিছু আছে?

হ্যাঁ, আছে। অনেক।—সরল কণ্ঠে জুরা জবাব দেয়: যেমন ধরো দুর্দান্ত সৌক-

সাই নদী। পাহাড়ে পর্বতে আমি অনেক ঘুরেছি, অনেক জামাকাপড় ছিঁড়েছি, গেছিও সর্বত্র। কিন্তু সোকসাইয়ের উজানে, তার উৎসের কাছে কখনো যেতে পারি নি। কেউই পারে না। দেবতাদের বাস সেখানে, আর ড্রাগনে ভরতি। কেউ গেলে, তার কপালে জোটে ভয়ঙ্কর মৃত্যু।

হা-হা করে ইভাস্কো এবার হেসে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণে ককিয়ে উঠলো যন্ত্রণায়। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে।

জুরা হকচকিয়ে যায়। কি! আগন্তুকরা হাসছে! কেন? ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে হিমশীতল কণ্ঠে সে বললে,—কি, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বেশ তো, সর্দার তো ভূয়োদর্শী, মুসাফিররা তাঁকেই জিজ্ঞেস করুক না!

সে কথা বন্ধ করলো। তার কালো মোটা ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেছে। চোখ ছোট করে কঠিন নির্বাক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে ব্যঙ্গকারী আগন্তুকদের দিকে।

ইভাস্কো মনে মনে স্থির করে, তাদের দুজনের পরিচয় ও এখানে আসার উদ্দেশ্য বাসিন্দাদের কাছে খুলে বলতে হবে। মুসাও সায় দেয় তার কথায়।

ইভাস্কোর কথা সে কিরঘিজ ভাষায় তর্জমা করে চলে,—শুনুন সর্দার, আমবা বাসমাচি নই, আমরা পার্টিজান। তাগাই আর তার দলের পেছু নিয়েছিলাম। কিন্তু একটা বুলেটও আমাদের খরচ করতে হয় নি। হিমানী-সম্প্রপাতে তারা সবাই খতম হয়েছে।

কথাটা জুরার মাথায় ঢোকে না। কারণ যার বন্দুক আছে, সে হয় শিকারী, নয়তো লুঠেরা বাসমাচি। এ লোকগুলোও নির্ঘাত বাসমাচি, অন্য ডাকাতদের পেছু নিয়েছিল। পয়লা দল লুটপাট করেছে, আর এরা সেই লুঠের মাল নিয়ে সরে পড়ার ফিকিরে ছিল।

মুসার মাধ্যমে ইভাস্কো বলে চলে,—আমরা বলশেভিক। সবার অবস্থা যাতে সমান হয়, তার জন্যে বড়লোকদের ধনদৌলত কেড়ে নিয়ে আমরা গরিবদের মাঝে বেঁটে দেই।

জুবা টিপ্পনী কাটলে,—তা বটে! কিন্তু মেহ্‌মানদের গায়ে আরমিন বা শেয়ালের চামড়ার বদলে সস্তা ভেড়ার চামড়ার জামা কেন? গরিবদের জন্যে তো দূরস্থান, নিজেদের জন্যেও যাবা ভাল জামাকাপড় জোগাড় করতে পারে না, যোদ্ধা হিসেবে তারা নিশ্চয়ই নীচু জাতের।

ইভাস্কোর এসব কথায় কাজ হবে না, মুসা বুঝতে পারছে। তাই ইভাস্কোর কথায় কান না দিয়ে এবার সে নিজেই শুরু করলে, জুরাকে উদ্দেশ করে বললে,—ব্যাপার কি জান? আমাদের সবই আছে, যা তুমি চাইবে। চাকাওলা লোহার কামরায় আমরা চলাফেরা করি।......

অ্যাঁ, সে কি! চাকা কি জান না?—মুসা বিস্ময়ে ফেটে পড়ে ঃ চাকা হলো গিয়ে একটা গোল জিনিস, গড়িয়ে চলে।......অ্যাঁ, কি হলো? বুঝতে পারছো না?

হতভম্ব চোখে সে ইভাস্কোর দিকে তাকায়। বলে,—বুঝলে হে, এরা আজো পর্যন্ত চাকা দেখে নি, চাকা কাকে বলে জানে না।

বলতে বলতে সে একটা চায়ের কাপ নিয়ে টেবিলের ওপর গড়িয়ে দেখায়। ব্যাখ্যা করে বলে,—এটা হলো গিয়ে একটা লোহার ঘর, ঘোড়ার চেয়ে পাঁচগুণ জোরে ছোটে।

কেউ কিছু বুঝতে পারে না। খুকখুক করে সবাই হাসছে।

সেদিকে আমল না দিয়ে মুসা বলে চলে,—এছাড়া আমাদের আর একটা জিনিস

আছে, তাকে বলে সিনেমা। রাতের বেলায় প্রকাণ্ড এক ঘরে ঢুকতে হয়, এর চেয়ে সেটা একশো গুণ বড়।

কুচাক মন্তব্য করে,—বড়লোক খানদের কুঠি!

হাঁ, হাঁ,—অকূল পাথারে মুসা যেন ডাঙা দেখতে পায় ঃ ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, খানদের কুঠিই বটে! তবে কিনা খানদের সব কুঠিই আমরা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছি। সে যাই হোক, সেই ঘরে ঢুকলে দেখবে, চারদিকে সব বলশেভিক বাতি জ্বলছে আর সামনে দেখবে একটা সাদা দেয়াল। বাতিগুলোর ভেতরকার আগুন কিন্তু ঠাণ্ডা, তেমনি সাদাও বটে। বাতি নেবানোর সময় তোমায় ফুঁ দিতে হবে না, দেয়ালে একটা বোতাম টিপলেই হলো।

মেয়েরা আবার হাসতে শুরু করে।

মুসা বলে চলে,—বাতি নিবতেই সেই সাদা দেয়ালে দেখতে পাবে এক আজব দৃশ্য। দেখবে, জ্যান্ত মানুষের রুহ্ বা আত্মারা সব দৌড়চ্ছে, চলাফেরা করছে, গুলি ছুড়ছে, খাচ্ছেদাচ্ছে, ঘোড়ার পিঠে ছুটছে, খুনোখুনি করছে।

বুড়িরা ভয়ে হাউমাউ করে উঠলো,—মাগো, কী সব্বোনাশ! লোকটা নিশ্চয়ই জাদু জানে। ভূতপেত্নী আর মরা মানুষের রুহ্ ডেকে আনতে পারে!

জুরা রাগে ফুঁসছে। ভ্রূ কুঁচকে সে তাকিয়ে আছে পার্টিজানদের দিকে। ওদের ওপর তার ঘেন্না ধরে গেছে। খাঁটি মরদ কখনো এরকম আবোলতাবোল বকতে পারে? এসব আষাঢ়ে রূপকথা শুধু মেয়েদের কাছেই চলে।

সর্দার কিন্তু মনে মনে অস্বস্তি বোধ করছে। গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে গাঁয়ের মানুষ যেভাবে পার্টিজানদের কথা শুনছে, তাতে খুশী হওয়া চলে না। বিশেষ করে একটা কথা ভেবে সে খুবই উদ্বেগ বোধ করে। মুসাফিররা যে দেশ থেকে এসেছে, মিন-আরখারের চেয়ে সে দেশ যদি বাসিন্দাদের কাছে ভাল লাগে, তাহলেই বিষম মুশকিলে পড়তে হবে। দেখা দেবে গুরুতর সমস্যা। এদের তাহলে এখানে আর আটকে রাখা যাবে না, বিশেষ করে জুরাকে।

সুতরাং ধূর্ত বুড়ো হঠাৎ নির্বিকার-উদাসীনের ভান করে মাথা নাড়তে শুরু করলো। ভাবখানা যেন, এ সবই সে জানে। অথচ জীবনে আজ এই প্রথম সে অনেক নতুন নতুন কথা শুনলো, যদিও তার একবর্ণও সে বিশ্বাস করে নি। মুসার কথার মাঝখানে এক সময় মাথা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ সে বলে উঠলো,—জানি, জানি, এ সবই আমাদের জানা। তাজ্জব হবার মতো কিছু নেই।

মুসা চটে গেল। বললে,—তাই নাকি? সর্দার দেখছি সবজান্তা। বেশ, তাহলে তিনিই বলুন, আমরা শুনি।

নিস্তব্ধ ঘর। অধীর আগ্রহে সবাই উৎকর্ণ হয়ে আছে। ঘোড়ার লোম আর রেশমের ফিতে দিয়ে সর্দারের ঝুলে-পড়া থুতনিটা বাঁধা। ধীরে ধীরে শুরু করে সর্দার,—হাঁ, ভূয়োদর্শী সর্দার সবই জানে। সে জানে, ককেসাসের পোষ-মানা দুরন্ত বন্য ঘোড়া আর্গামাক যখন হা-হুতাশ করে, তখন বুঝতে কষ্ট হয় না যে, দলের আর সব সাথীদের জন্যই তার মন পুড়ছে। শুভ্র তুষারে ঢাকা পর্বতমালার নীচে এক কালে সে কিভাবে সাথীদের সঙ্গে খুশী মনে ছুটোছুটি করে বেড়াত, তারই স্বপ্ন দেখে আর্গামাক। ঠিক তেমনি এমন একজন নির্ভীক তরুণ পাবে না, যে তার সোনার জন্মভূমির স্বপ্ন দেখে না। সাধের জন্মভূমি তার কাছে মক্কার মতোই পবিত্র। কে না জানে যে, বন্দী শ্বেত ঈগলের প্রাণ কাঁদে তার পুরনো সঙ্গীদের জন্যে, সেই পুরনো দিনের জন্যে—যখন নির্মেঘ আশমানের দূর নীলিমায় সে পাখা মেলতো?

এমন কে আছে, নিজের লোকদের নিরাপত্তার জন্যে যে ব্যাকুল নয়? কোথায় আছে সে পাখি, নিজের বাসা রক্ষার জন্যে যে ছটফট করে না?

এমনি করে বুড়ো বলে চলে। বলতে থাকে এক রহস্যময় অজ্ঞাত দেশের কাহিনী, ইভাস্কো ও মুসার কাছে যা শোনায় রূপকথার মতো।

নিবন্ত বাতিতে আয়েশা বার পাঁচেক তেল দিয়ে গেছে। সর্দারের তবু বলার বিরাম নেই। চামড়ার কোট গায়ে জড়িয়ে বাসিন্দারা হাঁ করে শুনছে তার কথা। শুনতে শুনতে তাদের মনে হয়, মেহমানদের সারগর্ভ কথাগুলোই যেন বেরিয়ে আসছে সর্দারের মুখ থেকে। আর তার ফলে সর্দার যা চেয়েছিল, তার ঠিক উল্টো ক্রিয়া ঘটতে থাকে তাদের মনের ওপর। জুরার মনেও প্রশ্নের ঝড়ঃ আগন্তুকরা তাহলে যে কাহিনী বলছিল, তা রূপকথা নয়! বুড়োর অনেক কথাই তার কাছে দুর্বোধ্য। তবু যেটুকু বুঝেছে, তাতে তার দৃঢ় ধারণা হয়, তার পূর্বপুরুষেরা যে কাল্পনিক সোনার দেশের স্বপ্ন দেখতো, বাস্তবে কোথাও-না-কোথাও নির্ঘাত তার অস্তিত্ব আছে।

তাই অসীম আগ্রহ ও বিস্ময় নিয়ে জুরা যেন গিলছে বুড়ো ইস্কান্দারের কথাগুলো।

বলতে বলতে সর্দার একসময় উড়ন্ত লোহার কার্পেটের কথা বলতেই পার্টিজানরা বললে,—হাঁ, ওটা উড়োজাহাজ।

সর্দার ভাসমান কুঠরির কথা বলতে মুসা সায় দেয়,—হাঁ, ওটা স্টীমার।

এমনি করে সর্দার ধীরে ধীরে বলে চলে তার দীর্ঘ কাহিনী।

চুল্লিতে আগুনের শিখা কাঁপছে! কাঁপছে বাতির শিখাও। পামীরের বুকে হিমশীতল নিস্তব্ধ রাত্রি। আর কামরার মাঝে আলোছায়ার খেলা। রহস্যময় এক অপার্থিব পরিবেশ যেন।

সবশেষে সর্দার বললে,—কিন্তু এ সবই আছে শুধু তাজিকদের দেশে। কোন আহাম্মক কিরঘিজ ওসব আজব জিনিসের লোভে যদি নিজের গাঁ ছেড়ে সে দেশে যায়, তাহলে ধড় থেকে তার গর্দান আলাদা হয়ে যাবে। আগে যা বললাম, সেসব যেমন আমি জানি, তেমনি এটাও জানি। আমাদের মেহমানরাও তো কবুল করেছেন যে, আমি সব জানি।

মুসার মারফৎ ইভাস্কো এবার জিজ্ঞেস করলে,—সর্দার, আমরা জানতে চাই, আপনি কে, কত দিন আগে নীচের উপত্যকা ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেছেন? যেসব জিনিসের কথা বললেন, তা কোথায় দেখেছেন? এই নিরানন্দ পার্বত্য এলাকায়ই বা পালিয়ে এলেন কেন? আপনি কি কোন ধনী জমিদার, না কোন মোল্লা?

সর্দার বললে,—না, কোথা থেকেও পালিয়ে আসি নি, পালিয়েও কোথাও যাব না। এখানেই জন্মেছি, এখানেই মরবো। দেবতারাই ওসব জিনিস আমায় দেখিয়েছেন।

কত দিন আগে দেখিয়েছেন? অনেক দিন আগে?—মুসা জিজ্ঞেস করে।

বুড়ো বললে,—হাঁ, অনেক বছর আগে......

তারপর ক্ষণকাল নীরব থেকে আবার সে বললে,—ইদীজ নামে আমাদের একজন মরদ ছিল, ওর বাবা।

বলে সে ঘাড় নেড়ে জুরাকে দেখিয়ে দেয়ঃ ইদীজ ছিল প্রচণ্ড বীর জোয়ান। ওরকম জোয়ান শয়ে একটা মেলে, তিন শো বছরে একবার জন্মায়। একবার সে শিকারে গেল। ঘুরতে ঘুরতে সে চলে যায় বহু—বহু দূর। অজানা পর্বতে পর্বতে সে ঘুরছে বহুক্ষণ। তেষ্টাও পেয়েছে। হঠাৎ বড় একটা ঝরনা নজরে পড়লো। ঝরনার পাশে সে কেবল হাঁটু গেড়ে বসেছে, জল খেতে যাবে, এমন সময় ঝরনার জলের সঙ্গে হঠাৎ একটা

আপেল পড়লো ওপর থেকে। কী ব্যাপার! ইদীজ তো অবাক। সে ওপরে উঠতে শুরু করলো। উঠছে তো উঠছেই—ওপরে, আরো ওপরে, আরো আরো ওপরে। মারা পড়ে আর কি! শেষে একসময় সে পর্বতের মাথায় গিয়ে পৌঁছলো। বিস্তীর্ণ এক সবুজ বনভূমি সেখানে। কয়েকজন সাদামুখো লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। তারা তাজিক।

বলতে বলতে বুড়ো ইভাস্কোর দিকে মাথা নাড়ে—ইদীজকে তারা কত অনুরোধ করলে ওদের সঙ্গে থাকার জন্যে। কিন্তু ইদীজ রাজী হলো না। আপেলটা নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল। অনেক-অনেক কথাই তখন সে আমায় বলেছিল।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে মুসা বললে,—কিন্তু সর্দার, আপনার কথা শুনে মনে হয়, এসবই আপনি নিজের চোখে দেখেছেন।

না, ঝুট বাত যদি বলে থাকি তো জিন্দিগি ভর আমার তকলিফের যেন শেষ না থাকে,—বলতে বলতে বুড়ো অস্থিসার কম্পিত আঙুল দিয়ে একখানা পাঁউরুটি তুলে নেয়, সেখানা ভাঙতে ভাঙতে বিড়বিড় করে বলে ঃ এই রুটিও যেন আমার বরাতে না জোটে। এই পার্বত্য মুল্লুকেই আমার সারা জীবন কেটেছে।

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপচাপ। কিন্তু সর্দারের মনে স্বস্তি নেই। আগন্তুকদের সন্দেহ দূর করার জন্যে সে আবার বললে,—বিশ্বাস করুন আমার কথা, আমি মিথ্যে বলি নি। ইদীজ ছিল আমাদের গোষ্ঠীর সবচেয়ে শক্তিমান মরদ। অনেক ক্ষমতা ছিল তার। তার ছেলে জুরাও সে ক্ষমতা কিছু কিছু পেয়েছে।

বলতে বলতে সে জুরার দিকে ফিরে কি যেন বললে ফিসফিস করে।

জুরার পাশে বাবু বসে আছে। জুরা টুপিটা এক দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে হুকুম করতেই, বাবু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল, টুপিটা মুখে করে ফিরে এল তার কাছে। আবার জুরা চেঁচিয়ে কি যেন বললো। এবার বাবু ছুটে গেল বরফের ভেতরকার অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে। ফিরে এল একটু পরেই। এক বুড়িকে তার ঘাগরার কিনারা কামড়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। বুড়ি কিছুতেই আসতে চাইছে না।

সর্দার বললে, আবেগে তার গলা কাঁপছে,—ইদীজ কুকুরদের এইরকমই তামিল দিত। সে যা হুকুম করতো, তা-ই করতো কুকুরগুলো। সোনালী ঈগলকে সে হুকুম করতেই ঈগল গিয়ে শেয়াল ধরে আনতো। তার একটা বিরাট চিতাবাঘ ছিল। সে হুকুম করলেই, চিতাবাঘটা পর্বতে পর্বতে ঘুরে বুনো ছাগল শিকার করে নিয়ে আসতো। বুনো জানোয়ারদের যে দেবতা আছে, ইদীজ ছিল তাঁর পেয়ারের মরদ।

বুড়োর কথা শেষ হয়। উত্তেজনায় চোখে তার জল এসে গেছে। গোঙাতে গোঙাতে আঙুলের ডগা দিয়ে সে চোখের জল মুছে ফেললে।

প্রথম পর্ব ৭

তুষার-ঢিবির ওপর জুরাকে বসে থাকতে দেখে সঙ্গের লোকদের মতো তাগাইও খেঁকিয়ে উঠেছিল। কিন্তু আহাম্মকরা যে সেইসঙ্গে রাইফেলও চালাতে শুরু করবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল? চিৎকার করে সে ওদের থামাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু

ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। পর্বতে পর্বতে শুরু হয়ে গেছে বিষম তোলপাড়। ভীম-বেগে নেমে আসছে মহাভয়ঙ্কর হিমানী-সম্প্রপাত।

তার ভয়াল গর্জন কানে যেতেই, তাগাই যে ইয়াকের পিঠে বসে ছিল, সেটা তীব্র আওয়াজ ছেড়ে আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলো। কুকুরটা ছিটকে পড়ে গেল তাগাইয়ের হাত থেকে।

পরক্ষণে তুষারের বিপুল ধস ওপর থেকে প্রচণ্ড বেগে ভেঙে পড়লো তাগাইয়ের ওপর। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে অভিজ্ঞ তাগাইয়ের মুহূর্তও দেরী হয় নি। সম্প্রপাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোটের নীচেটা সে চোখের পলকে টেনে তুললো মাথার ওপর। আর তার ফলে ইয়াকের মাথার ওপর ও তার মুখের সামনে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হলো। দম আটকে মরার হাত থেকে তারা রক্ষা পেল—অন্ততঃ কিছুটা সময়ের জন্যে তো বটেই।

তুষারের চাপে ইয়াকটা ছটফট করছে। বিন্দুমাত্র অসতর্ক নড়াচড়া হলেই মাথার ওপরের তুষারের ছাদ ধসে পড়তে পারে। আর তাহলেই দম আটকে তাদের মরতে হবে। দেরী হলেও মৃত্যু অনিবার্য। ফাঁকা জায়গাটুকুতে যে বাতাস আছে, সামান্যই তার পরিমাণ।

তাগাই অভিজ্ঞ ভাগ্যান্বেষী—দুঃসাহসী জাঁহাবাজ লুঠেরা। সম্পদের লোভে দেশে দেশে সে অভিযান করেছে। ঘুরেছে প্রায় গোটা চীনদেশ। গেছে জাপানে, ভারতবর্ষে। মৃত্যুর মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হয়েছে একাধিকবার। মৃত্যুকে সে দেখেছে রাইফেলের নলের মুখে, তার সরাসরি পাল্লার মধ্যে। দেখেছে গলায় বাঁধা ফাঁসির দড়িতে। দেখেছে ইয়াংসি নদীর ভয়ঙ্কর মরণ-আলিঙ্গনে। এবার সে মৃত্যু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রচণ্ড তুষার-ধসের রূপ নিয়ে।

দু হাত দিয়ে তাগাই মাথার ওপরের তুষারের ছাদ ঠেকিয়ে রেখেছে। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে হাত দুটো সে একটু নামিয়ে আনলে। প্রতি মুহূর্তে ভয়, ছাদ না ধসে পড়ে। এবার সাবধানে সে ওপরের তুষার খুঁড়তে শুরু করে আর পা দিয়ে মাড়াতে থাকে নীচের তুষার।

একটু পরে বিরাট তুষারের ঢিবির তলা থেকে প্রথমে বেরিয়ে এল ছোরাসমেত তার একখানা হাত, তারপর মাথা। যতদূর চোখ যায়, শুধু তুষারের সাদা আস্তরণ। তার নজর পড়ে কুকুরটার ওপর। তারপরই কানে এল পার্টিজানদের কণ্ঠস্বর। সে চকিতে গা ঢাকা দিলে।

অত্যন্ত সূক্ষ্ম পাতলা ও তনুভূত এখানকার বাতাস। পার্টিজানরা তার মৃত্যু সম্বন্ধে যে আলোচনা করছে, তার প্রতিটি কথা তাগাই স্পষ্ট শুনতে পায়। সে ঘাপটি মেরে থাকে। তারপর ওরা চলে যেতেই সে বেরিয়ে এল হামাগুড়ি দিয়ে। খোলা বাতাসের গন্ধ পেয়ে ইয়াকটাও উঠে এল তুষার পায়ে দলে।

দলের অন্যদের মতো তাগাই কিন্তু কখনই ক্লান্ত অবসন্ন হয় নি। দুস্তর অভি-যানে পথ চলার সময় দেহের শক্তি যাতে অযথা নষ্ট না হয়, সেদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি থাকে সব সময়। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

দলের কেউ আর বেঁচে নেই, এটা বুঝতে তার কষ্ট হয় না। দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে ইয়াকটাকে এক টিলার সঙ্গে আংটা দিয়ে আটকে রেখে সে রওনা হলো, পার্টিজানরা যে দিকে গেছে।

কিছু পরে শোনা গেল গাঁয়ের কুকুরদের উন্মত্ত ক্রুদ্ধ চিৎকার। তাগাইকে ওরা অভ্যর্থনা করছে।

তুষার-নীচের অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে জুরার সঙ্গে দেখা হয় বুড়ো সর্দারের। জুরাকেই সে খুঁজছে।

ক্ষীণ কণ্ঠে বুড়ো প্রায় গোঁঙিয়ে উঠলো,—হায় হায়, জুরা, সব্বোনাশ! অসুস্থ আমি, বুড়ো হয়েছি। আর ঠিক এখন কিনা হঠাৎ তাগাই এসে হাজির। আশ্রয় চাইছে। পার্টি-জানদের সে নির্ঘাত খুন করবে আর সে খুনের বদলা দিতে হবে আমাদের—নিজেদের রক্ত দিয়ে। কেউ আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিতে হয়। এটা চিরকেলে রীতি। সর্দার হয়ে সে রীতি আমি ভাঙতে পারি নে। এ অবস্থায় কি করি, বলতে পারিস?

দম নেবার জন্যে ক্ষণকাল থেমে বুড়ো বললে,—তাই বলছিলাম কি জুরা, তুই একবার যা। তোর উঠতি বয়েস, শক্তি-সাহসও যথেষ্ট আছে। তাগাইকে গিয়ে বুঝিয়ে বল্—সে এবারের মতো চলে যাক্। জয়নাব সেখানে পাহারা দিচ্ছে, নয়তো কুকুরগুলো তাগাইকে এতক্ষণে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেত।

বলতে বলতে বুড়ো কাশতে শুরু করে।

বিনা বাক্যব্যয়ে ক্ষিপ্র পদে জুরা তুষার-নীচের সুড়ঙ্গ-পথে এগিয়ে গেল। সুড়ঙ্গের মুখের কাছে আসতে আসতে তাগাইয়ের গলা সে শুনতে পায়। সে চমকে উঠলো। তাগাই জয়নাবকে বলছে,—সত্যি, জোর বরাত বলতে হবে, জয়নাব যে, পথ হারাই নি, তোমাদের গাঁয়ে এসে পেঁাছতে পেরেছি। তোমায় সওগাত দেবার জন্যে প্রচুর রেশম সঙ্গে এনেছি। কিন্তু সেসব রয়েছে কাফেলার সঙ্গে, এখান থেকে একদিনের পথ দূরে। আচ্ছা জয়নাব, রাতে থাকার জন্যে কারা আজ এখানে এসেছে, বলো তো?

তাদের চিনি নে, তাগাই,—জয়নাব জবাব দেয়ঃ নিজেদের তারা পার্টিজান বলছে। আর বলেছে, তুমি নাকি ডাকাত, হিমানী-সম্প্রপাতে মারা পড়েছ।

সচকিত কণ্ঠে তাগাই বলে,—বটে, বটে! তা ওরা দলে বুঝি বেশ ভারী?

কিন্তু, মাত্র দুজন শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর বদলে গেল। চপল কণ্ঠে বললে,—আঃ কী রূপ তোমার, জয়নাব! কী মন-মাতানো ঐ ভ্রূ জোড়া আর দুষ্টুমিভরা চপল চোখ দুটো! সর্দার বুড়ো হয়েছে, আর জুরা তো বাচ্চা,—আমায় তুমি শাদী করো, জয়নাব। জান বুলবুল আমার, তোমার জন্যে কি চমৎকারই না মুক্তো-বসানো কয়েক-গাছা নেকলেস আর রুপোর একছড়া কটিহার এনেছি! শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছি, আমায় আগুনের ধারে নিয়ে চলো, লক্ষ্মীটি।

জুরাই বিয়ে করবে জয়নাবকে,—এটা এমনি একটা ব্যাপার, যা গাঁয়ের সবাই জানে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে। জুরার কাছেও তা স্বতঃসিদ্ধ এবং বেশ কিছুকাল থেকেই। তাই তাগাইয়ের কথায় সঙ্গে সঙ্গে তার মেজাজ বিগড়ে গেল। ইতিমধ্যে তাগাই গিয়ে জয়-নাবের হাত ধরেছে। জুরা যেন ছিটকে বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গ-পথ থেকে। পেছনে থেকে সজোরে তাগাইয়ের কনুই চেপে ধরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো,—অ্যাঁ তুমি!

চোখের পলকে জয়নাব উধাও। তাগাই এক ঝটকায় কনুই ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরে দাঁড়াল। জুরাকে দেখে যেন কত খুশী হয়েছে এমনি ভান করে হৈ হৈ করে উঠলো সে,—আরে, আরে পিয়ারের দোস্ত যে! তুমি?

কিন্তু জুরা নীরব। চোখে ক্রুদ্ধ চাউনি। সেটা লক্ষ্য করে তাগাইও গরম হয়ে উঠলো। বললে,—ব্যাপার কি? মেহমানকে খাতির-যত্ন করছো না যে বড়? আদবকায়দা ভুলে গেলে নাকি?

জুরা বললে,—চলে যাও এখান থেকে। তোমার জায়গা হবে না।

তাগাই ভাবলে, ঈর্ষায় পড়ে জুরা বুঝি এসব বলছে। কুৎসিত মুখভঙ্গি করে

সে খেঁকিয়ে উঠলো,—কি বললি, বেয়াদব কুত্তার বাচ্চা? সর্দারকে ডাক্ তো, আদব-কায়দা কাকে বলে তোকে শিখিয়ে দেবে!

দুরন্ত রাগে জুরার রক্ত মাথায় উঠে যায়। সে গর্জে উঠলো,—খবরদার তাগাই! দ্বিতীয়বার গাল পাড়লে রেহাই দেব না। সর্দারই একথা বলে দিয়েছে।

—মিথ্যে কথা! তুই মিথ্যেবাদী! মেয়েছেলের মতো মিথ্যে কথা বলছিস্! উপকারী দোস্তকে সর্দার কখনই একথা বলতে পারে না। আর নয়তো সে বে-দীন কাফের বনে গেছে, আল্লাকে আর মানে না।

নিদারুণ রাগে ও বিতৃষ্ণায় জুরা থুথু ফেললে। তাগাইয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল কুকুরগুলোর দিকে, যেন ওদের দিকেই তার সমস্ত মনোযোগ।

দুজনেই এখন যেন দুজনের গলা কাটার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু দুজনেই কথা বলছে যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে। চেঁচামেচি বা গালাগালি করার অর্থ নিজেদের ইজ্জৎ নষ্ট করা, ঝগড়াটে মেয়েমানুষের পর্যায়ে নেমে আসা।

হুঁ বুঝেছি!—হিংস্র কণ্ঠে তাগাই গর্ গর্ করে উঠলো : বুড়ো শেয়ালটা ধূর্তোমি শিখেছে! লাল শয়তানদের ঠাঁই দিয়েছে। বটে বটে! তবে রে বুড়ো পচা খাটাস! এ জন্যে তোকে পস্তাতে হবে......

বলতে বলতে সে থেমে যায়। ক্ষণকাল কি যেন ভাবে। তারপর কণ্ঠে মধু ঢেলে হঠাৎ সে ফিরলো জুরার দিকে, বললে,—যাক্ গে ভাই জুরা। আমায় মাফ করো, রাগের মাথায় যা বলেছি, ভুলে যাও। সত্যিকার জোয়ান মরদ তুমি, তোমায় পরখ করছিলাম। শোন ভাই, আজ রাতে আমরা দুজনে পার্টিজানদের খুন করবো, তাদের রাইফেলগুলো নিয়ে নেব। তারপর কাল তোমায় আমি নিয়ে যাব এক দূরে দেশে—সারিকলে। সেখানে লাল শয়তানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তুমি বিরাট একজন নামকরা ব্যক্তিকে সাহায্য করবে,—কি বলো?

শীতে তাগাইয়ের সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপছে, দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ উঠছে।

তেমনি ভ্রু কুঁচকেই জুরা বললে,—যা বলছি তাগাই, চলে যাও এখান থেকে। পার্টিজানদের খতম করতে আমি একাই যথেষ্ট।

তাগাই তবু নাছোড়বান্দা। শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে আবার সে বললে, —শোন জুরা, তোমার বাবা বীর ইদীজকে সর্দার বিষ খাইয়ে মেরেছিল, জান? সর্দারের ভয় ছিল, তোমার বাবা হয়তো তার ধনদৌলত কেড়ে নেবে। তাই বলছি, এস আমরা দুজনে আগে বলশেভিকদের খুন করি, তারপর আমি সর্দারকে খুন করবো। তাহলে জ্ঞাতি-খুনের পাপ তোমায় বর্তাবে না। তারপর তুমিই হবে গোষ্ঠীর মাতব্বর। আশা করি, আমার এ প্রস্তাবে এবার তুমি রাজী হবে।

জুরার ভ্রু ভয়ংকর কুঁচকে যায়। বাবার রহস্যজনক মৃত্যুর দৃশ্য তার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। গাঁয়ের সবাই বাবাকে ভারী ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে জুরা যেন কেমন হয়ে যায়। বড় বিচলিত মনে হয় তাকে।

তার পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে হঠাৎ খাপ থেকে সে ছোরা টেনে বের করলে, দৃঢ় কঠোর কণ্ঠে বললে,—চলে যাও বলছি এখান থেকে!

তাগাইও ঝটকা মেরে রিভলবার টেনে নিলে।

তরুণ শিকারীর মুখে তিক্ত নীরস হাসি ফুটে ওঠে। সে বললে,—করো, গুলি করো! গুলির আওয়াজ পার্টিজানদের কানে যাবে, তারা বেরিয়ে এসে খতম করবে তোমায়।

তাগাই রিভলবার সরিয়ে নিতে নিতে বিষাক্ত কণ্ঠে যেন হিস হিস করে উঠলো,—

মনে রাখিস্‌, তোকে আর তোর গোষ্ঠীর সব্বাইকে রক্ত দিয়ে আজকের এই বেয়াদবির দাম শুধতে হবে।

জুরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। দেহের একটা মাংসপেশী পর্যন্ত নড়ছে না।

আর দ্বিরুক্তি না করে তাগাই ফিরলো।

মচ্‌মচ্‌ শব্দে তুষার গুঁড়ো হবার শব্দ ওঠে তার জুতোর তলা থেকে।

মিন-আরখার থেকে যাতায়াতের পথ তার জানা। সেই পথ ধরে সে রওনা হলো এক গোপন জায়গার উদ্দেশে। শেষবার সে যখন কাশগড় থেকে বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিল, তখন বেশ কিছু গরম জামাকাপড়, খাবারদাবার, জ্বালানি ইত্যাদি তারা লুকিয়ে রেখে গেছলো সেই গোপন জায়গায়।

প্রথম পর্ব ৮

নিজের কুঠরিতে চামড়ার বিছানায় শুয়ে জুরা ছটফট করছে। আর আগুনের পাশে বসে ভেড়ার কাঁধের পেছনের একখানা চ্যাপ্টা হাড় নিয়ে ভবিষ্যৎ গণনা করছে আয়েশা। ছেলের দিকে সে বারবার আড়চোখে তাকায়। শেষে একসময় জিজ্ঞেস করলে,—হাঁ রে, কি হলো তোর?

জুরাও ঠিক জানে না, কি হয়েছে। সে কল্পনায় দেখছে, লোহার কার্পেটে চড়ে দূর আসমানে পাড়ি দিচ্ছে সে...হ্যাঁ ঈগলের মতোই সে আসমান থেকে দেখতে চায় নীচের দুনিয়াটাকে......

নিজের কুঠরিতে বসে ক্ষুধার্ত কুচাক জেগে স্বপ্ন দেখছে। এমন এক কল্পলোকের স্বপ্নে সে বিভোর, যেখানে সবাই প্রাণ ভরে খেতে পায়......

অন্ধকারে বসে ফিস ফিস করছে বুড়ি ও কিশোর-কিশোরীর দল......

মুসা ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্লান্ত ইভাস্কো ঢুলছে। মুসলমানী আইনকানুনের ওপর তার আস্থা নেই। তাই ঠিক হয়েছিল, পালা করে তারা পাহারা দেবে ও ঘুমোবে।

প্রথম রাতে এখন ইভাস্কোর পাহারা দেবার পালা। কিন্তু ঘুমের চোটে সে চোখই খুলে রাখতে পারছে না, তা পাহারা! ঢুলতে ঢুলতে শেষে একসময় সে নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠলো,—ধুত্তোর ছাই! জাহান্নামে যাক্‌ ওরা! খুন করবে, করুক! চোখই মেলতে পারছি নে, তা পাহারা দে-ব—. ....

পরক্ষণে ইভাস্কো ঘুমিয়ে পড়ে .

আগুন নিভে যায় ধীরে ধীরে।

স্তব্ধ রাত্রি। ভেতরে অন্ধকার......

নিঃশব্দে গুড়ি মেরে ঘুমন্ত পার্টিজানদের দিকে এগিয়ে আসছে আয়েশা। হাতে ছোরা। তাজিকের মাথার একগোছা চুল তার চা-ই চাই। এ চুল আধিব্যাধির মোক্ষম দাওয়াই—এটা ওদের জন্মগত সংস্কার।

পার্টিজানদের সঙ্গেই রয়েছে বাসমাচী কুকুরটা। পাশে শুয়ে আছে। আয়েশার পায়ের শব্দ কানে যেতেই সে গরগর করতে করতে উঠে দাঁড়াল।

সর্বনাশ! কুকুরটার কথা বুড়ির মনেই নেই। ঘাবড়ে গিয়ে সে দৌড় মারলে পালা-

নোর জন্যে। পেছনে ধেয়ে এল কুকুরটা। কিন্তু পরক্ষণে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে পিছু হটে গেল।

দরজার বাইরে সর্দারের বিশালদেহী কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে। একটা মাত্র চোখ তার, তাই নাম এক-চোখো। অন্ধকারে আগুনের ভাঁটার মতো ঐ একটা চোখই নবাগত কুকুরটার নজরে পড়েছে।

ভয়ে ও উত্তেজনায় নবাগতের গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো সে। পায়ে পায়ে ঘুমন্ত লোক দুটির পাশে হটে এসে পেছনের পা দিয়ে কামরার মেঝে আঁচড়াতে শুরু করলো। শেষে একসময় তার ভয় ও উত্তেজনা কমে এল ধীরে ধীরে। সামনের প্রসারিত থাবার ওপর মাথা রেখে আবার সে শুয়ে পড়লো।

দরজার বাইরে থেকে হঠাৎ আবার একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে। জুরা সন্তর্পণে গুড়ি মেরে কামরায় ঢুকছে। হাতে লম্বা হাতল-দেওয়া একখানা কুড়ুল।

কুকুরটা আবার গরগর করতে শুরু করেছে। ঘুমের মধ্যে মুসা ও ইভাস্কো জোরে জোরে কি যেন বিড়বিড় করে উঠলো......

মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে, ওরা দুজনে কিন্তু গভীর ঘুমে অচেতন.....

কুকুরটা গোঁ গোঁ করে উঠলো—এবার আরো জোরে। জুরার ভয় হলো, ডাকাতরা জেগে না ওঠে। মুসা ও ইভাস্কোকে সে ডাকাত বলেই ধরে নিয়েছে। আর তার এগোতে ভরসা হয় না। অন্ধকারে পেছু হটতেই সে আচমকা মায়ের অর্থাৎ আয়েশার ঘাড়ে এসে পড়লো।

অন্ধকারে প্রথমে দুজনেই হকচকিয়ে যায়। তারপর পরস্পরের উদ্দেশ্য খোলসা হতেই, তর্ক বাধলো মা ও ছেলের মধ্যে। বুড়ি চায় জ্যান্ত তাজিকের মাথার একগোছা চুল। কিন্তু জুরা বলে, তা হবে না, আগে সে ডাকাতদের রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে তাদের খুন করবে, তারপর মা মরা তাজিকের মাথা থেকে যত চুল দরকার কেটে নিক। আয়েশা যত বোঝায়, কিন্তু জুরার সেই এক গোঁ। আয়েশা এবার শেষ অস্ত্র ছাড়লে, বললে,—সর্দারের মত না নিয়ে লোকদের খুন করা কিন্তু কখনই উচিত কাজ হবে না। হাজার হোক, ওরা মেহমান।

এ অস্ত্রে কাজ হয়। মায়ের কথায় শেষে রাজী হয় জুরা। দুজনের মধ্যে রফা হলো, কুকুরটাকে আগে ওখান থেকে সরাতে হবে। তারপর আয়েশা একগোছা চুল কেটে নেবার পর জুরা রাইফেল দুটো নিয়ে তাজিক ও কিরঘিজ দুটোকেই খুন করবে।

কিন্তু কুকুরটাকে সরানো যায় কি করে? ওকে সরাতে না পারলে সব মতলবই ভণ্ডুল।

জুরা কি ভাবলে ক্ষণকাল। তারপর বাবুকে ডেকে নিয়ে নিজের কামরায় বাতির ধারে গিয়ে বসলো। বাবুর মাথা দু হাতে চেপে ধরে সে নিষ্পলক চোখে তাকালো তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দিকে।

প্রথম প্রথম বাবু হাই তুলে মুখ বেঁকিয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! শেষ পর্যন্ত সে বাধ্য হলো জুরার চোখে চোখ রাখতে। কিছুক্ষণের মধ্যে চোখ সরিয়ে নেবার ক্ষমতাও তার লোপ পেল।

বাবুর মাথা জুরা তখন দু হাত দিয়ে পিষছে। এত জোরে পিষছে, যাতে সে ব্যথা পায়। পিষতে পিষতে তার কানে কি যেন সে বলে চলেছে ফিসফিস করে। বাবুর তখন বাইরের গন্ধ, ব্যথা ও শব্দ অনুভব করার শক্তি নেই। সে শুধু জুরাকে দেখছে, জুরার কথাই শুনছে।

শেষে একসময় জুরা বাবুকে ছেড়ে দিলে। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর করে ঘাম ছুটছে।

বাবুর নাকে আবার গুলজান ও গোবরের পরিচিত গন্ধের সুড়সুড়ি লাগতেই সে হেঁচে উঠলো।

দূর থেকে গাঁয়ের অন্য কুকুরদের বিষণ্ণ কণ্ঠের ডাক ভেসে আসছে। একটানা করুণ আর্তনাদ যেন। আয়েশার বুড়ি কুকুরটা আর্তনাদ করছে সবচেয়ে জোরে। একবার গোঙাতে শুরু করলে সে যেন থামতে চায় না।

বাবু হামাগুড়ি দিয়ে কামরায় ঢুকলো। ঘুমন্ত পার্টিজানদের পাশে নবাগত কুকুরটা শুয়ে আছে। বাবু সোজা এগিয়ে যায় তার দিকে।

বাবুর গায়ের গন্ধ নবাগতের নাকে আগেই গেছলো। বাবুকে দেখে ওর কান খাড়া হয়ে উঠলো। কাটা লেজের গোড়া নাড়তে নাড়তে বাবু এগিয়ে আসছে তার দিকে। সে মাদী কুকুর, তবু শঙ্কায় নবাগতের লেজ ঝুলে পড়েছে, কান পেছনে চলে গেছে। কিন্তু বাবু কাছে এগিয়ে আসতেই, তার হাবভাব পালটে গেল। সানন্দে দাঁত বের করে সে লেজ নাড়তে শুরু করলো।

আরো এগিয়ে গিয়ে বাবু তার নাক শুঁকলো। মাটিতে মাথা নামিয়ে খাঁড়া লেজটা নাড়ছে সে বারবার। ভরসা পেয়ে নবাগতও জবাব দেয় জোরে লেজ নেড়ে।

বাবু এবার সামনের দিকে কয়েকবার লাফ দিলে। আর বারবার শুয়ে পড়তে লাগলো মাটিতে বুক ঠেকিয়ে।

নবাগতের মনে আর শঙ্কা নেই। মহাখুশিতে বাবুর কাছে এগিয়ে এল সে। অমনি হঠাৎ দেহ বেঁকিয়ে, ভঙ্গিমা করে বাবু ছুট দিলে অন্ধকারের দিকে। নবাগতও ছুটলো তার পেছনে।

বাবুর গমন-পথের তীব্র গন্ধ অনুসরণ করে তুষার-তলের সুড়ঙ্গপথ ধরে সে ছুটছে। ক্ষণপরে সে লাফিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে—তুষার-ঝলমলো জোছনা-ঢালা নীলাভ রাত্রির মাঝে।

বাবুর নাগাল পাবার জন্যে নবাগতের তখন আর কোন দিকে লক্ষ্য নেই, ছুটছে সামনের দিকে। হঠাৎ সে অন্য আর একটা কুকুরের ঘাড়ে গিয়ে পড়লো। ডিগবাজি খেয়ে নিদারুণ ভয়ে সে লাফিয়ে উঠেই, দ্বিতীয়বার লাফ মারলো পেছনে কামরার সুড়ঙ্গ-দরজার দিকে। কিন্তু হায়! দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক কালো কুকুর—সেই এক-চোখো। মুহূর্তের মধ্যে কুকুরের পাল নবাগতকে ঘিরে ফেললে চারদিক থেকে।

নবাগতের কান পেছনে চলে যায়। লেজ পেটের নীচে এমন ভাবে সেঁধিয়েছে যে, তার আগা চলে এসেছে প্রায় সামনের থাবা পর্যন্ত। হতভাগ্য জানোয়ারটা দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো। গায়ের লোম তার খাড়া হয়ে উঠেছে। পিঠ বেঁকে গেছে ধনুকের মতো। নিজেকে আরো বড় আরো ভয়ংকর দেখানোর জন্যে হিংস্র দাঁত বের করে সে ঘুরপাক খেতে শুরু করলো।

কিন্তু ক্রুদ্ধ হিংস্র কুকুরের পাল ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল—নিশ্চল নিশ্চুপ। ঠাণ্ডা নিষ্পলক দৃষ্টি তাদের চোখে।

নবাগত আতঙ্কে দিশেহারা। সব দিক থেকে আক্রান্ত হবার ভয়ে সে পাগলের মতো ঘুরপাক খেতে শুরু করে। কিন্তু কুকুরের পাল তবু নড়ে না। শুধু আরো জোরে আরো ঘন ঘন পড়তে থাকে তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস।

মারাত্মক বিপদের সঙ্কেত সর্বদিকে। নবাগত আর্তনাদ করতে শুরু করলো।

তার ঠ্যাং কাঁপছে। কেঁউ কেঁউ করে সে করুণা মাগছে। সে চায়, ওরাও তার ডাকে সাড়া দিক। তাহলে অর্থাৎ ওরা ডাকলে, হয়তো সে রেহাই পেয়ে যেতে পারে।

হিমেল রাত্রির স্তব্ধতার মাঝে দূর থেকে শব্দ ভেসে এল। তুষারের ওপর দিয়ে কে যেন হাঁটছে সন্তর্পণে। আয়েশা গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে ঘুমন্ত পার্টিজানদের দিকে। কিন্তু সেদিকে নবাগত কুকুরটার তখন লক্ষ্যই নেই।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুধার্ত প্রকাণ্ড কুকুরগুলো। হিংস্র আক্রোশে চোখগুলো জ্বলছে। দলপতির সঙ্কেতের অপেক্ষা শুধু।

কিন্তু সবার ছোট কুকুরটার বুঝি আর দেরী সইল না। সে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো নবাগতের ওপর।

নবাগত হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান। এক লাফে সরে গিয়ে সে রোগা কুকুরটার কান কামড়ে ছিঁড়ে দিলে, তাকে পেড়ে ফেললে বরফের ওপর।

ক্ক্যাতে ক্ক্যাতে হামলাকারী ছুটে পালাল। কিন্তু কুকুরের পাল তবু নিশ্চল নিশ্চুপ। চোখের দৃষ্টি তাদের লকলক করছে ভয়ঙ্কর হিংস্রতায়। সেদিকে তাকিয়ে নবাগতের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাবার মতো। আবার সে আর্তনাদ করে উঠলো।

এক-চোখো এবার উঠে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল সামনের দিকে। একটা চোখের ক্রূর দৃষ্টি নবাগতের ওপর নিবদ্ধ। লেজ নাড়লো সে। নবাগত মহাখুশী—যেন বর্তে গেছে। এক-চোখোকে খাতির করার ভঙ্গিতে শরীরটা সে লম্বা করে দিলে সামনের দিকে। ভয় তার অবশ্য মোটেই কাটে নি, লেজ পেটের নীচে তেমনি সেঁধিয়ে আছে।

এক-চোখো আবার এগিয়ে গেল আরো কয়েক পা। এবার নবাগত ঘাবড়ে যায়। কোথায় উবে গেল তার শক্তি-সাহস! এক-চোখোর হিংস্র ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সামনে তার কি মনে হলো কে জানে! আকাশে চার-পা তুলে চিৎ হয়ে পড়লো সে। সবচেয়ে যে বলবান, তার করুণার ওপর নিজেকে সে সমর্পণ করলো বিনা যুদ্ধে।

চোখের পলকে এক-চোখো তার টুঁটি কামড়ে ধরলো। গোটা দলটা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। মরার আগে নবাগত ক্ষীণতম শব্দ করারও সুযোগ পেল না। তার টুঁটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।......

ঠাসাঠাসি-করা কুকুরের পাল—তার ভেতর থেকে গরম ধোঁয়া ওঠে। বাতাসে জমে গিয়ে তা হিমকণার আকারে ছড়িয়ে পড়ছে তাদের লোমশ দেহের ওপর।

তারপর সব শেষ।

নবাগত নিশ্চিহ্ন।

বাবু চাঁদের দিকে মুখ তুলে বিষণ্ণ কণ্ঠে ককিয়ে ওঠে একসময়। তাকে ঘিরে অন্য কুকুরগুলোও যোগ দেয় তাতে। তাদের জোরালো করুণ কণ্ঠের একটানা ঐকতান কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে যায় নিশুতি রাতের স্তব্ধতায়। মিলিয়ে যায় মেঘেরও ওপারে অসীম শূন্যতার মাঝে। প্রতিধ্বনি জাগে না।

কুচাকের লাললোমওলা আর আয়েশার ছাইরঙা কুকুর দুটো কিন্তু তখনও তুষারের ওপর জমাট রক্তমাখা কি একটা চিবোতে চিবোতে পরস্পরের প্রতি সমানে তর্জন-গর্জন করে চলেছে।

অন্ধকার! কামরার ভেতরে অন্ধকার।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে মুসা ও ইভাস্কো।

কিন্তু ও কে? কে এগিয়ে আসছে অন্ধকারে?

সন্তর্পণে জুরা কামরায় ঢুকলো।

তারপর স্বল্পস্থায়ী লড়াই একটু,—আধা-ঘুমন্ত পার্টিজানদের জুরা বেঁধে ফেললে।

খবরদার!—সে শাসিয়ে উঠলো : চোখ মেলবি নে, চোখ উপড়ে ফেলবো! টুঁ শব্দ করবি তো জিভ কেটে ফেলবো!

রাইফেল দুটো সে তুলে নেয়। গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করতে থাকে সেগুলো।

মুসা ততক্ষণে পুরোপুরি জেগে গেছে। সে চেঁচিয়ে উঠলো,—আমি দোভাষী, মুসলমান। আমার বাঁধন খুলে দাও। শুধু দোভাষীর কাজই আমি করি।

কিন্তু ওতে কাজ হয় না।

জুরার জবাব এল,—ঘাবড়াও মাৎ! ভেড়াকে পায়ের দিকেই বাঁধতে হয়, তা সে সাদাই হোক আর কালোই হোক।

হৈচৈ চেঁচামেচি ততক্ষণে সর্দারের কানে গেছে। উদ্বেগ-উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে সে এসে কামরায় ঢুকলো।

হতভাগা ছোঁড়া!—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সর্দার গর্জে উঠলো : নীরেট আহাম্মক কোথাকার! করেছিস কি? দীনদার কেউ কখনো নিজের বাড়িতে মেহমানদের ওপর বাটপাড়ি করে, তাদের খুন করে শুনেছিস? আইন হলো, নিজের বাড়িতে তাদের খাতির-আত্তি করবি, দানাপানি দিবি, তাদের পথে তারা চলে যাক। তারপর চাস্ তো পথে অদের খুন করবি, কেড়ে-কুড়ে নিবি।

জুরা চটে উঠলো। বললে,—থামো বুড়ো, ভাগো এখান থেকে। অন্ধকারে নিজের পথ আমি নিজেই খুঁজে নেব। হাতিয়ারগুলো নিয়েছি, এবার ওদের খতম করবো।

সর্দার গর্জে উঠলো আবার,—নচ্ছার আধপাগলা শয়তান! এ বয়েসে আমি অনেক দেখলাম, শুনেছিও অনেক। সে বছর তাগাইয়ের বাবা সেই ব্যাপারী কি বলেছিল শুনিস্ নি? বলেছিল, একটা তাজিককে খুন করলে একশো তাজিক তার জায়গায় এসে হাজির হয়।

না না, হাজার!—মুসা চেঁচিয়ে উঠলো : একশো হাজার তাজিক বলশেভিক এসে হাজির হবে। যদি ভাল চাও, মরতে না চাও তো, আমাদের ছেড়ে দাও। জুরা আমাদের ওপর হামলা করেছে সত্যি, তবু হলফ করছি, ওর গায়ে আমরা হাত দেব না।

বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে ইভাস্কো তখন মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

তীব্র কঠোর কণ্ঠে সর্দার এবার শাসিয়ে উঠলো,—হতচ্ছাড়া পাজী ছোঁড়া! তোকে আমি শাপ দেব বলছি। চীনা ব্যাপারীরা যে কেতাবখানা দিয়ে গেছে, তা থেকে আমি আখের গুনে দেখেছি জানিস? দেখেছি, মেহমানদের ছেড়ে দিতে হবেই। তা নইলে আল্লার গজব পড়বে তোর ওপর, সারা গাঁয়ের ওপর।

জুরা ততক্ষণে চূড়ান্ত ঘাবড়ে গেছে। এতটা হৈ-হল্লা হবে সে ভাবতে পারে নি, চেয়েছিল চুপিচুপি কাজ সারতে। সর্দারের শেষ কথার পর প্রতিবাদ করার বাকী ক্ষমতাটুকুও তার উবে গেল।

ধীরে ধীরে রাইফেল দুটো সে নামিয়ে রাখলে মেঝের ওপর।

মুসা ও ইভাস্কো বেঁচে গেল সেবারের মতো।

পরদিন সকালে গ্রাম ত্যাগ করার সময় জুরার ম্যাচলক গাদা বন্দুকটাও তারা সংগে নিলে।

সারা গাঁয়ে ঐ একটাই মাত্র বন্দুক। শিকারের জন্যে ওটা রেখে যেতে ইস্কান্দার ও আয়েশা অনেক কাকুতিমিনতি ধরাধরি করলে।

কিন্তু ইভাস্কো অনড়। মুসার মারফৎ সর্দারকে বললে,—তোমায় ধন্যবাদ, বন্ধু। তুমি আমাদের আশ্রয় দিয়েছ, শীতের হাত থেকে বাঁচিয়েছ। তোমার জন্যেই জুরাকে আমরা মাফ করেছি। কিন্তু আমাদের হাড়গোড় এখনো ব্যথায় টনটন করছে। তার ওপর ফেরার পথে জুরার বুলেট খাব, সে সাধ আমাদের নেই। গ্রীষ্মের সময় আবার আমবা আসবো। আসবো তোমাদের জন্যে খাবারদাবার, রসদপত্র আর সুতীর ছাপানো কাপড়চোপড় নিয়ে। পুরনো এই বন্দুকটাও সঙ্গে আনবো সে সময়।

দ্বিতীয় পর্ব ১

সারা গাঁ অনাহারে ধুঁকছে। সাড়া নেই, শব্দ নেই—অদ্ভুত নীরবতা থমথম করছে কুঠিগুলো ঘিরে। লোকগুলো পাণ্ডুর, কঙ্কালসার। হাঁটতে চলতেও তাদের বড় কষ্ট। একান্ত যেটুকু না করলে নয়, দুর্বলদেহে টলতে টলতে সেইটুকুই শুধু করে কোন-রকমে। এমন কি কয়লা ও মেটে তেল আনার ক্ষমতাটুকুও আজ তাদের নেই।

কুকুরগুলোর অবস্থা হয়েছে সবচেয়ে কাহিল। মানুষদের খাদ্যাভাব ঘটেছে সত্যি, তবু তাদের গুলজানের গুঁড়ো আছে। কিন্তু কুকুরগুলোর তাও নেই। একমাত্র বাবু-ই শুধু ব্যতিক্রম। শিকারী কুকুর হিসাবে তার জুড়ি নেই। যেনতেনপ্রকারে খাবার সে জুটিয়ে নেয়।

এমনি করে দিন গড়িয়ে চলে। গড়িয়ে গড়িয়ে কাটতে থাকে লম্বা শীতকাল।

তারপর ধীরে ধীরে একসময় শীত-বিদায়ের আভাস জাগে, বসন্তের আগমনী সাড়া জাগে দিকে দিকে। যত দিন যায়, ততই তা স্পষ্ট হতে থাকে। পাহাড়ের মাথায় মাথায় তুষার গলতে শুরু করে। বাতাসে ধুলোবালি ওড়ে। তুষারের ওপর হলদে বালুকণা জমে. রোদের তাপে তা গরম হয়।

আর আনন্দ-কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে সারা গাঁ।

দেখতে দেখতে কুঠরিগুলোর ছাদ থেকে তুষারের আস্তরণ অদৃশ্য হয়। কুকুর-গুলো সারাদিন সেখানে রোদ পোহায়।

জুরা ও কুচাক পাহাড়ে পর্বতে ফাঁদ পেতে পাহাড়ী তিতির ধরে। গাঁয়ে মাংস আসতে শুরু করেছে। জীবনযাত্রা তাই এখন অনেকটা সহজ সচ্ছল।

এক-একদিন সকালে তিরিক্ষি মেজাজে সর্দার কুঠরি থেকে বেরিয়ে আসে। মাথা নীচু করে গলা বাড়িয়ে আধবোজা চোখে সতৃষ্ণ নয়নে তাকায় নীচের গিরিখাতের দিকে। সেখানে এক উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে সবসময় ধোঁয়া উঠছে। বুড়ো জুরাকে জিজ্ঞেস করে,—হাঁরে, বলতে পারিস, ওখানকার অবস্থা কি?

কাছের পর্বত-ঢালে তখনো কঠিন তুষার পুরু হয়ে জমে আছে। সেদিকে দেখিয়ে জুরা বলে,—পথ এখনও সাফ হয় নি, হিমানী-সম্প্রপাত গলে নি এখনো।

গ্রীষ্মে হিমানী-সম্প্রপাত গলার পর গিরিখাতগুলো দেখা দেয়। তখুনি শুধু বাসিন্দারা সঙ্কীর্ণ ভাক বেয়ে এই গিরিখাতটিতে নামতে পারে। হেমন্ত পর্যন্ত পথটা চালু থাকে। তারপর পিচ্ছিল বরফে ঢেকে যায় আবার। তখন ও পথে নামে কার সাধ্য! সারা শীতকাল নীচের উপত্যকায় যাওয়ার পথ বন্ধ।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ভয়ঙ্কর বজ্র-নির্ঘোষে সারা গাঁ জেগে উঠলো। সর্দারের কুঠ-রিতে গিয়ে জুরা বললে,—হিমানী-সম্প্রপাত সাফ হয়ে গেল। পথ এখন খোলা।

সর্দার নীরবে মাথা নাড়ে।

পরদিন সকালে জুরা ও কুচাক সর্দারের পিছু পিছু রওনা হয় নীচে উপত্যকার দিকে। গিরিখাতের ধার বেয়ে তারা নীচে নেমে এল। কিছু দূরে এক পার্বত্য নদী। তার পাড় ধরে চলে তারা শেষে উষ্ণ প্রস্রবণটির ধারে গিয়ে পৌঁছলো।

প্রস্রবণ থেকে মেঘের মতো বাষ্প উঠছে। চারদিকে সবুজ ঘাস আর জলজ আগাছা। বাতাসে স্যাঁতসেঁতে ভিজে গন্ধ।

সাবধানে স্রোত পার হয়ে তারা গরম জলের বড় এক কুণ্ডের ধারে এসে হাজির হয়। গরম মাটিতে গর্ত করে জুরা তার মধ্যে তিতির পাখির কয়েকটা ডিম রেখে মাটি দিয়ে আবার ঢেকে দিলে সেগুলো।

নমাজ পড়ে সর্দার আলখাল্লা খুলে রেখে জলে নেমে পড়লো। কুচাককে বললে,—নেমে আয়। ভূতপ্রেত দত্যিদানোর কুনজরের ফলে হাড়ে আর গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয় তো! সে সব সেরে যাবে।

অ্যাঁ, জলে নামতে হবে! ওরে বাবা! কুচাক পেছিয়ে গেল। জুরা কিন্তু নীরবে চটপট নিজের জামাকাপড় ছেড়ে ফেললে। তার পরেই হঠাৎ ধরলে গিয়ে কুচাককে। জোর করে তার জামাকাপড় টেনে খুলে ফেললে। কুচাকের সে কী আর্তনাদ! কিন্তু কে শোনে কার কথা! টানতে টানতে তাকে নিয়ে জুরা জলে গিয়ে পড়লো।

উষ্ণ জল। গর্তে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে বড় আরাম। সন্ধ্যার দিকে তারা খোশমেজাজে গাঁয়ে ফিরে এল।

তারপর কয়েকটা দিন কেটে যায়।

জুরা রোজ ড্রাগন-পর্বতের চূড়োয় গিয়ে দাঁড়ায় আর বহুক্ষণ ধরে চারদিককার পর্বতশ্রেণী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে। অবাক হয়ে সে : কোথায় গেল পাহাড়ী বুনো ছাগলের পাল? কোথায় গেল ভেড়ার দল? নেকড়ে বা পাহাড়ী চিতাবাঘেরও তো পাত্তা নেই।

নাঃ, এভাবে চলবে না!

সেদিন সন্ধ্যায় শিকার থেকে ফিরে সে কুচাককে নিয়ে সারা রাত ধরে বুলেট তৈরি করলো। সিসের খনি থেকে তারা সিসে তুলে এনেছে। ছোট ছোট পাথরের নুড়ি সেই গলানো সিসের মধ্যে ফেলে তারা তৈরি করলে বুলেট।

কাজ করতে করতে কুচাক একসময় গজগজ করে ওঠে,—হুঁ, বন্দুক নেই, তার বুলেট! বুলেট দিয়ে তুই কি করবি, বল্ তো?

জুরা বললে,—বাঃ! এর মধ্যে ভুলে গেলে ম্যাচলক গাদা বন্দুক দুটোর কথা? সে দুটো বিলিয়াণ্ড-কীকে লুকনো আছে না?

পর দিন ভোরে সূর্য ওঠার আগেই জুরা সর্দারের কুঠরিতে গিয়ে হাজির হলো। সর্দার আগুনের পাশে বসে আছে। জুরার ঝুলকালিমাখা চেহারার দিকে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। জুরা বললে,—পর্বত সব ফাঁকা। বুনো ছাগল, ভেড়া বা পাহাড়ী মোরগ উলার, কোন কিছুরই পাত্তা নেই। শরৎকাল নাগাদ ছাগলগুলো মোটা হবে সত্যি, কিন্তু তত দিন সবুর করা মোটেই ঠিক হবে না। কুচাককে নিয়ে আমি শিকারে বেরোতে চাই, তাই অনুমতি চাইছি।

জুরার বেপরোয়া কথা বলার ধরন দেখে বুড়োর মেজাজ খিঁচড়ে গেল। বিরক্ত কণ্ঠে বললে,—জানি। আগে গুনে দেখতে হবে, তারপর বলবো, কোন্ দিকে শিকারে বেরোবি।

গণনার বই খুলে বসলো ইস্কান্দার। জুরাও বেরিয়ে পড়লো। মনে তার দুর্ভাবনা, সর্দার দক্ষিণে বিলিয়াণ্ড-কীকে যেতে না বললে, কি উপায় হবে? ওখানেই তো আছে বন্দুক দুটো। একা-একা বহুক্ষণ সে ঘুরলো গ্রামের মধ্যে। কি করবে, কিছুই ঠিক করতে পারছে না। শেষে এক সময় ডাক এল সর্দারের কাছ থেকে।

সর্দারের কামরায় সবাই জমায়েত হয়েছে। বুড়ি ও মধ্যবয়সী মেয়েদের সঙ্গে আয়েশা এসেছে। এসেছে কিশোরেরা আর জয়নাব ও তরুণীর দল।

কুচাককে নিয়ে জুরাও হাজির হলো। সবাই নীরব।

সোনালী ড্রাগন-আঁকা লম্বা রেশমী চীনা আলখাল্লা গায়ে সর্দার উঠে দাঁড়ায়। জ্যোতিষী বিদ্যার বইখানা সে মাথার ওপর তুলে ধরেছে। মহাগাম্ভীর্যের সঙ্গে বই-খানা সে ঘুরিয়ে দক্ষিণ দিক দেখিয়ে দিলে। চোখের তারায় তার ধূর্তামির ঝিলিক খেলে যায়। ম্যাচলক বন্দুক দুটোর কথা সে ভোলে নি।

অন্যদের অবশ্য ওসব বুঝবার কথা নয়। তারা সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

সর্দার বললে,—দৈব ও ভবিতব্যের বিচক্ষণতাকে ধন্যবাদ দাও। দক্ষিণ দিকে যাওয়ার নির্দেশ এসেছে। সেখানে বিলিয়ান্ড-কীকে হৃষ্টপুষ্ট ছাগল-ভেড়া প্রচুর পাবে। তোমাদের অভিযান সফল হোক।

জুরার সঙ্গে জয়নাবের দৃষ্টি বিনিময় হয়। সর্দারের কথায় জয়নাবের চোখে খুশির ঝিলিক খেলে গেল। কামরা থেকে বেরনোর সময় নীচু গলায় সে জুরাকে বললে,—প্রার্থনা করি, ছাগল-ভেড়ার অঢেল মাংস তুমি যেন আনতে পার, সেই সঙ্গে উলারের মাংসও।

মুচকি হেসে জুরা নীরবে মাথা নাড়ে।

দ্বিতীয় পর্ব ২

পর দিন ভোর হতেই জুরা ও কুচাক শিকার-অভিযানে বেরিয়ে পড়লো। পরনে তাদের ছাগল-চামড়ার পোশাক।

কুচাক মধ্যবয়সী—বেঁটেখাটো মানুষ। সারা গায়ে বাঁদরের মতো লোম। দু বাহু আজানুলম্বিত। টকটকে লাল মুখ বুড়োদের মতো ভাঁজপড়া, কুঞ্চিত।

জুরা তেইশ-চব্বিশ বছরের তরুণ। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত চওড়া কাঁধ। সে নিয়েছে বুলেট ও বারুদে ভর্তি চিতাবাঘের মাথা আঁকা বন্দুকের বাক্স।

আর কুচাকের ঘাড়ে মরিচ ও সুগন্ধ লতাগুল্মের মশলায় ঠাসা একগাদা থলি। ওস্তাদ মাংস-রাঁধুনী হিসেবে তার সুনাম আছে। জুরার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে প্রাণ তার ওষ্ঠাগত।

লবণ তারা সঙ্গে নেয়নি। বিলিয়ান্ড-কীকের পাহাড়ে পর্বতে নীল, পাটল ও ধূসর রঙের পাহাড়ী লবণ পাওয়া যায় প্রচুর।

ছাগল ও ভেড়ার শিঙের বেড়া দিয়ে ঘেরা গ্রামখানা তারা বহু পেছনে ফেলে এসেছে। তাদের হাতে লাঠি ও কুড়ুল। ভোরের হিমে তুষার তখনো শক্ত। পায়ের নীচে তুষার ভাঙছে মচ্ মচ্ শব্দে। দুই কুকুর তাদের সঙ্গে—ক্ষিপ্রগতি বুদ্ধিমতী বাবু আর রীঝায়া।

ছুটতে ছুটতে বাবু বহু দূর এগিয়ে যায়। মাঝে মাঝে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সে। অধীর আগ্রহে শিকারীদের জন্যে ক্ষণকাল অপেক্ষা করে আবার ছোটে সামনের দিকে। নানা দিক থেকে পাহাড়ী ছাগলের গন্ধ নাকে আসছে তার।

উ'চু পার্বত্য এলাকার দাঁড়কাকের ঝাঁক অবিরাম ডাকছে আর চক্রাকারে উড়ছে ওদের মাথার ওপর। তাদের লাল ঠোঁট, লাল পা।

পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে শিকারীরা ক্রমশঃ ওপরে উঠছে—উ'চু থেকে আরো উ'চুতে। পথঘাট জুরার পরিচিত। কখনো তারা চলেছে খাড়া গভীর খাদের ওপর দিয়ে, কখনও বা ছাগল-চলা সরু পথ ধরে। পথ সেখানে এত সরু যে, সোজাভাবে হাঁটা অসম্ভব।

পর্বতের যে দিকে রোদ, তারা পারতপক্ষে সে দিক দিয়ে চলার চেষ্টা করছে। উষ্ণ রোদের তাপে উ'চু পার্বত্য ভূমি সবুজ শ্যামল। কিন্তু ছায়ায় এলেই মুখ-হাত-পা যেন ঠাণ্ডায় জমে যায়।

টিউলিপ ফুলে ঝলোমলো তৃণভূমি একের পর এক পার হয় তারা। বেগুনি, পাটল, হলদে, নীল, ডোরাকাটা ও ছিটদেওয়া টিউলিপের সমুদ্র যেন—উত্তুরে লম্বু হাওয়ায় মৃদুমন্দ দুলছে।

গাঁ ছেড়ে আসার পর থেকেই সূর্যের আলোয় জুরার সেই ভারিক্কী মাতব্বরী চাল কোথায় উবে গেছে। খোশমেজাজে গান গাইতে গাইতে হাঁটছে সে নির্ভীক দৃঢ় পদক্ষেপে। কুচাকের দিকে ফিরে এক সময় সে হাঁক ছাড়লে,—বলি, ও ডাঁশে-কাটা জোয়ান, গান ধরো না!

জুরার সঙ্গে তাল রেখে চলতেই কুচাকের প্রাণান্ত। মাথা নাড়তে নাড়তে ঝাঁঝের সঙ্গে সে জবাব দেয়,—হুঁ, গান! সোজা খাড়া পর্বতের খাঁজ আঁকড়ে চলতে হচ্ছে, একটু পা ফসকালেই ব্যস্! একেবারে সটান অতল খাদে! এই অবস্থায় বলে কিনা গান! তুই হলি গিয়ে বুঝলি, একটা আস্ত ইয়ে!

কুচাকের দাঁতে দাঁত আটা বিস্ফারিত চোখের অবস্থা দেখে জুরা হাসতে থাকে।

একসময় গিরিদ্বারে এসে পৌঁছলো তারা। উত্তুরে ঝোড়ো হাওয়া যেন উড়িয়ে নিতে চায়। চারদিককার পর্বত থেকে বায়ুতাড়িত তুষার-গাদায় গোটা গিরিখাত ভরে গেছে। এগোনোর পথ বন্ধ।

গিরিখাতের চেহারা দেখে জুরা চমকে গেল। শিউরে উঠলো কুচাক। আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে,—সব্বোনাশ! ঐ সাদা পাঁক পার হতে হবে!

স্যাঁতসেঁতে ভঙ্গুর তুষার রোদে গলতে শুরু করলে কি রকম বিপজ্জনক হয়, সে ভালভাবে জানে। পা দিয়েছ কি, নীচেয় তলিয়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দফা-রফা। তারপর আর কি! ছাগলের মাংস, ভেড়ার মেটুলি ও চর্বির সাধ তোমার মিটে গেল চিরকালের মতো!

সে কাঁই কাঁই করতে থাকে,—আমরা বড্ড আগে এসে গেছি, বুঝলি! ভেড়াগুলোয় এখনো ঠিকমত চর্বি লাগে নি। শরৎকালে পথঘাট কত ভাল থাকে, ভেড়ার গায়ে তেমনি পুরু হয়ে চর্বিও জমে প্রচুর।

জুরা জবাব দেয় না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। তারপর একসময় বাবুকে সে হুকুম করলে এগিয়ে যেতে।

ধীরে ধীরে বাবু এগিয়ে যায়। ধীরে সুস্থে সামনের দুই থাবা সে রাখলে তুষারের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পা বসে গেল। চকিতে লাফ মেরে বাবু পিছু হটে এল।

জুরা তেড়ে উঠলো,—যা, এগিয়ে যা বলছি!

কিন্তু বাবু এবার শুয়ে পড়লো। এমনভাবে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল, যেন জুরার কথা শুনতেই পাচ্ছে না।

জুরা আবার পরখ করে তুষারের গাদা। শেষে বললে,—নাঃ, এ পথে এখন এগোনো যাবে না, কাল ভোর পর্যন্ত দেরি করতে হবে। তুষার তখন জমে গিয়ে শক্ত থাকবে।

গ্রীষ্মকালীন পশুচারণভূমির পাশে, সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া এক পাহাড়ের তলায় গুহার মতো এক ফাটল। সেখানে তারা রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে। গত হেমন্তে সেখানে বিচালি ও ঘুঁটের জ্বালানি গাদা করে রেখে যাওয়া হয়েছিল। কুচাক কেটলিতে খানিকটা তুষার গলিয়ে জল ফুটিয়ে নেয়। পাতলা লপ্‌সি তৈরি করে তা থেকে। তারপর গরম লপ্‌সি তারা গিলতে থাকে ঢকঢক করে। গা দিয়ে তাদের ঘাম ছোটে।

এক কাপ লপ্‌সি জুরা তুলে নেয় বাবুকে দেবার জন্যে। কাপটা দেবার জন্য বাবুর দিকে সে হাত বাড়াতেই, কুচাক হাঁ হাঁ করে উঠলো, জুরার হাত থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলে কাপটা। খেঁকিয়ে উঠলো সে,—তোর কি আক্কেল শুনি! মাথা খারাপ হয়েছে নাকি! কুকুর হলো গিয়ে নোংরা ইতর জানোয়ার। মুসলমান যে কাপে খায়, তুই কিনা তাকে সেই কাপে কালো নোংরা নাক ঢুকিয়ে খেতে বলছিস্!

বিড় বিড় করতে করতে সে কুকুর দুটোকে খাওয়ানোর জন্যে পাথরের মধ্যে গর্ত খুঁজে বের করে। খানিকটা লপ্‌সি সে ঢেলে দেয় তার মধ্যে। বাকিটুকু তার নিজের উদরস্থ করার ইচ্ছা।

জুরা তেড়ে উঠলো,—ভাল হবে না বলছি! অত লোভ ভাল নয়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুচাক বাকিটুকু সঙ্গে সঙ্গে গর্তে ঢেলে দিলে।

কুচাককে ঠেলে সরিয়ে রীঝাযা ছুটে গেল লপ্‌সির দিকে। তারপর—যেমন মনিব, তেমনি কুকুর! জিভ পুড়িয়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে হাভাতের মতো সে গিলতে শুরু করলো সেই ফুটন্ত লপ্‌সি। বাবুও খিদে পেয়েছে সত্যি, কিন্তু লপ্‌সি ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত সে বসে রইল, তারপর ধীরে সুস্থে খাওয়া শেষ করলে।

দ্বিতীয় পর্ব ৩

পর দিন ভোরে সূর্য ওঠার আগেই তারা গিরিখাতের ধারে এসে দাঁড়ায়। গিরিখাত ভরা তুষার—ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে আছে। জুরা পার হবার তোড়জোড় করে। কুচাককেও বলে তৈরী হতে।

কুচাক প্রথমে চেঁচামেচি হম্বিতম্বি করলে। কিন্তু যখন দেখলে যে, জুরা রওনা হচ্ছে, তখন কপাল চাপড়ে তাকেও অনুসরণ করতে হয়।

জমাট তুষারের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে হাত টেনে টেনে তারা সন্তর্পণে এগোতে থাকে, মনে হয় যেন সাঁতার কেটে চলেছে। সময় সময় দেহের ভারে তুষারের স্তর হঠাৎ মচ্ করে বসে যায়, নিদারুণ ভয়ে মানুষ ও কুকুর উভয়েই দম আটকে নিশ্চলের মতো পড়ে থাকে।

এমনি করে তারা এক সময় গিরিখাত পার হলো। আবার রওনা হলো গন্তব্যস্থলের দিকে!

দিনের পর দিন তারা পর্বতের পর পর্বত, নদ-নদী ও হিমবাহ পার হয়ে চলেছে। পর্বতের ঢালে পাহাড়ী বুনো ছাগল ও ভেড়ার পাল নজরে পড়ে। শিকারীদের দেখেই তারা পর্বতের মধ্যে অদৃশ্য হয়। আর জুরা অসহায়ের মতো নিজের হাত কামড়ায় ও

শাপ-শাপান্ত করতে থাকে সেই লোক দুটোকে, মুসা ও ইভাস্কোকে, যারা তার বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে গেছে।

পথ শেষ হয়ে আসছে। তারা শেষ গিরিদ্বারে এসে পৌঁছলো। লবণাক্ত টুজ-সু নদীগুলোর জলবিভাজিকা-পর্বতের ভেতর দিয়ে গেছে এ পথ। বিরাট বিরাট জলপ্রপাত বহু উঁচু থেকে বিপুল গর্জনে নীচে নানা দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

জুরা লাল রঙের খাড়া উঁচু পর্বতগুলোর দিকে ফিরলো। ঐ দিকেই পর্বতগুলোর ওপারে সেই সোকসাই নদী, এক গিরিসঙ্কটের ভেতর দিয়ে ভীম বিক্রমে বেরিয়ে আসছে।

সামনের সুবিশাল পর্বতের দেয়ালে অনেক ফাটল। কোন কোন ফাটল আকারে বড়, তাদের ভেতর দিয়ে একজন লোক কোনরকমে গলে যেতে পারে। একটা ফাটল জুরা বেছে নেয়। সেটা দিয়ে নীচে ওপাশে সোকসাইয়ের তীরে নামা যায়।

জুরার কান্ড দেখে কুচাকের আক্কেলগুড়ুম! সে কাকুতিমিনতি করতে থাকে,—না, না, এখেন দিয়ে নয় রে, এখেন দিয়ে নয়! চল্ ঘুরে যাই। অন্য পথ খুঁজে বের করি।

কিন্তু জুরা বাপের বেটা। বাবার সঙ্গে থেকে ছোটবেলা থেকেই সে ছাগল-চলা পথকে ঘৃণা করতে শিখেছে। বাবা বলতো,—মনে রাখিস্, নিজে আগে নিজের পথ ঠিক করবি। তাহলে দেখবি, কাফেলার দলকে দল তোর পথে চলেছে। ভেড়ামার্কা লোকেরাই শুধু পুরানো পথে চলে। নির্ভীক শিকারী যে, ছাগল-চলা পথে চলতে সে লজ্জা পায়। ছাগলের পালের সর্দারকে দেখেছিস্ তো, নিজে সে পথ বেছে নিয়ে দলের আগে আগে চলে। তুইও তেমনি চলবি গোষ্ঠীর আগে আগে—সবার সামনে

বাবার এ শিক্ষা জুরা ভুলতে পারে না, তার কথাগুলো মনে গেঁথে আছে। তাই কুচাকের কথায় কান দেবার প্রশ্নই ওঠে না। তাকে এক ধমক দিয়ে সে বাবুকে কাছে ডাকলে। তাকে তুলে নিয়ে সে ঝুলিয়ে দিলে কাঁধের দু পাশ দিয়ে।

বাবুর শীগ্‌গীরই বাচ্চা হবে। তবু সে শান্তভাবে চুপ করে থাকে। জুরার কাঁধের দু পাশ দিয়ে তার পা চারখানা ঝুলছে। মনিবের ওপর অটুট আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ পায় তার কটা চোখের চাহনিতে।

বাবুর পা শক্ত করে ধরে জুরা হাঁটু ভেঙে ফাটলের মধ্যে পা ঢুকিয়ে দেয়। তারপর কনুই ও হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে নামতে শুরু করে নীচের দিকে।

কুচাক এদিকে আল্লার কাছে দোয়া মেগে নমাজ শেষ করেছে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় গোঙাতে গোঙাতে সে জুরার পেছনে রওনা হবার জন্যে পা বাড়াতেই, কাঁধের ওপর শুরু হলো বীঝারার ছটফটানি আর কেঁউ-কেঁউ আর্তনাদ। কাজেই, ফাটলে নামার আগে বীঝারাকে দড়ি দিয়ে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিতে হলো।

দারুণ আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় কুচাকের হাত-পা থর থর করে কাঁপছে। সে গোঙায় আর মনে মনে মাথা কোটে ইষ্টদেবতার পায়ে। জুরার নিকুচি করছে সে মনে মনে,—হতভাগা নচ্ছার কোথাকার! ওর জিদ আর হামবড়ামির জন্যে আজ নির্ঘাত মরতে হবে।

জুরা নদীর দিকে মুখ করে নামছে। কিন্তু কুচাকের ঠিক উলটো—সে নামছে দেয়ালের দিকে মুখ করে। আতঙ্কে তার চোখ কুঁচকে গেছে। নামা প্রায় শেষ, এমন সময় যে পাথরখানা ধরে সে নামছে, সেটা হঠাৎ খসে এল। কুচাক আর্তনাদ করে উঠলে,—গেলাম, গেলাম! ধর্ ধর্!

জুরা ইতিমধ্যে নদীর উঁচু পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কুচাককে ধরতে হলো না,

পড়াটা সে নিজেই সামলে নিয়েছে। যখন সে চোখ মেললে, দেখলো, আর এক ধাপ নামলেই পাড়ে গিয়ে পে'ছিবে।

সৌকসাইয়ের ক‍ূলে এসে দাঁড়াল দ‍ুজনে।

প‍ূবে বহ‍ু-বহ‍ু দ‍ূরে মেঘমৌলী পর্বত থেকে সৌকসাই উঠেছে। পাহাড়-পর্বতের ভেতর দিয়ে তার ফেনিল খরস্রোত সগর্জনে প্রবাহিত। কিছ‍ু দ‍ূর এসে সে ওপর থেকে ধাপে ধাপে একের পর এক প্রপাতের আকারে নীচে নেমে গেছে। দ‍ু দিকের খাড়া উ'চ‍ু পর্বতের দেয়ালে ঘা খেতে খেতে বজ্রগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নীচে গিরি-সংকটের মধ্যে। স্রোতের টানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই নদীখাত দিয়ে দ‍ু দিকের পর্বতের দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে হালকা খেলনা বলের মতো গড়াতে গড়াতে চলেছে। তাদের ধাক্কায় পর্বতের গা থেকে বড় বড় পাথরের খণ্ড ভেঙে পড়ছে অবিরাম।

কুচাক তো দ‍ূরের কথা, জ‍ুরা পর্যন্ত হকচকিয়ে যায়। তার সামনে ফেনিল বিপ‍ুল জলরাশির দ‍ুরন্ত খরস্রোত—অবিরাম গর্জনে বয়ে চলেছে। জলীয় বাষ্পে ও জল-কণার ঝাপ্‌টায় নদীর ওপরকার বাতাস ভারী। বসন্তকালে নদীর এই দ‍ুরন্ত জলভরা চেহারা সে আগে কখনো দেখেনি। গ্রীষ্মকালের কথা অবশ্য আলাদা। তখন হিমবাহ গলতে শ‍ুর‍ু করে। সৌকসাই তার স‍ুপ্রশস্ত বিরাট গোটা খাতটায় ছড়িয়ে দেয় নিজেকে।

হতভম্বের মতো জ‍ুরা দাঁড়িয়ে থাকে। আতঙ্কে কুচাকের ম‍ুখে শব্দ নেই। হঠাৎ জ‍ুরার নজর পড়ে তুষারের বড় বড় চাংড়ার ওপর। স্রোতে পাক খেতে খেতে চাংড়া-গ‍ুলো ভেসে চলেছে। জ‍ুরা এবার হেসে ফেললে। এতক্ষণে সে ব‍ুঝতে পারে ব্যাপারটা। বললে,—দেখছো, পলকে পলকে জলের পরিমাণ কিভাবে একট‍ু একট‍ু করে কমছে? দেখতে পাচ্ছ? উজানে নদীর খাত কোথাও হিমানী-সম্প্রপাতে নিশ্চিত বন্ধ হয়ে গেছলো, স্রোতও তাই আটকা পড়েছিল। এখন সেই বিপ‍ুল তুষার-ধস ভেঙে স্রোত বেরিয়ে এসেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে জল কিছ‍ুটা কমলো সত্যি, কিন্তু নদী তখনো বিক্ষ‍ুব্ধ ফেনিল, হিমের মতো ঠাণ্ডা।

দড়ির এক লম্বা ল্যাসো বা ফাঁস জ‍ুরা এবার খ‍ুলে ফেললে, মাথার ওপর বার-কয়েক পাক মেরে সেটা সে ছ‍ুড়ে দিলে নদীর ওপর দিয়ে। ওপারে বড় এক পাথরের চাংড়ায় ফাঁসটা আটকে গেল। জ‍ুরা ও কুচাক এরপর গায়ের কোট খ‍ুলে ফেললে। মাল-পত্র যা সঙ্গে ছিল সব ভাল করে জড়িয়ে বেঁধে নিলে কাঁধের সঙ্গে।

দ‍ূরে সৌকসাইয়ের উজানে ভয়াবহ তুষার-ধসের গর্জন শোনা যায়। অবশিষ্ট তুষারের বিশাল চাংড়াগ‍ুলো কখনো স্রোতের ম‍ুখ আটকে দিচ্ছে, কখনো বা নিজেরাই গ‍ুঁড়িয়ে যাচ্ছে জলের তোড়ে। নদীও তাই বইছে অসমভাবে। জল কখনো ফ‍ুলে ফেঁপে দ‍ু ক‍ূল ভাসিয়ে দিচ্ছে, কখনো বা নীচেয় নেমে যাচ্ছে।

স্রোতে সাময়িক ভাটা পড়তেই জ‍ুরা ল্যাসো ধরে ঘ‍ূর্ণিবিক্ষ‍ুব্ধ জলে নেমে পড়লো। ল্যাসোর শেষপ্রান্ত সে আগেই বাব‍ুর ব‍ুক ও কাঁধ জড়িয়ে বেঁধে দিয়েছে। নদীর মাঝ-খানে এসে সে ল্যাসোয় টান মারলে।

জলের ভয় বাব‍ুর কোনদিনই নেই। তব‍ু আজ ফেনিল দ‍ুরন্ত স্রোতের দিকে তাকিয়ে সে ধীর শান্ত কণ্ঠে একবার কঁকিয়ে উঠলো। অল্প দিনের মধ্যেই তার বাচ্চা হবে। তাই বংশরক্ষার সহজাত সংস্কার বশে সে পেছিয়ে গেল বারেকের জন্যে। কিন্তু জ‍ুরা দড়িতে জোরে টান মারতেই সন্তর্পণে নেমে এল নদীতে। সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের তোড়ে তার পা ফসকে গেল। সে ভেসে চললো অসহায়ের মতো।

জুরার হাতে ল্যাসো ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে আছে। বাবু আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে ঢেউয়ের মধ্যে, স্রোতে ঘুরপাক খেতে খেতে তলিয়ে যাচ্ছে বারবার। জুরার ভয় হয়, হাত থেকে ল্যাসো ছিঁড়ে না যায়। তাহলে সোকসাইয়ের তীব্র স্রোত বাবুকে টেনে নিয়ে ফেলবে প্রচণ্ড তরঙ্গক্ষুব্ধ গভীর মুক্সু নদীতে। বাবু হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো।

বাবু হাবুডুবু খাচ্ছে—প্রায় ডুবে যাবার অবস্থা। জলকণার মেঘে জুরা তাকে সময় সময় দেখতেই পাচ্ছে না। তার নিজেরও পা শক্ত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর।

শেষ পর্যন্ত জুরা পাড়ে এসে উঠলো। দেখলো, স্রোতের ধাক্কায় বাবু আগেই কূলে এসে পড়েছে। গরম বালির ওপর গড়াগড়ি দিয়ে সে গায়ের লোম শুকোচ্ছে আর গা ঝাড়ছে। গা শুকোতেই সে বিশ্রামের জন্যে শুয়ে পড়লো। দুর্বলতায় সারা দেহ তার থরথর করে কাঁপছে। পেটের দুই কোঁক কুঁচকে যাচ্ছে বারবার।

জুরা ল্যাসোর প্রান্তে একখণ্ড পাথর বেঁধে আবার তা ওপারে ছুড়ে দিলে কুচাকের দিকে। ওপার থেকে কুচাকের গালমন্দ আর রীঝায়ার কেঁউকেঁউ আর্তনাদ কানে আসছে। জল দেখে রীঝায়া তটস্থ। সে পালানোর চেষ্টা করে, কুচাককে কামড়াতে যায়। ল্যাসো দিয়ে কুচাক তাকে অনেক কষ্টে বেঁধে ফেললে। রীঝায়া দাঁত দিয়ে সেটা কাটার চেষ্টা করে।

যাই হোক, হেঁচে কেশে, থুথু ছিটিয়ে, হাঁসফাঁস করতে করতে কুচাক শেষ পর্যন্ত এপারে উঠে এল। রীঝায়ার পেটে প্রচুর জল ঢুকেছে। ল্যাসো দিয়ে তাকে টেনে আনতে হয়েছে। জুরা তার পেছনের দু পা ধরে মাথা নীচু করে ঝাঁকুনি দিতেই নাকমুখ দিয়ে হড়হড় করে জল বেরিয়ে এল। রীঝায়ার গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ আসছে। বালির ওপর তাকে শুইয়ে দিয়ে জুরা তার বুকপিঠ মালিশ করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে রীঝায়ার জ্ঞান ফিরে এল।

কাপড়চোপড় শুকোতে গেলে দেরি হবে, তাই কোট গায়ে চড়িয়েই তারা রওনা হলো। জোরে হাঁটছে তারা শরীর গরম করার জন্যে। তা ছাড়া হাতে সময়ও কম। সূর্যাস্তের আগেই শিকারীদের আস্তানায় পেঁছতে হবে।

গাছপালাহীন ন্যাড়া পর্বতের পর পর্বত অতিক্রম করে তারা ক্রমেই উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠছে। বরফাচ্ছন্ন ছোট ছোট কয়েকটা নদীও পার হয়। শেষকালে তারা এক গিরিখাতে এসে পেঁছলো। চিরহরিৎ জুনিপার গাছের এক গভীর অরণ্য এখানে। তার পেছনে শুভ্র তুষারের পটভূমি।

গাছপালাবিবর্জিত এই সুউচ্চ পর্বত-রাজ্যে মাঝে মাঝে সবুজ তৃণভূমি ছাড়া আর সবই নগ্ন ঊষর। এখানে তাই এত বড় একটা জঙ্গলের অস্তিত্ব যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অস্বাভাবিক। কোথা থেকে কোন্ বাতাসে এখানে পাইন ও জুনিপার গাছের বীজ ভেসে এল, কেউ জানে না। অরণ্য কিন্তু ক্রমবর্ধমান, দিনে দিনে চারদিকে তা দেহ বিস্তার করছে।

এখানে এসে জুরা ও কুচাক ছাড়াছাড়ি হলো। জুরা চললো অরণ্যের সেই অংশে, গত বছর যেখানে বড় এক জুনিপার গাছের ফোঁকরে একজোড়া ম্যাচলক বন্দুক তারা লুকিয়ে রেখে গেছলো। শিকারের জায়গায় অস্ত্রশস্ত্রের কিছু কিছু লুকিয়ে রেখে যাবার এ রীতি শিকারীদের মধ্যে চলে আসছে বংশপরম্পরায়।

কুচাক চলেছে গুহার দিকে লাফিয়ে লাফিয়ে।

ধোঁয়ায় কালো প্রকাণ্ড এক গুহা—সেটাই শিকারীদের যুগ-যুগান্তের আস্তানা।

অতি সাধারণ গুহা—কোনরকম বৈশিষ্ট্য বর্জিত। যেসব গুহায় ভালুকেরা আস্তানা গাড়ে, তাদের থেকে এর কোন তফাতই নেই বলতে গেলে।

চলতে চলতে কুচাক আপন মনে বিড়বিড় করছে,—হুঁ, হুঁ, আধ-সেদ্ধ টাটকা কষা মাংস খাওয়াই কিরঘিজদের রীতি। আহা রে, শিকার যেন তোর প্রচুর জোটে, জুরা!

দ্বিতীয় পর্ব ৪

জুরা দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছে। পুরনো পাতা ও ফুলের তীব্র গন্ধ নাকে আসছে। সে বুক ভরে ঘ্রাণ নেয়। একটু আগেও খিদেয় ও ক্লান্তিতে পা চলছিল না। কিন্তু এখন সে পাথর থেকে পাথরে, তুষারের গাদা থেকে গাদায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। কোন ক্লান্তি নেই।

নাকে মুখে গাছের ডালপালার ঝাপটা লাগছে। সূর্য অস্ত যায় নি বটে, কিন্তু গাছপালার নীলাভ ছায়ার নীচে হিমেল ঠাণ্ডা। তুষার জমতে শুরু করেছে।

বাবু এগিয়ে গেছে। হঠাৎ দূর থেকে তার চিৎকার কানে এল। থেকে থেকে ডাকছে সে। জুরা দৌড়তে শুরু করে।

গাছপালা পাতলা হয়ে আসছে। শেষে জঙ্গলও শেষ হলো। জঙ্গলের গায়েই প্রকাণ্ড মোটা এক জুনিপার গাছ। হঠাৎ দুটো ভালুক বেরিয়ে এল সেখান থেকে। লাফাতে লাফাতে তারা পর্বত বেয়ে দ্রুত ওপরে উঠে গেল।

জুরার নজর পড়ে তৃতীয় আর একটা ভালুকের ওপর। সোজা হয়ে বসে সে বাবুর হামলা রোধ করছে।

বাবু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে বারবার। জুরাকে দেখে ভালুকটা গর্জন করতে করতে ছুটে পালালো। আর সংগে সংগে লাঠির মতো কি একটা জিনিস ছিটকে পড়লো তার থাবা থেকে। অদূরে একখণ্ড পাথরের ওপর গিয়ে সেটা সজোরে পড়তেই তার গা থেকে আগুনের ফুলকি ঠিকরে উঠলো।

জুরা ছুটে গেল জিনিসটার দিকে। ম্যাচলক বন্দুকের দুমড়ানো নল একটা। নলটা তুলে নিয়ে সে হায় হায় করে উঠলো, ধেয়ে গেল জুনিপার গাছটার দিকে।

সেখানে গিয়ে তার চক্ষুস্থির! গত বছর জুনিপার গাছটার গায়ে অনেক কষ্টে বড় এক ফোকর করে তার মধ্যে সে লুকিয়ে রেখে গেছলো বন্দুক দুটো—আজ তা লোপাট, তছনছ হয়ে গেছে! গাছের তলায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বন্দুক দুটোর দোমড়ানো ভাঙাচোরা অংশ আর শিকারের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম।

মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পড়ে, বুঝতে পারে ব্যাপারটা। ক্ষুধার্ত ব্রাউন বা বাদামী ভালুকের দল শীতের ঘুম থেকে জেগে উঠে শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে গাছের মধ্যে মানুষের গায়ের গন্ধ পেতেই গর্ত ভেঙে বন্দুক দুটো টেনে বের করেছে। চর্বিমাখা চামড়া দিয়ে জড়ানো ছিল বন্দুক দুটো।

ক্ষোভে দুঃখে হতাশায় জুরা যেন বোবা হয়ে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে ভাঙা বন্দুকগুলোর দিকে। এখন উপায়? ভবিষ্যতের কথা মনে হতেই ফার-টুপির নীচে তার মাথার চুল পর্যন্ত আতঙ্কে ও দুর্ভাবনায় খাড়া হয়ে উঠলো। মাংস যোগাড়ের

সব আশাই নির্মূল! বন্দুক নেই—কি দিয়ে সে শিকার করবে? অনাহারের হাত থেকে গাঁয়ের লোকজনদের বাঁচানো তো দূরের কথা, সে নিজে বাঁচবে কি খেয়ে?

ভাবতে ভাবতে চোখে তার জল এসে যায়। নিষ্ফল রাগে সে পাগলের মতো ছুটো-ছুটি শুরু করলে। বন্দুকের ভাঙা নল দুটো এক-একবার সে কুড়িয়ে নেয়, নিয়েই ছুড়ে ফেলে দেয়, পরক্ষণে কুড়িয়ে নেয় আবার। নিজের উপরই রাগ হয় তার: নীরেট গাধা, আস্ত নীরেট গাধা সে!

আবার সেই ভালুক—যাদের সঙ্গে প্রতি বছরই তাকে কঠিন লড়াই করতে হয়! তার স্থির বিশ্বাস, শিকারের এই এলাকা থেকে ভালুকরা তাকে তাড়াতে চায়। কিন্তু সে-ও বাপের বেটা—প্রাণ যায় সে-ও স্বীকার, হার সে মানবে না!

দুঃসহ রাগে হঠাৎ সে ছোরা টেনে বের করলো, তারপর পর্বত বেয়ে ওপর দিকে ধাওয়া করলো ভালুকদের পেছনে।

কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই—হঠাৎ এ কী! শাঁ শাঁ শব্দে তার দিকে বড় এক পাথরের চাংড়া নেমে এল, তীরবেগে বেরিয়ে গেল তার মাথার ওপর দিয়ে। তারপরেই পর্বতের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করলো পাথরের পর পাথরের বড় বড় চাংড়া।

ব্যাপার কি? জুরা হতভম্ব। ভূমিকম্প? কিন্তু কই, পর্বতে কোন কাঁপাঝাঁপা নেই তো! পাথরগুলো একের পর এক বলের মতো গড়িয়ে নেমে আসছে। লঘুপদে জুরা লাফিয়ে লাফিয়ে বারবার তাদের পাশ কাটিয়ে যায়। কখনো কখনো তার কানের পাশ দিয়েও পাথরের খণ্ড শোঁ শোঁ শব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে, সশব্দে নীচে খাতে গিয়ে পড়ছে। খাতে গভীর তুষারের পাঁক। খণ্ডগুলো পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছে।

কিছুই বুঝতে পারছে না জুরা। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে দুর্বোধ্য হত-বুদ্ধিকর। এ অবস্থায় কি যে করণীয়, তাও মাথায় আসছে না। এমনি যখন তার বিমূঢ় অবস্থা, তখন কোথা থেকে রীঝায়া হঠাৎ ছুটে এল। বিষম ভয় পেয়েছে সে। গুটিসুটি মেরে তাড়াতাড়ি সে জুরার দু পায়ের ফাঁকে গিয়ে ঢুকলো।

দুঃখে ক্ষোভে ও রাগে জুরার মন এমনিতেই বিকল। তার ওপর রীঝায়ার এই কাণ্ড দেখে সে যেন ক্ষেপে যায়।

হতচ্ছাড়া নেড়ী কুত্তা! দারুণ রাগে গর্জে উঠে তাকে সে লাথি মেরে দূরে ছুড়ে ফেললে। আর ঠিক তক্ষুণি ওপর থেকে প্রকাণ্ড এক পাথরের চাংড়া এসে পড়লো রীঝায়ার ওপর, তাকে পিষে গুঁড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।

জুরা লাফিয়ে পাশের এক পাথর-ঢিবির ওপর উঠে পড়েছিল। এতক্ষণ পরে ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়। ভালুকগুলোই ওপর থেকে তাকে তাক করে পাথরের চাংড়া ছুড়ে মারছে। সর্দারের কাছে সে শুনেছিল, ভালুকরা এইভাবেই পাহাড়ী বুনো ভেড়া শিকার করে। কিন্তু এ জাতীয় ঘটনার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম।

রীঝায়ার মৃত্যুতে জুরার মেজাজ ঠাণ্ডা হয়। এখনো ওপর থেকে সমানে পাথর নেমে আসছে। সেগুলো এড়িয়ে, বাবুকে ডেকে নিয়ে সে দ্রুতপায়ে নীচে নেমে জুনিপার গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

কিন্তু ভালুকগুলোর তা নজর এড়ায় না। এবার গাছ লক্ষ্য করে তারা পাথর ছুড়তে শুরু করে। বড় বড় চাংড়া গাছের গুঁড়ির ওপর এসে পড়ছে। গাছটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর তার মাথা থেকে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে পাতলা তুষারের খণ্ড।

গাছের আড়ালে থেকে জুরা বন্দুক দুটোর ভাঙা অংশগুলো এক জায়গায় জড়ো করে তার পাশে বসে পড়লো। রাগে, দুঃখে ও হতাশায় সে যেন মূক পাথর

বনে গেছে। হঠাৎ এক সময় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে মনের কষ্টে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

পাশেই বাবু বসে আছে। মনিবের ব্যথাহত কণ্ঠ কানে যেতে সে-ও যেন কেঁদে উঠলো,—হু-উ-উ-উ—

বিষণ্ণ সন্ধ্যা নামে বনানী পর্বতে। তাদের ছায়া দীর্ঘতর হয়।

জুবার বিশ্বস্ত প্রিয়তম সঙ্গী বাবু মনিবের কষ্ট দেখে আর্তনাদ করে চলেছে একভাবে। ব্যথায় ভেজা সে কণ্ঠ।

দ্বিতীয় পর্ব ৫

জুবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে, কুচাক নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে চলেছে। প্রথম দিকে বেশ জোরেই হাঁটছিল। কিন্তু অন্ধকার যত ঘনিয়ে আসে, ততই কমতে থাকে তার গতি। দত্যিদানোর কথা মনে পড়তে গলা আপনা থেকেই যেন হাঁসের মতো সামনের দিকে লম্বা হয়ে আসে। পেছনে-বাঁকানো-ঠ্যাং পর্বতের সেই অশরীরী লোমশ মানুষদের সঙ্গে মুখোমুখী হওয়ার কথা মনে হতেই তার গলা ঘড়ঘড় করে উঠলো : উরেব্বাপ্! তাহলেই তুই গেছিস্ কুচাক! একেবারে ফর্সা!

মাঝে মাঝে সে থমকে দাঁড়ায়, নিজের ছায়াটা ভাল করে পরখ করে : অ্যাঁ, কি ওটা? ছায়াটা কার? আমার? নাকি—

কোমরে দু হাত রেখে সে একটু নেচে নেয়। নাঃ ছায়াটাও নাচছে! সে আশ্বস্ত হয়।

শেষ পর্যন্ত গুহা আর পরিচিত গাছপালা নজরে পড়তে কুচাক যেন কতকটা স্বস্তি বোধ করলে।

আগুন জ্বালানোর জন্যে সে ডালপালা ও বাকল কুড়োতে শুরু করে।

কিন্তু হঠাৎ ও কী—একটা শব্দ না! বুক তার ধড়াস করে উঠলো। ডালপালা পড়ে গেল হাত থেকে।

শব্দটা আসছে গাছ থেকে। ওরে ব্বাপ! ক্-কী—ক্-কী ওটা?

কিন্তু ওদিকে তাকাবে কে? কুচাক? ওরে বাবারে—

যাই হোক, শেষে অনেক কষ্টে চোখের কোণা একটু ফাঁক করে সে তাকালো গাছটার দিকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রায় লাফিয়ে উঠলো—আরে, আরে, একটা লক্ষ্মী পেঁচা না!

বস্, আনন্দে ডগমগ কুচাক! আর ভয় নেই। গাছে বসে আছে এক লক্ষ্মী পেঁচা। হুঁ, দত্যি-দানো-জিনদের হাত থেকে লক্ষ্মী পেঁচাই তো মানুষকে রক্ষা করে! এই বিজন অরণ্যে লক্ষ্মী পেঁচার মতো নির্ভরযোগ্য সঙ্গী ও রক্ষক আর কে আছে!

খুশিতে কুচাক যেন উপচে পড়ে।

অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো সে লক্ষ্মী পেঁচার দিকে চোখ মটকালে। অবশ্য তার আগে সে ওকে আদর করে কিঞ্চিত অনুযোগ ভর্ৎসনা করে নিয়েছে তাকে ভয় দেখানোর জন্যে।

পায়ের বাঁকানো ধারালো নখ দিয়ে লক্ষ্মী পেঁচা ঠোঁট সাফ করছিল। কুচাকের

ব্যাপার দেখে সে বুঝি তাজ্জব বনে যায়। গোল গোল হলদে ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

চটপট আবার শুকনো খড়কুটো ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে, গুহার মুখের সামনে এসেই দাঁড়িয়ে পড়লো কুচাক। ঈহ্‌, ভেতরে কী অন্ধকার!

এক ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে সে জোরে হাঁক ছাড়লে,—গপ্‌গপ্‌ গপ্‌গপ্‌!

কিন্তু নাঃ, নীরব গুহা, কিছুই বেরলো না সেখান থেকে। তবু ভেতরে যা অন্ধকার, বিশ্বাস নেই, কেউ হয়তো ঘাপ্‌টি মেরে থাকতে পারে।

কোমরবন্ধের ভাঁজ খুলে সে একটা পুঁটলি বের করলে। তেলচিটে একখণ্ড চামড়া দিয়ে মোড়া পুঁটলিটা। চামড়ার ভাঁজ খুলতে ছোট একটা থলি বেরলো তা থেকে। থলি থেকে বেরলো একটা চকমকি ও সোরার আরকে ভেজানো কিছু ছাগলের চুলের জ্বালানি আর একখণ্ড ইস্পাত। আগুন জ্বালাবার সরঞ্জাম।

কুচাক বসে পড়ে বাঁ হাতে চকমকি ধরে বুড়ো আঙুল দিয়ে জ্বালানি চেপে ধরলো তার সঙ্গে। তারপর ইস্পাতের খণ্ডটা দিয়ে চকমকিতে ঘা মারতেই আগুনের ফুলকি উঠলো।

ঘায়ের পর ঘা মেরে চলেছে কুচাক, ফুলকিও উঠছে। কিন্তু কি কাণ্ড রে বাবা! জ্বালানিতে যে কিছুতেই আগুন ধরছে না!

নিদারুণ শীতের জন্যেই হোক বা ভয়ে আঙুল অসাড় হয়ে যাবার জন্যেই হোক, কুচাকের হাত কাঁপছে, আগুনের ফুল্‌কি ঠিক মতো জ্বালানিতে লাগছে না। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি। সামনে অন্ধকার গুহা। আতঙ্কে কুচাকের কি ছাই কোন দিকে তাকানোরও উপায় আছে! তার দৃঢ় বিশ্বাস, গুহার অশরীরী ছায়ারা আগুনকে ভয় করে বলেই তাকে আগুন জ্বালতে দিচ্ছে না।

বাবারে! এখন কি করি!—হাড়কাঁপানো অন্ধকার শীতের রাতে কুচাক ঘামতে শুরু করে।

যাই হোক, অনেক কষ্ট ও কসরতের পর জ্বালানি থেকে শেষ পর্যন্ত ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলো। সামনেই জড়ো-করা শুকনো ঘাসের আঁটির মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে দিয়ে ফুঁ দিতেই আগুন জ্বলে উঠলো। জ্বলন্ত ঘাসের আঁটিটা কুচাক ছুড়ে দিলে গুহার মধ্যে। গুহাটা আলোকিত হয়ে উঠলো।

ধোঁয়ায় কালো নোংরা প্রকাণ্ড গুহা—এক শো কুড়ি ফুট উঁচু, নব্বুই ফুট চওড়া। ঘোড়াসমেত সেখানে একশো লোকের জায়গা হতে পারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রতি বছরই স্থানীয় শিকারীরা এখানে এসে আস্তানা গাড়ে।

কত রকমের বিচিত্র দ্রব্যসম্ভারই না রয়েছে সেখানে! হাড়ের তৈরী বর্শাফলক, মরচে-পড়া তীরের ফলা, নানা জাতের জানোয়ারের হাড়গোড়, মানুষের মাথার খুলি—সব স্তূপাকার হয়ে আছে গুহার উঁচু দেয়াল ঘেঁষে।

শুকনো ঘাসপাতা ডালপালা কুচাক আগুনে ফেলে দিলে। সরু নীলাভ আগুনের শিখা হিস্‌হিস্‌ শব্দে জ্বলতে শুরু করে। মাথার খুলিগুলোর করাল চক্ষুকোটর জ্বলজ্বল করতে থাকে, ঝকমক করতে থাকে তাদের সাদা দাঁতের পাটি। শুকনো কাঠকুটো চিড়বিড় করে পুড়ছে। হঠাৎ একসময় ফুল্‌কি ছড়িয়ে সেগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

জ্‌ঝাঃ! কুচাক হাঁফ ছাড়লে। কোথায় অন্ধকার আর কোথায়ই বা সেই অপদেবতারা, এতক্ষণ যারা তাকে আধমরা করে রেখেছিল! সব হাওয়া।

গা-হাত-পা ভাল করে আগুনে সেঁকে সে ব্যাগে তুষার ভরে নিয়ে এল বাইরে

থেকে। গুহায় ফিরে জ্বলন্ত একখানা কাঠ সে তুলে নেয় চুল্লী থেকে। এক কোণে এক ফাটলের মধ্যে কাঠখানা পুঁতে দেয়। তারপর শুরু হয় তার মন্ত্রপড়া। দূর অতীত থেকে চলে আসছে এই পবিত্র অনুষ্ঠান।

কাজ শেষ করে কুচাক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।

গুহার এক পাশে গাদা করা কতকগুলো পাথর। সেগুলো সরিয়ে ফেলতেই বড় একটা পাথরের ঢাকনি দেখা যায়। ঢাকনিটা তুলতেই গোপন এক গর্ত বেরিয়ে পড়লো। গর্ত থেকে কুচাক বের করলো বড় এক রান্নার কড়াই। বহুকাল আগে তার পূর্বপুরুষরাই ওটা নিয়ে এসেছিল এখানে।

কড়াইটাকে সে আগুনের ধারে নিয়ে এল। ধাতুর তৈরী নানা জিনিস, লোহার ফাঁদ ইত্যাদি হরেকরকম বস্তু তার মধ্যে। জিনিসগুলো সব বের করে সে কড়াইয়ের ধুলোবালি ময়লা মরচে সব সাফ করে ফেলে। তারপর সেটা চাপিয়ে দেয় আগুনের ওপর—তুষার গলিয়ে লপ্‌সি তৈরি করার জন্যে।

কাজ করতে করতে গুন গুন করে তার গানও চলেছে। অন্যের তৈরী গান সে কোন-কালেই পছন্দ করে না। নিজের তৈরী গানে সে সুর ভাঁজছে।

স্তূপীকৃত ধাতুর জিনিসপত্রগুলো তার বড় শখের গুপ্তধন। জুরাও জানে না এর খবর। জিনিসগুলো ভাল করে পরখ করে আবার সে গোপন জায়গায় রেখে দেয়, পাথরের বড় ঢাকনিটা বসিয়ে দেয় গর্তের মুখে।

ক্ষিদেয় পেট চন চন করছে। অথচ জুরার পাত্তা নেই। কি করছে ছোঁড়াটা?

আগামী কাল সে যে ভেড়ার মেটুলি খাচ্ছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই কুচাকের। কেনই বা থাকবে? জুরা হলো গিয়ে দুনিয়ার সেরা শিকারী, তার জুড়ি নেই। সুতরাং সন্দেহ থাকার কথা নয়। কুচাকের খট্‌কা শুধু এক জায়গায়—মেটুলিটা সে খাচ্ছে কখন? দিনের বেলায়, না সন্ধ্যেয়?

আগামী 'কালের শিকার সম্বন্ধে সে এখন এতই নিশ্চিন্ত যে, অবশিষ্ট তিন মুঠো ময়দা ফুটন্ত জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে সে আবার গান ধরলো,—আগামী কাল মেটুলি খাব চর্‌—বি--

আঁ!..আঁ ...ওরে বাপ্‌!—কুচাক হঠাৎ হাউমাউ করে উঠলো ঃ ওরে বাবা! কি ওটা?...

অ্যাঁ, বাবু না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবুই তো!

বাবু হঠাৎ তীরবেগে ভেতরে ঢুকে চিল্লাতে শুরু করেছে বেখাপ্পা বেয়াড়ার মতো।

গালাগাল করতে করতে একখানা ডাল কুচাক ছুড়ে মারলে বাবুর দিকে ঃ পাজী হতচ্ছাড়া কুত্তী! জানটা গেছলো আর কি?

কিন্তু পরক্ষণে তার দুশ্চিন্তা দেখা দেয় ঃ জুরার কি হলো? কোন দুর্ঘটনা ঘটলো না তো?

এগিয়ে গিয়ে যে খোঁজ করবে, সে সম্ভাবনা নেই। যা অন্ধকার! কুচাক ইষ্ট-দেবতার নামজপ শুরু করে।

জুরা এল অনেক পরে। কুচাক আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলো। সে এত খুশী যে, জুরার সঙ্গে যে বন্দুক নেই, তা লক্ষ্যই করে না।

জুরা অত্যধিক গম্ভীর—বিষন্নও বটে। আগুনের ধারে সে গুম মেরে বসে রইল। তাকে ঘিরে বাবুর চিৎকার, লাফালাফি চলেছে। তার দিকে খানিক থুতু ফেলে কুচাক খেঁকিয়ে উঠলো ঃ দূর হ, হারামজাদী!

জুরা শেষে মুখ খোলে। বললে,—বড় কঠিন অবস্থায় আমরা পড়েছি। সব কটা বন্দুকই ভালুকে ভেঙে ফেলেছে।

অ্যাঁ!—কুচাক আর্তনাদ করে উঠলো। এবার তার নজর পড়ে, জুরার সংগে বন্দুক নেই। সে হায়হায় করে উঠলো,—সব্বোনাশ সব্বোনাশ! জানোয়ারদের দেবতা তাহলে আমাদের মাংস দিতে নারাজ!

তা ছাড়া ভালুকেরা পাথর ছুড়ে রীঝিয়াকেও মেরে ফেলেছে!—ক্ষুব্ধ অবসন্ন কণ্ঠে জুরা আবার বললে।

অ্যাঁক্-কী! কি বলছো তুমি? রীঝিয়াকে মেরে ফেলেছে!—হাউমাউ করে কুচাক আবার কাঁকিয়ে উঠলো।

অনেকক্ষণ কেটে যায়। কারো মুখে কথা নেই। নিস্তব্ধ গুহা, নিস্তব্ধ বন-পর্বত! অসহায় অবস্থা বুঝে বাবুও যেন নীরব হয়ে গেছে। পাতলা লপ্সি দুজনে শেষ করে নীরবে।

চামড়ায় ভাল করে মাথা জড়িয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে জুরা বললে,—বড্ড কঠিন অবস্থায় পড়তে হলো!

দ্বিতীয় পর্ব ৬

আবার সেই উপোস। দিনের পর রাত। রাতের পর দিন। সময় যেন আর কাটতে চায় না—ঘণ্টাগুলো যেন অনন্তকাল ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে।

কড়াইতে অবিরাম জল ফুটছে। মাঝে মাঝে ওরা এক টিপ করে চা তাতে ফেলে দেয়। নিছক জলের বদলে তবু তো কিছু পেটে যাবে।

অধীর আগ্রহ নিয়ে বাবু অপেক্ষা করে, জুরা কখন শিকারে বেরোবে। গুহাময় সে ছুটোছুটি করে বেড়ায়, শোঁকে সব জায়গা, কিন্তু বন্দুক মেলে না কোথাও। শিকারে বেরোবার জন্যে সে অস্থির। শেষ পর্যন্ত আজ সকালে সে এক কান্ড করেছিল, ছুটে গেছলো সেই অলক্ষুণে জুনিপার গাছটার দিকে।

বসে বসে ওরা তখন চা-মেশানো জল খাচ্ছে, এমন সময় কুচাক বললে,—দেখ!

বাবু একখন্ড চামড়ার স্ট্র্যাপ কামড়ে ধরে বন্দুকের এক দুমড়ানো নল টানতে টানতে গুহায় নিয়ে আসছে। জুরার পায়ের কাছে ওটা রেখে সে তাকালো তার চোখের দিকে—মনিবের কাছ থেকে সে বাহবা পাবার আশা করছে।

রাগে জুরার চোখ জ্বলে উঠলো। ধমকে উঠলো,—এটা ভাঙা। কোন কাজে লাগবে না।

বাবু সরে গিয়ে ধীরে ধীরে গুহার মুখে গিয়ে বসলো। রোদ পোয়াতে পোয়াতে আড়চোখে সে দৃষ্টি রাখে মনিবের ওপর।

দুপুর বেলা। কুচাককে কিছু গুল্‌জান শুকোতে বলে লোহার ফাঁদ নিয়ে জুরা রওনা হলো ওপরে পর্বতের দিকে। হিমবাহের ওপর দিয়ে ভেড়া চলাচলের পথ গেছে, সেখানে সে ফাঁদ পাতবে ঃ বরাত জোরে যদি একটা আটকা পড়ে।

কুচাক চললো গুল্‌জানের মোথা তুলতে। পর্বতের দক্ষিণ দিকের খাড়া ঢাল সূর্যের আলোয় নতুন করে গুল্‌জানে ভরে গেছে। হাতের ছোট কুড়ুলটার হাতল

দিয়ে দুপাশের পাথরঢিবিতে ঠুকঠাক ঘা মারতে মারতে কুচাক চলেছে। চারদিকে বড়োসড়ো কাঠবেড়ালী জাতের মারমটেব দল। কুচাককে দেখেই তারা তীরবেগে গর্তে ঢুকে পড়ছে, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে ভয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তাকে।

পর্বতের ওপরে তুষারেব আস্তরণ ভেদ করে সবুজের সমারোহ উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। উষ্ণ রোদে পাঁশুটে পর্বতগুলো গন্ধে ভরপুর। নীচে—বহু-বহু নীচে পার্বত্য জলা সব সবুজ আভায় ঝলমল করছে।

ঢিবি ও টিলার ফাঁকে ফাঁকে কাঁকুরে জমিতে গুল্‌জান জন্মেছে। পনেরোটা মোথা তুলে কুচাক ধুয়ে শুকিয়ে ফেললে। এবার সেগুলো কাটতে হবে। ক্ষোভে দুঃখে ছোবাটা সে টেনে বের করে, শোঁকে কয়েকবার। গুল্‌জানের এমনি অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ যে, সেটা দূর করা চাট্টিখানি কথা নয়। গাঁ ছেড়ে আসার আগে অনেক কষ্টে ছোরাটা সে গন্ধমুক্ত করেছিল। আবার তা নোংরা করতে হবে। মনের কষ্টে কুচাক ভাবতে বসলো।

পর্বতের ওপর দিয়ে নীচু হয়ে ঈগল উড়ছে। চকচক করছে তাদের পাখার নীচে-কার সাদা পালকের রাশি। পাখার ঝাপ্‌টায় ছোট ছোট নুড়ি স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীচেয়।

কুচাক গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। কোন দিকে লক্ষ্য নেই। হঠাৎ কোটে টান পড়তেই ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো,—আরে আবে!

পরক্ষণে দেখে, বাবু তার কোটেব কোণা কামড়ে ধরে টানছে, অর্থাৎ ডাকছে। নিরর্থক যে ডাকছে না, তাতে সন্দেহ নেই। ছোরাটা খাপে ভরতে ভরতে কুচাক এক-লাফে উঠে দাঁড়ালো। ছুটলো বাবুব পেছনে।

বাবু আগে আগে ছুটছে, মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছে, আর ডাকছে তাকে লক্ষ্য করে। আনন্দে ও উত্তেজনায় ফোঁস ফোঁস করছে কুচাক। বাবুরও যেন তর সইছে না।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই কুচাকের পা দুটো যেন আপনা থেকে থেমে যায়ঃ আচ্ছা, ব্যাপারটা যদি এক জ্যান্ত ভালুক হয়, তাহলে—?

বাবু কিন্তু সমানে ডেকে চলেছে। কুচাক শেষ-পর্যন্ত নিজেকে সান্ত্বনা দেয়,—নাঃ, খোশমেজাজেই বাবু ডাকছে।

সাহসে ভর কবে সে এক টিলাব ওপর গিয়ে উঠলো।

অদূবে পুরনো এক গলে-যাওয়া হিমানী-সম্প্রপাতের পড়ে-থাকা অবশিষ্ট অংশে ছোট-বড় পাথরের ঢিবি ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তারই একটার ওপর বসে আছে জুরা। একটা পা সে রেখেছে এক মরা পাহাড়ী ছাগলের ওপর। ছাগলটার বয়স বেশী নয়। আঙুল দিয়ে জুরা ছাগলটা দেখিয়ে দিলে।

কুচাকও বুঝলো ব্যাপারটা। নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে অনেক কষ্টে একখন্ড চামড়া সে ছাড়িয়ে নিলে ছাগলটার গা থেকে। পাথরের মতো শক্ত চামড়া। চামড়ার নীচে শুকনো মাংস। ছাগলটা বরফের নীচে রয়েছে বহু বছর।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুচাক সখেদে বললে,—উঁহু, হারাম! চলবে না।

ছোরাটা দিয়ে সে ছাগলের কণ্ঠনালিটা দেখিয়ে দেয়, সেটা হালাল করা নেই। মুসলমানী আইনের বিধান হলো, কণ্ঠনালি কেটে রক্ত বের করে দিযে জবাই করতে হবে, নয়তো সে মাংস খাওয়া গুনাহ।

জুরা কথা বলে না। নীরবে ছোরা বের করে ছাগলটা সে খন্ড খন্ড করে কেটে

ফেললে। বাবুর এটা আবিষ্কার করেছিল। তাই বকশিশ হিসাবে একটা খণ্ড সে ছুড়ে দিলে বাবুর দিকে। বাকী খণ্ডগুলো নিয়ে চললো ফাঁদে পাতার জন্যে। হিমবাহের ওপর দিয়ে ভেড়া চলাচলের যে পথ গেছে, সেখানকার দুটো ফাঁদ বাদে আর সব জায়-গায় সে ফাঁদ পাতলো ঐসব মাংসের টুকরো দিয়ে—মাংসাশী কোন জানোয়ার ফাঁদে আটকাতে পারে সেই আশায়।

কুচাক ফিরে চললো গুল্‌জানের মোথাগুলোর দিকে। পর্বত থেকে নামতে নামতে রাগে সে দাঁত কিড়মিড় করে। পর্বতশ্রেণীর ঢালে ছাগল ও ভেড়ার পাল চরছে—এত কাছে, অথচ কত দূরে! গুল্‌জানের বিশ্রী দুর্গন্ধ তার নাকে আসছে, বমি ঠেলে আসতে চায়। ছাগলটার মাংস না নেওয়ায় তার এখন আফসোস হচ্ছে। গুল্‌জানের মোথাগুলোকে সে খাড়াইয়ের ওপর থেকে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে। জুরা এলে বললে, গুল্‌জান এখনো শুকোয় নি, তাকে পিষে ময়দা করা চলবে না।

জুরা উচ্চবাচ্য করে না। শিকারী সে, মাংস খেতে অভ্যস্ত। গুল্‌জান সে-ও বরদাস্ত করতে পারে না।

খাওয়ার কিছু নেই। পরদিনও সেই অবস্থা। শুধু চা-মেশানো গরম জল। কুচাক ক্ষিদেয় অস্থির। নাচার অবস্থা। আবার কিছু গুল্‌জান তুলে সে শুকোতে দিলে।

তৃতীয় দিনে ফাঁদ পরীক্ষা করতে বেরিয়ে জুরা ফিরলো অল্পবয়সী একটা ঈগল বেঁধে নিয়ে।

ঈগলটাকে দেখে কুচাকের চোখ বিস্ফারিত। সর্বনাশ! ঈগল পবিত্র পাখি, তার মাংস খাওয়া হারাম! কিন্তু জুরা নীরব, নিঃশব্দে সে ছোরা বের করলো।

এত বড় কাফেরী কাণ্ড দেখাও গুনাহ—কুচাক দুহাতে মুখ ঢাকে।

যখন সে চোখ মেললো, ঈগলের কণ্ঠনালি বেয়ে রক্ত চুইয়ে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত কুচাক সিদ্ধান্তে এল, গুল্‌জান খাওয়ার চেয়ে জীবনে একবার—মাত্র একবার—ঈগলের নিষিদ্ধ মাংসের স্বাদ নিলে এমন কিছু অন্যায় হবে না।

অনেকক্ষণ ধরে ঈগলটাকে তারা সিদ্ধ করলো। তবু তার মাংস এত শক্ত যে, দাঁত বসানো দায়।

দ্বিতীয় পর্ব ৭

পাঁচ দিন কেটে গেছে তারপর। খাওয়ার মধ্যে শুধু ঐ চা-মেশানো গরম জল আর গুল্‌জানের মোথা। নিতান্ত নিরুপায় না হলে গুল্‌জান খাওয়ার কথা ওরা ভাবতেই পারে না।

বাবুর কথা অবশ্য আলাদা। পর্বতে ফিকে ছাইরঙা গিরগিটির আস্তানা। সেই সব গিরগিটি শিকার করে বাবু ক্ষিদে মেটাচ্ছে।

ছয় দিনের দিন আবহাওয়ায় পরিবর্তন দেখা দেয়। ঠাণ্ডা বাড়ছে। মনে মনে জুরা ও কুচাকেরও প্রার্থনা, ঠাণ্ডা আরো বাড়ুক। আবহাওয়া আরো ঠাণ্ডা হলে ছাগল ও ভেড়ার পাল হিমবাহ পেরিয়ে দক্ষিণমুখো ধাওয়া করবে। তখন চাই কি, এক-আধটা ফাঁদে আটকেও যেতে পারে।

মেঘের অবস্থা পরীক্ষা করার জন্যে, গুহাটা যে পর্বতে, জুরা বারবার তার

মাথায় গিয়ে উঠছে। শেষে একসময় ফাটলের ভেতর দিয়ে সে নীচে গুহার ভেতরে কুচাকের উদ্দেশে হাঁক ছাড়লে,—মেঘে মেঘে তোলপাড় চলছে, বুঝলে?

যে পর্বতের মাথায় জুরা দাঁড়িয়ে আছে, তার সামনে সুবিস্তীর্ণ এক ফাঁকা এলাকা, চারদিক পর্বতশ্রেণী দিয়ে ঘেরা—দেখতে অনেকটা সুবিশাল এক গভীর গামলার মতো। আবহাওয়ায় পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ এখানে ঘন হয়ে আসছে, পাক খাচ্ছে।

অদ্ভুত এই ফাঁকা এলাকাটার কিনারায় দাঁড়িয়ে ধরা যায় আবহাওয়ার পরিবর্তন। জুরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

সোকসাই নদীর গতিপথ ধরে 'কাশগড়' বায়ু এর ভেতরে ছুটে আসছে। 'কাশ-গড়'-এর দেখা হচ্ছে 'তাজিক' বায়ুর সঙ্গে। 'তাজিক' আসছে পশ্চিমের গিরিখাত ধরে। তেমনি দক্ষিণ থেকে আসছে 'আফগান' বায়ু। ঠাণ্ডা হিমেল বায়ুও বসে নেই, সে ছুটে আসছে উত্তরের গিরিপথ ধরে হিমবাহের ওপর দিয়ে।

ফুটন্ত কড়াইয়ের মধ্যে বাষ্প যেমন পাক খায়, মেঘও তেমনি পাক খেতে খেতে খোলা এলাকাটার কিনারা বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। একটা অংশ পর্বতের ঢাল বেয়ে আরো ওপরে উঠে গুহা পেরিয়ে দক্ষিণে ছুট দেবার চেষ্টা করতেই, 'আফগান' বায়ুর বোধহয় এ বেআদপি সহ্য হলো না। সে ছুটে এসে মেঘকে ধাক্কা মেরে নীচে নামিয়ে এনে ছিন্নভিন্ন করে ফেললে।

এমনি করে বায়ু ও মেঘের মধ্যে বিষম ওলটপালট চলতে থাকে। আবহাওয়া আরো ঠাণ্ডা হয়।

জুরা এবার বাবুকে নিয়ে রওনা হলো পর্বতশ্রেণীর দিকে।

আর কুচাক! গুহার অদূরে দুখানা পাথর দিয়ে সে নাক কুঁচকে গুল্‌জান গুঁড়ো করতে বসলো। দুনিয়ার গা থেকে যেন গুল্‌জানেব গন্ধ উঠছে!

নিজের মনে বিড়বিড় করছে সে,—এখন কিং কর্তব্যম্? সরে পড়বো? কোথায়? বাড়ি? দূর! সেখানেও তো সেই আকাল আর গুল্‌জান! তাছাড়া জুরা কি রাজী হবে? ছোঁড়াটা যেমন একগুঁয়ে, তেমনি দেমাকে। জান দেবে, তবু মাংস না নিয়ে ঘরে ফিরবে না।

গুল্‌জানের ময়দা করা সাঙ্গপ্রায়, হঠাৎ ছুটতে ছুটতে বাবু এসে হাজির। আবার সে তার কোট কামড়ে ধরে টানতে শুরু করেছে।

কুচাক মহাখুশী। গুল্‌জানের ময়দাটা এবার ফেলে না দিয়ে একটা পাথরের নীচে লুকিয়ে রেখেই সে ছুটলো বাবুর পেছনে। এবার তার সিদ্ধান্তে কোন 'কিন্তু' নেই। ছাগল হোক আর ভেড়া হোক, বুড়ো হোক আর যুব হোক, কুছপরোয়া নেই, জবাই করা আছে কিনা তারও পরোয়া করবে না, ওটাকে সে সমাদরে এনে সেদ্ধ করে উদরস্থ করবে।

হিমবাহের দিকে না গিয়ে বাবু সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে চলেছে। চলতে চলতে কুচাক হাঁপিয়ে পড়লো। বুক চেপে ধরে বারবার সে থামে জিরিয়ে নেবার জন্যে।

দুর্গম পথ আরো দুর্গম হয়ে উঠছে। আগে পিছে, ডাইনে বাঁয়ে শুধু খাড়া পাহাড় আর পর্বত আর টিলা ও ঢিবি। বাবুর কিন্তু ছোটার বিরাম নেই। জামার আস্তিনে ঘাম মুছতে মুছতে টেনে হিঁচড়ে অতি কষ্টে কুচাক চলেছে তার পেছনে। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দেবার মতো অবস্থা।

এমন সময় হঠাৎ—ও কী! হাউমাউ করে উঠলো কুচাক। সর্বনাশ! হিংস্র এক প্যান্থার বা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে কোথায় গেল কুচাকের ক্লান্তি ও অবসাদ! ক্ষণেক আগে হামাগুড়ি

দেবার ক্ষমতাও যার ছিল না, প্যান্থার দেখেই সে স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠলো, ছিটকে পড়লো পেছনে। সাধের শেয়াললোমের টুপিটা উড়ে গেল মাথা থেকে। সেটা তুলে নেবারও ফুরসত হয় না। প্রকাণ্ড ভয়াল প্যান্থারের কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় তারস্বরে আর্তনাদ করতে করতে কুচাক মরিবাঁচি করে ঢাল বেয়ে ছুটলো নীচের দিকে। প্যান্থার জলকে ভয় করে। তাই জলের দিকেই দৌড়চ্ছে কুচাক। ওখানে একবার পৌঁছতে পারলে হয়, খালে গিয়ে সে ডুব দেবে।

পেছনে জানোয়ারটার লাফ দেবার শব্দ শোনা যায়। সামনেই এক ঢিবি। লাফ মেরে সেটা টপকাতে গিয়ে কুচাকের পা হড়কে গেল।

ওরে বাবারে—জান নিলে রে!—বুকফাটা আর্তনাদ করেই সে চিৎপাত। প্যান্থারও ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

'মলাম মলাম' বলে চেঁচিয়ে উঠলো কুচাক। তারপর লাথির পর লাথি. . .

অ্যাঁ, ওরে বাবা! প্যান্থার যে তার নাক চাটছে! সঙ্গে সঙ্গে আবার কুচাকের হাহাকার, তার পরেই আবার লাথি এবং লাথির পর লাথি. ....

কিন্তু কি হলো? ব্যাপার কি? প্যান্থার তো কিছু বলছে না? বাঁ চোখটা কুচাক অতি সন্তর্পণে একটু ফাঁক করেই লাফিয়ে উঠলো ভূমিশয্যা ছেড়ে। অ্যাঁ, কোথায় প্যান্থার! পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাবু!

রাগে কুচাকের পিত্তিনাড়ি জ্বলে গেল, সে বুখে উঠলো,—হতচ্ছাড়ী পাজী শয়তান! তোকেই আমি প্যান্থার ঠাউরেছিলাম!

রাগে গবগর করতে করতে সে ফিরে যাবার উপক্রম করতেই, বাবু আবার তার কোট কামড়ে ধরলো। কুচাকের মনে হলো, চোখ পিটপিট করে ও যেন হাসছে। এমন সময় হঠাৎ তার কানে এল জুরার গলা। সঙ্গে সঙ্গে কুচাক আবার চাঙ্গা। তাড়াতাড়ি এক ঢিবির মাথায় উঠতেই দেখে, কিছু দূরে আর একটা ঢিবির ওপর জুরা বসে আছে। হাতের ইশারায় তাকে ডাকছে।

ভয়ে কুচাক গোঙিয়ে উঠলো,—আরে, আরে, একটা প্যান্থার ওখানে!

শান্ত নির্বিকার কণ্ঠে জুরা জবাব দেয়,—জানি। ওটা ফাঁদে পড়েছে।

অ্যাঁ, ফাঁদে পড়েছে!—আনন্দে উত্তেজনায় কুচাক দু-চার লাফেই জুরার কাছে গিয়ে হাজির। বিরাটকায় এক প্যান্থার। একটা পা ফাঁদে আটকে গেছে। ওরা একটু নড়াচড়া করছে কি, সে ভয়ংকর দাঁত খিঁচিয়ে উঠছে।

জুরা ও কুচাক এবার দারুণ উৎসাহে ওর দিকে পাথর-বৃষ্টি শুরু করলো। খাদ্য হিসেবে প্যান্থারের মাংস অচল কিছু নয়, বিশেষ করে বর্তমান অবস্থায়। কিন্তু ঢিল ছুঁড়ে প্যান্থার শিকারের কথা কে কবে শুনেছে? এদিক-ওদিক লাফ মেরে প্যান্থার কৌশলে এড়িয়ে যায় পাথরগুলো। বিশেষ করে সে মাথা বাঁচায় পাথর থেকে। তার গায়ে বেশ কয়েকবার চোট লাগলো বটে, কিন্তু তেমন মারাত্মক কিছু নয়।

দুঃখে ক্ষোভে জুরা একসময় চেঁচিয়ে ওঠে,—ওঃ! বন্দুক থাকলে ওটা কখন খতম হয়ে যেত!

বলতে বলতে আবার শুরু হয় তার পাথর-বৃষ্টি।

ভয়ঙ্কর চেহারা তখন প্যান্থারের। পাগলের মতো মাঝে মাঝে সে শেকলে দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে। সারা মুখ রক্তে লাল।

কুচাকের হাত-পা কাঁপছে। জুরার দুই হাত ক্ষত-বিক্ষত। প্যান্থারের গা থেকেও যথেষ্ট রক্তপাত ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তখনো সে দুর্দান্ত।

দিন শেষ হয়ে আসে। ওদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ঢিল ছুড়ে যে প্যান্থার ঘায়েল করা যায় না, এটা ওরা হাড়ে হাড়ে টের পেল আর একবার।

শ্রান্তক্লান্ত অবসন্ন দেহ—শেষ পর্যন্ত ওরা গুহার পথ ধরে। পথে জুরা লম্বা দুখানা মোটা লাঠি কেটে নিলে।

তুষার ও বরফ রাঙিয়ে, পাহাড়-পর্বতের ছায়া দীর্ঘতর করে সূর্য পাটে নামে।

ক্লান্ত পায়ে ওরা চলেছে। সন্ধ্যা হয়ে যায় গুহায় ফিরতে।

গুহার ভেতরে জড়ো-করা অব্যবহার্য জিনিসের গাদা থেকে জুবা সবচেয়ে ভাল দুটো লোহার তীরের ফলা বেছে নিলে। তারপর তাদের ধার দিয়ে লাঠি দুখানার মাথায় বসিয়ে দিতেই চমৎকার দুটো বর্শা তৈরী হলো।

আবার সেই গুল্‌জান-ময়দার লপ্‌সি আর চা-মেশানো জল।

রাতে ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হয়—সেই সঙ্গে তুষারপাত। জুরার মেজাজ আবার চাঙা হয়ে উঠলো। ছাগল ও ভেড়ার পাল ঠাণ্ডার ভয়ে এবার হিমবাহ পার হয়ে দক্ষিণ-মুখো ধাওয়া করবে। হিমবাহের পথে ফাঁদগুলো পাতা আছে। অধীর আগ্রহে জুরা ও কুচাক ভোরের প্রতীক্ষা করে।

দ্বিতীয় পর্ব ৮

পরদিন ভোরে রওনা হয় তারা। পর্বতের ওপর ঘন হয়ে মেঘ জমেছে। স্যাঁতসেঁতে ভিজে মেঘ। তার ভেতর দিয়ে তারা ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে—উঁচু থেকে আরো উঁচুতে।

চিরন্তন মেঘের দেশ ভেদ করে তারা উঠছে তো উঠছেই—চলেছে যেন স্বর্গের দেশে।

শেষে একসময় মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে তারা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলো, যার নীচে মেঘ আর চারদিকে চোখ-ধাঁধানো তীব্র সূর্যের আলো। অত উঁচুতে মেঘ উঠতে পারে না। তেমনি রোদেরও কোন তাপ নেই সেখানে। হিমবাহ থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে তাদের চোখে মুখে বিঁধছে সূচের মতো।

ভেড়া ও ছাগলের পাল দলে দলে চলেছে হিমবাহের দিকে। বাবু ছটফট করে ওদের পিছু ধাওয়া করার জন্যে। তার গলায় বাঁধা চামড়ার ফিতেটা কুচাক ধরে আছে। ফিতেয় সে বারবার টান মারছে।

বড় বড় টিলা ও ঢিবির মাথায় ঈগলেরা বসে আছে। চোখে তাদের হিংস্র নীরব চাউনি।

বল্লম-দণ্ডে ভর দিয়ে জুরা ও কুচাক ধীরমন্থর পদক্ষেপে ক্রমশঃ ওপরে উঠছে—উঠছে বিলিয়াণ্ড-কীকের দিকে। অত উঁচুতে বাতাস অত্যন্ত পাতলা। এত পাতলা যে, হাঁটতেও কষ্ট হয়।

একের পর এক শৈলশিরা পার হয়ে তারা একসময় নুড়ি ভরতি এক হিমবাহের তলায় এসে দাঁড়ালো। কিছু দূরে নিঃসঙ্গ এক বুড়ো ছাগল হিমবাহ পার হয়ে চলেছে। ফাঁদে পড়ে তার পেছনের একটা পা ক্ষতবিক্ষত। ছাগলটার ওপর নজর পড়তেই বাবু

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ছুট দিলে সামনের দিকে। কুচাক এজন্যে তৈরী ছিল না—ফিতেটা ফসকে গেল হাত থেকে। তারা দৌড়লো বাবুর পেছনে তাকে আটকাবার জন্যে।

বিচিত্র ভয়ঙ্কর এলাকাটার দৃশ্য। বরফের সুবিশাল চাংড়া ও স্তূপ সর্বত্র। দূরে দৃষ্টি চলে না। অদ্ভুত বিদ্ঘুটে তাদের চেহারা—যেন কোন রকমে টাল সামলে দাঁড়িয়ে আছে, যে কোন মুহূর্তে গড়িয়ে পড়তে পারে। নোংরা ময়লা রঙের বরফের আস্তরণে ঢাকা এলাকাটা। ছোট-বড় গর্ত এখানে ওখানে।

যতদূর সম্ভব সাবধানে তারা ছুটছে বাবুর পেছনে। কুচাক মাঝে মাঝে পা হড়কে বরফের গর্তে গিয়ে পড়ছে। জুরাও বাদ যাচ্ছে না—অবশ্য কুচাকের তুলনায় বারে অনেক কম। ময়লা বরফ শেষ হয় একসময়। এবার শক্ত সাদা তুষার। পায়ের নীচে মচমচ করে তুষার ভাঙছে। সাদা তুষার শেষ হতেই এল নীলরঙের বরফ। সবশেষে যে বরফ পড়লো, সবজে-কালোতে মেশানো তার রঙ।

বরফের মধ্যে চিড় ও ফাটল সর্বত্র। পিছল বরফে কুচাক হরদম আছাড় খাচ্ছে আর হিক্কা তুলছে সশব্দে। ফাটলের ভয়ে সে তটস্থ। গভীর ফাটলে গিয়ে পড়লে আর দেখতে হবে না, কোথায় তলিয়ে যাবে—একেবারে জ্যান্ত কবর! জুরার পেছনে তার পায়ে পায়ে সে এগোনোর চেষ্টা করছে।

এদিকে বাবু তাড়া করতেই, ছাগলটা পেছন ফিরে ছাইরঙা দাড়ি ও ধারালো শিং জোড়া দুরন্ত রাগে ঝেঁকে উঠলো। হিংস্র ভয়ঙ্কর তার চেহারা। গত দু-বছর সে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে। জোয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে মার খেয়ে দল থেকে সে বিতাড়িত। আজ সে বুড়ো হয়েছে, তার ওপর আহত। তবু শক্তি ও সামর্থ্যে নেহাত কম যায় না। দূর থেকে আরো দূরে সে সরে যাচ্ছে, ঢুকছে গিয়ে দুর্গম পর্বতরাজ্যে। আর ততই হিংস্র হয়ে উঠছে তার ক্রূর চোখের চাহনি।

হিমবাহের কিনারায় সে প্রায় এসে পড়েছিল, এমন সময় বাবুর এই হামলায় সে ঘাবড়ে গেল। পর্বতশ্রেণীর দিকে না গিয়ে লাফিয়ে পড়লো নীচে—প্রায় গলে-যাওয়া পুরনো এক হিমানী-সম্প্রপাতের তলায়। সেখানে তাকে ধরা শক্ত নয়। তবু যতবার বাবু তেড়ে যাচ্ছে তার দিকে, ততবারই সে শিং বেঁকিয়ে রুখে দাঁড়াচ্ছে।

এসব যেখানে ঘটছে, তার পাশেই সুবিশাল এক পর্বত—'শয়তানের কফিন' বলা হয়। সোজা খাড়া সে উঠে গেছে মহাশূন্যে—হিমবাহেরও ওপরে। হিমবাহের তুষার-প্রবাহ এখানে এসে দুভাগ হয়ে গেছে। এক ভাগ বাঁ দিকে গিয়ে মোড় নিয়েছে হঠাৎ।

সর্বত্র বরফ—যেমন গভীর তেমনি পুরু। ভয়ঙ্কর ফাটলও সর্বত্র। কত তাদের গভীরতা, কে জানে!

এখানেই বাবু রুখছে ছাগলটাকে। দু পক্ষে তীব্র মোকাবিলা চলেছে। এমন সময় গলার দড়িতে পা আটকে বাবু হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

জুরা ও কুচাক তখন ছাগলটার কাছাকাছি এসে পড়েছে। বাবু পড়ে যেতেই জুরা বল্লম বাগিয়ে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে উঠলো,—কিশ্ কিশ্ কিশ্!

কিন্তু বাবু হঠাৎ অবসন্ন হয়ে পড়লো। তার জিব বেরিয়ে এল। জিব দিয়ে লালা ঝরছে। করুণ অসহায় দৃষ্টিতে সে একবার তাকালো মনিবের দিকে। তার পরেই একখণ্ড বরফ গিলে শুয়ে পড়লো।

ঘটনাটা এত অপ্রত্যাশিত যে, জুরা ও কুচাক হকচকিয়ে যায়। বাবু পড়ে যেতেই ছাগলটা ফিরে দাঁড়ালো। তার মুখ দিয়ে রক্তের গাঁজলা বেরোচ্ছে। যে দুশমন তাকে এতক্ষণ হয়রান করেছে, সে পড়ে গেছে! দারুণ আক্রোশে সে হিংস্র ধারালো শিং

ঝাঁকিয়ে ছুটে গেল বাবুর দিকে। বাবু লাফ দিয়ে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলো একবার, কিন্তু পারলো না, দড়িতে পা আটকে গেছে।

পরক্ষণে ছাগলটা তাকে শিঙে তুলে প্রচণ্ড জোরে আছাড় মারলে শক্ত তুষারের ওপর। বারেকের জন্যে জুরা ও কুচাকের কানে এল ক্ষীণ সরু গলার এক কিঁউ-কিঁউ শব্দ। বাবু এক বাচ্চা প্রসব করেছে!

আর ঠিক তখনই কড়কড় মড়মড় শব্দে হঠাৎ তুষারের আস্তরণ ফেটে গেল। তার তলায় প্রকাণ্ড এক গহ্বর। নিমেষের মধ্যে বাবু, তার সদ্যোজাত বাচ্চা ও ছাগল, তিনটেই অদৃশ্য হয়ে গেল গহ্বরের তলায়।

নিদারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ক্ষণেকের জন্যে জুরা বুঝি পাথর হয়ে যায়। আর কুচাক তো আতঙ্কে প্রায় বাহ্যজ্ঞানরহিত। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো সে বরফের ওপর আর একটানা কঁকিয়ে চললো আঁই-আঁই করে : ওরেব্বাবা! মেদিনী রাক্ষুসে হাঁ করে চোখের পলকে সব কিছু গ্রাস করে নিলে!

নিদারুণ ভয়ে বারবার সে বরফ সাপটে ধরছে দু হাত বাড়িয়ে।

প্রকৃতির রাজ্যে কিন্তু ততক্ষণে আবার সব আগের মতোই স্বাভাবিক। ক্ষণকাল আগে যে এত বড় ঘটনাটা ঘটে গেল, তার চিহ্ন নেই কোথাও। আগের মতোই চোখ-ঝলসানো সূর্যের আলোয় সবকিছু ঝলমল করছে। নীচে মেঘে মেঘে তোলপাড়।

জুরার বুঝি সংবিৎ ফিরে এল। সে ছুটে গেল গহ্বরের কাছে। চেহারা তার পাগলের মতো। চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। গহ্বরটা বেড় দিয়ে সে দৌড়োয় আর ব্যাকুল কণ্ঠে হায়-হায় করে চলে,—আমার কুকুর! আমার কুকুর!

আর কুচাক! তার অবস্থা আরো কাহিল। তেমনি উপুড় হয়ে পড়ে একটানা কঁকিয়ে চলেছে আর খাবি খাচ্ছে ও বরফ চাটছে।

থাম!—জুরা গর্জে উঠলো। কুচাকের কানে তা গেল কিনা, কে জানে! তার ককানি থামে না। দুরন্ত রাগে জুরা ধেয়ে গেল তার দিকে। বুটের এক ঘা কষিয়ে দিয়ে আবার গর্জে উঠলো,—চোপ্ রও বলছি!

সঙ্গে সঙ্গে কুচাকের ককানি বন্ধ। আর সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে গহ্বর থেকে ভেসে এল আবার সেই তীক্ষ্ণ কিঁউ-কিঁউ আওয়াজ।

বুকফাটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল জুরার গলা থেকে,—হায় হায়! কুকুর! আমার কুকুর! হায় হায়, আমার নামকরা বাবু হারিয়ে যাবে! দুটো ঘোড়া দিয়ে বাবা ওকে কিনেছিল। হায় হায়, হারিয়ে যাবে বাচ্চাগুলোও! ওরা বাবুর বাচ্চা! এক-একটার দাম এক-একটা ইয়াকের সমান। কি করে বাঁচবো আমরা? খাবার আসবে কোত্থেকে? বন্দুক নেই, বাবুও নেই!

কুচাক!—হঠাৎ সে গর্জন করে উঠলো।

জুরার আর্তনাদ কানে যেতেই কুচাক ছটফট করতে করতে এক লাফে উঠে বসেছিল। পরক্ষণে জুরার হুঙ্কার শুনতেই একাগ্র চিত্তে সে নমাজ পড়তে শুরু করলো। শরীয়ত মতে নমাজের সময় কোন চিৎকার-ডাকাডাকি কানে যাবার কথা নয়। কুচাক তাই নির্বিকার—জুরার গর্জনে সাড়া দেওয়া দূরের কথা, ঘাড় ফেরায় না পর্যন্ত।

দুঃসহ রাগে জুরা চোখে অন্ধকার দেখে। খুন! কুচাককে খুন করবে সে! ভয়ঙ্কর কণ্ঠে শুরু হয় তার অবিশ্রান্ত গালাগালি।

কুচাক ঘাবড়ে যায় : বদমেজাজী ছোঁড়াটার মাথা ঠিক আছে তো!

কথাটা মনে হতেই, কোথায় উবে গেল তার সেই ভক্তি ও একাগ্রতা! সচকিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলে,—কি বলছিস?

—দড়িগুলো দাও।

ক্ষিপ্রহাতে জুরা দড়িতে কয়েকটা ফাঁস লাগালো। তারপর কুড়ুল দিয়ে বরফে গভীর গর্ত করে, বল্লমটা তার মধ্যে শক্ত করে পুঁতে সে দড়ির এক কোণা বাঁধলো তার সঙ্গে। অন্য দিকটা অতল গহ্বরের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে সে এবার ফিরলো কুচাকের দিকে, বললে,—নাম! দড়ি ধরে ভেতরে নামতে হবে তোমাকে।

অ্যাঁ!—কুচাক ভয়ানক আঁতকে উঠলো, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল জুরার মুখের দিকে ঃ সত্যিই কি ওর মাথাটা বিগড়ে গেল! তার পরেই গোঙিয়ে উঠলো,—ভেতরে নামবো? আমি? সব্বোনাশ! বলছিস্ কি?

জুরার এই অসম্ভব প্রস্তাব সে কল্পনাও করেনি। সজোরে মাথা নেড়ে পেছিয়ে গেল সে।

শোন,—অবিচল ভয়ঙ্কর কণ্ঠ জুরার ঃ দিব্বি কেটে বলছি, বাচ্চাটাকে আনতে না নাম তো আজ খুন হবে আমার হাতে। বাবুও হয়তো এখনো বেঁচে আছে।

কুচাক হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো—পালিয়ে যাবার উপায় নেই। সে জানে, জুরা যা বলে তাই করে।

ছোরা বের করে জুরা গর্জন করে উঠলো,—জল্‌দি!

কুচাক একপা একপা করে এগিয়ে যায়, গহ্বরের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, সারসের মতো গলা লম্বা করে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে নীচে অন্ধকারের দিকে। জাহান্নামের পথে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

জুরা আবার তর্জন করে উঠলো,—জল্‌দি!

কুচাকের আর দ্বিরুক্তি করার ক্ষমতা নেই। মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোচ্ছে। জাহান্নামে যাবার আগে দেবতাদের কাছে কোরবানি দিয়ে যাবার কথা তার মনে পড়ে। ধীরে ধীরে সে ছোরা বের করলো। কড়ে আঙুল চিরে রক্ত ছড়িয়ে দিলে বরফের ওপর। তারপর বুক চাপড়ে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে দড়ি ধরে ঝুলে পড়লো গহ্বরের মধ্যে।

শেষবারের মতো তার গলা শোনা গেল,—উঃ! কী ঠাণ্ডা! কী ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা!

তৃতীয় পর্ব ১

জুরা দড়ি ধরে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিচ্ছে কুচাককে। ভারের চাপে দড়িটা ফাটলের কিনারায় কেটে বসেছে, টান-টান হয়ে নামছে নীচের দিকে।

হাতে তখনো যে দড়িটুকু আছে, সেদিকে তাকিয়ে জুরার ভয় হয়, বাকী দড়িতে কুলোবে তো? ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কের মতো দড়িটা সে কেবল হাত-বদল করতে গেছে, এমন সময় হঠাৎ সেটা এত জোরে ঝেঁকে উঠলো যে, ছিটকে বেরিয়ে গেল হাত থেকে।

বল্লমের সঙ্গে দড়িটা বাঁধা। জুরা শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে চেপে ধরলো দড়ি ও বল্লমটা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে গহ্বরেব তলদেশ তোলপাড় করে ভেসে এল এক অসহায় করুণ আর্তনাদ।•

জুরা সচকিত : কুচাকের পা হড়কে গেল না তো বরফের কোন তাক থেকে?

সে প্রাণপণে দড়ি টেনে তুলতে শুরু করলো। কিন্তু ব্যাপার কি! দড়িটা হাতে ঢলঢল করছে—কোন টান নেই!

জুরা ঘাবড়ে গিয়ে আরো জোরে টানতে শুরু করে দড়িটা। অর্ধেক আন্দাজ বোধহয় তুলেছে, এমন সময় গহ্বরের কিনারায় কুচাকের দুই লোমশ হাত উঠে এল। পরক্ষণে কুচাক হিঁচড়ে টেনে তুললো নিজেকে। দু হাতে সে এত জোরে কিনারা আঁকড়ে ধরেছিল যে, হাতের নখ পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে।

কুচাকেব দিকে তাকিয়ে জুরা একটু হকচকিয়ে যায়—ব্যাপার কি! কুচাকের চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। হাবভাব পাগলের মতো।

জুরার দিকে বারেক তাকিয়েই কুচাক দৌড় মারলে। কিন্তু কিছু দূর যেতেই পা পিছলে পড়ে গেল বরফের ওপর। জুরাও ছুটেছে তার পেছনে। সর্বশক্তি দিয়ে কুচাককে সে চেপে ধরলো বরফের ওপর।

কুচাক যেন পাগল হযে গেছে। চোখের তারা ঘুরছে বনবন করে। চেঁচাচ্ছে আর হুটোপাটি করছে ছাড়া পাবার জন্যে। জুরা যে তাকে এত ঝাঁকাচ্ছে আর ডাকছে নাম ধরে, তা বোধহয় তার মাথায়ই ঢুকছে না।

যাই হোক, শেষ অবধি অনেক ঝাঁকুনি ও ডাকাডাকির পর কুচাকের সংবিৎ ফিরে এল। তাব ভাব দেখে মনে হয়, জুরাকে যেন সে এইমাত্র দেখতে পেল।

দারুণ আতঙ্কে জুরাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে উঠলো সে,—চ, চ, এক্ষুণি পালাই এখান থেকে!

বরফের ওপর কিল মারতে মারতে নীচের দিকে আঙুল দেখিয়ে রুদ্ধশ্বাসে আবার সে চেঁচিয়ে উঠলো,—ঐ-ঐ-ওখেনে নীচে রয়েছে শয়তান আর পিশাচের দল, জিন আর আলবেস্ট!

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জুরা বাধা দেয়,—কিন্তু বাবু কোথায়? বাচ্চাটারই বা কি হলো?

কিন্তু কে শোনে কার কথা! আতঙ্কে দিশেহারা কুচাক ভয়ঙ্কর ফাটলটার ধার থেকে পালানোর জন্যে ছটফট করছে। কথাবার্তায়ও কোন সংগতি নেই।

তার আবোলতাবোল প্রলাপ থেকে জুরা যা বুঝতে পারে, তা হলো—বাবু বা ছাগল কোনটাকেই সে দেখে নি, বরফের এক তাকের ওপর বাচ্চাটাকে শুধু পড়ে থাকতে দেখেছিল। তাকে তুলে নেবার জন্যে সে কুঁজো হয়ে হাতও বাড়িয়েছিল, এমন সময় উঃ! গহ্বরের বিপরীত দেয়ালে নজর পড়তেই তার জান যাবার যোগাড়। সেখানে বরফের মধ্যে শয়তান ও পিশাচেরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজন ছোরা খুরটা বাড়িয়ে দিলে তার দিকে। এ অবস্থায় বাচ্চা-ফাচ্চা কারুর কথাই মনে থাকার কথা নয়। যেন-তেন প্রকারে তখন সে পালাতে পারলে বাঁচে।

অসহ্য রাগে জুরা দাঁতে দাঁত পেষে। কুচাক কত বড় ভীরু কাপুরুষ সে জানে। তার একটা কথাও সে বিশ্বাস করেনি। বাচ্চাটাকে ফেলে আসায় গালাগালি করে সে তার ভূত ভাগালে। শেষে বললে,—আবার তোমায় নীচে নামতে হবে।

কুচাক সোজা বেঁকে বসলো। জুরার দু হাতে বারবার সে চুমু খায় আর হাউ-মাউ করতে থাকে,—ওরে না, না! আল্লার দোহাই, অভিশপ্ত সাংঘাতিক এ জায়গা! চ চ, এক্ষুণি পালাই!

বুড়ো সর্দারের মুখে জুরা শুনেছে, প্রথম সন্তান প্রসব করে মা-কুকুর মারা গেলে তার আত্মা বাচ্চার দেহ আশ্রয় করে। তাই বাবুর এই বাচ্চাকে যে ভাবে হোক বাঁচাতেই হবে। তাছাড়া এই প্রথম বাচ্চা হলো বাবুর।

বল্লমটাকে আবার সে বরফের মধ্যে শক্ত করে পুঁতে দড়ি বাঁধলে তার সঙ্গে। এবার সে নিজেই নামবে। আর কুচাক বরফের গর্তে গোড়ালি আটকে দড়ির শেষ দিকটা ধরে থাকবে শক্ত করে। এ প্রস্তাবে কুচাক রাজী হলো বলা মাত্র।

জুরা দড়ি ধরে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করে। গহ্বরের ওপরের দিকটা অপেক্ষা-কৃত চওড়া। কিনারায় বরফ পরিষ্কার—চকচক করছে। কিন্তু যতই সে নীচে নামছে, বরফের রঙ ততই পাল্টে যাচ্ছে—কালো হয়ে উঠছে। আর ততই বাড়ছে ঠান্ডার দাপট।

আরো কিছু নীচে, আবছা অন্ধকারে দেখা যায়, গহ্বরের দেয়াল থেকে তাকের মতো খানিকটা চকচকে অংশ সামনের দিকে বেরিয়ে আছে। তার ওপর কালো বলের মতো কি একটা বস্তু দেখা যায়।

কি ওটা? বাচ্চা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, নির্ঘাত বাবুর বাচ্চা! জুরা যত নামছে, ততই বাড়ছে উৎকণ্ঠা। বাচ্চাটা বেঁচে আছে কিনা কে জানে!

শেষ দিকে উদ্বেগে সে চোখ বোজে। চোখ মেললে তাকে পা ঠেকতে। আধো-আঁধারে বাচ্চাটাকে দেখা যাচ্ছে। নত হয়ে তাকে সে তুলে নিলে। খুদে জানোয়ারটা ঠান্ডায় কাঁপছে থরথর করে।

আঃ, বেঁচে আছে। বেঁচে আছে তুলতুলে নরম কালো বলটা! আঃ, বাবুর বাচ্চা! —পরম স্নেহে জুরা তাকে আলগোছে কোটের ভেতরকার বুক পকেটে সোজা চালান করে দিলে।

এতক্ষণে তার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে।

দেয়ালের দিকে মুখ করে তাকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে জুরা। এবার গহ্বরের বিপরীত দেয়ালের দিকে সন্তর্পণে ঘাড় ফেরাতেই হঠাৎ ভয়ানক চমকে উঠলো, সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো থরথর করেঃ ক্-কী! ক্-কী! কী ওটা?

জুরা টাল সামলাতে পারে না—তাক থেকে পা পিছলে যায়। দড়ি ধ'রে সে ঝুলে পড়লো। তারপরেই মরি-বাঁচি ক'রে দড়ি বেয়ে ধাওয়া করলো উপরমুখো। উঃ কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

কিন্তু পাঁচ নম্বর ফাঁস পর্যন্ত আসতে আসতে নিজেকে সে অনেকটা সামলে নেয়। সন্তর্পণে আবার সে তাকালে পেছনে ঃ নাঃ কেউ তো তেড়ে আসছে না! সবই ঠিক আছে আগের মতো। তাহলে?......

জুরা ভাবে কয়েক মুহূর্ত, তারপর ধীরে ধীরে আবার নামতে শুরু করে নীচে তাকের দিকে। যে কোন মুহূর্তে ওপরে ওঠার জন্যে তৈরী হয়েই নামছে সে। উঃ কী সাংঘাতিক! ভাবতে গেলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

তীক্ষ্ন দৃষ্টি তার সামনের বিপরীত দেয়ালের দিকে...... ঐ—ঐ তো দেখা যায়!

ধীরে—অতি ধীরে সে নেমে আসে, সন্তর্পণে পা রাখে তাকের ওপর। বিস্ফারিত চোখে তাকায় সামনের দিকে। বিপরীত দেয়ালে একটা লোক বরফে আটকে জমে আছে, কাঁধটা বেরিয়ে আছে পাশ থেকে। কিরঘিজের মতো তার চেহারা, হাতে এক বন্দুক। সামান্য নীচে একটা ঘোড়া। বরফের ভেতর থেকে তার খুরওলা একখানা পা বেরিয়ে আছে। ঘোড়াটার কাছে আরো দুজন লোক—অদ্ভুত তাদের সাজপোশাক। আরও নীচে অস্পষ্ট কিছু কিছু ছোপছাপ দেখা যায়। হয়তো জমে-যাওয়া আরো কিছু মানুষ আছে সেখানে।

শেষের লোক দুটোর লম্বা চুল আর কিম্ভূতকিমাকার সাজপোশাকের দিকে জুরা হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে। কিন্তু যে লোকটার হাতে বন্দুক, তার ওপরই নজরটা তার সবচেয়ে বেশী। সত্যিই খাঁটি বন্দুক ওটা—নলের গড়ন দেখে ম্যাচলক বলে মনে হয়।

কিন্তু লোকগুলো এই গহ্বরের মধ্যে এল কি করে? তাদের সাজপোশাক সব ভিন্ন ধরনের—বিদেশী।

জুরা দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করে। ঘটনাটা এতই অস্বাভাবিক ও আকস্মিক যে, তার সংকীর্ণ চিন্তার রাজ্যে সম্পূর্ণ ওলটপালট ঘটে গেছে।

ভ্রূ কুঁচকে সে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে ঃ কারা ওরা? এখানে কেন?......

হয়তো সুদূর কোন অতীত যুগে অন্য কোন দেশ থেকে ওরা এসেছিল ....হয়তো দুর্গম পামীরের ততোধিক দুর্গম বিলিয়াণ্ড-কীক পার হতে গিয়ে এই গহ্বরে পড়ে বরফে জমাট বেঁধে আছে তখন থেকে......

মৃত লোকগুলো ও বন্দুকটার দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছে জুরা! চোখে মুখে আতঙ্ক ও বিহ্বলতা। ব্যাপারটা জাদু বা ভেল্কি নয় তো? পরখ করার জন্যে বরফের দেয়ালে সে ছোরা বসিয়ে দিলে। কয়েকটা বরফের টুকরো গড়িয়ে নেমে গেল নীচে অতল অন্ধকারের দিকে। না, ভেল্কি নয়। জাদুও নয়। বন্দুকটা ঠিকই আছে, অদৃশ্য হয় নি।

জুরার সাহস ফিরে আসে। একটু একটু করে সে এগিয়ে যায় লোমগুলোর কাছে। সন্তর্পণে ছোরা দিয়ে সে একটু আঘাত করলে বন্দুকটার গায়ে। ঠুং করে শব্দ হয়। না, ওটা সত্যিকার বন্দুকই বটে,—জুরা নিশ্চিন্ত হয়। আর তার পরেই সর্ব শক্তি দিয়ে এক সময় সে বন্দুকের চারপাশের বরফ খুঁড়তে শুরু করে। বন্দুকের মুখের এক-তৃতীয়াংশ বেরিয়ে আসতেই, নলটা ধরে সে তার ওপর ছোরা দিয়ে আস্তে ঘা মারলে। টুং-টাং আওয়াজ উঠলো তা থেকে।

মাঝে মাঝে সে কোটের ভেতরকার বুক পকেটে সন্তর্পণে হাত ঢুকিয়ে অনুভব করছে বাচ্চাটাকে ঃ নাঃ, ঠিক আছে! তার কোটের ও দেহের উষ্ণতায় আরামে ঘুমোচ্ছে সে।

বন্দুকটার পাশেই আরো কি একটা বস্তু দেখা যাচ্ছে না? বরফের দেয়ালে মুখ লাগিয়ে জুরা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে ঃ হ্যাঁ, কালোরঙের কি একটা জিনিস। বরফে জমে-যাওয়া জিনে-বাঁধা একটা ব্যাগ মনে হয়।

কোটের নীচে বাচ্চাটা ইতিমধ্যে জেগে গেছে, কিঁউ কিঁউ করে ডাকতে শুরু করেছে।

আর ওপরে কুচাক ভীতত্রস্ত। আতঙ্কে তার দম যেন আটকে আসতে চায়। হঠাৎ একসময় তার মনে হলো ঃ আচ্ছা, এমন যদি হয়, জুরার বদলে তার মূর্তি ধরে অশরীরী কোন পর্বত-মানব ওপরে উঠে এল আর এসেই তাকে আক্রমণ করলো, তাহলে—? অ্যাঁ, কি হবে তাহলে?

চক্ষু মুদে নামী-অনামী-বেনামী যাবতীয় দেবতার নাম জপতে শুরু করে কুচাক। সবার নাম যে ছাই মনেও পড়ছে না!

হঠাৎ একটু শব্দ হতেই সে ভয়ানক চমকে উঠলো ঃ কি! কি! কে এল?

চোখের কোণা সে সামান্য একটু ফাঁক করে ঃ অ্যাঁ, কে!...জুরা!...সত্যি?...

পরক্ষণে বিস্ফারিত চোখে সে তাকালো ঃ হ্যাঁ, জুরাই বটে! অত্যন্ত উত্তেজিত। ঠান্ডায় নীল হয়ে গেছে। বাচ্চাটাকে সে কুচাকের হাতে দিলে।

বেকুবের মতো ছোট্ট তুলতুলে ঠান্ডা বান্ডিলটাকে কোটের ভেতরকার বুক পকেটে রাখতে রাখতে কুচাক বেকুবের মতোই শুকনো হেসে নিরুৎসুক কণ্ঠে বললে,— অ, বাবুর বাচ্চা বুঝি? কিন্তু ও কি খাবে? কিচ্ছু নেই দেবার মতো। আজ হোক কাল হোক, অক্কা ওকে শেষতক পেতেই হবে।

সেদিকে কান না দিয়ে গহ্বরের মধ্যে জুরা যা যা দেখেছে, সবই খুলে বললে কুচাককে।

শুনতে শুনতে কুচাক আতঙ্কে গোঙিয়ে ওঠে,—ওরা সব পর্বত-মানব, আর নয়তো জিন বা আলবেস্ট। লোহার হাত ওদের, পিঠ নেই।

জুরা চটে ওঠে,—থাম তুমি হাঁদারাম! বন্দুকটা আমাদের আনতেই হবে. নয়তো না খেয়ে মরবো।

কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত কুচাক তবু মাথা নাড়ে,—যে বন্দুকটা তুই দেখেছিস, আসলে তা বন্দুকই নয়, ভেল্কি বা জাদু।

জুরা এবার রাগে ফেটে পড়লো,—থামবে তুমি নীরেট খচ্চর! বললাম না, আমি নিজের হাতে ওটার চারপাশ খুঁড়েছি। বুঝতে পারছো না, ওটা দেবতাদের দান? তাঁরাই আমাদের বন্দুকটা পাঠিয়েছেন।

ব্যস্, কথাটা সঙ্গে সঙ্গে কুচাকের মনে ধরলো। হ্যাঁ, একটা কথার মতো কথাই বটে! বন্দুকটা তাহলে অনাই দরকার। বাচ্চাটাকে জুরার কাছে দিয়ে কুড়ুল নিয়ে সে আবার নামলো গহ্বরের মধ্যে। ভয়ে ও আশঙ্কায় মন তার অন্ধকার।

একটু পরেই কুড়ুল মারার চাপা আওয়াজ আসে নীচে থেকে।......

এমনি করে কাজ চললো।

দুজনে পালা করে গহ্বরের বরফ কেটে চলে। দুরন্ত মেহনত।

শেষ দিকে হাত যেন আর চলতে চায় না। অবসাদে শরীর ভেঙে পড়তে চায়। কাজেই সেদিনের মতো কাজ বন্ধ রাখা ছাড়া উপায় নেই। দুজনে এত ক্লান্ত যে, হেঁটে গুহায় ফেরাও কষ্টকর। কুচাক তো আদ্দেক পথ পার হলো কোন রকমে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে।

আগের দিন বাবু একটা মারমট শিকার করেছিল। সবটা খেয়ে শেষ করতে পারে

নি। সর্দার বলে, অসৎ বদ লোক মারা গেলে তার আত্মা মারমটের দেহে আশ্রয় নেয়, তাই মারমটের মাংস খাওয়া মানুষের বারণ। কিন্তু জুরা নীরবে মারমটটা কুচাককে দিলে রান্না করতে।

বাচ্চাটা মদ্দা, বাবুর কালো রঙের ছেলে—কপালে সাদা বড় একটা টিপ। ওরা তার নাম রাখলে টীক।

একদিনের বাচ্চা টীক। তার আয়তন ও ওজন দেখে ওরা অবাক হয়। নবজাত বাচ্চাদের তুলনায় সে অনেক—অনেক বড়।

সন্ধ্যার দিকে জুরা তাকে এক টুকরো মারমটের চর্বি খেতে দিলে। কিন্তু টুকরোটা আরো ছোট করে কেটে দেবার জন্যে সে ওটা সরিয়ে নিতেই টীক বিরক্ত হয়ে উঠলো। এ ধরনের ব্যবহারে অর্থাৎ দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়ায় তার তীব্র আপত্তি। চোয়ালে চোয়ালে শব্দ করে এমন সরু তীক্ষ্ন কণ্ঠে সে ডাকতে শুরু করলো যে, ওরা থ। বয়েস তার এক দিনও হয় নি—এরই মধ্যে এত জোরে ডাকছে সে!

কী যে আনন্দ হয় জুরার! টীককে সে বুকে তুলে নিলে। বাবুকে তার বারবার মনে পড়ছে। তার প্রিয়তম বিশ্বস্ত সঙ্গী বাবু। সে চলে গেছে, পেছনে রেখে গেছে তার প্রাণাধিক টীককে। আনন্দ-বেদনায় জুবার মনের মধ্যে কি যে করতে থাকে, নিজেই তা সে ঠিকমতো বুঝতে পারে না।

টীক কিন্তু এসব আদর-আদিখ্যেতা আদৌ পছন্দ করছে না। তীক্ষ্ন কণ্ঠে 'খিণ্ড খিণ্ড' করে সমানে তীব্র আপত্তি জানিয়ে চলেছে।

জুরার মন খুশিতে ভরে উঠলো : সত্যিই টীক বড় হয়ে একটা কুকুরের মতো কুকুর হবে।

আবার সে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

তৃতীয় পর্ব ২

পরদিন ভোরবেলা জুরা ও কুচাক আবার এসে পৌঁছয় গহ্বরেব মুখে। জ্বালানী কাঠের কয়েকটা বড় বড় বাণ্ডিল সঙ্গে এনেছে। আর এনেছে টীককেও। তাকে গুহায় রেখে আসতে সাহস হয় নি। বড় বড় পাহাড়ী ইঁদুরের যা প্রাদুর্ভাব, টীককে ওরা খেয়ে শেষ করতে পারে।

গহ্বরে নেমে বরফ কাটা শুরু হয়। জুরার কথা, বন্দুকটাকে আগে উদ্ধার করতে হবে। তাই তার চারপাশের বরফ আগে কাটা দরকার। কিন্তু কুচাকের ইচ্ছা অন্যরকম। তার বক্তব্য হলো, ব্যাগ আর ঘোড়ার চারপাশের বরফ আগে কাটা উচিত। তাহলে ঘোড়ার মাংস আর ব্যাগ দুটোই পাওয়া যাবে। ঘোড়াটা যেহেতু গোড়া থেকে বরফের মধ্যেই আছে, তাই পচে যাবার সম্ভাবনা নেই।

শেষ পর্যন্ত জুরাব শাসানি আর ধমকানি খেয়ে কুচাক জুরার মতে মত দিল বটে, কিন্ত তার পরেও জুরা যতবার গহ্বরে নেমেছে, ততবারই দেখেছে, ঘোড়ার চারপাশের ববফই কুচাক বেশী করে কাটছে।

হিমের মতো কনকনে ঠাণ্ডা গহ্বরের মধ্যে। সেখানে নেমে পাষাণের মতো কঠিন বরফ কেটে জিনিসগুলো উদ্ধার করা অত্যন্ত দুরূহ কষ্টসাধ্য কাজ। এতখানি কষ্ট

ও পরিশ্রমের কথা তারা ভাবে নি। মানুষ, ঘোড়া, বস্তা, বন্দুক—সব বরফের মধ্যে জমে পাথরের মতো গস্ত হয়ে আছে!

পালা করে ওরা গহ্বরে নেমে বরফ কেটে চলে।

শেষ পর্যন্ত বহুক্ষণ কঠিন মেহনতের পর বন্দুকটা তারা বের করে আনলে।

জুরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

গহ্বরের পাশে আগুনের ধারে রাখা হলো বন্দুকটা—তার ভেতর-বার বরফে একদম জমে গেছে।

এরপর বস্তাটা ও বড় একখন্ড ঘোড়ার মাংসও কেটে বের করা হলো। কুচাকই সমাধা করে কাজটা। এবার বেশ চটপট কাজ সেরেছে সে।

বেলা গড়িয়ে বিকেল হয়। সেই ভোর থেকে কাজ শুরু হয়েছে। সেদিনের মতো কাজ মুলতুবী রাখা হলো।

জিনিসগুলো গুহায় বয়ে নিয়ে যাওয়াও আর এক কঠিন মেহনতের ব্যাপার। ফেরার পথে মাঝে মাঝে বেশ কিছুক্ষণ ধরে জিরিয়ে জিরিয়ে তাদের এগোতে হয়।

জুরার কোটের নীচে থেকে টীকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, নরম গলায় ডেকে চলেছে সে ঃ খেতে চায়।

মাঝ রাত হয়ে তাদের গুহায় ফিরতে। বড় করে আগুন জ্বালা হলো। জিনিসগুলো থেকে বরফ গলতে শুরু করে। জমে যাওয়া ঘোড়ার মাংসের টুকরোটা চামড়া-সুদ্ধই পাত্রে দেওয়া হলো সেদ্ধ করতে।

টীক একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একদিনের বাচ্চা, তাই মারমটের চর্বি সহ্য হয় নি। তাকে সেদ্ধ মাংস খেতে দেওয়া হলো।

বন্দুকের জোড়গুলো খুলে তার সব অংশ জুরা আলাদা করে ফেললে। আগুনের তাপে বরফ-গলা ময়লা জলের স্রোত বেরোয় নল থেকে। ছড় দিয়ে ভেতরটা সাফ করতে গিয়েই জুরা চমকে উঠলো। ভেতরটা গুলিভরা রয়েছে। ভেজা বারুদ আর বুলেটটা শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে নলের সঙ্গে। সুতরাং ভেতর থেকে বারুদটা চেঁছে বের না করলেই নয়। বুলেটটা অবশ্য ওভাবে বেরোবে না। তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা। ধারালো একখানা হাড় নিয়ে জুরার কাজ শুরু হলো।

রাত ভোর হয়ে যায়। সারা রাত কেটেছে বারুদ চাঁছার কাজে। সকাল বেলায় বন্দুকের অংশগুলো সব জোড়া দিয়ে জুরা এল গুহার বাইরে। পেছনে কুচাক। গাঁ থেকে যে বারুদ তারা এনেছিল, সেই বারুদ ভরা হলো বন্দুকে। পলতেয় আগুনও দেওয়া হলো। সবই এখন নির্ভর করছে বন্দুকটার ওপর। পুরনো বুলেটটা বেরিয়ে যাবে, না ফাটিয়ে ফেলবে নলটা—তারই ওপর নির্ভর করছে শিকারের ভবিষ্যত আর সারা গাঁয়ের ভাগ্য।

ছোট এক টিলার কাছে একটা মারমট বসে আছে। তাকে তাক করে দুরুদুরু বুকে জুরা ট্রিগার টিপলো। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটলো বারুদে। কিন্তু নাঃ, বন্দুক থেকে গুলি বেরলো না।

কি করা? জুরার মাথায় চিন্তার ঝড় চলেছে। নাঃ, ভাগ্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বন্দুকে আবার তারা কিছু বারুদ ভরলে। আবার গর্জে উঠলো বন্দুক।

আর তার পরেই জুরার মুখ ঝলসে দিয়ে বন্দুক থেকে সশব্দে বেরিয়ে গেল গুলিটা!

কুচাক ছুটলো মারমটকে লক্ষ্য করে।

ঝলসানিতে জুরার ডান গাল এত ফুলে উঠেছে যে, ডান চোখটা মেলা কঠিন। কিন্তু বন্দুকটা অক্ষত আছে।

একটু পরেই কুচাকের সোল্লাস চিৎকার শোনা গেল,—হে' হে', সোজা মাথায় লেগেছে!

এত দিন পরে এত কষ্ট ও কৃচ্ছ্র-সাধনের পর জুরার মুখে আজ প্রথম হাসি ফুটলো।

মারমটের রক্তমাখা দেহটা শূন্যে নাচাতে নাচাতে কুচাক তখন গান ধরেছে, গোটা গানটাই অবশ্যি তার স্বরচিত :

হো-হো-হো! হো-হো-হো!
শিকারীর চেয়ে বড় কেউ নেই,
শিকারীর চেয়ে দোস্ত কেউ নেই—
আমাদের চেয়ে আছে কে সাহসী,
কে আছে নির্ভীক?
হো-হো-হো! হো-হো-হো—

গুহার ভেতরে আগুনের পাশে গিয়ে তারা বসলো। মন খুশিতে ভরপুর। ব্যাগ ও বস্তা থেকে বরফ গলছে। ব্যাগ থেকে প্রথম যে জিনিসটা তারা টেনে বের করলে, সেটা এক চামড়ার থলি—সাদা কি এক তরল পদার্থে ভরতি। দু-এক ফোঁটা মুখে দিয়ে বোঝা গেল, দুধ।

হুর্রে!—সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো জুরা,—টীক বেঁচে গেল!

বাচ্চাটাকে তুলে সে শূন্যে নাচাতে শুরু করে। কিন্তু বয়স দু দিন হলে কি হবে, এসব নাচানাচির ব্যাপার টীকের মোটেই পছন্দ নয়, গরগর করে আর খেঁউ খেঁউ করে সে বিরক্তি জানাতে থাকে।

কুচাক ততক্ষণে ছোরা দিয়ে চামড়ার বস্তাটা কেটে ফেলেছে। ভেতরকার জিনিস-গুলো আগুনের ধারে ঢালা হতেই দুজনে ভয়ানক চমকে উঠলো—এ কী!

ছোট-বড় বরফের টুকরোর মধ্যে হঠাৎ ঝলমল করে উঠলো মণি-মুক্তা ও অন্যান্য বহুমূল্য পাথর বসানো সোনার কাঁকন, কানপাশা প্রভৃতি হরেকরকমের জড়োয়া গয়না। সোনার মোহর সব গড়িয়ে চলেছে মেঝের ওপর দিয়ে। কুচাকের পায়ের কাছে পড়ে আছে পেটা সোনা ও রুপোর তৈরী নানা আকারের থালা ও কাপ আর এক হাত চওড়া সোনার প্লেট একখানা। প্লেটের ওপর কি যেন সব খোদাই করা।

নিদারুণ বিস্ময়ের চমকে কারো মুখে কথা নেই। তার পরেই কুচাক যেন হঠাৎ জেগে উঠলো একসময়। এত ধনদৌলতের আকস্মিক ধাক্কায় তার অবস্থা কাহিল—হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে জিনিসগুলোর ওপর। পরক্ষণে সেগুলো দুহাতে সাপ্টে ধরে সে ছুটে গেল গুহার এক কোণে। চোখে তার তাড়া-খাওয়া নেকড়ের মতো সন্ত্রস্ত দৃষ্টি, যেন এক্ষণি কেউ আক্রমণ করবে। ঝড়ের বেগে সে মেজে খুঁড়তে শুরু করে—জিনিসগুলো গর্তে লুকিয়ে রাখবে।

জুরা অনেক কষ্টে তার হাত থেকে একটা রুপোর কাপ ছিনিয়ে নিলে। জমে-যাওয়া দুধের কয়েকটা টুকরো সে গরম করে কাপের মধ্যে। তারপর টীককে কোলে নিয়ে তার নাকটা সে চেপে ধরলো দুধের মধ্যে। কিন্তু দুধে মুখ দিতে টীক রাজী নয়, গরগর করতে করতে বারবার পিছু হটে যায় সে। শেষে একসময় হঠাৎ ভিজে নাক ও ঠোঁট চাটতে গিয়ে কয়েক ফোঁটা দুধ জিভে লাগতেই শৈশবের সুপ্ত দুধের পিপাসা

তার জেগে উঠলো। চুক চুক করে খুদে লেজটা নাড়তে নাড়তে সাততাড়াতাড়ি সে খেয়ে নিলে দুধটা।

বড় একখণ্ড বরফের চাংড়া তখনো গলে নি। কুড়ুল দিয়ে সেটা ভেঙে ফেলতেই তার থেকে বের হলো একটা কাস্‌কেট আর গমের কেক কতকগুলো। কেকগুলো জমে পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে।

কাস্‌কেটের ডালা খুলে ফেললে কুচাক। ভেতরটা লাল মখমলে মোড়া। লাল রেশমী সুতোয় বাঁধা গোল করে পাকানো কিছু পার্চম্যান্ট পুঁথি রয়েছে সেখানে, আর আছে হাঁসের পালকের তিনটে কলম আর এক শিশি কালো কি এক তরল পদার্থ। আর সব ধনদৌলতের মতো কাস্‌কেটটাও কুচাক গর্তে লুকিয়ে রাখলো। জুরার প্রস্তাবমতো ওটা সর্দারকে দেওয়া ঠিক হয়।

দিন শেষ হয়।

দুজনে খেতে বসলো। নরম-করা কেক ও ঘোড়ার মাংস দিয়ে সত্যিকার ভোজ এত দিন পরে—বিশেষ করে সদা-ক্ষুধার্ত ভোজনরসিক কুচাকের কাছে। কিন্তু কোথায় কি! সোনার চিন্তায় কুচাকের খিদে মাত। মাথার মধ্যে তার দুশ্চিন্তা পাক খাচ্ছে অবিরাম ঃ ইস্, এত ধনদৌলত! কেউ কেড়ে নেবে না তো!

মাংসের খণ্ডগুলো কোন রকমে চিবিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলছে সে।

খাওয়া সেরে দুজনে শুয়ে পড়ে। আরামদায়ক উষ্ণ আগুনের ধার ছেড়ে কুচাক গিয়ে শুয়েছে ঠাণ্ডা গুহার কোণে লুকনো ধনদৌলতের গর্তের ওপর। কোথাও একটু পাতার ঝিরঝির-খসখস শব্দ হয়েছে কি, সে লাফিয়ে উঠছে, চোখ কুঁচকে বহুক্ষণ চেয়ে থাকছে অন্ধকারের দিকে। তার সবচেয়ে বেশী ভয় সেই অশরীরী পর্বত-মানবদের।

জুরা কিন্তু অঘোরে ঘুমোয় সাত রাত। পাহাড়ী লম্বোকর্ণ ইঁদুরগুলোর গুহাময় হুটোপুটি, উচ্ছিষ্ট খাবারের টুকরো নিয়ে হুটোপুটি, কিছুই তার কানে যায় না।

পর দিন টীকই জুরার ঘুম ভাঙালে। তুলতুলে কালো ক্ষুদেটা জুরার গায়ে নাক ঘসে খেতে চাইছে।

উষ্ণ রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। পাইন-বীথির রঙ আরো সবুজ হয়ে আসছে। শুভ্র তুষারের পটভূমিকায় চিরহরিৎ জুনিপার অরণ্যকে এখন আর কালো দেখায় না।

কোণের গর্তটার দিকে নজর পড়তে জুরা অবাক হলো। ওখানে কিছু অদলবদল ঘটেছে।

সোনাটা কোথায়?—সে জিজ্ঞেস করে কুচাককে।

সারা রাত কুচাকের অনিদ্রা গেছে। ক্লান্তিতে মাথা দোলাতে দোলাতে ক্লিষ্ট কণ্ঠে সে বললে,—সাবধানের মার নেই! অন্য জায়গায় সরিয়ে রেখেছি।

সোনার ব্যাপারে জুরার অবশ্য মাথাব্যথা নেই। কুচাককে টীকের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে সে শিকারে বেরিয়ে পড়লো। দৃপ্ত দৃঢ় আজ তার চলার ভঙ্গি। চারদিক-কার পাহাড়-পর্বত সতর্ক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে করতে দ্রুত পদক্ষেপে সে অগ্রসর হয়।

কুচাক এসে বসলো গুহার বাইরে। রোদ পোয়াতে পোয়াতে সে ফষ্টি-নষ্টি করতে থাকে টীককে নিয়ে। তাকে উত্যক্ত করাই তার মতলব। টীক শেষে না পেরে রেগে-মেগে ডাকতে শুরু করলো খেঁউ খেঁউ করে। আর হা-হা করে খোশমেজাজে হাসতে থাকে কুচাক। মাত্র তিন দিনের বাচ্চা! এখুনি এই যদি হয় তার চোটপাট, তাহলে বড় হয়ে সে যে দুশমনদের মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে দাঁড়াবে, তাতে সন্দেহ কি!

হঠাৎ দূর পর্বতশ্রেণী থেকে গুলির আওয়াজ এল। জুরা গুলি ছুঁড়ছে।

গুলির আওয়াজে কোথায় যেন হিমানী-সম্প্রপাত বা তুষার-পাহাড়ের ধস নামে। তার গর্জনে গিরি-রাজ্য কাঁপতে থাকে কয়েক সেকেন্ড ধরে। পরক্ষণে আবার শোনা গেল আরও একটা গুলির শব্দ।

আরো কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল জুরা। একটু পরেই দেখা গেল, গুনগুন করে গান করতে করতে ছাগলের চর্বি দিয়ে মেটুলির রোস্ট তৈরি করছে কুচাক।

প্রাচুর্যে ভরা পরিতৃপ্ত সুখের জীবন তাদের শুরু হলো। মাংস মজুত করার সময়ও এসে গেছে।

তৃতীয় পর্ব ৩

মাস দেড়েক কেটে গেছে তারপর। টীক দিনে দিনে বড় হচ্ছে। জুরার প্রতি ক্রমেই বাড়ছে তার দুরন্ত আকর্ষণ।

সেদিন ভোরবেলা জুরা শিকারে বেরোবে, টীক নাছোড়বান্দা—সঙ্গে যাবেই। বিরক্তির সঙ্গে জুরা কুচাককে বললে,—টীককে বেঁধে রাখ। দেখছো না, ও আমার পিছু পিছু ছুটতে চায়? কিন্তু বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে শিকারে যাওয়ার কোন মানে হয় না। উল্টে বরং ঝামেলাই বাড়ে।

সুতরাং কুচাক চামড়ার ফিতে দিয়ে টীককে বেঁধে ফেললে। ছাড়া পাওয়ার জন্যে টীকের সে কী ঝাঁপাঝাঁপি! জুরা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে টীক ছটফট করতে থাকে।

কুচাক মাংস রান্না করতে বসলো। টীকের দিকে তার নজর নেই।

লাফালাফি থামিয়ে টীক এবার ক্ষণেক কি ভাবলো। আড়চোখে দু-একবার তাকালো কুচাকের দিকে। তার পরেই দাঁত দিয়ে নিঃশব্দে কাটতে শুরু করলো চামড়ার ফিতেটা। কয়েক মুহূর্ত মাত্র—ব্যস্ তার পরেই মুক্ত সে। ছুট দিলে গুহার বাইরে।

চমকে উঠে কুচাকও দৌড়লো তার পেছনে। টীক ছুটছে জুরার নাগাল পাওয়ার জন্যে। আর পেছনে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে কুচাক—টীক, টীক! ফিরে আয়, ফিরে আয়!

কিন্তু কে শোনে কার কথা! অন্ততঃ টীক সে বান্দা নয়। মুক্তির আনন্দে কুচাককে বহু পেছনে ফেলে টিলা ঢিবি গর্ত পার হয়ে সে তখন ছুটে চলেছে তীরবেগে।

কুচাকের গলা যতক্ষণ কানে যায়, ততক্ষণ সে ছুটতে থাকে বেপরোয়া। ধরা পড়ার ভয়ে জুরার চলার পথ খোঁজার চেষ্টাও তার নেই। তারপর সে গতি কমিয়ে দিলে। কুচাকের গলা আর শোনা যাচ্ছে না।

বিচিত্র অজানা দেশ। উৎসুক চোখে টীক চারদিকে তাকায়। সামনে এদিকে ওদিকে গিরগিটির দল ঘুরছে। তাদের সে তাড়া করে। কিন্তু ধরতে পারে না একটাকেও। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার বিরক্তি ধরে যায়। শেষে এক টিলার মাথায় গিয়ে সে উঠলো।

হিমবাহ থেকে বাতাস এসে তার গায়ের লোম এলোমেলো করে দিচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডা লাগছে গায়ের দু পাশে। যে দিকেই সে ফেরে, হাজার হাজার রহস্যময় শব্দ আর মর্মরধ্বনি কানে আসে। হঠাৎ অদূরবর্তী শৈলশ্রেণীতে কিসের এক গুম্‌গুম্ গর্জন শুরু হলো। উঁচু খাড়া পর্বতগুলো হিমানী-সম্প্রপাতে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

টিলা থেকে টীক নীচে লাফিয়ে পড়লো চিৎপাত হয়ে। তার পরেই খেঁউ খেঁউ আর্তনাদ! ধূলিশয্যা ছেড়ে খেঁউ খেঁউ করতে করতে সে দৌড়লো ঘরমুখো।

কিন্তু হঠাৎ ও কী! টীক থমকে দাঁড়ায়। এক মারমট তার সামনে। টীক ধেয়ে গেল তার দিকে। কিন্তু মারমট ততক্ষণে সুড়ুৎ করে গর্তে ঢুকে পড়েছে।

টীক আবার রওনা হয়। হঠাৎ হোঁচট খেল সে। তার পায়ের চাপে সাদা রঙের একটা নুড়ি গুঁড়ো হয়ে গেছে—কি একটা তরল পদার্থ বেরিয়ে এসেছে ভেতর থেকে। টীক গোঁ গোঁ করে উঠলো। ঘাড়ের লোম তার খাড়া হয়ে উঠেছে। নুড়িটা শুঁকে, একবার সে জিভ লাগালো তরল জিনিসটায়। বাঃ, বেশ সুস্বাদু উপাদেয় তো! জিনিসটা সে চেটেপুটে খেয়ে ফেললে। জিনিসটা আর কিছুই নয়, এক পাহাড়ী তিতিরের ডিম। তিতিরের এক বাসার ওপর সে এসে পড়েছে। হঠাৎ আর একটা ডিম তার পায়ের চাপে ভেঙে গেল। সেটাও সে খেয়ে ফেললে। এর পর আর কথা নেই। বাকিগুলো সে খুঁজে বের করে দাঁত দিয়ে গুঁড়িয়ে খেল কড়মড় করে। এইভাবে প্রথম ডিমের আস্বাদ পেল টীক।

আবার সে ছুটলো বাড়িমুখো। কিন্তু তিতিরের বাসার গন্ধ এতই তীব্র যে, সহজে মনে থাকে। কিছু দূরে যেতেই আবার সেই গন্ধ নাকে আসে। এবার টীক সোজা এগিয়ে গেল তিতিরের বাসা লক্ষ্য করে।

হঠাৎ বাসা থেকে একটা তিতির বেরিয়ে এল, উড়ে গিয়ে বসলো টীকের খুব কাছেই। টীক তাড়া করতেই সে উড়ে গেল। কিন্তু আর বসলো না। পাক দিয়ে সে উড়তে শুরু করলো টীকের মাথার ওপর। টীককে জ্বালাতন করাই যেন তার মতলব। এটা যে তার এক ফন্দি, টীক তা বুঝতে পারে না। অনভিজ্ঞ বাচ্চার পক্ষে বোঝা সম্ভবও নয়। এমনি করে টীককে সে একটু একটু করে বাসা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

পাখির পেছনে ছুটে ছুটে টীকের ক্লান্তি ধরে গেল একসময়। শুয়ে পড়লো সে বিশ্রামের জন্যে।

কাছেই আশেপাশে গিরগিটির দল ছুটোছুটি করছে। সেদিকে নজর পড়তেই টীক আবার উঠে বসলো। থাবা দিয়ে ধরে ফেললে একটাকে। কিন্তু থাবা তুলতেই সেটা হাওয়া। আবার সে ধরলো আর একটাকে। দু-একবার শুঁকে চিবিয়ে খেয়ে ফেললে তাকে। খেতে মন্দ লাগে না।

কাছেই ঘুরছে তৃতীয় আর একটা গিরগিটি—আকারে অনেক বড়, পিঠ জুড়ে ঘাড় থেকে নীচে পর্যন্ত মোটা মোটা ডোরা। কিন্তু অনভিজ্ঞ টীকের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। গিরগিটিটাকে সে ধরে ফেললে থাবা দিয়ে। আর তার পরেই—

গিরগিটিটায় সে কামড় বসাতে যাবে, হঠাৎ ধা করে সে টীকের নাকে ছোবল বসিয়ে দিলে। তীক্ষ্ন করুণ কণ্ঠে গোঙিয়ে উঠলো টীক। আর্তনাদ করতে করতে ছুটলো জঙ্গল লক্ষ্য করে।

দেখতে দেখতে টীকের নাক ফুলে উঠলো। নাকে যন্ত্রণাও তেমনি। খানিকটা ঘাস সে খেয়ে ফেললে তাড়াতাড়ি। কেন খেল, সে জানে না। সহজাত এক জান্তব সংস্কার বুঝি ভেতর থেকে তাকে তাড়া দিয়ে এই বস্তুটি খেতে বাধ্য করলো।

দেখতে দেখতে তার চোখ ফুলে ওঠে, ঘ্রাণশক্তিও লোপ পায়। অথচ ঘর তাকে ডাকছে। বাতাস শোঁকে সে। কিন্তু কোথায় পাবে ঘরের গন্ধ? অন্ধের মতো সে ছুটে চলে সামনে সোজা পর্বতশ্রেণীর দিকে—বাড়ি থেকে আরো আরো দূরে।

রাত্রি নামে এক সময়। এক টিলার পাশে শুয়ে পড়লো টীক। হঠাৎ খুব কাছে কোথায় যেন ডেকে উঠলো নেকড়ের পাল।

টীকের ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে, লেজ পেটের নীচে সেঁধিয়ে যায়, আর কান চলে যায় পেছনে। সে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো।

ডাকতে ডাকতে নেকড়ের পাল ক্রমেই এগিয়ে আসছে। ভয়ে শঙ্কায় টীক আবার ছুটতে শুরু করে। পালায় সে দূর থেকে আরো দূরে।

চাঁদ ওঠে। ছুটতে ছুটতে টীক এক ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লো। আর ঠিক তখুনি হঠাৎ তার ঠিক পাশেই এসে দাঁড়ালো আর এক নতুন দুশমন।

সঙ্গে সঙ্গে টীকের ঘাড়ের লোম আবার খাড়া হয়ে উঠলো। খেঁউ খেঁউ করে সে তেড়ে গেল দুশমনের দিকে। কিন্তু দুশমনটিও তেমনি—ছিটকে সরে গেল এক পাশে। আবার ধেয়ে গেল টীক। কিন্তু আবারও সেই অবস্থা।

এমনি করে টীকের ছুটোছুটিই শুধু সার হয়। বেতমীজ দুশমনের নাগাল সে পায় না। কি করেই বা পাবে? অনভিজ্ঞ শিশু টীক তো আর জানে না যে, নিজের ছায়াই যেখানে দুশমনি করে, সেখানে লড়াইটা এইরকমই হয়।

এমনিভাবে টীক ছায়া দুশমনের বিরুদ্ধে বারবার ধেয়ে যায়, ছুটে যায়, তেড়ে যায়। ওকে ধরার জন্যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরতে থাকে বনবন করে।

শ্রান্তক্লান্ত টীক শেষপর্যন্ত শুয়ে পড়লো। আর অমনি কী তাজ্জব কাণ্ড! দুশমনও শুয়ে পড়লো তার পাশে।

কী আপদ! পাশে এ জাতীয় এক অপরিচিত নচ্ছারকে নিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকা যায় কখনো! বিপন্ন টীক আড়চোখে তাকাল নাছোড়বান্দা সঙ্গীর দিকে। শেষকালে কিনা এমনই এক সঙ্গী তার জুটলো, যার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই। চাঁদের দিকে মুখ তুলে মনের দুঃখে আর্ত কণ্ঠে ককিয়ে উঠলো সে।

ধীরে ধীরে ভোর হয়। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত টীক—গুহা থেকে তখন বহু দূরে। সারা রাতের কনকনে ঠাণ্ডায় তখনো সে কাঁপছে। সূর্য উঠলো। উষ্ণ রোদে গা গরম করে আবার সে ছুটলো জুরা ও কুচাকের খোঁজে। ক্ষুধা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

সামনে কত গিরগিটি পড়ে। কিন্তু আর কি টীক সেদিকে মাড়ায়? ওদের সম্বন্ধে সে এখন ভীষণ সতর্ক। যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলছে।

সারা দিন কেটে যায়। টিলা ঢিবি গর্ত পার হয়ে টীকের ছোটার বিরাম নেই। হঠাৎ সামনে এক উঁচু টিলা পড়তেই, কি এক আকর্ষণে সে তার মাথায় উঠে গেল। এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখে, অদূরে একটা মরা ছাগলকে ঘিরে একপাল শেয়াল জড়ো হয়েছে। তাকে দেখেই শেয়ালের পাল দৌড়ে পালালো। কিন্তু পরক্ষণে ফিরে এল রাগে দাঁত খিঁচিয়ে খ্যাক খ্যাক করতে করতে।

মাথা নামিয়ে শুয়ে পড়ে ক্ষুধার্ত টীক করুণ কণ্ঠে ডেকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো শেয়ালের পাল। এরা যে দুশমন, টীক বুঝতে পারে। দাঁত খিঁচিয়ে গোঁ গোঁ করতে করতে পিছু হটে যায়।

শেয়ালের পালের ভোজ চলেছে ছাগলটাকে ঘিরে, এমন সময় হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলো প্রকাণ্ড এক প্যান্থার। চোখের পলকে শেয়ালের পাল ছত্রভঙ্গ। প্যান্থা-রের গায়ের চামড়া নীলাভ, ছিটছিট ফুটকি দেওয়া—টীকের কাছে যেন পরিচিত মনে হয়। তবু কি এক অজানা শঙ্কায় মাটির সঙ্গে লেপ্‌টে পড়ে থাকে সে।

প্যান্থারের তখন ভরপেট। মরা ছাগলটাকে সে শুঁকছে। এমন সময় টীক হঠাৎ

হেঁচে উঠলো। ভয়ে লাফিয়ে উঠলো প্যান্থার। তার পরেই বিদ্যুৎ-বেগে সে অদৃশ্য হয়ে গেল টিলা-ঢিবির ওপর দিয়ে।

টীক এবার উঠে বসে। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে অপেক্ষাও করে একটু। তারপর দৌড়ে যায় ছাগলটার দিকে। যে মাংসটুকু তখনো অবশিষ্ট আছে, তাই সে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে গবগর করতে করতে।

কিন্তু হঠাৎ—ও কী! সে চমকে উঠলো। ছাগল ছেড়ে সভয়ে পিছু হটে গেল। একটা ছায়া নামছে ওপর থেকে। পরক্ষণে কাছেই এক টিলার ওপর নেমে এল প্রকাণ্ড এক শকুন। চোরের মতো সন্তর্পণে সে তাকাচ্ছে চারদিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আরো তিনটে হাজির হলো সেখানে।

টীক ক্ষুধার্ত নিরুপায়—পিছু হটার পথ নেই। তাহলে খাবে কি? সে তেড়ে গেল আগন্তুকদের দিকে। কিন্তু পরক্ষণে ডানার এক জোরালো ঘা খেয়ে ছিটকে গড়িয়ে পড়লো ঢাল বেয়ে। গড়াতে গড়াতে সে নীচে গিয়ে পড়লো এক ঝরনার জলে। ঝরনা থেকে ধোঁয়া উঠছে। জল বেশ গরম। টীক একটা টিলার ওপর উঠে এল। গায়ের ভিজে লোম চাটতে চাটতে সে ডেকে উঠলো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

সন্ধ্যার যবনিকা নামছে ধীরে ধীরে। চাঁদ ওঠে এক সময়। আলোর বন্যা নামে পাহাড়ে পর্বতে, খাদে কন্দরে আর দুরন্ত নদ-নদীর বুকে। নির্জন প্রকৃতির বুকে শুরু হয় আলো-ছায়ার খেলা। রহস্যময় হয়ে ওঠে বিজন পর্বত-রাজ্য।

নিঃসংগ টীক পথহারা। ঘরের নিশানা হারিয়ে গেছে তার। এক টিলার মাথায় বসে কান্নাভেজা গলায় ডেকে উঠলো সে.....

তৃতীয় পর্ব ৪

জুরা শিকার থেকে ফিরে এল। ভয়ে কুচাকের অবস্থা আধমরা। জুরাকে দেখেই সে গোঙিয়ে উঠলো,—আমার কিন্তু কোন দোষ নেই! করতে আমি কিছুই বাকি রাখিনি।

জুরা অবাক। বললে,—কেন, কি হয়েছে? টীক কোথায়? আজ তো সে ছুটে যায় নি আমায় দেখে!

হাত কচলাতে কচলাতে কুচাক হায়-হায় করে উঠলো,—তাই তো বলছি! তাই তো বলছি! কী যে বিপদ গেছে বলার নয়। অথচ আমার কোন দোষই নেই।

জুরার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। সে গর্জে উঠলো,—কথার ঠিকমত জবাব দেবে কিনা? টীক কোথায়?

বলছি! বলছি!—হাউমাউ করে উঠলো কুচাক।

তারপর সে যা বিবরণ দিল, তা হলো ঃ কড়াইটার পাশে সে বসে ছিল, এমন সময় আচম্বিতে এক সাংঘাতিক কাণ্ড! কোথা থেকে হঠাৎ একটা ড্রাগন উড়ে এল। এসেই ছোঁ মারলে টীকের ওপর। কুচাক কিন্তু চুপ করে বসে থাকে নি। ধাঁ করে ছোরা বের করে সে প্যান্থারের মতো তড়াং করে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। কিন্তু ড্রাগনটা হাঁ করে মুখ থেকে তার ওপর আগুন ঢেলে দিলে। সে চিং হয়ে পড়ে গেল আর টীককে নিয়ে উধাও হয়ে গেল ড্রাগনটা।

খবর শুনে জুরা স্তব্ধ। ক্ষোভে দুঃখে যেন পাথর হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে সে বেরিয়ে পড়লো পর্বতশ্রেণীর দিকে।

কিন্তু বৃথাই অন্বেষণ—টীক নেই। টীক হারিয়ে গেছে।

টীক অদৃশ্য হওয়ার পর দশ দিন কেটে গেছে। কুচাকের সঙ্গে জুরা এ পর্যন্ত একটাও কথা বলে নি। এগারো দিনের দিন সকালে হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা, টীক কি লড়াই করেছিল?

জুরা আবার কথা বলছে তার সঙ্গে! কুচাক খুশিতে ফেটে পড়লো,—লড়াই? ওরেব্‌বাবা! সে কি লড়াই! টীক লড়াই করেছিল বাঘের মতো। ঘটনাটা তাহলে বলি শোন্—

বলতে বলতে কড়াইয়ের পাশটায় কুচাক বেশ আরাম করে জাঁকিয়ে বসলো......

আর তারপর সেই দিন থেকে শুরু হলো কুচাকের গল্পের কসরৎ......

প্রতি সন্ধ্যায় জুরা শিকার থেকে ফিরে আগুনের পাশে বসতেই শুরু হয় তার গল্প, ড্রাগনের সঙ্গে টীকের লড়াইয়ের বর্ণনা ঃ টীক কেমন করে ড্রাগনের পাঁচটা মাথা কামড়ে ছিঁড়ে নিয়েছিল, এমন সময় আরো একটা ড্রাগন উড়ে এল......

যত দিন যায়, ড্রাগনের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে। মাস শেষ হতে হতে কুচাকের ঘোষণা মতো ড্রাগনের সংখ্যা দশটায় গিয়ে দাঁড়ালো, দ্বিতীয় মাস শেষ হতে না হতে তাদের সংখ্যা এসে ঠেকলো কুড়িটায়, আর কুচাক স্পষ্ট জানিয়ে দিলে যে, গোটা দল-টার সঙ্গেই টীক সমানে লড়াই করেছিল।

সেদিন জুরা খালি হাতে শিকার থেকে ফিরে এল। রাগে খানিকক্ষণ বসে রইল গুম মেরে। শেষে কথা বললে সে, রাগে গলা কাঁপছে, কুচাককে বললে,—শোন হত-ভাগা খাটাশ, দু-দুটো জখমী ছাগল আজ পর্বতে পালিয়ে গেছে। কেন যেতে পারলো জান? কারণ সঙ্গে কুকুর ছিল না। ড্রাগন যে টীককে নিয়ে যেতে পেরেছে, তার জন্যে তুমিই দায়ী। বুঝতে পারছো? শিকারের কাজে তোমার কাছ থেকে কোন সাহায্যই পাই নে। তোমার একমাত্র কাজ খাওয়া আর ঘুমনো। মাংস শুকানো মরদের কাজ নয়। সুতরাং আজ থেকে তোমাকে নিজের খাওয়ার মাংস নিজেই জোগাড় করে নিতে হবে। শুঁটকী মাংসে হাত দিয়েছ কি, সেই মাংসটুকু তোমার গা থেকে আমি ছাড়িয়ে নেব। বুঝলে?

না বোঝার মতো কথা নয়। নির্জীবের মতো কুচাক ঘাড় নাড়ে। পর দিন থেকে শুরু হলো তার খাবার জোগাড়ের কাজ। বিষম নাচার অবস্থা!

সেদিন সন্ধ্যায় শিকার থেকে ফিরে জুরা শোনে, কোথায় যেন একটা ছাগলছানা ম্যা-ম্যা করে ডাকছে। বন্দুকটা ঠিক করে সে বেরিয়ে পড়লো সন্তর্পণে। ডাকটা আসছে ছোট নদীটার কাছ থেকে। গুঁড়ি মেরে সে এগিয়ে যায়।

বড় এক পাথরের চাংড়ার পেছনে ডাকছে বাচ্চাটা। চাংড়াটা টপকে ওপাশে গিয়ে পড়তেই জুরা অবাক ঃ কি কাণ্ড! মাটিতে বসে ছোট এক বাঁশির সাহায্যে ছাগল-ছানার মতো ম্যা-ম্যা করে ডাকছে আর কেউ নয়—কুচাক স্বয়ং।

জুরার পায়ের শব্দ হতেই চমকে লাফিয়ে উঠলো কুচাক, বাঁশিটা পড়ে গেল হাত থেকে। জুরা তুলে নিলে বাঁশিটা। পাহাড়ী টার্কি মোরগের হাড় দিয়ে সেটা তৈরী। ফুঁ দিতেই ছাগলছানার ম্যা-ম্যা আওয়াজ বেরিয়ে এল তা থেকে।

ব্যাপারটা মন্দ নয়!

জুরা বললে,—বেশ বানিয়েছ কিন্তু বাঁশিটা। ছাগীরা ছোট বাচ্চাদের ভারী ভালবাসে। নিজের বাচ্চা সঙ্গে থাকলেও, অন্য কোন বাচ্চার ডাক কানে এলে, তা সে যত অপরিচিতই হোক, সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না, ছুটে যাবেই। বেশ, বেশ। চালিয়ে যাও ঠিকমতো।

এর পর থেকে সান্ধ্য মজলিশ আবার জমে ওঠে, আবার শুরু হয় কুচাকের গল্প ও রূপকথা। কখনো সে বলে মহাবীর ইন-মানাসের কাহিনী, কখনো বা ড্রাগনের সঙ্গে টীকের লোমহর্ষক লড়াইয়ের গল্প......

সময় গড়িয়ে চলে। গ্রীষ্মের তাপে বরফ গলে, নতুন নতুন তৃণভূমি দেখা দেয়।

ছাগলছানারা বড় হচ্ছে, আর তাই ছাগলের পাল ক্রমেই উঠে যাচ্ছে পর্বতের ওপর দিকে—উঁচু থেকে আরো উঁচুতে।

কুচাক রোজই শিকারে বেরোয়। কিন্তু জোয়ান ছাগল আর ধরতে পারছে না।

জুরা পরামর্শ দেয়,—আরো দূরে যাও। তাহলে হয়তো কিছু মিলতে পারে।

সেইমতো দূরের এক জঙ্গলে গিয়ে কুচাক সেদিন এক ছাগী আর একটা বাচ্চা শিকার করে আনলে। এর ফলে তার উৎসাহ বেড়ে গেল বহুগুণ, ফাঁদ নিয়ে পরদিন সে গেল আরো দূরে। ফাঁদগুলো বড় এক পাথর-ঢিবির সঙ্গে আটকে এক জুনিপার গাছের পেছনে গিয়ে সে গা ঢাকা দিলে। গাছটার গুঁড়িতে মস্ত এক ফোকর, ফোকরটা ভাঙা। এবার শুরু হলো কুচাকের কসরৎ—ছাগলছানার সেই ম্যা-ম্যা ডাক।

বহুক্ষণ কেটে যায়। কুচাকের বাঁশির যেমন বিরাম নেই, তেমনি কোন ছাগলেরও পাত্তা নেই। প্রচণ্ড রোদে সব যেন ঝলসে যাচ্ছে। ক্লান্ত কুচাক—খানিকটা ঠাণ্ডা মাংস খেয়ে ঝরনা থেকে জল খেয়ে এল। তারপর একটু জিরিয়ে নিয়ে জুনিপার গাছের আড়ালে গিয়ে আবার শুরু করলো তার বংশী-বাদন।

একটু পরেই জঙ্গল থেকে এল এক খসখস আওয়াজ। মহোৎসাহে আরো জোরে বাজাতে শুরু করলো কুচাকের বাঁশি।

খসখস-খড়মড়! খড়মড়-খসখস!—আওয়াজটা আরো কাছে এগিয়ে এসেছে, ঢিবিগুলোর মাঝ থেকে আসছে বোঝা যায়।

নির্ঘাত মা-ছাগী আসছে!—কুচাক বিষম পুলকিত। সঙ্গে সঙ্গে আরো তীক্ষ্ণ করুণ কণ্ঠে ম্যা-ম্যা করে ডেকে উঠলো ছাগলছানা।

খড়মড় আওয়াজ এবার এল খুব কাছ থেকেই। আর পরক্ষণে কুচাকের ঠিক সামনে এক ঢিবির পেছন থেকে হঠাৎ উঁকি মারলো মস্ত এক ভালুকের মাথা!

নাক উঁচিয়ে ভালুকটা বাতাস শুঁকছে। সে-ও খোঁজ করছে কচি ছাগলের। চোখের পলকে ফাঁকা মাঠে লাফিয়ে পড়লো সে।

কুচাক ততক্ষণে আর মাটিতে নেই। জুনিপার গাছ বেয়ে তড়বড় করে ওপরে উঠছে। কোথায় পড়ে গেছে বাঁশিটা! দু হাত ছড়ে গেছে। হাঁসফাঁস করতে করতে জানের তাড়নায় সে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে গুঁড়ি বেয়ে উঠছে ওপর দিক। ভালুকটাও ততক্ষণে গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছাগলছানা না পেয়ে সে বিষম চটে গেছে। তার সঙ্গে চালাকি? বিষম গর্জন করতে করতে থাবা দিয়ে সে তখন কুচাককে ধরার চেষ্টায় ব্যস্ত।

একটা ডালের ওপর উঠে বিস্ফারিত চোখে কুচাক তাকালে নীচের দিকে। ওরেব্বাবা! একটা নয়, দুটো—দু-দুটো ভালুক গাছতলায় দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে তার

দিকে চেয়ে আছে। লোভে জ্বলজ্বল করছে দু জোড়া চোখ। কুচাক আরো ওপরে উঠে যায়।

হঠাৎ বড় ভাল্লুকটা এগিয়ে এসে আচমকা জোরে ঝাঁকুনি মারতে শুরু করলো গাছটায়। আর একটু হলেই ডাল থেকে হাত ফস্‌কে গেছলো আর কি!

গাছটাকে ঘিরে সন্ধ্যা পর্যন্ত চললো ভাল্লুক দুটোর তর্জনগর্জন আর লম্ফঝম্প। তারপর চলে গেল তারা। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কুচাক এবার নামতে শুরু করে। হঠাৎ তার নজর যায় প্রকাণ্ড এক ঢিবির দিকে। ঢিবিটার আড়াল থেকে একটা চোখ উঁকিঝুঁকি মারছে।

ওরে বাবারে! হারামজাদারা যায় নি! ওৎ পেতে আছে!—হাউমাউ করতে করতে টেনে হিঁচড়ে কুচাক উঠে গেল আরো ওপরে।

ভাল্লুক বুঝতে পারে, কুচাক তাকে দেখে ফেলেছে। রাগে গর্জন করতে করতে পেছনের দু পায়ে ভর দিয়ে সে ধেয়ে এল গাছটার দিকে।

হাতের কাছেই ছিল শুকনো একখানা ডাল। কুচাক সেটা ছুঁড়ে মারলে ভাল্লুকটাকে লক্ষ্য করে। ডালখানা তার চোখে গিয়ে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে রাগে যেন পাগল হয়ে উঠলো ভাল্লুকটা। গাছের গুঁড়িটা সে জাপটে ধরলো থাবা দিয়ে। আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে কুচাক দেখে, ভাল্লুকটা ওপরে উঠছে।

গাছ কাঁপছে থরথর করে। ভাল্লুক ক্রমেই ওপরে উঠে আসছে।

এইবার খতম!—চোখ বুজে কুচাক চার হাত-পায়ে সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরে ডালখানা।

এমন সময় হঠাৎ এক বন্দুকের গর্জন! জোরে কেঁপে উঠলো গাছটা। তার পরেই শোনা গেল জুরার পরিহাসতরল কণ্ঠ,—কি হে কত্তা, কি ব্যাপার? ভাল্লুক ধরার নতুন কসরৎ বের করেছ নাকি?

কুচাক চোখ মেললে। ভাল্লুকটা নীচে পড়ে আছে, মরণ-যন্ত্রণায় মাটি আঁচড়াচ্ছে থাবা দিয়ে। অন্য ভাল্লুকটার পাত্তা নেই। সে আগেই সরে পড়েছে।

তৃতীয় পর্ব ৫

গুহায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েক ডজন শুঁটকী মাংস জমেছে। কিন্তু গাঁ থেকে এখনো কেউ আসে নি তা নিয়ে যেতে।

জুরা বুড়ো ছাগল মেরে আনলে কুচাকের এখন গোসা হয়, জোয়ান ছাগল ছাড়া আর কিছু মুখে রোচে না। বলে, পুষ্ট জোয়ান ছাগলের মাংস যেমন নরম, সরসও তেমনি।

জুরাকে তাই কিছুকাল ধরে যেতে হচ্ছে দূর-দূর পর্বতশ্রেণীর দিকে।

এবারও সে তেমনি রওনা হয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে পার্বত্য হ্রদ 'ম্যাম'-এর তীরে যখন সে এসে পৌঁছলো, তখন সন্ধ্যা নেমেছে। এক জুনিপার জঙ্গলের ধারে রাত কাটিয়ে পরদিন সূর্যোদয়ের অনেক আগেই কিছু শুঁটকী মাংস খেয়ে সে শিকারে বেরিয়ে পড়লো।

পর্বতে ঘেরা ম্যাম হ্রদ টলটল করছে—কাকচক্ষুর মতো নির্মল স্বচ্ছ জল। রাজ-

হাঁস, পাতিহাঁস প্রভৃতি নানা জলচর পাখির আনন্দ-কলরবে মুখরিত। সবুজের জোয়ার নেমেছে যেন চারদিকে। এক ধারে স্তব্ধ জুনিপার অরণ্যের সবুজ শোভা। অন্য দিকে পর্বতের ঢালুতে ঢালুতে শ্যাম দুর্বাদলেব কোমল গালিচা বিছানো। প্রত্যূষের নিস্পন্দ গিরিরাজ্যে প্রকৃতির নিঃসীম প্রশান্তি বিরাজমান।

হ্রদের তীর ধরে নিঃশব্দে এগোয় জুরা। কিছুদূর যেতেই ভোরের কুয়াশার ভেতর দিয়ে দেখে—সামনে পর্বত-ঢালে সবুজ ঘাসের জমি থাকে থাকে ওপর থেকে নীচে হ্রদের ধার পর্যন্ত নেমে এসেছে, আর বহু ছাগল চরছে সেখানে।

একটা টিলায় বসে জুরা বন্দুক নিয়ে তৈরী হলো। সঙ্গে আছে আর কয়েকটা মাত্র বুলেট আর অল্প কিছু বারুদ। তাই অল্প খরচে বেশী লাভ করাই এখন তার মতলব। কাছেই দুটো জোয়ান ছাগল চরছে। চরতে চরতে একসময় তারা একটার পেছনে আরেকটা এসে দাঁড়াতেই, জুরা গুলি ছুঁড়লো। দুটো ছাগলই ঘায়েল হলো এক বুলেটে।

নেকড়ে বা শেয়াল যাতে ছাগল দুটোর নাগাল না পায়, তার ব্যবস্থা করে জুরা আবার রওনা হলো। ছাগলের পাল ইতিমধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়েছে। ভীতত্রস্ত পাতিহাঁস ও রাজহাঁসের ঝাঁক ডাকতে ডাকতে উড়ে গেছে হ্রদের বুক থেকে।

পর্বতের ঢাল বেয়ে জুরা ক্রমেই ওপরে উঠছে। হঠাৎ দেখে, ঠিক তার সামনে পর্বতের এক খাড়া কিনারায় একটা পাহাড়ী ভেড়া দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে পাহাড়ী ভেড়ার দেখা মিলছে কদাচিৎ। সুতরাং নিশানা ঠিক কবে জুরা আবার বন্দুক ছুঁড়লো।

কিন্তু ভেড়াটা ঘায়েল হলো না, বুলেটে জখম হলো শুধু। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পর্বত বেয়ে সে ছুটলো ওপর দিকে। জুরাও দৌড়লো তার পেছনে।

কিন্তু দু পা যেতে না যেতেই সে হতভম্ব।

এক পাথরের ঢিবির পেছন থেকে আচম্বিতে প্রকান্ড এক কালো নেকড়ে লাফিয়ে পড়ে ধাওয়া করেছে ভেড়াটার পেছনে।

কালো নেকড়ে! জুরা চমৎকৃত, চোখে তার নিদারুণ বিস্ময়। নেকড়ে কালো হয় কখনো? সে চেঁচিয়ে উঠলো,—কক্‌খনো না! নির্ঘাত ও কুকুর!

কালো 'নেকড়ে' ততক্ষণে ভেড়াটার পালানোর পথ আটকে ফেলেছে, আর—আর—তাজ্জব কান্ড—ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে ডাকতে কুকুরেব মতো ঘুরছে তাকে বেড় দিয়ে।

ডাক শুনে জুরার আর সন্দেহ থাকে না। চকিতে তার মনে ঝিলিক খেলে যায়ঃ টীক নয় তো!

কিন্তু পরক্ষণে এই উদ্ভট অসম্ভব কল্পনায় নিজের উপরই রাগ হয় তার। কুচাক না একাধিকবার জোর দিয়ে বলেছে সেই ঘটনাটাঃ কিভাবে ড্রাগন এসে টীককে ধরে নিয়ে গেছে!

তবু জোরে ছুটতে থাকে জুরা। হঠাৎ কুকুরটাব কপালে নজর পড়তেই বিস্ময়ের ধাক্কায় তার পা যেন সেঁটে গেল মাটিব সঙ্গে। টিপ! সাদা বড় একটা টিপ ওর কপালে! পরক্ষণে হাসিতে তাব চোখমুখ ঝলমল করে উঠলো। সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো সে,—টীক! ও আলবৎ টীক! টীক না হয়ে যায় না!

উচ্ছ্বসিত আনন্দে 'টীক! টীক!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে তীরবেগে ছুটলো সে সামনের দিকে। টীক ইতিমধ্যে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতাব সঙ্গে আহত ভেড়াটার পা কামড়ে ধরে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে। জুরা ছুটে গিয়ে ভেড়ার শিং দুটো আঁকড়ে তার মাথাটা সজোরে পাথরের ওপর চেপে ধরে কণ্ঠনালিটা কেটে ফেললে।

এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপে টীক কিন্তু রাগে গজরাচ্ছে। দুরন্ত লোভে ভেড়ার খোঁড়া পা থেকে কয়েক দলা মাংস সে কামড়ে ছিঁড়ে নিলে, আস্ত গিলে ফেললে না চিবিয়েই।

জুরা ততক্ষণে চামড়ার ফিতে ঠিক করে ফেলেছে। 'খা টীক, খা!' বলতে বলতে নত হয়ে সে সন্তর্পণে টীকের গলায় ফিতেটা বেঁধে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে টীকের ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে উঠলো। খেতে খেতেই সে গোঁ গোঁ করতে থাকে। কিন্তু খাওয়া বন্ধ করে না মুহূর্তের জন্যও......

হারানো টীক শেষ পর্যন্ত ফিরে এল।

জুরার খুশির অন্ত নেই। তেমনি খুশী কুচাকও। টীকের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলে,—বাব্বা, কী বড় হয়েছে! প্যান্থারের মতো প্রকাণ্ড জোয়ান কুকুর!

তিন মাস ছাড়া থেকে টীক বুনো হয়ে গেছে। দিনের পর দিন জুরাকে এর ফলে অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে হয়। শেষে আবার টীকে পোষ মানে।

অবশ্য এই তিন মাস ছাড়া থেকে টীকের উপকারও হয়েছে কম নয়। বেঁচে থাকার দুর্বার তাড়নায় নিজের একক চেষ্টার ওপরই তাকে নির্ভর করতে হয়েছে সর্বক্ষণ—যেমন শিকার ধরার কাজে, তেমনি দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। আর তার ফলে যেমন বেড়েছে তার ক্ষিপ্রতা, দক্ষতা ও সতর্ক তীক্ষ্ম দৃষ্টি, তেমনি বেড়েছে গায়ের জোর।

তবে সবার ওপরে যেটা সত্য, তা হলো—সে বাবুর ছেলে। যেমন মা তেমনি হয়েছে তার ছেলে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পর্ব ১

দিন গড়িয়ে চলে।

পায়ে পায়ে শীত এগিয়ে আসছে। শীত এলে শিকারের পালা খতম। খতম ফুর্তির দিনও।

বিষণ্ণ চোখে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে কুচাক বসে আছে, গুন্‌গুন্‌ করে গাইছে নিজেরই তৈরী একটা গান,—শীত আসে এগিয়ে ভবোয়াল টেনে নিয়ে পেছনে......

গাছ থেকে হলদে পাতা ঝরে পড়ছে, কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

সন্ধ্যার দিকে দুটো ছাগল নিয়ে জুরা গুহায় ফিরলো। ছাগল দেখলে কুচাকের এখন মেজাজ খিঁচড়ে যায়। জুরাকে সে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ছাগলের খসখসে মোটা মাংস তার গলা দিয়ে আর নামতে চাইছে না।

সেদিনও সে চটে উঠলো,—আবার ছাগল! তুই ভেবেছিস কি! কেন, উলার চোখে দেখিস না? পাহাড়ী ঐ মোরগগুলো এখন কত মোটা হয়েছে, চর্বিতে ভরতি। মাংস যেমন নরম, তেমনি রসালো। কত দিন থেকে তোকে পই পই করে বলছি, উলার নে আয়, উলার নে আয়, উলারের মাংস খেলে বসন্ত রোগের ভয় থাকে না! সে কথা কানে যাচ্ছে না বুঝি অ্যাঁ?

জুরা আগুনের পাশে বসে পড়ে। কোন উচ্চবাচ্য করে না।

জুরার ভাবগতিক দেখে কুচাক আরও চটে যায়, খেঁকিয়ে ওঠে,—বটে! আচ্ছা তাহলে শুনে রাখ্‌, এবার উলার না আনলে রূপকথার ভাঁড়ারে কুলুপ আঁটা থাকবে।

এবারও জুরা জবাব দেয় না। ছুরি দিয়ে একটা ছাগলের মেটুলি নীরবে কেটে বের করে। টীক পাশে বসে আছে। জিভ দিয়ে বারবার চোয়াল চাটছে।

মেটুলিটা হাতে নিয়ে জুরা নিজের মনে বললে, অবশ্যি কুচাককে শুনিয়ে শুনিয়েই —আহা, চর্বিজড়ানো কী সুস্বাদু মেটুলি! রূপকথা যখন ও আর বলবেই না, তখন কি আর করা! মেটুলিটা টীককেই দেওয়া যাক।

বলতে বলতে সে মেটুলিটা ছুড়ে দিলে টীকের দিকে। হাঁ হাঁ করতে করতে কুচাক মেটুলি তাগ করে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েই তড়াং করে পেছিয়ে গেল। টীক হাঁক করে তাকে কামড়ে দিয়েছিল আর কি! একটা লাঠি টেনে নিয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে কুচাক ছুটলো তার পেছনে। কিন্তু টীক ততক্ষণে মেটুলি নিয়ে হাওয়া।

একটু পরে টীকের বাপান্ত করতে করতে কুচাক ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে।

জুরা হাসছে। বললে,—কি কত্তা, অন্য মেটুলিরও কি ঐ দশা হবে? হুঁ, বলে কিনা ছাগলের মাংস মোটা শক্ত লাগছে! শীতের সময় যে ছিল চিমসে চাঁদের মতো রোগা লিকলিকে, মুখ দিয়ে শব্দ বেরোতো না, তার এখন অবস্থাটা কি? যে ছাগলের

মাংসের দৌলতে তার শরীরটা হয়েছে গোলগাল নাদুসনুদুস চর্বিভরতি, বকবকানিরও অন্ত নেই, সেই ছাগলের মাংসই কিনা এখন আর মুখে রুচছে না!

কুচাক ততক্ষণে ছাগল দুটোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। একটা পাত্রে সযত্নে রক্ত ধরে রাখতে রাখতে সে বললে,—কিরঘিজরা ভাজা রক্ত খেতে বড্ড ভালবাসে, না রে?

জবাব না দিয়ে জুরা উঠে গেল, কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল জঙ্গল থেকে, হাতে এক জোড়া পাহাড়ী মোরগ—উলার। মোরগ দুটো কুচাকের ঘাড়ের ওপর ছুড়ে দিয়ে সে বললে,—নাও, খাও এখন।

কুচাকের বেসামাল অবস্থা—আনন্দের চোটে ফেটে পড়ার মতো। কয়েক মুহূর্ত সে কথাই বলতে পারে না। হৃষ্টপুষ্ট প্রকাণ্ড পাখি দুটোর ছাইরঙা পালকে সে হাত বুলোয় আর সমানে সশব্দে ঠোঁট চেটে চলে। শেষে তার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এক সময় বাক্যস্ফূর্তি ঘটলো,—বাঃ বাঃ! ঠিক মাথায় মেরেছিস! সত্যি জুরা, তুই সত্যিই খু-ব বড় পাকা শিকারী।

কুচাকের এই সার্টিফিকেটে জুরার আপত্তি করার কিছু নেই। তার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস, শিকারীরাই শুধু সত্যিকার মরদ। যারা শিকারী নয়, তারা নীচুজাতের নগণ্য মানুষ।

কুচাক লেগে গেল রান্নার কাজে। এ ব্যাপারে চিরকালই তার অখণ্ড মনোযোগ।

আগুনে চড়বড় করে ডালপালা পুড়ছে—খুশির আমেজে শব্দ করছে যেন। বারো রকমের সুগন্ধি মশলা ও লতাপাতার ঝোলের সঙ্গে ধীরে সুস্থে উলার রান্না হচ্ছে।

শুঁটকী মাংস তৈরির কাজে গাঁয়ে কুচাকের নামডাক যথেষ্ট। কিন্তু সর্দার তাকে সবচেয়ে তারিফ করে ওস্তাদ উলার-রাঁধুনি হিসেবে।

রান্না একসময় শেষ হতে কুচাক মাংস থেকে হাড় ছাড়িয়ে নিয়ে সেগুলো ফেলে দিলে। মাংসে এবার সে ভাল করে চর্বি মাখায়। পাত্রের মধ্যেও বড় একদলা চর্বি ফেলে দেয়। তারপর গোল একখানা কাঠি দিয়ে সে মাংস ভাজতে শুরু করে। চর্বি গলে যেতেই যে গন্ধ বের হয়, তা সত্যিই অপূর্ব মনোরম।

ছাগলের একটা পরিষ্কার-করা পাকস্থলীর মধ্যে এর পর সে রান্না মাংসটা রেখে তার দুটো দিক কষে বেঁধে দিলে। তৈরী হলো মাংসের পুর-দেওয়া আঁটসাঁট মোটা এক সসিজ। জিভ দিয়ে কুচাক সযত্নে কাঠিখানা চেটে দেখে।

আঃ! এটাকে এবার ঠাণ্ডা করতে হবে।—কুচাকের মোলায়েম কণ্ঠ থেকে দরদ যেন উপচে পড়ছে। সে চললো গুহার বাইরে। সসিজটা তুষারের নীচে পুতে রাখতে হবে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। চিড়বিড় করে আগুন জ্বলছে, স্ফুলিঙ্গের ঝাঁক উড়ছে চুল্লী থেকে। খোশ মেজাজে কুচাক ফিরে এল।

এবার তাহলে একটা রূপকথা হোক।—জুরা প্রস্তাব করে।

কুচাক ভাবতে বসলো। পা দুটো মুড়ে আসনপিঁড়ি হয়ে আরাম করে বসে, হাতের তেলোয় তামাক পাতার খইনি টিপতে টিপতে, চকিতে একসময় মুখে তার দুষ্টুমির মৃদু হাসি খেলে যায়।

শোন্ তাহলে বলি,—সে শুরু করে গল্প:

অনেক—অনেক দূরে শয়ে শয়ে আসমানছোঁয়া পর্বতেরও ওপারে এক খান রাজত্ব করতো। তার রাজ্যে ছিল ভারী জোয়ান এক দুঃসাহসী শিকারী। এক-একটা ভেড়া

সে একাই খেতে পারতো। মরদের মতো মরদ ছিল লোকটা। গাঁয়ের সব্বাই তার বিরুদ্ধে এককাট্টা হলেও, একাই সে মহড়া নিতে পারতো তাদের সঙ্গে।

সেই রাজ্যে এমন কতকগুলো পর্বত ছিল, যেখানে শিকারে যাওয়া ছিল বারণ। কেউ সেখানে গেলে আর ফিরে আসতো না। পরে তার দেহটা পর্বতের তলায় পাওয়া যেত টুকরো টুকরো অবস্থায়। কেউ বলতো, লোহার শকুনরা ওখানে বাস করে। কেউ বলতো, জিনরা। কেউ বা বলতো, পর্বতের অশরীরী বাসিন্দারাই থাকে ওখানে।

আর সেসব পর্বতের কথাই বা কি বলবো! তার প্রত্যেকটা ঘাস-জমিতে খুব কম করেও শ পাঁচেক করে বড় বড় পাহাড়ী ছাগল চরতো দল বেঁধে। লোকে বলতো, পালের গোদা যে ছাগল, তার শিং দুটো খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী।

এখন, সেই শিকারী একদিন ঠিক করলো, ওখানে যাবে সে শিকার করতে। তার শাদি করার ইচ্ছে অনেক দিনের, কিন্তু এত গরীব যে, টাকা দিয়ে মেয়ের বাপ-মায়ের কাছ থেকে যে বৌ কিনবে, সে সম্বল নেই।

শিকারে সে রওনা হবে, এমন সময় তার দোস্ত এক বুড়ো শিকারী এসে বললে, —আমায় সঙ্গে নাও, জোয়ান। তোমার শিকার-করা ছাগল বইবার কাজ করবো। তোমার কাজে বাগড়া তো দেবই না, বরং মদত করবো। তোমার যে উপকার করবো, তার বদলে তোমার শিকারের আর্দ্ধেক আমায় দিও।

হাসতে হাসতে জোয়ান বললে,—তোমাকে তো আমার দরকার নেই। তা ভাগ কেন দেব?

ওখানে গেলেই তা মালুম হবে। কিছু যদি না ঘটে, দিও না।—বুড়ো জবাব দিলে।

শেষ পর্যন্ত রাজী হয় শিকারী।

ইষ্টদেবতার কাছে মোটাসোটা সাদা একটা ভেড়ার বাচ্চা কোরবানি করে তারা রওনা হয়।

দিন ভোর তারা একের পর এক পর্বতশ্রেণী পার হয়ে চললো। পরের দু দিনও কেটে যায়। তারা উঠছে তো উঠছেই। কিন্তু ছাগলের পাত্তা নেই কোথাও।

জোয়ান ক্রমেই খাপ্পা হয়ে উঠছে বুড়োর ওপর।

পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে তারা এগোয়। চলার বিরাম নেই! আরো একটা দিন কাটলো। পরদিন কিছু দূর যেতেই সামনে পড়লো এক বিরাট পর্বত। সেটা পার হয়ে ও পাশে যেতেই দেখা গেল, পর্বত-ঢালে পালে পালে ছাগল চরছে, ভয়ডর কাকে বলে জানে না।

জোয়ান বন্দুক ছুড়তে শুরু করলো। এক-এক বুলেটে তিন-চারটে করে ছাগল পড়ছে। এমনি করে দিন শেষ হলো। যা তারা বইতে পারবে, তার চেয়েও বেশী ছাগল মেরেছে শিকারী।

এবার বিশ্রামের দরকার। তারা এক জঙ্গলে ঢুকলো। জোয়ান আগুন জ্বালতে যাবে, বুড়ো বাধা দিয়ে বললে,—এক পাজী বদমাশ খান এই পর্বতে রাজত্ব করতো; বিনা কারণে বহু লোককে খুন করেছিল সে। আগুন জ্বাললে তাদের আত্মারা—জিন ও আলবেস্টরা—আমাদের দেখতে পাবে, খুন করে ফেলবে।

শিকারী রুখে উঠলো,—ওদের আমি থোড়াই কেয়ার করি। আগুন জ্বাল।

বুড়ো বললে,—বেশ তাই হোক। কিন্তু কথা রইল, আগুন জেবলে কিছু খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা অন্য জায়গায় গিয়ে রাত কাটাব।

তারপর মাংস রান্না করে খাওয়াদাওয়া শেষ হলো। কিন্তু শিকারী আর এক পা-ও নড়তে রাজী নয়। তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বুড়ো শেষে কাছেই এক পাথর-

ঢিবির আড়ালে গিয়ে গা ঢাকা দিলে। একটু পরেই তারা চমকে উঠলো। দেখে, দুটো রূপসী মেয়ে এগিয়ে আসছে আগুনের দিকে।

শিকারী লাফিয়ে উঠে ওদের দিকে দৌড় দেয় আর কি! বুড়ো বাধা দেয়,—যেও না, সবুর করো।

অনেক কষ্টে সে শিকারীকে ঠেকায়।

তারপর পূব আকাশে ভোরের আলো ফুটতেই মেয়ে দুটো চলে গেল।

পরদিন বুড়োর পরামর্শ মতো তারা দুটো গাছ কাটলো। গাছ দুটোর ডালপালা ছেঁটে চেঁচেছুলে নিজেদের জামাকাপড় দিয়ে ওদুটোকে তারা এমনভাবে সাজালো যে, দেখতে যেন ঠিক মানুষের মতো। তারপর সন্ধ্যা নামতেই ডামি দুটোকে আগুনের পাশে রেখে তারা গা ঢাকা দিলে ঢিবির পেছনে। একটু পরেই গত রাত্রের মতো আবার মেয়ে দুটো এসে উপস্থিত।

তাদের রূপ দেখে শিকারী আবার ছটফট করে উঠলো, বললে,—দুটোকেই আমি শাদি করবো!

ফিস্‌ফিস্ করে বুড়ো বললে,—চুপ! জানের মায়া থাকলে ওদের কাছে কক্‌খনো যেও না। আমি জানি, ওরা কারা। ওরা জেস্টার্‌নাক্, পিশাচী!

শিকারী ধমকে ওঠে,—থাম! সবটাই তোমার মনগড়া বানানো কথা।

আগুনের পাশে বসে মেয়ে দুটো তখন হাসছে। জামার আস্তিনের ভেতর হাত দুটো গোটানো। আর আগুনের ধারে 'লোক' দুটো ঘুমে বিভোর। জাগার কোন লক্ষণই নেই। মেয়ে দুটো ধীরে ধীরে এবার আস্তিন গোটায়।

শিকারী চমকে ওঠে। দেখে, তাদের হাত দুটো তামার তৈরী আর আঙুলের নখগুলো সত্যিকার থাবা, ভালুকের চেয়েও লম্বা।

শিকারী তো রেগেমেগে গুলি করে আর কি। বুড়ো আবার বাধা দিলে,—সবুর করো। দেখা যাক, কি ঘটে।

মেয়ে দুটো তামার থাবাগুলো আগুনে গরম করছে। শেষে সেই থাবা তারা বসিয়ে দিলে ডামি দুটোর গায়ে। ব্যস, আর যায় কোথা! থাবা আটকে গেল কাঠের মধ্যে। থাবা বের করার জন্যে এবার শুরু হলো জেস্টার্‌নাক্‌দের টানাটানি। সে কী গর্জন আর ধস্তাধস্তি!

বুড়োর পরামর্শ মতো শিকারী এবার গুলি করলো। কিন্তু তার আগে সাধারণ প্যাডের বদলে বুড়োর দেওয়া বিশেষ ধরনের প্যাড দিয়ে বারুদ ভরে নিলে সে। তারপর জেস্টার্‌নাক্ দুটোর কাছে গিয়ে তারা তো অবাক। ওদের হাত দুটো কনুই পর্যন্ত তামার নয়—সোনা দিয়ে তৈরী। সোনার হাতগুলো তারা কেটে নিলে। তারপর ছাগল আর সোনা, সবই আধাআধি বখরা হলো। খোদা আর দেওদের হুকুম হলো, সব জিনিসেরই সমান ভাগ-বাটোয়ারা হওয়া উচিত, বিশেষ করে সোনা.

অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে শেষের শাস্ত্রীয় অনুশাসনটুকু আওড়াতে আওড়াতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুচাক চকিতে তাকাল জুরার দিকে। চোখে তার অর্থপূর্ণ ধূর্ত চাউনি। বলা বাহুল্য, শাস্ত্রীয় অনুশাসনটা তার নিজের তৈরী।

জুরা হেসে ফেলে বললে,—যথেষ্ট রাত হয়েছে। নেকড়েরা তোমার উলার খেয়ে সাবাড় করবে।

কুচাক বললে,—উঁহুঁ, সে ভয় নেই। আগুনে কতকগুলো ভিজে কাঠ দিয়ে এসেছি, সারা রাত ধরে জ্বলবে। সন্ধ্যেতারা পর্বতের মাথার ওপর দু আঙুল উঠলে তবেই আনবো সাসিজটা।

জুরা বললে,—তাহলে আর একটা গল্প বলো। ইর-মানাসের গল্প। কেমন করে তিনি লোহার কার্পেটে করে আকাশে উড়তেন, লোহার গিরগিটির পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন—সেইসব গল্প, সর্দার আর পার্টিজানরা যেসব গল্প বলেছিল।

কিন্তু ওসব গল্প কুচাক জানবে কি করে? সোকসাইয়ের উজানে ওপরের দিকে সে তো কখনো যায় নি। তার ওপর দেও সর্দারকেই শুধু ঐসব অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়েছেন, তাকে নয়।

সুতরাং কিছু সময় দুজনেই নির্বাক। জুরার বারকয়েক তাগিদের পর কুচাককে শেষে কবুল করতে হলো, ওসব গল্প সে জানে না। দেশ ছেড়ে সে তো আর কোথাও যায় নি যে জানবে।

কয়েক মুহূর্ত জুরা গুম হয়ে রইল, শেষে বললে,—তাহলে শুনে রাখ, দেওদের কাছে একটা সাদা ছাগল কোরবানি করে, আমি নিজেই যাব সোকসাইয়ের উজানে ওপরের দিকে।

বলতে বলতে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পাথরের মেঝের ওপর ঘুসি মেরে বলে,—কাউকে বা কোন কিছুকেই আমি পরোয়া করি নে। আমি জানি, দেও আমাকেও দেখাবেন ওসব ব্যাপার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুচাক উঠে দাঁড়াল। বললে,—যাই. সসিজটা নিয়ে আসি।

কিন্তু গুহার মুখ পর্যন্ত গিয়েই সে ফিরে দাঁড়ালো. বললে,—তোর কথা তো শুনলাম। এবার আমার কথাটাও তাহলে শুনে রাখ্। আমার পা কিন্তু এখানেই আটকে আছে। তোর সঙ্গে সোকসাইয়ের উজানে ওপরের দিকে আমি কিন্তু যেতে পারবো না।

জুরা মনে মনে বললো,—তা বটে। পা যখন এখানেই আটকে আছে, তখন দুনিয়াটা কত বড়, তা জেনে কি লাভ তোমার? ঠিক আছে, আমি থোড়াই কেয়ার করি.

প্রথম পর্ব ২

জুরা চিন্তামগ্ন। সোকসাইয়ের উজানে ওপর দিকে যাবার চিন্তায় বিভোর।

হঠাৎ টীক গোঁ গোঁ করে লাফিয়ে উঠতেই সে চমকে উঠলো। পরক্ষণে মরিবাঁচি করে ছুটতে ছুটতে গুহায় ঢুকে কুচাক ধপাস করে বসে পড়লো আগুনের পাশে। আতঙ্কে চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কথা বন্ধ।

জুরা প্রথমে হতভম্ব। তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে। কিন্তু কে জবাব দেবে? কুচাকের মুখ দিয়ে শব্দ বেরোয় না। আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে একখানা লাঠি তুলে সে শুধু দেখিয়ে দিলে অন্ধকারের দিকে।

জুরা সেদিকে আঙুল তুলে টীককে লেলিয়ে দিলে : কিশ্ কিশ্ কিশ্!

টীক ছুটে বেরিয়ে গেল গর্‌গর্ করতে করতে। কুচাক তখনো ধাতস্থ হয় নি। থরথর করে কাঁপছে। শেষে একখণ্ড বরফ গিলে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো,—জেস্টার্-নাক্! একটা জেস্টার্‌নাক্! ঐ ওখেনে!

জেস্টার্‌নাক্! জুরা হকচকিয়ে যায়, কিছুই বুঝতে পারে না।

হাঁপাতে হাঁপাতে রুদ্ধশ্বাসে কুচাক শেষে বললে,—সাংঘাতিক বিপদ! আমি যে আগুন জেবলেছিলাম, তার পাশে একটা জেস্টার্‌নাক্‌ বসে আছে। হাত দুটো সে গরম করছে! অদ্ভুত তার সাজপোশাক। তাকে এখুনি খতম করা দরকার, নয়তো ভয়ংকর বিপদ ঘটবে। তার বাহু দুটো সোনার। ও দুটো আমিই কেটে নেব। আমি তাকে আগে দেখেছি, তাই দুটো বাহুই আমার প্রাপ্য।

জুরার মনও কুসংস্কারে ভরা। জিন-দানো, পর্বত-মানব, জেস্টার্‌নাক্‌ বা অস্পষ্ট রহস্যময় যা কিছু, সে সবেতেই তার অখণ্ড বিশ্বাস। তার ওপর একটু আগেই সে শুনেছে জেস্টার্‌নাকের কাহিনী। তার প্রভাবে মন তার তখনো আচ্ছন্ন। সুতরাং কুচাকের কথা শুনেই সে লাফিয়ে উঠলো। জেস্টার্‌নাক্‌ মেরে সে শ্রেষ্ঠ বীর জোয়ানের সম্মান পাবে ভাবতেই বুকের স্পন্দন তার বেড়ে যায়।

কিন্তু কুচাক বলেছে, জেস্টার্‌নাক্‌ মারতে গেলে বুলেট ভরতে হয় বিশেষ ধরনের প্যাড দিয়ে। কুচাকের পরামর্শমতো নেকড়ের লোমে তৈরী বড় একটা প্যাড বন্দুকে ভরে নিয়ে সে দৌড়লো জঙ্গলের দিকে। আর কুচাক! দৌড়লো সে-ও। জুরার জামার আস্তিন আঁকড়ে ধরে নিজের মেদবহুল দেহ নিয়ে সে হাঁসফাঁস করতে করতে ছুটলো তার পেছনে। টীক কিন্তু তখনো ফেরে নি।

খুব সম্ভব জেস্টার্‌নাক্‌ তাকে খতম করেছে!—কুচাক বললে।

বটে! বটে! এতখানি দুঃসাহস! এত আস্পদ্দা!—জুরা আরো জোরে ছুটতে থাকে। রাগে ফুঁসছে সে।

বনের কিনারায় এসে এক ঝোপের আড়ালে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছু দূরে আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছে। আগুনেব পাশে বসে হাত দুটো গরম করছে একটি মেয়ে। এত ধোঁয়া যে, তার মুখ ঠিকমত চেনা যায় না। কিন্তু অস্বাভাবিক তার সাজপোশাক। পায়ে অদ্ভুত জুতো। সর্বোপরি হাত দুটো মনে হয় তামার তৈরী। অতএব নির্ঘাত জেস্টার্‌নাক্‌! জেস্টারনাক্‌ না হয়ে যায় না!

ফিস্‌ফিস্‌ করে কুচাক কাকুতিমিনতি করছে,—একটিবার, জুরা মাত্র, একটিবার আমায় বন্দুকটা দে। আমি ওকে গুলি করি। সারা জীবন আমি তোর কেনা গোলাম হয়ে থাকবো।

বীর জোয়ান হিসাবে নাম কেনার এমন অপূর্ব সুযোগ আর দ্বিতীয়বার আসবে না। এ সুযোগ কি কুচাক কখনো হাতছাড়া করতে পারে!

কিন্তু জুরা অটল ঃ সে-ই গুলি করবে জেস্টার্‌নাক্‌কে।

টীক হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল তাদের পাশ দিয়ে। দেখে মনে হয়, তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

জেস্টার্‌নাক্‌! জেস্টারনাক্‌ না হয়ে যায় না!—চাপা কণ্ঠে কুচাক গোঙিয়ে উঠলো ঃ কুকুরটার মাথাও বিগড়ে দিয়েছে!

টীক আবারও ছুটে গেল। তার আগে আগে ছুটছে লালচে-বাদামী রঙের একটা কুকুর।

আবারও কুচাক চেঁচিয়ে ওঠে চাপা কণ্ঠে,—গুলি কর্‌! গুলি কর্‌! নির্ঘাত ওটা জেস্টার্‌নাকী কুকুর। জাদুর দাপটে টীক ওর পেছনে ছুটছে সম্মোহিতের মতো।

নিদারুণ উত্তেজনায় জুরার হাত কাঁপছে। সে গুলি ছুড়লো। লালচে কুকুরটা পালিয়ে গেল, কিন্তু গোঙিয়ে উঠলো টীক। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে একপাশে সরে গেল।

কুচাক ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে,—তুক্‌! জাদু! জেস্টার্‌নাকী জাদু কাজ করছে সব জায়গায়।

গুলির শব্দ শুনেই জেস্টার্‌নাক্‌ লাফিয়ে উঠেছিল। সে চেঁচিয়ে উঠলো,—জুরা! জুরা—

গলাটা যেন চেনা-চেনা মনে হয়। বন্দুকে আবার গুলি ভরতে ভরতে জুরা হাঁক ছাড়লে,—টীক! টীক!

তার গলা কানে যেতেই লালচে কুকুরটা হঠাৎ এগিয়ে এল। অনুগতের মতো হামা-গুড়ি দিয়ে দাঁত বের করে সে এগিয়ে আসে। জুরা সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো,—আরে, আরে, এটা তো জয়নাবের সেই মাদী কুকুরটা! মেয়েটাও তাহলে জয়নাব।

আতঙ্কে কুচাকের হাত-পা ও গলা কাঁপছে। সে গোঙিয়ে উঠলো,—ও কিছু না, ও কিছু না! নির্ঘাত জেস্টার্‌নাক্‌! জয়নাবের মূর্তি ধরে এসেছে আমাদের ফাঁদে ফেলার জন্যে।

আগুনের পাশ থেকে মেয়েটির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবার,—এই জুরা! এই কুচাক! জুরা, জুরা—

পরিষ্কার জয়নাবের গলা। জুরা এগোতে যাবে, এমন সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে টীক এগিয়ে এল। তার পেছনে তুষারের ওপর রক্তের রেখা। বন্দুক বেখে জুরা পরীক্ষা করে টীককে ঃ পায়ে সে অল্প একটু জখম হয়েছে।

এই ফাঁকে কুচাক তুলে নিলে বন্দুকটা। পরক্ষণে মেয়েটির বুক লক্ষ্য করে গর্জে উঠলো বন্দুক।

জুরা ও কুচাক ছুটলো আগুনের দিকে। ঘোলাটে ধোঁয়ার মেঘের পেছনে মেয়েটি অদৃশ্য হয়েছে। ছুটতে ছুটতে কুচাক ছোরা টেনে বের করে ঃ জেস্টার্‌নাকের সোনার হাত দুটো কেটে নিতে হবে সবার আগে।

অক্ষত দেহে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে যে মেয়েটি, সে আর কেউ নয়—জয়নাব। অতি অল্পের জন্যে সে বেঁচে গেছে। এরকম সাংঘাতিক অভ্যর্থনার জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ভয়ে বিস্ময়ে দিশেহারা কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলে,—এ কী! কী এ! কী ব্যাপার অ্যাঁ?

জুরার আচ্ছন্নতা তখনো পুরো কাটে নি। সে পাল্‌টা প্রশ্ন করে,—তু-তু-তুমি ক্‌কে?

প্রশ্ন শুনে জয়নাবের আক্কেলগুড়ুম। চোখ কপালে তুলে ক্ষণপরে রুদ্ধ কাঁপা কণ্ঠে সে বললে,—অ্যাঁ, বলছো কি! আমি মিন-আরখার গাঁয়ের জয়নাব। মাংস নিয়ে যাবার জন্যে সর্দার আমাদের এখানে পাঠিয়েছে। আর সব মেয়েরা নদী পার হতে পারে নি। সৌকসাইয়ের ওপারে অপেক্ষা করছে। তাই একা আমিই এসেছি। আমায় চিনতে পারছো না?

জুরার সন্দেহের ঘোর তখনো যায় নি। জিজ্ঞেস করে,—তা তোমার হাত দুটো তামার কেন?

আতঙ্কে কুচাক চোখ বুজলো। তার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। ধপাস্‌ করে বসে পড়লো সে হাঁটু ভেঙে। তারপর বাঁ চোখের কোণা সামান্য একটু ফাঁক করে দেখতে লাগলো, ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়।

জুরার কথা কানে যেতেই জয়নাব হাসিতে ফেটে পড়ে। হাত থেকে কি একটা খুলতে খুলতে সে বললে,—একে বলে 'দস্তানা'। দস্তানা তৈরী হয় পশম দিয়ে। লোকে পায়ে যেমন মোজা পরে, তেমনি হাতেও পরে দস্তানা।

কিন্তু গায়ে ওসব কি পোশাক চাপিয়েছ?—জুরা স্বাগত কণ্ঠে কথাগুলো বললো বটে, কিন্তু মনে মনে সে যথেষ্ট লজ্জিত ও বেকুব বনে গেছে।

জুরার কথা শুনে জয়নাব আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কলকণ্ঠে বললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি, বলছি! ওঃ, কত কথাই না তোমাদের বলার আছে! কত তাজ্জব খবরই না আছে!

তারপর রুদ্ধশ্বাসে আবেগকম্পিত কণ্ঠে সে বলে চললো,—বছরের এ সময় কেউ আসবে আমাদের কাছে, স্বপ্নেও ভাবি নি। সেই চিরাচরিত গুল্জান খেয়েই দিন কাটছিল। মাংস নেবার জন্যে এখানে আসবো-আসবো করছি, এমন সময় আচমকা ব্যাপারীদের এক কাফেলা এসে হাজির হলো উত্তর থেকে—

জুরা ভুল শুধরে দেয়,—উত্তর থেকে নয়, পুব থেকে।

না, উত্তর থেকে!—জয়নাব দৃঢ়কণ্ঠে বললে: যা ঘটেছে, তাই বলছি। উত্তর থেকে—

বাজে কথা!—জুরা আবার বাধা দেয়: ওদিক থেকে আসার কোন পথ নেই।

এবার রেগে উঠলো জয়নাব,—থাম, কথার মাঝে বাধা দিও না। সাংঘাতিক একটা আওয়াজ কি শুনতে পাও নি? সে আওয়াজে গোটা পর্বত-রাজ্যটাই কেঁপে উঠেছিল। সে লোকগুলো সব পারে। বাজ তৈরি করে তারা ছুড়ে মারলো, অমনি পর্বতের একটা দিক ধসে পড়লো। তার ভেতর দিয়েই তো তারা এল! সাতটা ঘোড়া, আর পাঁচজন লোক—তিনজন কিরঘিজ ও একজন তাজিক, আর একজন রুশ, সেই যে লোকটা শীতকালে এসেছিল। আমরা তো ভয়েই মরি। ভাবলাম, ওরা বোধহয় আমাদের মেরে ধরে সব কিছু লুটপাট করার জন্য এসেছে।

জুরা ও কুচাকের মুখে কথা নেই। প্রচণ্ড বিস্ময়ে তারা যেন বোবা বনে গেছে।

একটু দম নিয়ে জয়নাব আবার শুরু করে,—কিন্তু না, ঠিক তার উল্‌টো। ওরা আমাদের দিলে চা, চাল, সাবান, ময়দা। খাঁটি গমের ময়দা—তা চল্লিশ-পঞ্চাশ বুশেল হবে। আর সেই সঙ্গে যবও প্রচুর—পুরো দুই বস্তা। গোড়ায় সর্দার অসুখের ভান করেছিল, কিন্তু সওগাতগুলো দেখে নিমেষে চাঙা হয়ে উঠলো।

জয়নাব যা বলছে, জুরা ও কুচাকের কাছে তা অশ্রুতপূর্ব কাহিনী।

জয়নাব বলে চলে,—ওদের আনা কাপড়-চোপড় খাবারদাবারের সঙ্গে আমরা বিনিময় করলাম জানোয়ারের চামড়া আর সোনার গুঁড়ো। চীনা ব্যাপারীদের কাছে সর্দার যা দাবি করতো, তারও দশগুণ বেশি সে চেয়ে বসলো ওদের কাছে। কিন্তু সেই রুশ বলশেভিক কি করলো জান? সর্দার যা চেয়েছিল, তারও কুড়িগুণ বেশি দিল। আর সেইসঙ্গে এ-ও বললো যে, সেই সোনার গুঁড়ো আর এমন চমৎকার চামড়ার পক্ষে ও দামও নাকি যথেষ্ট নয়। আর তার ফলে আমরা রোজ খেতে লাগলাম গমের রুটি আর খাঁটি চা। রোজ তিন বেলা—সকালে, দুপুরে, রাতে।

নিদারুণ মনস্তাপে কুচাক জ্বলছে। জয়নাবের শেষ কথায় তা বুঝি জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে,—আঁ! সবই কি সবাড় করেছিস্?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার দিকে এক নজর তাকিয়ে জয়নাব আবার বলতে থাকে,—বলশেভিকরা আমাদের সঙ্গে ছিল পাঁচ দিন। পর্বতে পর্বতে উঠে তারা পর্যবেক্ষণ চালিয়েছে, সর্দারকে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। বুড়ো সবই বলেছে, এমন কি তাগাই কিভাবে পালিয়ে গেছলো, তা-ও। প্রথমে অবশ্যি সে কিছুই ফাঁস করতে চায়নি। কিন্তু তোমার বুড়ী-মা আয়েশা কিছুটা বলতেই বুড়ো গড়গড় করে সব বলে গেল। এজন্যে আয়েশা ও সর্দারকে তারা একটা করে রেশমী কোট বকশিশ দিয়েছে। সত্যি,

কী চমৎকার সব জিনিসপত্র আর জামা-কাপড়ই না তারা এনেছিল, তা আর কি বলবো। এই যে পোশাকটা আর বুটজোড়া আমি পরে আছি, এটাও এসেছে সেই দেশ থেকে। এ হলো রুশ পোশাক।

উদ্‌গ্রীব হয়ে জুরা খবরগুলো শুনছে বটে, কিন্তু বাইরে সে নির্বিকার, বিস্ময়ের কোন চিহ্ন নেই। আর কুচাক জয়নাবের পায়ের কাছে বসে এমন হাঁ করে গিলছে তার প্রত্যেকটি কথা, যেন শ্রবণ ও দর্শণ ইন্দ্রিয় ছাড়া আর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার লোপ পেয়েছে।

জয়নাব বলে চলে,—উত্তরে বহু-বহু পাহাড়-পর্বতের ওপারে প্রকান্ড একটা গ্রাম আছে। এত দিন আমরা তার কোন খবরই জানতাম না। সেথায় বহু-বহু লোক বাস করে—তা এক শো তো হবেই। তারা সবাই গমের রুটি খায়, বাহারে জামাকাপড় পরে, খিদে কাকে বলে জানে না। বলশেভিকরা সেখানে থাকে—

কুচাক বাধা দিলে, নিদারুণ উৎকণ্ঠায় তার গলা কাঁপছে,—তা খাবারদাবার-জিনিসপত্তরগুলোর কি হয়েছে?

তার কথায় যেন আমলই দিচ্ছে না, এমনিভাবে জয়নাব বলতে থাকে,—সর্দারের মতলব ছিল, জিনিসপত্তর সব সে নিজেই গায়েব করবে। কিন্তু সেই রুশ বলশেভিক বললে, না তা হবে না, এসব জিনিসে সবারই সমান অধিকার। তারপর সে খুব লম্বা একটা দলিল লিখলো, একজন কিরঘিজ সেটা আমাদের পড়ে শোনাল, আর আমরা বুড়ো আঙুল লাল রঙে ছুপিয়ে সেই কাগজটার ওপর টিপসই দিলাম। এখন আমরা এক শিকারী কিপারেটিফ, যাকে বলে শিকারী সমবায়, তার সভ্য। এখন থেকে আমরা চামড়া মজুত করে যাব, তারপর বিনিময় করবো ওদের সঙ্গে। বলশেভিকরা কি ভাবে জীবন চালায়, সে সম্বন্ধে ওরা আমাদের অনেক কথা বলেছে। ওদের দেশে যাওয়ার জন্যে নেমন্তন্নও করে গেছে।

আমার বন্দুকটার কি হয়েছে?—উদ্বিগ্নকণ্ঠে জুরা জিজ্ঞেস করে।

—ও-হো! তোমার জন্যেও তারা একটা বন্দুক এনেছে, আর একগাদা বারুদ ও বুলেট। বন্দুকটা আমি সঙ্গে আনি নি। সর্দার বললে, এখানে তোমাদের কাছে নাকি দু-দুটো বন্দুক আছে।

শুনতে শুনতে গভীর উৎকণ্ঠায় কুচাক আবার কঁকিয়ে ওঠে,—ওরে, ওরে, তোরা তো এখন মহাফুর্তিতে পুরোদমে তিন বেলা গিলছিস! তা আমরা যে এখানে তোদের জন্যে খাবার জোগাড় করতে পড়ে আছি, আমাদের জন্যে আনিস নি কিছু?

জয়নাব এবার রাগে ফেটে পড়লো, কুচাককে লক্ষ্য করে বললো, হুঁ, তা বটে! এই সব খবর নিয়ে আমি কোথায় সাত তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম, আর তুমি কিনা আমায় গুলি করে খতম করেছিলে আর কি! আর জুবা, তুমিও কিনা আমায় চিনতে পারলে না? তুমি না শিকারী? তুমিও কি চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ? আচ্ছা, সত্যিই কি আমি জেন্টার্‌নাকের মতো অত সুন্দরী? হাঁ করে আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

জুরা রেগে যায় জিজ্ঞেস করে,—তোমার গায়ে কিসের গন্ধ?

একরকম সুগন্ধি জলের। সেই রুশ আমায় সওগাত দিয়েছে।—হাসতে হাসতে জয়নাব বলে।

অ্যাঁ, বট্‌টে! জুরা এবার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। জয়নাব, তারই জয়নাব শুধু—সে কিনা সওগাত নিলে সেই বিদেশী লোকটার কাছ থেকে, যাকে সে খুন

করতে চেয়েছিল! তার পরেও সে কিনা দাঁত বের করে হাসছে! জয়নাবকে এক চড় কষিয়ে দিলে।

অপ্রত্যাশিত আঘাত! এত আকস্মিক যে, জয়নাব প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেল, তার পরেই কেঁদে ফেললে ঝরঝর করে।

গাধা! আস্ত গাধা!—অশ্রুমুখী জয়নাব কাঁদতে কাঁদতে রুদ্ধকণ্ঠে ফুঁসে ওঠে একসময় ঃ আস্ত নিরেট গাধা কোথাকার!

জুরার রাগ ততক্ষণে জল। জয়নাব ফুঁসে উঠতে, বিষম অপরাধীর মতো মিন-মিন করে সে বললে,—কেঁদ না।

জয়নাবের কান্না আরো বেড়ে যায়। তার ফলে জুরার অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় আরও কাহিল। জয়নাব কেঁদে ফেলতেই কুচাক কেটে পড়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতির মোকা-বিলা করতে হলে কি করা দরকার, জুরার জানা নেই। আগে সে জয়নাবের সঙ্গে সাথীর মতো ব্যবহার করেছে, কিন্তু কিছুকাল হলো জয়নাব বড় তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছে আর কেমন যেন একদম বদলে গেছে।

জুরা কেঁউ কেঁউ করতে থাকে। যত সে নিজের দোষ কবুল করে জয়নাবকে শান্ত করার চেষ্টা করে, কান্না ততই বেড়ে যায়।

কি বিপদ রে বাবা! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে, জুরার জানা ছিল না। ঝক-মারি! আস্ত ঝকমারি! বেকুবের মতো সে একবার এ পা একবার ও পা ওঠানামা করতে থাকে। শেষে আর গত্যন্তর না দেখে জয়নাবের ডান হাতটা সে একসময় নিজের দু হাতে চেপে ধরলো।

সঙ্গে সঙ্গে কান্না বন্ধ। জলভরা ডাগর দুই কালো চোখ তুলে জয়নাব তাকাল জুরার মুখের দিকে।

জুরা তাড়াতাড়ি জয়নাব যে ভারী বোঝাটা এনেছিল সেটা কাঁধে ফেলে, তার দিকে চোখ না তুলে বললে,—চলো, যাওয়া যাক। তোমায় একটা জিনিসের মতো জিনিস খাওয়াব।

ওদের আসতে দেখে, দূর থেকে কুচাক সোৎসাহে হেঁকে ওঠে,—আহা রে, বোঝাটা বড়ই ভারী মনে হচ্ছে!

বস্তার ভেতর থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে বের হলো চামড়ার বড় এক থলি-ভর্তি কৌমিশ আর কাপড়ে জড়ানো অনেকগুলো পাউরুটি।

গমের রুটি ওগুলো।—বলতে বলতে জয়নাব পাউরুটিগুলো জুরার হাতে তুলে দেয়। মুখে তার মিষ্টি হাসি। বিব্রত জুরা রুটিগুলো হাতে নিয়ে অনুগতের মতো নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে আগুনের পাশে।

দুর্ধর্ষ জোয়ান শিকারীর অসহায় করুণ অবস্থা দেখে হেসে ফেললে কুচাক।

প্রথম পর্ব ৩

গুনগুন করে গানের সুর ভাজতে ভাজতে কুচাক ভোজের আয়োজন করতে ব্যস্ত। ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে মেজাজ তার ভারী শরীফ। যাকে বলে নবাবী খানা—উপাদেয় উলারের সসিজ আর তার সঙ্গে অঢেল পাউরুটি আর কৌমিশ। তার পরেও

আছে। সত্যি, এই দুনিয়ায় ছাড়া এমন পরিপাটি খানা আর কোথায় মিলবে! বেহেস্তে? দূর! দূর!!

ছুরি দিয়ে সসিজটা ঠিক করতে করতে, কিভাবে ওদের দুজনকে নিয়ে রুটি সহ-যোগে ডবল উলারের সসিজটা ধীরেসুস্থে সাবাড় করবে, স্বরচিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তারই গাথা সে রচনা করে চলেছে, এমন সময় কিনা বিনা মেঘে বজ্রপাত! বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ সে যেন ছিটকে পড়লো ফ্যাসাদের এক অকূল দরিয়ায়। পড়েই হাবুডুবু খেতে শুরু করলো।

যে ছুরিখানা দিয়ে সে ঠিক করছে সসিজটা, তার দিকে নজর পড়তেই সবিস্ময়ে জয়নাব হঠাৎ কলকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো,—আরে, আরে, ছুরিটায় যে সোনার কাজ করা!

সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র এক আওয়াজ করে মাঝপথেই থেমে যায় কুচাকের গান। মনে হয়, যেন হিক্কা উঠলো।

তাই নাকি? ওটা আমরা পেয়ে...—কথাটা জুরা শেষ করতে পারে না, তার আগেই কুচাক ছুটে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে,—দোহাই তোর, জয়নাবকে বলিস নে সোনার কথা! মেয়েছেলের ছলচাতুরির তুই আর কতটুকু জানিস! একটামাত্র মেয়েমানুষের ছলচাতুরি বইবার ব্যবস্থা করতে হলে কম করেও চল্লিশটে গাধার দরকার হয়।

ভ্রূকুটি করে জুরা মুখ বন্ধ করলে। জয়নাবের আগ্রহ তাতে আরো বেড়ে যায়। উৎসুক কণ্ঠে সে প্রশ্ন করলে,—কি যেন পেয়েছ বলছিলে?

কুচাকের বেসামাল অবস্থা। যে ভাবে হোক জয়নাবকে ভোলাতে হবে কথাটা—সে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। কেটলিতে জল ফুটছে। তামার একটা চা-পাত্রে গরম জল ঢালতে ঢালতে সে চেঁচিয়ে উঠলো,—এক মিনিট সবুর কর্ জয়নাব, মাত্তর এক মিনিট, তোকে ভারী চমৎকার একটা গল্প বলবো। এবার চা-টা একটু হোক।

পরক্ষণে কাউকে কিছু বলার অবসর না দিয়ে সে আবার হেঁকে উঠলো,—এই জয়-নাব এই, কাপড়টা একটু পাত্ না বাপু।

কোমরে জড়ানো কাপড় খুলে জয়নাব আগুনের ধারে পেতে দেয়। উলারের সসিজ আর এক গাদা রুটি কুচাক নামিয়ে রাখলে তার ওপর। তারপর কাপড় ঘিরে তিনজনে খেতে বসলো, মাঝখানে জয়নাব।

সবচেয়ে যে বয়স্ক বা মানী ব্যক্তি, নিয়ম হলো সে-ই প্রথম খাওয়া শুরু করবে। এ-ক্ষেত্রে সে সম্মান জুরার প্রাপ্য। জুরার পর জয়নাব একখণ্ড সসিজ তুলে নিলে, খেতে খেতে বললে,—চমৎকার হয়েছে।

তিনজনের খাওয়া চলে। সেই সঙ্গে চলে কুচাকের একটানা বকবকানি।

জয়নাবের মাথায় ঘুরছে প্রশ্নটা। কিন্তু কুচাক যেভাবে বকে চলেছে, তাতে যে কিছু জিজ্ঞেস করবে সে ফুরসুৎ কোথায়?

খাওয়া শেষ হয় একসময়। এবার পোলাও রাঁধার পালা। কুচাকের মতো ভাল পোলাও কেউ রাঁধতে পারে না। জুরাকে সে বললে,—জঙ্গল থেকে কিছু শুকনো কাঠ নে আয়। জয়নাবকেও সঙ্গে নিয়ে যা। জানিস তো, মেয়েলোক হাঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে পোলাও কক্ষনো ভাল হয় না!

তারপর জুরার কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বললে,—কিন্তু খবরদার! জয়নাবকে ভুলেও বলবি নে সোনার কথা।

জুরা ঘাড় নেড়ে জয়নাবকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কেটে যায় তারপর। পোলাও রান্না শেষ। তবু জুরা ও জয়নাবের পাত্তা নেই। অপেক্ষা করে করে কুচাকের বিরক্তি ধরে যায়। কি করবে, পোলাওটা নিজেই সাবাড় করবে কিনা ভাবছে, এমন সময় দ্রুতপায়ে জুরা গুহায় ঢুকলো। কাঠের বোঝাটা সে আছড়ে ফেললে মেঝের ওপর। চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো কাঠগুলো।

জুরার পিছু পিছু জয়নাবও গুহায় ঢুকেছে। সে-ও ছুড়ে ফেলে ছোট বোঝাটা।

জুরাকে বকার জন্য হাঁ করতে গিয়েই কুচাক সামলে নেয়। জুরার মেজাজ বিগড়ে আছে, সে বুঝতে পারে। নির্ঘাত ওরা দু'জনে আবার ঝগড়াঝাঁটি করেছে।

জুরা নীরবে আগুনের ধারে বসে পড়লে। আর জয়নাব কাপড় বিছিয়ে দিয়ে কেটলিটা নামিয়ে নিলে চুল্লী থেকে। নামানোর সময় খানিকটা গরম জল সে ইচ্ছে করেই ছিটকে ফেললে জুরার হাতে।

প্রকান্ড থালা ভরতি গরম পোলাও। ধোঁয়া উঠছে। থালাটা কাপড়ের ওপর রাখতে রাখতে কুচাক সোল্লাসে হাঁক ছাড়ে,—হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, পোলাও খাঁ আসছেন!

জয়নাব হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে থালাখানার ওপর। থালার কানা পরীক্ষা করতে করতে একসময় সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হাততালি দিয়ে উঠলো,—আরে আরে, এমন চমৎকার থালা তোমরা কোথায় পেলে? এ যে রুপোর তৈরী!

বিস্ময়ে হতবাক সে—জুরা ও কুচাকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কুচাকের মুখ হাঁ হয়ে আছে। মিনতিভরা ঘোলাটে চোখে সে তাকায় জুরার দিকে। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণে সামলে নিয়ে সে হৈ-হৈ করে উঠলো,—আরে, আরে, পোলাওয়ের দিকে মন দাও! জুড়িয়ে যাবে যে। শুরু করা যাক, শুরু করা যাক।

উত্তেজনায় তার গলা কাঁপছে, ঠিকমতো কথা সরছে না।

জয়নাব এবার পরিষ্কার বুঝতে পারে, ওরা তার কাছ থেকে কিছু একটা গোপন করছে।

পোলাওটা রান্না হয়েছে চমৎকার। কিন্তু কুচাকের খিদে মাৎ। জুরা ও জয়নাবের প্রশংসা তার কানে ঢুকছে না। সোনার ভবিষ্যৎ ভেবে তার খাওয়া মাথায় উঠেছে। সোনার খবর জয়নাব জানা মানে সবাই জানা। শেষ পর্যন্ত সর্দারই হয়তো গায়েব করবে সবটুকু।

পোলাও শেষ হতেই থালার তলা থেকে নানারকম সব নক্‌শা বেরিয়ে পড়ে—নানা জন্তুজানোয়ার, বিচিত্র সাজ-পোশাকের মানুষ, কোণওলা উঁচু তাবু।

জয়নাব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে,—দ্যাখ, দ্যাখ, একটা ভালুক! আরে ঐ দ্যাখ একটা শেয়াল......

জুরা নির্বাক। কুচাকের বুক তোলপাড় করে বেরিয়ে এল লম্বা দীর্ঘশ্বাস। জয়নাবের বিস্ময়ভরা দৃষ্টি ও প্রশ্নের সামনে চুপ করে থাকা ছাড়া কিছুই করার নেই।

চায়ের প্রথম পাট চুকতে জুরা মুখ খোলে। যথাসাধ্য শান্ত সংযত কণ্ঠে সে কুচাককে বললে,—শোন, জয়নাবের কাছে শুনলাম, বলশেভিকদের সেই কাফেলা চলে যাবার পরই কাশগড় থেকে তাগাইয়ের এক শাগ্‌রেদ এসেছিল। বলশেভিকদের সঙ্গে সমস্ত সোনা ও পশমী চামড়া বিনিময় করা হয়েছে শুনে লোকটার সে কী রাগ! গত বছর থেকে সর্দার নাকি তাগাইয়ের বাবার কাছে সোনা ধারে। লোকটা বলে গেছে, এই শরতে তারা আবার আসবে। সে সময় সোনা শোধ না করলে তাগাই শুধু সর্দারের আংরাখাটাই নয়, গাঁয়ের মেয়েদেরও ধরে নিয়ে যাবে। বলশেভিকরা কতজন ছিল, কোন্

দিকে গেছে, এসবও সে বারবার জিজ্ঞেস করেছিল। আমরা কোথায় আছি, তা-ও জানতে চেয়েছিল। সর্দারের ইচ্ছে, আগামী পূর্ণিমার দিন আমরা গাঁয়ে ফিরি।

জুরা থামলো। তারপর জয়নাবের দিকে ফিরে বললে,—এবার বাকিটুকু তুমিই বলো।

জয়নাব শুরু করে,—বুঝলে কুচাক, এক বছর হলো তোমার বৌ কাচ্চাবাচ্চা না রেখে মারা গেছে। তাই সর্দারের ইচ্ছে, তুমি আবার বিয়ে করো। তাছাড়া সর্দার ঠিক করেছে, তার নাতনী বিবির সঙ্গে জুরার বিয়ে হবে।

বিবির সঙ্গে!—কুচাক যেন আকাশ থেকে পড়েঃ বিবির বয়েস তো মাত্তর দশ বছর!

তাতে কিছু যায় আসে না। সর্দারের মর্জি। আর আমাকে সে...—জয়নাবের গলা কেঁপে উঠলো, ক্ষণেক থেমে সে আবার বললেঃ তার ইচ্ছে, আমি তাগাইয়ের বিবি হই। তার জন্যে সর্দার আমায় তৈরী হতে হুকুম করেছে। সোনার বদলে আমাকে তাগাইয়ের হাতে তুলে দেবার মতলব আর কি।

জুরা বাধা দিয়ে বললে,—জয়নাব বলেছে, দারাউৎ-কুরঘানের ওপারে নাকি ভীষণ লড়াই চলেছে, শান্তি বজায় আছে শুধু কাশগড়িয়ায়।

হ্যাঁ, ঠিকই। তাছাড়া তাগাইয়ের লোক আর একটা কথাও বলে গেছে, জয়নাবের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপঃ কাশগড়ে তাগাইয়ের নাকি অনেক দোকানপাট আছে, সেখানে আমি রোজ গমের রুটি আর পোলাও খেতে পাব। সওগাত হিসেবে তাগাই একটা আংটিও আমায় পাঠিয়েছে। নীলকান্তমণি-বসানো আংটিটা কিন্তু সত্যিই চমৎকার।

জুরা চমকে ওঠে। চকিতে জয়নাবের হাতের আঙুলগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে সে বললে,—কই, ও কথা তো আগে বলো নি? আংটিটা কোথায়?

কেন, ওটা দিয়ে কি করবে? রেখে দিয়েছি।—কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে জয়নাব বলে।

রেখে দিয়েছ! মানে?—বিদ্রূপভরা কণ্ঠে জুরা বললেঃ অমন চমৎকার জিনিসটা হাতে পরো নি যে?

ম্লান হাসে জয়নাব। ধীরে ধীরে বলে,—ওটা রেখে দিয়েছি বিবির বিয়েতে সও-গাত দেব বলে।

গুলি খাওয়া লেপার্ডের মতো সচমকে জুরা ফুঁসে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলে। কিন্তু তার চোখ-মুখের চেহারা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ভেতরের উত্তেজনার পরিমাণ।

জয়নাব ততক্ষণে ভেতরের কটিবন্ধ থেকে বের করেছে আংটিটা। জুরার সামনে হাতটা মেলে ধরে সে বললে,—এই দ্যাখ।

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো একবার সেদিকে তাকিয়েই জুরা ছোঁ মেরে তুলে নিলে আংটিটা। তার পরেই চোখের পলকে সেটা চলে গেল চুল্লির আগুনের মধ্যে।

কুচাক হায় হায় করে উঠলো। জয়নাব স্তম্ভিত। বিস্ফারিত চোখে কয়েক মুহূর্ত জুরার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা কাঠি নিয়ে সে আগুনের মধ্যে খুঁজতে থাকে আংটিটা। চোখ তার অশ্রুসজল।

জুরা স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। চোখেমুখে তার ঝড়ের সংকেত। অস্থির পায়ে সে উঠে গেল গুহার মুখের দিকে। বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

প্রথম পর্ব ৪

পর দিন ভোরে তিনজনে—জুরা, কুচাক ও জয়নাব—রওনা হয় সৌকসাইয়ের দিকে। সঙ্গে টীক ও এককানী। ওদের কাঁধে শুঁটকী মাংসের বিরাট বিরাট বোঝা, তবু পথ চলতে কষ্ট নেই—যেহেতু চড়াই নেই কোথাও, শুধু উতরাই। উতরাই বেয়ে নেমে যাওয়া শুধু।

সোনার ব্যাপারটা জয়নাব ক্ষণেকের জন্যেও ভুলতে পারে নি। কিন্তু কথাটা যে জিজ্ঞেস করবে, সে ফাঁকও পাচ্ছে না। সারা পথ কুচাক চলেছে চিল্লাতে চিল্লাতে। পথের দুধারে যেসব দৃশ্য পড়ছে, তার মনোহারিত্ব নিয়ে সে গল্প ফাঁদছে একের পর এক। দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞানগম্যি যেন তার মুঠোর মধ্যে, এমনি ভাব।

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে জুরা একসময় ফোড়ন কাটে,—আচ্ছা, তুমি তো দেখছি সবজান্তা। তা বলতে পার, নতুন চাঁদগুলো জন্মাবার পর পুরনো চাঁদগুলো কোথায় যায়?

সঙ্গে সঙ্গে কুচাক জবাব দেয়,—ওঃ এই কথা! কেন, ওরা তো টুকরো টুকরো হয়ে নতুন নতুন তারার জন্ম দেয়।

বাঃ! বাঃ!—জয়নাব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কুচাকের সর্বজ্ঞতায় সে মন্ত্রমুগ্ধ যেন।

ভ্রূকুটি কেটে জুরা চুপ করে যায়। সারা পথ সে আর মুখ খোলে না।

একসময় ওরা সৌকসাইয়ের তীরে নেমে এল।

কিন্তু সৌকসাইয়ের চেহারা দেখে হকচকিয়ে যায়। এ কী ভয়ঙ্কর চেহারা তার! বিক্ষুব্ধ সৌকসাইয়ের ফেনিল জলরাশি দেড় শো কদম চওড়া পুরো খাত ভরে অতিকায় হিংস্র জানোয়ারের মতো গর্জন করতে করতে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব পাথরের চাংড়া বজ্রনির্ঘোষে গড়াতে গড়াতে চলেছে স্রোতের তোড়ে। থোকা থোকা হলদে ফেনায় ঢিবি, টিলা সব আচ্ছন্ন।

নদীর ওপারে একদল স্ত্রীলোক ও অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জয়নাবের সঙ্গী সব। তারা হাত নেড়ে চিৎকার করে কি যেন বললে, কিন্তু নদীর গর্জনে ডুবে গেল তাদের কণ্ঠস্বর।

জুরা তখন নদীর উজান বেয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলেছে। উঁচু 'কালো দাঁড়কাক' পাহাড়টা তার লক্ষ্য। নদীর দুই পাড় এখানে সঙ্কীর্ণ হয়ে গিরিসংকটের আকার নিয়েছে। জলস্রোত বিপুল গর্জনে বেরিয়ে আসছে তার ভেতর দিয়ে।

পাড়ের একেবারে কিনারায় গিয়ে জুরা দাঁড়ায়। বাষ্পের ঝাপ্টা এসে চোখেমুখে লাগছে। জুরা গভীর চিন্তামগ্ন।

রাতে হিমবাহের গলা বন্ধ হয়। নদীর জল তখন নেমে যায় তার স্বাভাবিক পুরনো খাতে। নদী পার হতে হলে, হয় সেই রাত অবধি তাদের কূলে বসে থাকতে হবে, আর নয়তো নদীর উজানে ওপর দিকে তুষার-ধসে খাত আটকে না যাওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হবে। তখুনি কেবল নদীর শুকনো খাত পার হওয়া সম্ভব—কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়। পুঞ্জীভূত জলের তোড় ফেঁপে ফুলে উঠে একসময় তুষারের ধস ভেঙে গিরি-সংকটের ভেতর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে। তখন তার সামনে যা কিছু

পড়ে, ভেঙে গঁুড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। গত শরতে গাঁয়ের তিনজন মরদ এই-ভাবেই মারা পড়েছিল।

গত বছরের কথাটা জুরার মনে পড়ে। সর্দারের কাছে গিরিসংকটের ওপর দিয়ে সৌকসাইয়ের দুই পাড় বরাবর একটা দড়ি বেঁধে দেবার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু নতুন কোন পরিকল্পনা বা পরিবর্তন সর্দার বরদাস্ত করতে পারে না। তাই সে চটে গিয়ে ওটাকে ছেলেমানুষী কল্পনা বলে খারিজ করে দিয়েছিল।

জুরার ধারণা, প্রস্তাবটায় অবাস্তব বা আজগুবী কিছু নেই। যাই হোক, এ বছর সর্দার এখানে নেই। একবার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়?

জুরা ভাবে। তারপর কুচাককে বললে কথাটা। হাঁটতে হাঁটতে এমন একটা অসাধারণ প্রস্তাব ঠিকমতো যাচাই করা শক্ত। তাই চলতে চলতে কুচাক বারবার থামতে থাকে। শেষে বললে,—নাঃ, ওটা চলবে না।

তবু দেখা যাক চেষ্টা করে।—জুরা ততক্ষণে মন স্থির করে ফেলেছে।

অনেক রাতে তুষার গলা বন্ধ হতে নদীতে জলের তোড় কমে এল। ঠিক হয়, কুচাকই আগে ওপারে যাবে। ইতিমধ্যে সে ও জুরা গুহা থেকে সব মাংস বয়ে এনেছে। মাংসের এক বোঝা পিঠে নিয়ে অনেক কষ্টে সে নদী পার হলো।

কুচাককে পেয়ে মেয়েরা মহাখুশী। সারা রাত ধরে চললো গল্পগুজব আর খবর দেয়া-নেয়া।

সূর্যোদয়ের আগেই জুরার পরিকল্পনা মতো কাজ শুরু হয়। গিরিসংকটের ওপারে কুচাক। তার সঙ্গে মেয়ে ও ছোকরার দল। এপারে জুরা, তার পেছনে জয়নাব।

মেয়েরা কুচাকের কাছে শুনেছে এই আজগুবী কাণ্ড—দড়ির ওপর দিয়ে নাকি মাংস পার হবে। তাদের মধ্যে হাসি-মস্করা চলেছে।

গিরিসংকটের ওপর দিয়ে দড়ি বাঁধা হয় সহজেই। জুরা দড়ির এক মাথায় পাথর বেঁধে নদীর ওপারে ছুড়ে দিতেই কুচাক তা ধরে প্রকাণ্ড এক ঢিবির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেললে। দড়ির অন্য প্রান্তটা জুরা অবশ্যি আগেই পাহাড়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিল।

জুরা এবার দড়িতে আলাদা একটা ফাঁস আলগা ভাবে আটকে তার সঙ্গে মাংসের একটা বোঝা ঝুলিয়ে দিলে। তারপর নিজের ল্যাসোর এক মাথা বস্তার সঙ্গে বেঁধে অন্য মাথাটা ওপারে কুচাকের দিকে ছুড়ে দিয়ে চিৎকার করে বললে,—টানো!

ছোকরাদের হাসির শব্দ ভেসে এল ওপার থেকে।

দোমনাভাবে কুচাক টান মারলে দড়িতে। বস্তাটা নেচে উঠলো, কিন্তু নড়লো না।

পা ফাঁক করে বিস্ফারিত চোখে জুরা দাঁড়িয়ে আছে—হাত মুষ্টিবদ্ধ, উত্তেজনায় ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছে। সে জানে, তার এ পরিকল্পনা সফল না হলে সারা জীবন তাকে সবার ঠাট্টার পাত্র হয়ে কাটাতে হবে।

জুরা ধৈর্য রাখতে পারে না। গলা সপ্তমে চড়িয়ে ঘুষি পাকিয়ে কুচাককে সে শাসাতে শুরু করে।

ঘাবড়ে গিয়ে কুচাক আরো জোরে টান মারলে ল্যাসোতে। কিন্তু বৃথা। বস্তাটা নড়ে না। উপরন্তু চামড়ার ফালি দিয়ে তৈরী দড়িটা জলের ঝাপটায় ভিজে গিয়ে ক্রমেই আলগা হয়ে আসতে থাকে, মাংসের ভারে সেটা একটু একটু করে নামছে নদীর দিকে। মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠলো,—গেল! গেল!

চোখ বড় বড় করে জয়নাব অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। জুরার মনের অবস্থা সে

যেন নিজের অন্তর দিয়ে বুঝতে পারে। এ পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ায় তো কোন বাধা নেই। তার কেন জানি মনে হয়, কুচাকের গাফিলতির জন্যে পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেলে পরাজয় শুধু জুরার নয়, পরাজয় তারও। উত্তেজনায় জুরার মতো সে-ও স্থির থাকতে পারে না। পাড় থেকে জলের ওপর যে পাহাড়টা ঝুঁকে আছে, একলাফে তার ওপর উঠে সে কলকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো,—টানো! টানো!

অসহিষ্ণুভাবে সে পাথরের ওপর সজোরে লাথির পর লাথি মারতে থাকে। কোন দিকে খেয়াল নেই।

হঠাৎ তার পায়ের তলা থেকে পাথরটা ধসে পড়লো। আর—আর সর্বনাশ! জয়নাব আকাশের দিকে হাত তুলে সোজা পড়ে গেল উন্মত্ত নদীর ভয়াল আবর্তে।

মেয়েরা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো,—গেল! গেল! হায় হায়, জয়নাব গেল!

আর কুচাক হকচকিয়ে গিয়ে ল্যাসোতে আরো জোরে টান মারতেই বস্তাটা সহজে চলে এল তার কাছে।

জুরা অবশ্য তার পরিকল্পনার এ সাফল্য দেখার জন্যে তখন সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। সৌকসাইয়ের ঘূর্ণাবর্তে জয়নাবের লাল জামাটার যেটুকু মাঝে মাঝে নজরে পড়ছে, সেদিকে চোখ রেখে পিছল পাথর-ঢিপিগুলোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সে পাড় ধরে ছুটছে তীরবেগে।

মাথায় তার একমাত্র চিন্তা : যে করে হোক জয়নাবকে বাঁচাতে হবে—এমন কি নিজের জান দিয়েও।

জলের তোড় জয়নাবকে মুক-সু নদীর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সৌকসাইয়ের মতো বহু নদীর সঙ্গম-স্থল মুক-সু। জয়নাব সেখানে গিয়ে পড়লে, হয় ঘূর্ণিতে তার হাড়গোড় মাথার খুলি চুরমার হয়ে দেহ কূলে আছড়ে পড়বে, আর নয়তো পর্বতের জলের তলার ডুবো অংশে গিয়ে আটকাবে।

ল্যাসো ঘোরাতে ঘোরাতে জুরা ছুটছে। নদীটা যেখানে বাঁ দিকে মোড় ঘুরেছে, সেখানে তীরের লাগোয়া নদীর মধ্যে বড় এক পাহাড়। তার ধারে অগভীর কিছুটা জায়গা। জয়নাবকে সেখানে দেখা গেল মুহূর্তের জন্য। জুরার কাছে তা-ই যথেষ্ট। চোখের পলকে তার ল্যাসো ছুটে গিয়ে জয়নাবের কাঁধ পেঁচিয়ে ফাঁস আটকে ফেললে। কিন্তু যে রকম দুর্দান্ত জলের তোড়—দড়ি টেনে রাখা দায়। জুরার গায়ে অবশ্য তখন মত্তহস্তীর বল।

শত চেষ্টা সত্ত্বেও দিন থাকতে কিছু করা গেল না। পাগলের মতো অস্থিরতায় জুরার সারা দিন কাটলো। রাতে জল নেমে গেলে জয়নাবকে সে পাড়ে তুলে আনলে। বিপর্যস্ত অবসন্ন জয়নাব, কাঁদারও শক্তি নেই—বড় দুর্বল, বড় অসহায়। তাকে নিজের ফার-কোটে জড়িয়ে কোলে করে জুরা তাবুতে নিয়ে এল।

সারা রাত জুরার চোখে ঘুম নেই। আগুনের পাশে জয়নাব ঘুমে অচেতন। নিষ্পলক চোখে জুরা চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। জয়নাবের কুঞ্চিত কালো কেশরাশি, অবাধ্য তারা জয়নাবের মতোই, তার মুদ্রিত চোখের পাতা, কম্পমান দীর্ঘ পক্ষ্মরাজি আর মসৃণ সুডৌল দুই বাহু—মুগ্ধ জুরা চোখ ফেরাতে পারে না।

পূব আকাশ ফরসা হতেই কুচাক নদী পার হয়ে এল। প্রশ্নের পর সে প্রশ্ন করে চলে। কিন্তু জুরা নির্বাক—গভীর চিন্তায় ডুবে আছে।

জয়নাবের ঘুম ভাঙলো আরো পরে। সে উঠে বসলো, যেন কিছুই হয়নি। আগের মতোই সে সতেজ—তেমনি প্রাণোচ্ছলা, হাসি-তামাসায় মুখর।

সমস্ত মাংস ওপারে নেওয়া শেষ হলে, জয়নাব জিজ্ঞেস করলে,—এবার আমায় পার করবে না?

জুরার চোখে ভ্রূকুটি দেখা দেয়। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সে পাল্‌টা প্রশ্ন করে,—সত্যিই কি তুমি যেতে চাও? কিন্তু কেন? একবার ভেবে দেখ, আমার প্রতি তোমার কি কোনই কর্তব্য নেই?

জয়নাব নির্বাক। এত দিন মনের মধ্যে যে চিন্তা তোলপাড় করেছে, বাইরে তা প্রকাশ পায় নি। আজ জুরার কথায় সেখানে বুঝি ঝড় উঠলো। গাঁয়ের সেরা সুন্দরী সে। সবাই জানে, কার সংগে তার বিয়ে হবে। জুরার জুটি জয়নাব, এটা স্বতঃসিদ্ধ যেমন অন্যদের কাছে, তেমনি জয়নাবের কাছেও।

তা ছাড়া গতকালকার ঘটনাই বা সে ভোলে কেমন করে? অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে সে রক্ষা পেয়েছে—কার জন্যে? কুচাকের মুখেই তো একটু আগে শুনলো জুরার সে সময়কার অবস্থা। কিন্তু তাগাই?...সর্দারের হুকুম?...জয়নাব ভ্রূ কোঁচকায়: কিন্তু—কিন্তু—

জুরা নীরবে অপেক্ষা করে আছে জবাবের জন্যে।

কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়নাব বললে,—কিন্তু তাগাই যে শাসিয়েছে তার কি হবে? তাছাড়া সর্দারের হুকুমও তো শুনেছ?

দৃপ্ত অস্থির ভঙ্গিতে জুরা উঠে দাঁড়ায়। জয়নাবের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর দৃঢ় কঠিন কণ্ঠে সে বললে,—তাগাইয়ের কথা কি বলছো? বাসমাচী ডাকাত! ওকে আমি থোড়াই পরোয়া করি। আর সর্দারের হুকুম? এ ব্যাপারে সর্দারের হুকুম আমি মানবো না। যাই হোক ওসব কথা রাখ। শুধু তুমি বলো, তুমি কি চাও?

জয়নাব চোখ নত করে। মাথা হেঁট করে ধীরে ধীরে বললে,—বেশ, তাই হোক।

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ালো। তাঁবুর দরজার দিকে যেতে যেতে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলে,—কিন্তু এ জন্যে তুমি আমায় কি দেবে?

জয়নাবের প্রশ্নের অর্থ জুরা কি বুঝলো, সে-ই জানে। গাঢ়স্বরে বললে,—কি দেব? কি চাও তুমি? গয়না? দাঁড়াও। শোন, তোমায় আমি দামী দামী পাথর-বসানো এমন এক সোনার কাঁকন দেব, যা আজ পর্যন্ত কেউ চোখেও দেখেনি।

জয়নাব অবশ্যি জুরার এ সব কথা শোনার জন্যে তখন সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। সোকসাইয়ের তীরে গিয়ে সে দাঁড়ালো। তারপর প্রাণপণ চীৎকার করে ওপারের মেয়েদের বললে,—মাংস নিয়ে তোমরা গাঁয়ে ফিরে যাও। আমি এখানে রয়ে গেলাম।

ওপার থেকে সবিস্ময় প্রশ্ন এল,—কিন্তু তাগাই? তাগাইয়ের ব্যাপারটার কি হবে? সর্দারের হুকুম .

হাত নেড়ে বিদায় জানাতে জানাতে সদর্পে জয়নাব জবাব দিলে,—ঈগলী কখনো দাঁড়কাকের সহচরী হয় না, দুরন্ত ঈগলকেই সে বেছে নেয়!

এদিকে কুচাকের প্রায়-মতিচ্ছন্ন অবস্থা। তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে সে মোটামুটি শুনেছে ওদের কথাবার্তা। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। সোনা! সোনার কি হবে? জয়নাব থাকবে এখানে। জুরা তাকে সোনার কাঁকন দেবে। সোনার ব্যাপারটা জয়নাব সবই জানবে। তার মানে, সবই গেল! কি হবে তাহলে? মাথামুণ্ডু কিছুই ভেবে পায় না কুচাক। এত বড় সমস্যা তার জীবনে এই প্রথম। যত ভাবে, মাথা ততই গরম হয়ে ওঠে। আর ছটফট করতে করতে সে সোকসাইয়ের পাড় ধরে কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকে। বুদ্ধিসুদ্ধি তার লোপ পাবার মতো।

দ্বিতীয় পর্ব ১

দিন গড়িয়ে চলে। শীত আসছে। চারদিকে তার স্পষ্ট আভাস।

জুরা ও জয়নাবের বিয়ে হয়ে গেছে। কুচাককেই করতে হয়েছে মোল্লার কাজ। বিয়ের পর জুরা ও জয়নাবের দিন কাটছে মধুর আনন্দে। জুরা জয়নাবকে একটা সোনার কাঁকন উপহার দিয়েছে। কাঁকনটি দেখে জয়নাবের খুশির অন্ত নেই।

আর সোনার চিন্তায় কুচাকের সময় যেন কাটতেই চায় না। ছটফট করে করে, দিন দিন সে রোগা হয়ে যাচ্ছে। শেষে আর থাকতে না পেরে জুরাকে সে একদিন বললে,—ওরকম একটা কাঁকন দিয়ে তুই পাঁচ-পাঁচটা বিবি কিনতে পারতিস। তা না, একটা ছুঁড়ীকে দিয়ে দিলি! তোর কি জ্ঞানগম্যি সব লোপ পেল? ফিরিয়ে নে, এখনো বলছি ফিরিয়ে নে!

এর ফল হলো উল্‌টো। জুরার চোখমুখ কঠিন হয়ে উঠলো। কয়েক দিনের মধ্যেই ধনভাণ্ডার থেকে সে জয়নাবকে উপহার দিলে আবো একটা কাঁকন আর বাজুবন্ধ। এমনি করে কুচাককে সে বুঝিয়ে দিলে, জয়নাবকে তার অদেয় কিছু নেই।

ঠাট্টা করে কুচাককে সে হাসতে হাসতে বললে,—তুমি তো জেস্টার্‌নাকের সোনার হাত চেয়েছিলে। তা জয়নাবের হাতের দিকে চেয়ে দেখ, ওটা তো পেয়েই গেছ, কি বলো?

হিংসায় কুচাক যেন ক্ষেপে যায়। অসহ্য দাহনে জ্বলে পুড়ে মরে।

জুরা জয়নাবের কথা মতো চলে। জয়নাব না বললে শিকারে যায় না। ওদের আনন্দ-কলহাস্যে গুহা ক্ষণে ক্ষণে মুখরিত হয়ে ওঠে। এমন অনাবিল মিষ্টি সুখের জীবন জয়নাব কোনদিন কল্পনাও করে নি। সুমধুর স্বপ্ন যেন। যা কিছু অশান্তি শুধু কুচাককে নিয়ে। তার সঙ্গে অকারণ খিটিমিটি ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে, আর দিনে দিনে তা বৃদ্ধির পথে। ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো কুচাক যেন কামড়াবার জন্যে সব সময় তৈরী হয়ে আছে। অবশ্যি জুরা উপস্থিত থাকলে সে চুপচাপ থাকে।

সময় সময় জয়নাবের মনে পড়ে অনুচর মারফৎ তাগাইয়েব সেই শাসানি : খবরদার জয়নাব, আব কাউকে শাদি করেছ কি, আমার হাতে তোমায় খুন হতে হবে।

চিন্তাটা জয়নাব মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায়, নিজেকে প্রবোধ দেয় : গাঁয়ে এসে তাগাই যখন শুনবে জুরার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, সে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে।

কুচাকেব খাওয়া পড়ে গেছে। সোনার চিন্তায় সারা রাত সে চোখ বুজতে পারে না। কিন্তু করণীয়ই বা কি? সাবাক্ষণ দাঁত কিড়মিড় কবা আর জয়নাবের মৃত্যু-কামনা ছাড়া আর কি যে কববে, ভেবে পায় না।

দ্বিতীয় পর্ব ২

দিনের পর দিন বিজাতীয় হিংসার বিষবাষ্প ও বারুদ জমা হচ্ছে কুচাকের মনে। অসহ্য তার জ্বালা।

তারপর হঠাৎ সেদিন সেই বারুদে ঘটলো বিস্ফোরণ।

জুরা শিকারে বেরিয়ে যেতেই, সেই সাত সকালে কুচাক অনর্থক ঝগড়া বাধালো জয়নাবের সঙ্গে। কথা কাটাকাটি চলেছে, আচমকা কুচাক ধাক্কা মারলে জয়নাবকে। জয়নাব পড়ে গেল। কুচাকের মাথায় তখন বুঝি শয়তান চেপেছে। সে কুঁজো হয়ে বাঁ হাতে তার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা চেপে ধরলো মাটির সঙ্গে।

জয়নাব হকচকিয়ে গেছলো। পরক্ষণে এক ঝটকায় সে উঠে দাঁড়ালো। তারপর একখানা লাঠি নিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে শুরু করলো কুচাককে।

কুচাকের রাগ ততক্ষণে ঠান্ডা। সে গোঙাতে থাকে,—আরে আরে, থাম্ থাম্! আর মারিস নে, আর মারিস নে। ক্যামা দে।

ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে জয়নাবের। চুল আলুথালু। জামার বাঁ পাশটা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বললে,—হতভাগা নচ্ছার গিদ্ধড়, আসুক জুরা, তাকে বলে তোর আজ কি দশা করি, দেখিস বুড়ো খটাশ!

তাই তো! সর্বনাশ! কথাটা তো মনে ছিল না!—হতভম্ব কুচাক ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লো জঙ্গলের দিকে।

খিদের জ্বালায় টীক আর এককানী সারা সকাল পর্বতে পর্বতে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে। শীতেব ঘুম দেবার জন্যে মারমটেরা গর্তে ঢুকে গেছে। ইঁদুরদেরও পাত্তা নেই। তাই ক্ষুধার্ত কুকুর দুটো ফিরলো ঘরমুখো।

জয়নাব বসে ছেঁড়া জামাটা সেলাই করছে, এমন সময় টীক ও এককানী নিঃশব্দে গুহায় ঢুকলো। দাঁড় থেকে মাংস ঝুলছে। টীক জোরে লাফ মেরে বড় একখণ্ড মাংস কামড়ে ধবে টান মারতেই, মাংসসুদ্ধ দাঁড়টা ভেঙে পড়লো হুড়মুড় করে।

জয়নাব লাফিয়ে উঠলো। বড় একখণ্ড মাংস টেনে নিয়ে টীক দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে গুহা থেকে। তার পেছনে এককানী। জয়নাবেব মনমেজাজ এমনিতেই তিরিক্ষে হয়ে আছে, তার ওপব কিনা এই কাণ্ড! বিষম রাগে সে লাঠি নিয়ে ধাওয়া করলো টীকের পেছনে। বুট জোড়া পায়ে দেবারও সময় হলো না।

মাংসের খণ্ডটা যথেষ্ট বড়, ভারীও বটে। সেটা টেনে নিয়ে টীক পর্বতের ঢাল বেয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে সোকসাইয়ের দিকে। হাঁফাতে হাঁফাতে জয়নাব ছুটছে পেছনে।

গুহা থেকে তারা অনেক দূরে এসে পড়েছে, এমন সময় টীক হঠাৎ মাংসটা ছেড়ে দিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো। ছাইরঙা প্রকাণ্ড দুই কুকুর পাথর-ঢিবির পেছন থেকে আচমকা লাফ মেরে ধেয়ে আসছে তাব দিকে।

টীকও খাড়া দাঁড়িয়ে পড়লো। এক পা পিছু না হটে রুখে দাঁড়ালো—একলাই দুই বিশালকায় প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে।

জয়নাব এত রেগে আছে যে, অপরিচিত কুকুর দুটো কোথা থেকে এল, সে চিন্তা একবারও তার মাথায় এল না। বড় একখানা পাথর সে ছুড়ে মারলে টীকের দিকে। পাথরখানা টীক এড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু কুকুর দুটো ততক্ষণে আক্রমণ করেছে। টীক এক লাফে উঁচু এক টিলার ওপর উঠে পড়ে। পেছনে একটা কুকুর লাফ দিয়েছে তাকে ধরার জন্যে। কিন্তু পরক্ষণে সে ছুটে পালালো আর্তনাদ করতে করতে। টীক তার টুঁটি কামড়ে দিয়েছে।

জয়নাব এবার গুহার দিকে পা বাড়ায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বড় বড় পাথরের চাঁই ও ঢিবির পেছন থেকে বেরিয়ে এল একদল সশস্ত্র লোক। তাদের একজন পেছন থেকে জয়নাবকে নাম ধরে ডাকতেই, চমকে ফিরে দাঁড়ালো জয়নাব। লোকটার ওপর নজর

পড়তেই আতঙ্কে তার হাত-পা যেন অসাড় হয়ে আসে। ধীরে ধীরে একটা ঢিবির ওপর বসে পড়লো সে। তাগাই! লোকটা আর কেউ নয়—তাগাই! তাগাইয়ের মুখের ওপর তার দৃষ্টি যেন আটকে গেছে।

কক্! গপ্! এদিকে আয়।—তাগাই ডাক দেয় কুকুর দুটোকে। তারা তখন হিংস্র আক্রোশে মোকাবিলা করছে টীকের সঙ্গে। কিন্তু এঁটে উঠতে পারছে না।

ছাড়িয়ে দাও কুকুরগুলোকে!—অনুচরদের হুকুম দিয়ে তাগাই এগিয়ে যায় জয়নাবের দিকে। জয়নাব ততক্ষণে কিছুটা সামলে নিয়েছে। সে উঠে দাঁড়ায়। তাগাই জিজ্ঞেস করে,—তারপর? কি করছো এখানে?

পরক্ষণে সোনার কাঁকন ও বাজুবন্ধগুলোর দিকে নজর পড়তেই তার চোখ কুঁচকে এল,—বাঃ বাঃ! কোথায় পেলে এগুলো?

তাগাইয়ের দুই অনুচর খাঁদা আর চির। খাঁদার নাক নেই।

ফিস্‌ফিস্ করে খাঁদা বললে,—সোনা!

আলবৎ! সোনা। খাঁটি সোনা!—বিড়বিড় করে উঠলো চির।

সঙ্গে সঙ্গে খাঁদা ছুটে গিয়ে জয়নাবের হাত চেপে ধরলো। তাড়া-খাওয়া শিকারের মতো জয়নাবের অবস্থা। সে ত্রস্ত চোখে এদিক ওদিকে তাকায়। কিন্তু সব দিকেই শুধু কতকগুলো বিস্ফারিত চোখের লোলুপ দৃষ্টি তার সোনার কাঁকন ও বাজুবন্ধগুলোর দিকে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল তাগাই। খাঁদার হাত চেপে ধরে জুজুৎসুর একটা প্যাঁচ মারতেই সে গোঙিয়ে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সরে গেল একপাশে। জয়নাবের দিকে ফিরে তাগাই বললে,—তারপর, তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, সর্দার তোমাকে দিয়ে আমার দেনা শোধ করেছে?

বেশ, তার বদলে এই কাঁকন ও বাজুবন্ধগুলো নাও।—বলতে বলতে জয়নাব সেগুলো খুলে তাগাইয়ের দিকে এগিয়ে ধরলো।

কিন্তু তাগাইয়ের চোখে বিদ্রুপের হাসি। সে মাথা নাড়ছে। তার পরেই জয়নাবের হাত চেপে ধরে সে রূঢ়কণ্ঠে বললে,—হয়েছে! এবার চলো, যাওয়া যাক।

অসহায় কণ্ঠে জয়নাব কেঁদে উঠলো,—না, না, কক্ষণো না! কক্ষণো না! আমায় ছেড়ে দাও। আমি জুরার বৌ, জুরার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। তোমায় সে অনেক সোনা দেবে।

বলতে বলতে সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ডাকাত দলের ভেতর দিয়ে ছুটতে থাকে চড়াই বেয়ে।

ধর্ ওকে!—তাগাই নিজের কুকুরটাকে লেলিয়ে দেয় জয়নাবের দিকে।

ছাইরঙা প্রকাণ্ড কুকুরটা তেড়ে গিয়ে জয়নাবের জামা কামড়ে ধরলো। জয়নাব মাথা থেকে ওড়না টেনে নিয়ে তাই দিয়েই মারতে থাকে কুকুরটাকে। কিন্তু ঐ ক্ষীণ প্রতিরোধ কতক্ষণ চলে! কুকুরটা তাকে মাটিতে ফেলে দিলে। তাগাই গিয়ে জয়নাবের হাত ধরে টান মারলে,—ওঠো!

কিন্তু জয়নাব ওঠে না। অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে।

তোল ওকে!—তাগাই হুকুম দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো অশ্রুমুখী জয়নাব। মারমুখী চেহারা। ডাকাতদের সঙ্গে শুরু হলো তার মারামারি ধস্তাধস্তি। এক বাঘিনী লড়ছে যেন একপাল হিংস্র নেকড়ের সঙ্গে। তাদের সে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে তোলে আর একটানা বুকফাটা আর্ত চিৎকার করতে থাকে: জুরা—জুরা—জুরা—

কিন্তু কোথায় জুরা! সে তখন অনেক দূরে। প্রতিধ্বনিই শুধু গুমরে ফেরে অরণ্যে পর্বতে।

একা জয়নাব কতক্ষণ পারবে অতগুলো দুর্ধর্ষ ডাকাতের সঙ্গে! তাগাইয়ের ভয় জুরাকে নিয়ে। তার সন্ত্রস্ত কণ্ঠের হুঙ্কার শোনা যায়,—একটা মেয়েছেলেকে তোমরা কাবু করতে পারছো না! সৌকসাইতে ডুবে মরো গে!

শেষ পর্যন্ত জয়নাবকে ওরা বেঁধে ফেললে। তাগাইয়ের হুকুমে তাকে বয়ে নিয়ে চললো নীচে সৌকসাইয়ের দিকে।

চিরের বাঁ গাল ছড়ে গেছে। সেখানে হাত বুলোতে বুলোতে তাগাইকে উদ্দেশ করে সে বললে,—কী সাংঘাতিক ছুঁড়ী রে বাবা! দেখো সর্দার, ওর জন্যে তোমার কপালে দুঃখ আছে, বলে রাখছি। এখন তো শুনবে না, বুঝবে পরে।

তাগাইও রেহাই পায় নি জয়নাবের আক্রোশ থেকে। জয়নাবের কামড়ে তার হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে।

সারা অন্তর মন্থন করে জয়নাবের দু চোখে নেমেছে ব্যথার অশ্রুধারা। প্রাণের আকুতি জানাচ্ছে সে দেওদের কাছে, আকাশ ও পর্বতমালার কাছে,—হে দেও, আমাকে চলে যেতে হচ্ছে! জুরাকে বলো সব কথা। বলো, জানোয়ার তাগাই আমাকে জোর করে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল!

নিস্তব্ধ আকাশ, পর্বত ও বনভূমি। নিষ্পলক চোখে তারা বুঝি তাকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর এক ভবিষ্যতের দিকে। আর ধীরে ধীরে জয়নাবের বুকফাটা কান্নার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যায় দূরে—দূর থেকে আরো আরো দূরে—

দ্বিতীয় পর্ব ৩

এক জোড়া উলার নিয়ে জুরা শিকার থেকে ফিরে এল। দূর থেকে সে জয়নাবকে ডাকছে। অন্য দিন জয়নাব ছুটে বেরিয়ে আসে গুহা থেকে। কিন্তু আজ এই ব্যতিক্রম কেন?

জুরা আশ্চর্য হয়। জয়নাবকে ডাকতে ডাকতে সে গুহায় ঢুকলো। জুরার গলা শুনে কুচাকও ফিরে এল জঙ্গল থেকে। জয়নাবকে না দেখে সে-ও অবাক। জুরার কোন প্রশ্নেরই সে জবাব দিতে পারে না। মাথা হেঁট করে শুধু ঘাড় নেড়ে চলে।

নিভে-যাওয়া আগুনের পাশে জয়নাবের চামড়ার বুটজোড়া পড়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে জুরা আশ্বস্ত হয়ঃ জয়নাব তাহলে বেশী দূরে যায় নি।

ঘণ্টাখানেক চুপচাপ কেটে গেল। তার পরেও জয়নাব ফিরলো না দেখে জুরা এবার উদ্বেগ বোধ করে। গুহার বাইরে এসে নাম ধরে সে বারবার ডাকতে থাকে জয়-নাবকে। কিন্তু ফিরে আসে শুধু প্রতিধ্বনি।

এবার টীককে সে ডাকলো।

গুহার অদূরে বিপর্যস্ত ক্ষুধার্ত টীক তিরিক্ষি মেজাজে বসে ক্ষতস্থানগুলো চাটছে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে এই তার প্রথম সত্যিকার শক্তি-পরীক্ষা এবং এ পরীক্ষায়

সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার দাবি সে অনায়াসে করতে পারে। প্রকাণ্ড দু-দুটো শক্তিমান অভিজ্ঞ কুকুরের সঙ্গে লড়াইয়ে সে এক পা-ও পিছু হটে নি, তাদের এতটুকু সুযোগ দেয় নি ওকে কাবু করার।

জুরার ডাকে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল। তার গায়ে এখানে-ওখানে রক্ত। তার অবস্থা দেখে জুরা যেমন অবাক হয়, উদ্বিগ্ন হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। তার ক্ষত-স্থানগুলো পরীক্ষা করতে করতে সে বললে,—কী ব্যাপার! টীক কার সঙ্গে মারামারি করলে? জয়নাবই বা কোথায়?

এ প্রশ্নের জবাবও কুচাকের জানা নেই। তার কাছেও সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যজনক।

জয়নাবের একটা জামা জুরা টীকের নাকের কাছে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে গোঁ গোঁ করে লাফিয়ে উঠলো টীক। জয়নাবের গায়ের গন্ধ সে বরদাস্ত করতে রাজী নয়—তাকে খোঁজা তো দূরের কথা। সে ভোলে নি, জয়নাব কিভাবে তাকে তাড়া করেছিল, এবং তার বিষম বিপদের সময় সাহায্য করা তো দূরের কথা কিভাবে তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল।

টীকের এই আচরণে জুরার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। যতবার সে জামাটা টীকের নাকের কাছে ধরে, ততবারই সে গজরাতে গজরাতে পিছু হটে যায়।

শেষ পর্যন্ত জুরা কড়া ধমক লাগালো,—টীক, কিশ কিশ! এদিকে আয়। খোঁজ্ খোঁজ্!

টীক এবার এগিয়ে এল ধীরে ধীরে—অনুগতের মতো, যদিও অনিচ্ছার সঙ্গে। তারপর জয়নাবের জামাটা শুঁকে দৌড়লো গুহার বাইরে। একটা বল্লম টেনে নিয়ে জুরা ছুটলো তার পেছনে।

উৎরাই বেয়ে তারা নামছে। হঠাৎ জুরা দাঁড়িয়ে পড়লো। অদূরে পর্বত-ঢালে টিলা ও ঢিবির মাঝে জয়নাবের লাল ওড়নাটা পড়ে আছে। জুরা ছুটে গিয়ে সেটা তুলে নিলে। সাম্প্রতিক লড়াইয়ের চিহ্ন সর্বত্র। জুরা বসে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিহ্নগুলো পরীক্ষা করতে থাকে।

হঠাৎ একটা খসখস আওয়াজ আসে তার পাশ থেকে। জুরা দেখে, কতকগুলো ছায়া তার চারপাশে। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

তাকে ঘিরে পাঁচজন লোক। তিনজনের হাতে রাইফেল, দুজনের হাতে শিকারের বন্দুক। একজনের নাক নেই, সারা মুখে বসন্তের দাগ। আর একজন কুঁজো বেঁটে আর বুড়ো। তার পাশেই আর একজন—মোটাসোটা, মুখে কালো দাড়ি।

জুরাকে ওরা আগে দেখে নি বটে, তবে তার সম্বন্ধে যেটুকু শুনেছে, তাতে এই তরুণ শিকারীকে জুরা বলে অনুমান করতে তাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। তারা সতর্ক হয়। ইশারায় কি যেন কথা হয় তাদের চোখে চোখে। প্রথম কথা বলে কালো দাড়িওলা। বললে,—শিকার করা ভারী চমৎকার, তাই না?

এতগুলো সশস্ত্র অপরিচিত লোক দেখে, কয়েক লহমার জন্যে জুরা হকচকিয়ে গেছলো। প্রশ্নটা কানে যেতেই তার যেন হুঁশ ফিরে এল, বললে,—আলবৎ! আলবৎ!

লোকটার কথা বলার ধরন দেখে জুরা একটু অবাক হয়। অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করার কেতাদুরস্ত আদবকায়দায় তারা অভিজ্ঞ সন্দেহ নেই। সন্দিগ্ধ চোখে সে লোকগুলোর আপাদমস্তক পরখ করে। খাঁদার বুটের তলায় নাল লাগানো। যে সব দাগ এ পর্যন্ত এখানে নজরে পড়েছে, তাতে এটা নিশ্চিত যে, যারা এখানে লড়াই করেছে, তাদের কারো বুটের তলায় নাল লাগানো ছিল।

কালো দাড়িয়াল জুরার বল্লমটার ওপর এমনভাবে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে, যেন

ব্যাপারটা আকস্মিক। সেদিকে চকিত দৃষ্টি হেনে জুরা জিজ্ঞেস করলে,—তা মুসাফিরদের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

বেঁটে বুড়ো লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয়,—ও-হো আদবকায়দা জানা নেই দেখছি! মেহমানদের আগে খাতির-যত্ন খানাপিনার বন্দোবস্ত করতে হয়, তার পরেই তো সওয়াল করার রেওয়াজ।

জুরা চাইছে, এদের কোনরকমে বিদায় দিয়ে সে জয়নাবের খোঁজ করে। কিন্তু বুড়োর কথার পর প্রচলিত রীতি অনুসারে তাদের গুহায় নিমন্ত্রণ না করে উপায় কি? অন্ততঃ জুরার জানা নেই। মানসিক উদ্বেগ চেপে যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে সে বললে,—বিবি সাহেবা জ্বালানি আনতে গেছেন। তাকে কি দেখেছেন আপনারা?

ধড়িবাজ খাঁদা প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল, বললে,—এই প্রথম একজন শিকারীর সঙ্গে মোলাকাত হলো, যিনি তার বিবির খোঁজ করছেন।

এর পর আর কথা চলে না, অন্ততঃ জুরার পক্ষে। আগন্তুকদের নিয়ে সে গুহায় ফিরলো।

এতগুলো অপরিচিত লোক দেখে কুচাক তো ভয়ে দিশেহারা। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, বুদ্ধিসুদ্ধিও লোপ পাবার মতো। কাঁপতে কাঁপতে সে জুরার হুকুম মতো চা তৈরি করে পরিবেশন করে আগন্তুকদের।

জুরার কিন্তু নজর নেই কোন দিকে—আনমনে সে বসে বসে সরু একখানা কাঠে ছুরি দিয়ে ছোট এক মূর্তি খোদাই করছে আর ভাবছে জয়নাবের কথা। মনে মনে স্বভাবতঃই সে অস্থির জয়নাবের জন্যে।

চা খাওয়া শেষ হতেই বুড়ো বাসমাচিটা মাথা নেড়ে কি যেন ইশারা করলে। পরক্ষণে দলের একজন জুরার ভারী ছোরাখানা এমনভাবে তুলে নিলে, যেন তার হাতলের নকশা তাকে আকৃষ্ট করেছে। আর একজন আড়মোড়া খেতে খেতে ধীরে সুস্থে গিয়ে দাঁড়ালো গুহার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে খাঁদা ইসারা করতেই সবাই যে যার বন্দুক উঁচিয়ে ধরলো একসঙ্গে।

কোমরবন্ধ থেকে কি একটা জিনিস বের করে খাঁদা এবার মেলে ধরলে জুরার সামনে: পান্না-বসানো বাজুবন্ধ একটা, জুরা যা জয়নাবকে উপহার দিয়েছিল।

জুরার চোখ বিস্ফারিত। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। এত বড় বিস্ময়ের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। কি করেই বা থাকবে—কোন অভিজ্ঞতাই তার নেই। সে লাফিয়ে উঠে ছুটলো গুহার মুখের দিকে।

মুখের কাছে যে বাসমাচিটা দাঁড়িয়ে আছে, সে পা বাড়িয়ে দিতেই জুরা দারুণ জোরে আছাড় খেয়ে পড়লো মাটিতে। বাসমাচিরা সবাই চেপে ধরলো তাকে। চির তার বুকে ছোরা বসাতে যাবে, খাঁদা বাধা দিলে: উঁহু! ও না থাকলে সোনাদানা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, আমরা জানতেই পারবো না।

জুরা গলা ফাটিয়ে ডাক ছাড়লে,—টীক! টীক!

কিন্তু টীক তখন বহুদূরে। সকালের বাকী মাংসটুকু এককানী কোথায় চাপা দিয়ে রেখেছে, তা-ই খুঁজতেই সে ব্যস্ত।

জুরা চেঁচায়,—কুচাক! কুচাক!

কিন্তু কুচাক তখন আতঙ্কে প্রায় মরো-মরো।

ডাকাতরা জুরাকে বেঁধে টানতে টানতে গুহার মাঝখানে আগুনের পাশে নিয়ে এল।

শোন!—খাঁদা বললে: জয়নাব এখন আমাদের সর্দার তাগাইয়ের বিবি হয়েছে। খোশমেজাজেই সে তাগাইয়ের সঙ্গে কাশগড়িয়ায় চলে গেছে। যাবার সময় বলে

গেছে, আমার এই বাজুবন্ধটা নাও, শিকারী জুরাকে গিয়ে বলো, সে যেন আমার সব সোনাদানা, রুপোর থালাবাসন, কাপ-ডিস, টাকাকড়ি তোমাদের কাছে দিয়ে দেয়। শোন, আমরা কথা দিচ্ছি, সোনাদানা সব দিয়ে দিলে তোমায় আমরা ছেড়ে দেব।

তাগাইয়ের নাম শুনতেই মুহূর্তে গোটা ব্যাপারটা জুরার কাছে মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে গেল। দুরন্ত রাগে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো,—বেইমান! মিথ্যে কথা বলছিস, শয়তান কুত্তার দল!

কালোদেড়ে বাসমাচিটা তেড়ে উঠলো,—চোপ্ রও, বেল্লিক ছুঁচো! বল্, সোনা-দানা কোথায় আছে!

বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করতে করতে জুরা মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠছে। গর্জে উঠলো সে,—নিজেরাই খুঁজে নে, বদমাস জানোয়ার! তোদের আমি থোড়াই পরোয়া করি!

বাসমাচিরা এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো জুরার ওপর। শুরু হলো মার—বেদম মার—অমানুষিক অকল্পনীয়।

যন্ত্রণায় জুরা চিৎকার করতে থাকে, শাপ-শাপান্ত করে বাসমাচিদের। কিন্তু সোনা সম্বন্ধে একটা কথাও বের হয় না তার মুখ থেকে।

পিটুনিতে কাজ হলো না দেখে ডাকাতরা এবার নতুন দাওয়াই ঠিক করে। একটা ছোরা এনে তারা আগুনে গরম করলো, তারপর লাল টকটকে ছোরাটা চেপে ধরলো জুরার গায়ে।

গন্‌গনে আগুনে লোহার ছেঁকা! অকথ্য দুর্বিষহ যন্ত্রণা! জুরা বুকফাটা আর্তনাদ করতে থাকে। তবু ছেঁকা চলতে থাকে অবিরাম।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সব দাওয়াই-ই ব্যর্থ হয় একে একে—জুরার কাছ থেকে বাস-মাচিরা একটা কথাও আদায় করতে পারে না সোনা সম্বন্ধে।

কুচাক দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে ককাচ্ছে সেই প্রথম থেকে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, আর একটানা বকে চলেছে,—আমাদের কাছে কোন সোনা নেই, একরত্তি সোনাও নেই..জয়নাব সেরেফ ঝুটো বাৎ বলেছে। মেয়েছেলের কথায় যে মরদ বিশ্বাস করে, সে আস্ত গাধা, আস্ত নিরেট গাধা......

বাসমাচিদের এবার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো কুচাকের ওপর। তাকে বেঁধে ওরা আগুনের পাশে নিয়ে এল। তারপর শুরু করলো মারতে। একটানা চললো সকলের সম্মিলিত নির্মম বেদম প্রহার।

কিন্তু তাতেও ফল হলো না দেখে খাঁদা গর্জে উঠলো,—দাঁড়া হারামজাদা ধাড়ী কাক, তোর ককর্ ককর্ কি করে বন্ধ করতে হয় দেখাচ্ছি। ওহে, পচা খাটাসটাকে লাল টকটকে লোহার আস্বাদটা একটু টের পাইয়ে দাও তো।

চির উঠলো। সে ঠিক করে, কিরঘিজ বলশেভিকদের কাছ থেকে যে কায়দায় কথা বের করা হয়, সেইটাই সে চালাবে কুচাকের ওপর। রাইফেলের ভেতর থেকে নল-সাফ-করা লোহার ছড়গুলো নিয়ে সে ধরলো আগুনের মধ্যে। সেগুলো তেতে লাল টকটকে হতেই, তাই দিয়ে সে পেটাতে শুরু করলো কুচাককে।

অসহ্য জ্বালায় কুচাকের সারা দেহ যেন দাউদাউ করে জ্বলছে। তার সে মর্মভেদী আর্তনাদ কোন মানুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। তার মনে হয়, ভেতরটা বুঝি পুড়ে খাক হয়ে গেল।

শেষে হাহাকার করতে করতে কুচাক এক সময় গেঙিয়ে উঠলো,—পুড়ে গেল! পুড়ে গেল! গেলাম! গেলাম! থামো! থামো! বলছি, সব বলছি......

তারপর গোঙাতে গোঙাতে কুচাক ভাঙা ভাঙা কথায় জানালে, গুহার কোথায় কোন্ গর্তে লুকনো আছে সোনাদানা, হিমবাহের কোথায় কোন্ বরফ-ফাটলে তারা পেয়েছিল এসব, আরো কত সোনা আছে সেখানে......একে একে সব খবরই বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, আর বেরিয়ে এল রক্তের গাজলা মুখের দু কশ বেয়ে......

পৈশাচিক লুব্ধতায় ডাকাতেরা হুড়োহুড়ি করে গর্ত থেকে সোনার জিনিসগুলো টেনে বের করলে। তারপর ঝুটোপুটি করতে করতে আবার ফিরে এল কুচাকের কাছে। কুচাক চোখ উলটে শিবনেত্র হয়ে পড়ে আছে। দাঁতে দাঁত আঁটা।

কালো-দাড়িওলা ছোরা টেনে বের করতেই থাঁদা তার হাত চেপে ধরলে,—না, এখন নয়। ও যদি মিথ্যে বলে থাকে, তাহলে খাঁটি কথা জানার আর কোন উপায় থাকবে না। তাই আরো কিছু সময় ওদের জিইয়ে রাখা দরকার।

তারপর গুহার সরু মুখ পাথরের চাংড়া দিয়ে বন্ধ করে ডাকাতেরা ছুটলো হিমবাহের দিকে—আরো সোনার সন্ধানে।

দ্বিতীয় পর্ব 8

বাসমাচিরা বেরিয়ে যায়ার প্রায় পর পরই ছুটতে ছুটতে টীক এসে হাজির। গুহার ভেতর থেকে জুবাও বুঝতে পারে টীকের উপস্থিতি। তার অস্পষ্ট গলা ভেসে এল,—টীক, টীক! ভেতরে আয় টীক, ভেতবে আয়!

গুহার আটকানো মুখের দিকে টীক ধেয়ে যায়। চাঙড়াগুলোর সামনে শুরু হলো তার লাফালাফি। সেই সংগে ডাকতে থাকে সে অধীর কণ্ঠে।

পাথরগুলো আঁচড়ে ঠেলে সে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্তু পাবে না। এবার খাড়াই বেয়ে সে ধাওয়া করলো ওপর দিকে, পাহাড়টার মাথায় উঠে ধোঁয়া বেরোবার পথ দিয়ে তাকালো নীচের গুহার মধ্যে।

গুহার মধ্যে টীকের ছায়া পড়েছে। জুরা হাঁক ছাড়ে,—টীক, আয় আয়! টীক, টীক, ভেতরে আয়!

টীক আবার ছুটলো নীচের দিকে। গুহার সামনে কয়েক মুহূর্ত আবার সেই লাফালাফি আর ছুটোছুটি। শেষে তার বোধহয় ধারণা হলো, এভাবে চলবে না। সে ধেয়ে গেল বড় এক পাহাড়ী ইঁদুরের গর্তের কাছে—বাচ্চা বয়সে গুঁড়ি মেরে এই গর্তের ভেতর দিয়ে সে গুহার বাইরে যাতায়াত করেছে বহুবার।

গর্তটা সে শুঁকে নিলে একবার, তারপর খুঁড়তে শুরু করলে। নখরের ঘায়ে দলাদলা জমাটবাঁধা মাটি উঠে আসে, কেটে গিয়ে তার থাবাও জখম হলো। কিন্তু টীকের খোঁড়ার বিরাম নেই। ভেতর থেকে জুরার ডাক কানে আসছে, আর গোঁ গোঁ করতে করতে টীক আরো জোরে খুঁড়ছে গর্তটা।

জুরা এসবের কিছুই জানে না। তার মনে হতাশা চেপে বসছে। সে বাঁধান ছিঁড়তে চেষ্টা করে, কিন্তু চামড়ার দড়া গায়ে কেটে বসে আরো জোরে। হামাগুড়ি দিয়ে যে কুচাকের কাছে যাবে, তারও সামর্থ্য নেই। সামান্য নড়াচড়াতেই ছেঁকা-দেওয়া শরীর অসহ্য যন্ত্রণায় টাটিয়ে উঠছে। নিজের মনেই সে বলে,—নাঃ, আর হলো না। বাসমাচিরা ফিরে এসে খুনই করবে।

ওদিকে চোখ বুজে একটানা আর্তনাদ করে চলেছে কুচাক।

এমন সময় হঠাৎ কালো কি একটা ঝাঁপিয়ে পড়লো গুহার মধ্যে। পরক্ষণে টীক জুরার মুখ চাটতে শুরু করে।

সে যে কী আনন্দ জুরার! কিন্তু তার তর সয় না। সে ভেবে পায় না, কিভাবে টীককে বোঝাবে যে, দাঁত দিয়ে তাকে চামড়ার ফালিগুলো কেটে ফেলতে হবে। পিঠ-মোড়া দিয়ে বাঁধা হাত দুটো ওপর দিকে তুলে সে বললে,—ধর্ টীক, ধর! কেটে ফ্যাল্!

টীক ঘাবড়ে যায়। সে জুরার হাত শোঁকে, আঙুল চাটে, চামড়ার ফালিগুলোও শোঁকে দু-একবার। কিন্তু জুরা কি চায়, বুঝতে পারে না।

জুরার উদ্বেগ চরমে ওঠে। আর সময় নেই। এভাবে কিছু হবে না, সে বুঝতে পারছে। টীককে এবার সে কাছে ডেকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালে তার চোখের দিকে। জুরার উত্তেজনা টীকের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। সে লাফিয়ে উঠেই আবার বসে পড়লে।

জুরার নিষ্পলক স্থির দৃষ্টি টীকের চোখে নিবদ্ধ। সে একটানা বলে চলেছে,—টীক, চামড়াগুলো কেটে ফ্যাল্! কেটে ফ্যাল্, টীক, কেটে ফ্যাল্!

টীক তবু ধরতে পারে না, মনিব কি চায়। অন্য দিকে বারেক মুখ ফেরায় সে। কিন্তু জুরা হাল ছাড়ে না। সমানে বলে চলে,—কেটে ফ্যাল্, টীক, চামড়াগুলো কেটে ফ্যাল্!

এ ছাড়া করারও কিছু নেই। টীকই একমাত্র ভরসা—যদি সে কোনরকমে বুঝতে পারে, মনিব কি চায়।

জুরার চোখে চোখ রেখে হঠাৎ একসময় টীক যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আশা ও আনন্দে জুরার বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়ঃ এইবার—এইবার বোধহয় টীক বুঝতে পেরেছে!

পরক্ষণে দাঁত দিয়ে টীক চামড়ার ফালি কামড়ে ধরলো। তার পরেই কেটে ফেললে চামড়ার বাঁধন। আনন্দে আত্মহারা জুরা অবশ হাতে টীকের মাথা বুকে চেপে ধরলো।

পায়ের দড়ি কেটে যন্ত্রণা সত্ত্বেও জুরা উঠে দাঁড়ালো। কুচাকের বাঁধন কেটে দিলে। তারপর সমস্ত শক্তি জড়ো করে পাথরগুলো সরিয়ে এল গুহার বাইরে। পর্বতের মাথায় উঠে সে দেখে, দূরে বাসমাচিরা ফিরে আসছে।

গুহায় ফিরে কুচাককে সে বললে কিছু শুঁটকী মাংস সঙ্গে নিতে, আর নিজে নিলে বন্দুক, চকমকি, গোলাবারুদ আর কিছু চামড়া।

বসন্তকালে তারা যেখানে চিতাবাঘ বা প্যান্থারটাকে ফাঁদে আটকেছিল, সেই বাঘটার গুহা তার কাছেই। পূবের গিরিশ্রেণী ধরে তারা রওনা হয় সেদিকে। মহানন্দে টীক ছুটছে আগে আগে।

গুহাটা খুঁজে বের করে তারা ভেতরে ঢুকলো। শুয়ে পড়েই কুচাক শুঁটকী মাংস চিবোতে শুরু করে। কিন্তু জুরার মাথায় অন্য চিন্তার ঝড় আর হিংস্র ভয়ঙ্কর শপথঃ বদলা নেবে সে এই দুশমনদের ওপর, নেবে তাগাইয়ের ওপর, গোটা বাসমাচি দলের ওপর, আর উদ্ধার করবে তার জয়নাবকে! কিন্তু কিভাবে?

গুহায় ফিরে বাসমাচিরা চমকে উঠলোঃ কয়েদীরা পালিয়েছে!

চির বললে,—ওদের এক্ষুণি পাকড়াও ও খতম করা দরকার।

সোনার বোঝাটা খাঁদার কাছে। সে বললে,—হক কথা বলেছ। তোমরা যাও, ওদের খুঁজে নিয়ে এস। তোমাদের জন্যে আমি এখানে থাকবো।

চির, কালোদাড়িয়াল ও বুড়ো সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো,—না, তা কেন! তোমরা যাও, আমি থাকবো সোনার পাহারায়।

সন্দিগ্ধ চোখে বাসমাচিরা তাকায় পরস্পরের দিকে। প্রত্যেকেই চায় অন্যদের পাঠিয়ে নিজে সোনার কাছে থাকতে।

দেখতে দেখতে তুমুল ঝগড়া বাধলো তাদের মধ্যে। চোখে তাদের লুব্ধ বন্য দৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত সোনা নিয়ে শুরু হলো কাড়াকাড়ি।

শক্তিতে খাঁদা সবার ওপরে। সে হাতায় সবচেয়ে বেশি। চির দেখলে মুশকিল, সে প্রস্তাব করলে,—জিনিসগুলো সবাই সমান ভাগ করে নেওয়া উচিত। কি বলো তোমরা?

আলবৎ! আলবৎ!—অন্যেরা চেঁচিয়ে উঠলো ঃ হক কথা বলেছ! ভাগ করো!

বলতে বলতে তারা বন্দুক টেনে নিলে। ক্লিক্-ক্লিক্—বন্দুকের ঘোড়া তোলার শব্দ হলো। চারটে বন্দুকের মুখই সোজা তাগ করা খাঁদার দিকে।

দীর্ঘশ্বাস চেপে খাঁদা সায় দিলে,—বেশ, তাই হোক।

তারপর অনেক তর্কবিতর্ক, হুমকি ও শাসানির পর রফা হয়। পাঁচভাগে ভাগ হয় ধনদৌলত।

নিজের নিজের অংশ বুঝে নিয়ে তারা এবার রওনা হলো বিভিন্ন দিকে—জুরা ও কুচাকের খোঁজে। প্রত্যেকেরই কিন্তু সরে পড়ার মতলব। অবশ্য যাবার সময় সবাই হলফ করে গেল, সন্ধ্যার মধ্যেই তারা গুহায় ফিরবে। হিংস্র নীরব ক্রূর দৃষ্টিতে তারা বিদায় নিলে পরস্পরের কাছ থেকে। সোনা তাদের সবাইকে পরস্পরের দুশমন করে তুলেছে।

খাঁদা আর বুড়ো একসঙ্গে চলেছে। তারা শুনেছে, বন্দুকে জুরার পাকা হাত। তাই ভারী হুঁশিয়ার তারা। হঠাৎ পাশের দিকে ইশারা করে খাঁদা আচমকা হিসহিস করে উঠলো,—জুরা!

অ্যাঁ! বুড়ো লাফিয়ে উঠে ঘুরে তাকাতেই, পেছন থেকে খাঁদার গুলি তার পিঠে গিয়ে বিঁধলো।

সোনা-রুপোর অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে নিজের ভাগ হিসেবে বুড়ো পেয়েছিল দেড়-ফুট লম্বা সোনার থালা একখানা। সেগুলো সব হাতিয়ে বুড়োর রাইফেলটা পিঠে ফেলে খাঁদা আবার রওনা হলো। তার মতলব, একে একে সবাইকে এমনিভাবে খতম করে সে গায়েব করবে সমস্ত সোনাটা। চিরকেই শুধু রেহাই দেবে। কারণ এই পর্বত-রাজ্যের গোলকধাঁধা থেকে বেরোনোর পথঘাট সে-ই শুধু জানে ঠিকমতো। সোজা সে কাশগড়িয়ায় চলে যাবে, তারপর সোনার দৌলতে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে সুখ-স্বচ্ছন্দে—মহা আরামে।

আঁধার ঘনিয়ে আসছে। গুহায় ফিরতে খাঁদার ভরসা হয় না। প্রকৃতপক্ষে ডাকাতরা কেউ-ই গুহায় ফেরে নি। যে যার সরে পড়েছে বিভিন্ন পথে। খাঁদা আর চিরই শুধু লুকিয়ে আছে টিলা-ঢিবির আড়ালে। তাদের বিনিদ্র রজনী কাটছে ভোরের প্রতীক্ষায়।

নিস্তব্ধ রাত্রি। প্যান্থার বা চিতাবাঘের গুহা থেকে টীক গুড়ি মেরে বেরিয়ে এল। রওনা হলো সে নিজেদের গুহার দিকে। হঠাৎ পথে এ কী—লাশ একটা! বুড়ো বাসমাচির লাশ। লাশটা টীক শোঁকে। শোঁকে তার চারপাশ। তারপর গতি পরিবর্তন করে। এবং গন্ধ শুঁকে শুঁকে সন্তর্পণে গিয়ে হাজির হয় খাঁদার কাছে। খাঁদা শুয়ে আছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন। তার মাথার নীচে একটা বস্তা। বস্তাটা থেকে মাংসের গন্ধ

আসছে। টীক সন্তর্পণে খাঁদার মাথার নীচে থেকে বস্তাটা টেনে নিয়েই দে ছুট প্যান্থারের আস্তানার দিকে।

খাঁদার তন্দ্রা টুটে যায়। তড়াং করে লাফিয়ে উঠলো সেঃ একটা কুকুর পালাচ্ছে বস্তাটা নিয়ে! সে গুলি করলে, কিন্তু গুলি ফসকে গেল।

টীক ফিরে এল প্যান্থারের আস্তানায়। শব্দ শুনে জুরা বেরিয়ে এসে দেখে, টীক রান্না-করা মাংস খাচ্ছে, তার পাশে এক ছেঁড়া বস্তা, বস্তার ভেতর থেকে কয়েকটা সোনার কাপ বেরিয়ে এসেছে, উঁকি মারছে দেড়ফুট লম্বা একটা সোনার থালা। বলা বাহুল্য, বুড়ো বাসমাচিরই অংশ ওটুকু। জুরা ওটা ভেতরে নিয়ে গেল।

কেয়াবাৎ! সোনা!—ব্যথা-যন্ত্রণা ভুলে কুচাক উঠে বসলো, উত্তেজনায় ফিসফিস করে উঠলো ঃ সোনা! সোনা!

দ্বিতীয় পর্ব ৫

সকাল থেকে তুষারপাত শুরু হয়েছে। ডাকাতদের খোঁজ না পেয়ে জুরা ও কুচাক শেষ পর্যন্ত নিজেদের গুহায় ফিরে এল।

চর্বি আর বুনো গাছ-গাছড়া দিয়ে একটা মলম তৈরি করে কুচাক নিজের ও জুরার ঘাগুলোয় লাগিয়ে দেয়।

জুরা আবার বের হয় বাসমাচিদের খোঁজে। দিনভোর তল্লাশি চলে। হঠাৎ এক-সময় সে থমকে দাঁড়ালো ঃ তার সামনে একটা লাশ! বুড়ো বাসমাচিটা মরে পড়ে আছে।

জুরা লাশটা পরীক্ষা করে। তার চারপাশ থেকে তুষার সরিয়ে, যাতায়াতের চিহ্ন-গুলো পরীক্ষা করে সে বুঝতে পারে, এটাকে যে বাসমাচি খুন করেছে, সে গেছে সোকসাইয়ের উজান দিকে। করদ্‌জিল্‌গা হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে কাশগড়িয়ায় যাওয়াই তার মতলব।

লাশটার ওপর পা রেখে জুরা শপথ নিলে—ভয়ংকর শপথ, যুগ-যুগান্তর ধরে যা চলে আসছে কিরঘিজদের মধ্যে। সে শপথ নিলেঃ তোদের খুন যদি আমি আকণ্ঠ পান না করতে পারি, তাহলে আমার যেন মৃত্যু হয় আর জাহান্নামে পচি যেন আখেরী জমানা তক.. ..

সন্ধ্যা নামে। আঁধার ঘনায় পর্বতে-জঙ্গলে আর গুহার মাঝে ... .

জুরা ও কুচাক আগুনের ধারে বসে আছে। জুরা বিষণ্ণ, চিন্তাচ্ছন্ন। হঠাৎ টীক গোঁ গোঁ করে লাফিয়ে উঠলো। জুরা ও কুচাক সচকিত। পরক্ষণে ছুটতে ছুটতে গুহায় ঢুকলো জুরার ছোট ভাই।

জুরাকে দেখেই সে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বললে,—সর্বনাশ হয়েছে! ভারী খারাপ খবর! তাগাই গাঁয়ে গিয়েছিল। জয়নাবকে সে কাশগড়িয়ায় নিয়ে গেছে। বলে গেছে, তোমার সঙ্গে জয়নাবের শাদি হয় নি, তার সঙ্গে হবে। জয়নাব কত কান্না-কাটি করলে। যাবার সময় তাগাই সর্দারকে গুরুতর জখম করে গেছে। আমাকেও

খুন করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি পালিয়ে যাই। সে বলে গেছে, তুমি নাকি মারা পড়েছ। কিন্তু আমাদের তা বিশ্বাস হয় নি......

জুরা নির্বাক। আগুনের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। মাথায় চিন্তার ঝড়। কুচাকও নীরব।

গভীর রাতে, ছেলেটি তখন খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, জুরা কুচাককে বললে,—তাগাই জয়নাবকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তাকে আমি খুন করবোই। খুন করবো বাসমাচিদেরও। সৌকসাইয়ের উজানে ওপর দিকে আমি যাচ্ছি। ভাইয়ের সঙ্গে তুমি গাঁয়ে ফিরে যাও। শপথ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরবো না।

কুচাক হাউমাউ করে উঠলো,—না না,— কক্ষনো না! ওদিকে তুই কক্ষনো যেতে পারবি নে। তাহলে নির্ঘাত মারা পড়বি।

জুরা নিশ্চুপ। ভ্রূ জোড়া ভয়ানক কুচকে আছে। কুচাকের তবু নিবৃত্তি নেই। তার সে কী অনুনয়বিনয়, কাকুতিমিনতি আর হাতে পায়ে ধরাধরি! কিন্তু জুরা নীরব অটল। শেষে একবার শুধু বললে,—যা বলেছি তার নড়চড় নেই। বাসমাচিদের যদি ঝাড়েবংশে সাবাড় করতে না পারি তো, চিরকাল আমি যেন নিরেট হাবাগোবা গাধা হয়ে থাকি।

বলতে বলতে চামড়া জড়িয়ে সে শুয়ে পড়লো।

বহুক্ষণ কেটে যায়। কিন্তু জুরার চোখে ঘুম নেই।

ঘুম নেই কুচাকের চোখেও। অন্ধকারে বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে আছে। মাথায় চলেছে চিন্তাস্রোত, সোনার চিন্তা : সোনাটা তাহলে সবই গেল! একে তো ডাকাতরা সব লুঠ করেছে, তারপরে যেটুকু বা ফিরে পেলাম, তা-ও এবার যাবে...আচ্ছা, সোনাটা নিয়ে এখানে কোথাও লুকিয়ে থাকলে কেমন হয়? কিন্তু শীত এলে? শীত তো এসেই গেছে বলা যায়। সে সময় সেই ভয়ংকর শীতে এখানে একলা থাকলে যে নেকড়েরা হজম করে ফেলবে! সোনা নিয়ে গাঁয়ে ফিরলেও রেহাই নেই, সবটাই সর্দার গায়েব করবে। তাহলে......তাহলে. ...আচ্ছা, কাশগড়িয়ায় পালালে কেমন হয়?...... কাশগড়িয়া! .কিন্তু কোথায় কত দূরে কাশগড়িয়া?......

সেই রাতেই সোনাটা কোমরবন্ধে ভাল করে জড়িয়ে কিছু শুঁটকী মাংস নিয়ে কুচাক নিঃশব্দে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল।

পর দিন দেরিতে জুরার ঘুম ভাঙে। কিন্তু কুচাক কোথায়? ভাইকে সে জিজ্ঞেস করে। খোঁজও করে। কিন্তু কুচাকের পাত্তা মেলে না কোথাও। জুরা বুঝতে পারে সবাই। ভাইকে সে বললে,—তুই গাঁয়ে ফিরে যা... .

জুরা রওনা হয়—রওনা হয় অজানা অন্ধকার ভবিষ্যতের পথে। আজ এই প্রথম সে পা বাড়ালে সম্পূর্ণ এক অপরিচিত জগতের দিকে। কিন্তু ওসব ভাবনা তার নেই। মাথায় শুধু এক চিন্তা : শপথ !শপথ ! .... বদলা তাকে নিতেই হবে—যে করে হোক......

জুরা চলেছে। সঙ্গে বন্দুক, বারুদ, বুলেট, চকমকি, কিছু শুঁটকী মাংস ও প্যান্থারের চামড়া একখানা আর শেকলে বাঁধা টৌক। সব দিকেই দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশিখর! দূরে আকাশে মাথা তুলে শিখরের পর, শিখর, অগুনতি শিখরশ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে—নিস্তব্ধ ভয়ঙ্কর। কিন্তু জুরার কাছে কোন পথই বুঝি দুর্লঙ্ঘ্য নয়।

এক সময় সে কাইন্দা গিরিচূড়ায় এসে পেঁছলো। পূবের সীমানা, এখানেই শেষ—এর পর আর এগোনো সর্দারের বারণ।

বহু নীচে দেখা যায় বিক্ষুব্ধ সোকসাই রূপোর পাতের মতো সর্পিল গতিতে এঁকেবেঁকে চলেছে। পর্বত-শিখরে উন্দাম ঝোড়ো হাওয়ার একটানা গর্জন। কিছুদূরে নিঃশঙ্ক চিত্তে ছাগলের পাল চরছে। সূর্যকিরণে ঝলমল করছে সুবিশাল সব হিমবাহ—চোখ ঝলসে দেয়। নীচে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘপুঞ্জের নিঃশব্দ সঞ্চার।

নীচে সোকসাইয়ের দিকে তাকাতেই জুরা দেখে, ছোট দুটো বিন্দু নদীর পাড় ধরে এগিয়ে চলেছে।

বাসমাচি!—দাঁতে দাঁত চেপে সে উচ্চারণ করে কথাটা। ওদের ধরতে হলে তাড়াতাড়ি করা দরকার। কিন্তু তার আগে আল্লার কাছে কোরবানি দিতে হবে। অদূরে ছাগলের পাল চরছে। ধূসর রঙের প্রায়-সাদা একটা ছাগল বেছে নিয়ে জুরা তার পায়ে গুলি করলে...

আধঘণ্টা পরে। তুষার-ঢাকা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পর্বতশিখরে আগুন জেবলে সাদা ছাগলটাকে কোরবানি করে জুরা আল্লা ও দেওদের কাছে আরজি জানালে,—হে আল্লা! হে দেও! আপনাদের কাছে আমি ছাগল কোরবানি করছি...শয়তানের কফিনের কাছে ফাটলের মধ্যে এখনো যে সোনা রয়েছে, তা-ও আপনাদের কাছে উৎসর্গ করলাম..আমায় আপনারা সাহায্য করুন!

আকাশের দিকে আগুন-ঝরা রক্তরাঙা চোখ তুলে সে শপথ নিলে,—প্রত্যেক বাসমাচি আমার শত্রু। একটাও বেঁচে থাকতে আমি থামবো না। সর্দারের ওপর, আমার ও কুচাকের ওপর আর জয়নাবের ওপর যে অন্যায় ও নির্যাতন ওরা করেছে, তার প্রত্যেকটার জন্যেই আমি আলাদা আলাদা বদলা নেব......

অনুষ্ঠান শেষে কোমরের কাপড় কষে বেঁধে, টীকের শেকল খুলে দিয়ে জুরা আবার দ্রুতপদে রওনা হলো পূব দিকে।

দিন নেই, রাত্রি নেই, টীককে সঙ্গে নিয়ে জুরা চলেছে। গিরিশ্রেণীর নীচের অংশ যখন মেঘে ঢাকা পড়ে, আকাশের নক্ষত্র তাকে পথ দেখায়।

তুষার ও বরফে মোড়া, তীক্ষ্ণ টিলা-ঢিবি-পাথরে সমাকীর্ণ, আকাশছোঁয়া দুর্লঙ্ঘ্য ভয়াল পর্বতশ্রেণী একের পর এক পেছনে ফেলে সে চলেছে। মুখে লম্বা দাড়ি গজিয়েছে। টীকের দুই চোখ রক্তবর্ণ।

এমনি করে সে পার হলো, একটা নয় দুটো নয়, চল্লিশটা মহাপর্বতের শ্রেণী যাদের মাথায় এর আগে কখনও মানুষের পদার্পণ ঘটেনি। চিরন্তন তুষার, বরফ আর জমাট নৈঃশব্দ্যের একটানা রাজত্ব সেখানে।

আবার একদিন এক পর্বতশ্রেণীর তলায় অনেক-অনেক নীচে বহুদূরে প্রায় অস্পষ্ট দুটো বিন্দু দেখা গেল। খাঁদা ও চির চলেছে। দাঁত কিড়মিড় করতে করতে আরো জোরে পা চালায় জুরা।

তৃতীয় পর্ব ১

জুরা বা টীক আগে কখনো এত উ'চুতে ওঠে নি। তারা এগোচ্ছে অনেক কষ্টে। কোন দিকেই কিছু নজরে পড়ে না শুধু আকাশচুম্বী অগণন পর্বততরঙ্গ ছাড়া।

শেষে এক সময় জুরা এসে পৌছলো বড় এক জলপ্রপাতের ধারে। খাড়া পর্বত থেকে বিষম তোড়ে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলপ্রপাতটি। অনেক চেষ্টার পর জুরা বুঝতে পারে, এটাই সৌকসাইয়ের উৎস-মুখ। বাসমাচিদের পেছনে রেখে এগিয়ে এসেছে সে।

ত'ব পরে আরো তিন দিন কেটে যায়। জুরা ওখানে লুকিয়ে ওত পেতে থাকে বাসমা.চদের জন্যে। কিন্তু তাজ্জব কাণ্ড! তাদের পাত্তা মেলে না। জুরা ভেবে পায় না, কোথায় গেল বদমাশ দুটো।

হঠাৎ সেদিন শেষ রাত্রে বন্দুকের শব্দে জুরার ঘুম ভেঙে গেল। টীকও লাফিয়ে উঠেছে। শব্দটা মনে হয় নীচে থেকে এসেছে। কিন্তু টীকের দৃষ্টি পূব দিকে নিবদ্ধ। জুরা অবাক হয়।

আবাব সেই নীচে থেকেই এল বন্দুকের শব্দ—এবার আরো স্পষ্ট। জুরা ইতস্তত করে, টীক ভুল করছে না তো! তবু সে টীকের পেছনেই রওনা হলো পূবের গিরি-শ্রেণীর দিকে।

সেদিন কেটে যায়। পর দিন কুয়াসাচ্ছন্ন ভোরে আবার রওনা হলো জুরা। সূর্য উঠতেই কুয়াসা কেটে গেল। ওদের কিন্তু চলাব বিরাম নেই। হঠাৎ টীক গোঁ গোঁ করে উঠতেই, জুরা দেখে, কিছু দূরে টিলা-ঢিবির-পাহাড়ের পেছন থেকে অস্পষ্ট ধোঁয়ার রেখা ওপরে উঠছে।

সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে এক ঢিবির পেছন থেকে সে এক সময় উ'কি মারলে। কিন্তু কোথায় কে! অদূরে শুধু দেখা যায় এক নিবন্ত আগুনের কুণ্ড ও ছাইয়ের গাদা আর খাবাবেব উচ্ছিষ্ট অংশ। বাসমাচিরা যে এখানে রাত কাটিয়েছে, তা স্পষ্ট। ছাগল শিকারের জন্যই গুলি ছুড়েছিল তারা।

জুবা আবার রওনা হয়। দুই পা রক্তাক্ত। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। চামড়ার ট্রাউজাব হাঁটু পর্যন্ত ছি'ড়ে গেছে। ঘামে চোখ জ্বালা করছে, হাত দিয়ে বারবার চোখ ডলছে সে।

রোদের তাপ বাড়ছে ক্রমেই। এত গরম দেখে জুরা অবাক হয়। শরৎকালে এত উ'চুতে এরকম গরম কি করে পড়তে পারে, সে ভেবে পায় না।

কি করেই বা পারবে! সে তো আর জানে না, কিছু দূরেই রয়েছে ঘূর্ণিবাত্যার মরুভূমি মারকান-সু—যার ভেতর দিয়ে গেছে সুদূর ফেরগানা উপত্যকা থেকে কাশ-গড়িয়া যাতায়াতের সুপ্রাচীন কাফেলা-পথ। হাজার হাজার উট, ঘোড়া, গাধা ও মানুষের কঙ্কাল ও মাথার খুলিতে সমাকীর্ণ সে পথ।

তৃতীয় পর্ব ২

খাঁদা ও চির পর্বত বেয়ে অতি কষ্টে ওপরে উঠছে। তাদের লক্ষ্য মারকান-সু এবং মারকান-সু পেরিয়ে কাশগাড়িয়া।

এক অধিত্যকায় এসে তারা পৌঁছালো। পর্বতের উপরিস্থ এই অধিত্যকাটি বেশ প্রশস্ত। আর সবচেয়ে যা উল্লেখ করার মতো, তা হলো, ভূ-পৃষ্ঠের বায়ুস্তর এখানে বড় বেশী কাঁপছে। ক্রমেই বাড়ছে কম্পন। আর যত বাড়ছে, ততই বারবার পাল্টে যাচ্ছে পর্বতশ্রেণীর বহিরঙ্গের রূপরেখা।

খাঁদা বা চিরের এসব লক্ষ্য করার কথা নয়।

হঠাৎ চির চেঁচিয়ে উঠলো,—দ্যাখ দ্যাখ, সমুন্দুর! ঐ দ্যাখ সমুন্দুর!

সত্যিই, অদূরে দেখা যাচ্ছে দিগন্তবিসারী এক সুনীল জলরাশি। কাঁপছে সে মরু-মরীচিকা।

হতভম্ব খাঁদা বললে,—কারা-কুল নয় তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কারা-কুল! ঠিক বলেছ কারা-কুল!—চির সোল্লাসে সায় দিয়েই আবার চেঁচিয়ে উঠলো ঃ আরে দ্যাখ দ্যাখ, ঐ যে ওখেনে! মারকান-সু থেকে একটা কাফেলা হ্রদের দিকে এগিয়ে আসছে।

হ্যাঁ সত্যিই, হ্রদের পাশ দিয়ে বড় এক কাফেলা চলেছে। সমান তালে দুলতে দুলতে চলেছে উটের সারি। তাদের পায়ের খুরে ধুলোর মেঘ উড়ছে।

ভয়ে বিস্ময়ে খাঁদা ও চির হতভম্ব। তারা বিড়বিড় করছে,—জাদু! জাদু!

আল্লার কাছে দোয়া মাগার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো তারা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে এল গুলির আওয়াজ। চির একপাশে কাৎ হয়ে পড়ে গেল।

খাঁদা তড়িৎ-বেগে ঘুরে দাঁড়ালো। পাহাড়ের পেছন থেকে প্রকাণ্ড এক কালো কুকুর সোজা ধেয়ে আসছে তার দিকে।

ইয়া আল্লা! হতভম্ব খাঁদা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় মারলে টীকের কবল থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

আড়াল থেকে জুরা হাঁক ছাড়লে,—কিশ্ কিশ্ টীক! কিশ্ কিশ্!

কিন্তু টীক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। কিছু দূর দিয়ে এক কাফেলা যাচ্ছে। তার সামনে আগে-আগে দুই প্রকাণ্ড কুকুর। টীক দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো। তার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটু পরেই সে আবার শান্ত হলো। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে তাকাচ্ছে চারদিকে। কাফেলা ও কুকুর দুটো অদৃশ্য হয়েছে।

টীক এবার ছুটে যায় চিরের কাছে, তার গন্ধ শোঁকে আর গোঁ গোঁ করতে থাকে। চির মারা গেছে। তার পাশে একটা রাইফেল।

টিলার পেছন থেকে ছুটে বেরিয়ে এল জুরা। কম্পিত হাতে রাইফেলটা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে। নিজের মনে সে বললে ফিসফিস করে,—আঃ রাইফেল! চিরকাল যা মনেপ্রাণে চেয়েছি, আজ তা আমার হাতের মুঠোয়! আঃ!...কিন্তু অন্য বাসমাচিটা গেল কোথায়?

পরক্ষণে ঘুরে দাঁড়াতেই সে স্তব্ধ হয়ে গেল। এ কী! দূরে একটা হ্রদ রোদে ঝিলমিল করছে। হ্রদের জলে প্রকাণ্ড এক ভাসমান কামরা, তার চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠছে।

আনন্দের আবেগে জুরা কাঁপতে থাকে। শেষ পর্যন্ত একটা জাদু তাহলে চোখে পড়লো! এই জাদুর কথাই তো সর্দার বলেছিল! সে বসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে হ্রদও মিলিয়ে যায়।

তারপর আবার জুরার বিস্ময়বিস্ফারিত চোখের সামনে ভূ-পৃষ্ঠের কম্পমান বায়ু-স্তরে জেগে উঠলো আর এক মরীচিকা, আর এক দৃশ্য—নানা ধরনের মসজিদ, মিনার, আসমানী-রঙা জহরৎ-বসানো ঝলমলে থামওলা ইমারতের পর ইমারত, আর জনবহুল এক বাজার। অগুনতি মানুষ, উট, গাধা ও কুকুর বাজারে ঘোরাফেরা করছে।

বাজারও শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে যায়। জুরা তাকিয়ে আছে—যেন সম্মোহিত। এই তাহলে জাদু! কিন্তু তাজিকরা বলেছিল, এসব রূপকথা নয়, সে মুল্লুক সত্যিই আছে।

হ্যাঁ, সে যাবে সেই মুল্লুকে।

টীক তার পাশে লম্ফঝম্প করছে আর একটানা ডেকে চলেছে।

জুরার কোন দিকে খেয়াল নেই। মুগ্ধ তন্ময় চোখে সে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে আর বিড়বিড় করছে,—জাদু! জাদু!

হঠাৎ এক গুলির আওয়াজ এল—গুড়ুম!

পাঁজরায় নিদারুণ আঘাত খেয়ে জুরা লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

তার ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠ থেকে বারেক শুধু বেরিয়ে এল—জাদু!..তার পরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললো সে।

আধিতাকার অপর কিনারায় টিলা-ঢিবির পেছন থেকে খাঁদা জুরাকে আবার গুলি করতে যাবে, হঠাৎ দেখে, প্রকাণ্ড সেই কালো কুকুরটা আবার সোজা ছুটে আসছে তার দিকে। কুকুরটাকে তাক করে সে গুলি ছুড়লো, কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

সন্ত্রস্ত বাসমাচি পর্বত বেয়ে মরিবাঁচি করে ওপরে উঠতে উঠতে আপন মনে ফিসফিসিয়ে উঠলো,—গুলি লাগবে কি। ও যে জাদুর আওতায় রয়েছে।

টীক এদিকে টিলার পেছনে দাঁড়িয়ে বিষম চিৎকার করে চলেছে। জুরাকে ডাকছে সে...

ধীরে ধীরে দিন শেষ হয়। পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যা নামে। জনহীন নিস্তব্ধ পর্বতরাজ্যে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসে অন্ধকারের কালো ছায়া।

আর জুরার অসাড় নিশ্চল দেহ পড়ে থাকে পাথরের ওপর রক্তের স্রোতের মধ্যে।

চতুর্থ পর্ব ১

জুরার কাছ থেকে পালানোর সময় কুচাক ভেবেছিল, তুষারে ও বাতাসে তার পথের চিহ্ন হারিয়ে যাবে। কিন্তু এমনি তাব মাজা কপাল যে, তুষারপাত বেশী সময় চললো না, বাতাসও পড়ে গেল। তার ওপর মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে দেখা দিল উজ্জ্বল তারার ঝিকিমিকি।

টাটকা তুষারের ওপর দিয়ে হাঁটতে কুচাকের ভরসা হয় না, পথের নিশানা তাহলে স্পষ্ট থেকে যাবে। সে ঠিক করে, সারা দিন লুকিয়ে থেকে রাতের অন্ধকারে পথ চলবে, তারপর বিলিয়াণ্ড-কীক পার হয়ে ধরবে কাশগড়িয়ার পথ।

ভোর হয়ে আসছে। খাড়া এক পর্বতের তলায় একটা গর্তের মধ্যে গিয়ে সে আশ্রয় নেয়। যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি জুরাতঙ্ক—কোনটাই কম নয় তার কাছে। দুইয়ের তাড়নাতেই সে সমান কাহিল। জুরার প্যান্থারের মতো ধাবালো দৃষ্টিকেই তার সবচেয়ে ভয়। দূর থেকে তাকে দেখে ফেলা জুরার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। আতঙ্কে ও ঠাণ্ডায় বেসামাল কুচাক কাঁপতে কাঁপতে সারাটা দিন কাটালো সেই গর্তের মধ্যে।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হয়ে আসে। কুচাক রওনা হবার তোড়জোড় করছে, এমন সময় আঁতকে উঠলো—কোথায় ছিল জয়নাবের 'এককানী' বুড়ী কুত্তাটা, হঠাৎ এসে হাজির। কুচাকের বুঝতে কষ্ট হয় না, বাতাসে শুঁটকী মাংসের গন্ধ শুঁকে শুঁকে সে এসেছে।

সেরেছে! দারুণ ঘাবড়ে গেল কুচাক। আর রক্ষে নেই! এককানীর পিছু পিছু জুবা আর টীকও হাজির হবে এক্ষুণি। সর্বনাশ! সর্বনাশ !

কিন্তু নাঃ!—কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর উঁকিঝুঁকি মেরে সে নিশ্চিন্ত হলো : না, সে ভয় নেই।

পর দিন আবহাওয়া পালটে গেল। চারদিক বোদে ঝলমল করছে। কুচাকের মেজাজ চাঙা হয়ে ওঠে। সে ঠিক করে, এককানীকেও কাশগড়িয়ায় নিয়ে যাবে, পাহারাদারিব কাজে সে উপকারে আসতে পারে।

রওনা হয় সে। পাথর ও টিলা-টিবির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সেল্‌দারা গাঙের কূল ধরে এগোয় দক্ষিণ-পূব দিকে। দূরে দেখা যায় তুষারমৌলী বিলিয়াণ্ড-কীক গিরিবর্ত্ম—নীল আকাশপটে রোদে ঝলমল করছে।

পথে পড়ে কত নদীনালা, কত বিক্ষুব্ধ হিমেল গাঙ ও খরস্রোতা নদী। সিক্ত অবশ কুচাকের সর্বাঙ্গ। তবু ভয়ে সে আগুন জ্বালতে পারে না, পাছে ধোঁয়া জুরার নজরে পড়ে যায়। পর্বতেব ফাটলে সে রাত কাটায়। ভয়ে ও শীতে কাঁপতে কাঁপতে ভোরের প্রতীক্ষা করে অধীর আগ্রহে।

তিন দিনের দিন সন্ধ্যাব দিকে গিরিবর্ত্মেব তলায় এসে সে পেঁছালো। ওপবে ওঠার আগে অসাড় অবশ হাত-পা ভাল কবে আগুনে সেঁকে না নিলে আর চলছে না। কিছু লতাপাতা জোগাড় করে সমতল একখানা বড় পাথরের ওপর আগুন জ্বাললে সে।

বুক ভরে কটু ধোঁয়ার আঘ্রাণ নিতে নিতে আগুনে সে আরাম করে সেঁকে নেয় নিজের সর্বাঙ্গ। কাপড়চোপড়ও সব শুকিয়ে নেয়। এবার ব্যাগ থেকে সে বের করলে বড়

একখণ্ড ছাগলের মাংস। মাংসখানায় ভাল করে চর্বি মাখিয়ে তাকে রাখলে আগুনের ওপর—অর্থাৎ আগুনের মধ্যে দুখানা পাথরের ওপর।

আগুনে মাংস রোস্ট হচ্ছে। আর তন্দ্রায় ঢুলছে কুচাক। আগুনের সামনে উলটো দিকে এককানী বসে আছে। কুচাক তাই নিশ্চিন্ত। জুরাকে স্বপ্ন দেখছে সেঃ টীককে নিয়ে পাহাড়-পর্বতে গুহা-কন্দরে জুরা তাকে খুঁজছে আঁতিপাঁতি করে......

হঠাৎ সে গোঙিয়ে উঠলো হাউমাউ করে। কাঁধের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুষি এসে পড়েছে, আর সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ চিৎকার। মুহূর্তে তার তন্দ্রা টুটে গেলঃ সর্বনাশ! জুরা! পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, আতঙ্কে তারই দুই পা সে জড়িয়ে ধরলে। পরক্ষণে মাথা তুলতেই দেখে—না, জুরা তো নয়, অপরিচিত কয়েকজন লোক। চোখ মুছে, দীর্ঘনিশ্বাস চাপতে চাপতে চকিতে সে গুণে ফেললে ওদের—মোট সাতজন।

দলের সবচেয়ে মোটা লোকটা প্রথম কথা বললে। কুচাক মনে মনে তার নামকরণ করে 'বুনো শুয়োর'। লোকটা তার নামধাম জিজ্ঞেস করতে নিজের নাম সে বললে আর জানালে, বহুদূর থেকে সে আসছে।

তার কথা শেষ হতে না হতেই দলের আর একজন হঠাৎ একলাফে তার পাশে এসে পড়লো। লোকটা যেমন রোগা, তেমনি ছটফটে। কুচাক সঙ্গে সঙ্গে তারও নামকরণ করে 'ভাইপার' বা 'কেউটে'। লোকটা লাথি মেরে তাকে আগুনের পাশ থেকে দূরে ছিটকে ফেলে দিলে। দারুণ যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো কুচাক। লাথিটা লেগেছে একটা পোড়া ঘায়ের ওপর। জায়গাটা এখনো কাঁচা আছে।

দলের আর একজন তেড়ে ওঠে,—ভাগ্, পালা এখান থেকে!

হাসতে হাসতে তারা বসে পড়লে আগুনের পাশে।

একটু দূরে বসে থাকে কুচাক। কুঁজো হয়ে বসে রাতের ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসে হাই তুলতে তুলতে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সে তাকালে লোকগুলোর মুখের দিকে। হঠাৎ চমক লাগে তারঃ দলের ঐ লোকটাকে তো সে চেনে—নাম সঈদ। ভারী তুখোড় ধড়িবাজ। আইনের চোখে ধুলো দিয়ে চলাফেরা করতে আর সীমান্ত পারাপারের বেআইনী কাজকারবারে তার জুড়ি নেই। সেবার যে চীনা ব্যাপারী কাশগড়িয়া থেকে তাদের মিন-আরখার গাঁয়ে গিয়েছিল, সঈদ ছিল তার গাইড। কয়লার ঝুলের মতো কালো তেরছা চোখ দেখেই কুচাক তাকে চিনতে পেরেছে।

জ্বালানি কুড়োবার জন্যে সঈদ একসময় আগুনের ধার থেকে দূরে সরে আসতেই কুচাক এগিয়ে গেল তার দিকে। কুচাককে চিনতে পেরে সঈদ খুব খুশী। কুচাক লোক-গুলোর পরিচয় জিজ্ঞেস করতে, সে তাকে বললে এমন সব তাজ্জব খবর, যা কুচাক জীবনে এই প্রথম শুনলো।

সে বললে,—মোটা লোকগুলো সব ফেরগানার আশপাশের বড়লোক জমিদার। সে ওদের গোপন পথে কাশগড়িয়ায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। এসব পথের খোঁজ সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

কুচাক শোনে আর অবাক হয়। ভেবে পায় না, কেন এই পয়সাওলা লোকগুলো দুর্গম পাহাড়-পর্বত ভেঙে এভাবে পায়ে হেঁটে চলেছে। ঘোড়ার পিঠে ভাল রাস্তা দিয়ে তো আরো অনেক আরামে যেতে পারতো?

কুচাকের প্রশ্ন শুনে জিব দিয়ে ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ করে সঈদ। দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাতাস টেনে নিতে নিতে সে হিসহিস করে উঠলো,—ছোঃ! কিস্সু জান না দেখছি! তুর্কিস্তানে বড়লোকদের জমিজমা টাকাকড়ি গরুঘোড়া ছাগলভেড়া সব কেড়ে নিয়ে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, শোনোনি?

বাঃ! বেড়ে বলেছ যা হোক! যত্তো সব গ্যাঁজা!—বলতে বলতে কুচাক হেসে ফেললে। কল্পনায় তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে—সর্দার গরিব বনে গেছে, আর সে কুচাক কিনা সর্দারের দামী আরমিন-কোটটা গায়ে চাপিয়ে সবার ওপর মাতব্বরি ফলিয়ে বেড়াচ্ছে।

সঙ্গীদের মেজাজ বিগড়ে গেল, খেঁকিয়ে উঠল সে,—কী! মিথ্যে বলছি? যা বলছি, তা যদি সত্যি না হয় তো, আমি যেন হাবাগোবা নীরেট গাধা হয়ে থাকি। এই সব ভুঁড়িদার পয়সাওলা জমিদারের দল সোনাদানা নিয়ে বৌছেলেমেয়ে সব ফেলে কাশ-গড়িয়ায় পালিয়ে যাচ্ছে, বুঝেছ? আমার কাছে অবিশ্যি সবই সমান। নিজে আমি কাশ-গাড়িয়ায় মানুষ, আমায় ওরা মোটা টাকা দেয়, আমিও তাই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই। কিন্তু তুমি কেন গরিবদের রাজত্ব থেকে পালিয়ে যাচ্ছ? তুমি নিজে গরিব, তোমার তো এখানে থাকাই লাভের। তোমার তো আর সোনা-দানা নেই!

কুচাক চমকে উঠলো। সঙ্গীদ কিছু আঁচ করেছে নাকি? ত্রস্ত চোখে সে তাকায় সঙ্গীদের দিকে, তাকায় চারপাশের গিরিশ্রেণীর দিকে। কোমরবন্ধের ভাঁজগুলোর ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে টেনে টেনে সে বললে,—বটেই তো! বটেই তো! আমার আবার সোনাদানা কোথায়? সত্যিই তো!

সঙ্গীদের কিন্তু ওদিকে খেয়াল নেই। সে কাশগড়িয়ার অবস্থা বলে চলেছেঃ একটা ঘোড়া পোষাও দায় কাশগড়িয়ার কোন শহরে। কারণ সামান্য যে বিচালি, তারও দাম আকাশছোঁয়া। তার চেয়েও বড় দায় ঘাড়ের ওপর মাথা রাখা, কারণ ওটার কোন দামই নেই সেখানে।

দূর থেকে জমিদারদের গলা শোনা গেল,—সঙ্গীদ!

যাই!—সঙ্গীদ সাড়া দেয়। দুজনে জ্বালানি কুড়োতে শুরু করে।

আগুনের কাছে ফিরে এসে কুচাক কিন্তু থ। তার রোস্ট-করা মাংসের খন্ডটা জমিদাররা খাচ্ছে। সশব্দে মাংস চিবোচ্ছে আর আঙুল চাটছে মহা তৃপ্তির সঙ্গে।

মানুষের এমন ব্যবহার কুচাকের কল্পনার বাইরে।

কাঠগুলো মাটিতে ছুড়ে ফেলে সে তেড়ে উঠলো,—অ্যাঁ, কি হচ্ছে এটা? আমার মাংস তোমরা খাচ্ছ মানে?

জমিদাররা সে কথায় আমলও দেয় না। যেমন খাচ্ছে, তেমনি গল্পগুজব করতে করতে খেয়ে চলে নির্বিকার চিত্তে।

কয়েক মুহূর্ত কুচাক দাঁড়িয়ে থাকে হাঁ করে। তারপর বিড়বিড় করতে করতে ব্যাগ থেকে বের করলে আর একখন্ড মাংস। কাঁচা-কাঁচাই মাংসটা সে খাবে ঠিক করে, এমন সময় ঢ্যাঙা এক জমিদার এগিয়ে এল, বিনা বাক্যব্যয়ে হাত থেকে ছোঁ মেরে টেনে নিলে মাংসটা।

কুচাক বাধা দেবার চেষ্টা করে না বা তত অবাকও আর হয় না। এদের ধরন-ধারণ সে ইতিমধ্যে কিছুটা আঁচ করে নিয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে শুয়ে পড়ে। তারপর ওদের নজর এড়িয়ে ব্যাগে আঙুল ঢুকিয়ে নিঃশব্দে বের করে আনতে থাকে ছোট ছোট সব মাংসের টুকরো।

চতুর্থ পর্ব ২

পর দিন কুচাক নিজের পথে রওনা হবার তোড়জোড় করছে, এমন সময় জমিদাররা তার পথ আটকালে। বুনো শুয়োর বললে,—যাচ্ছিস কোথা, গাধার ল্যাজ? আমাদের মালপত্তর কে বইবে তুই ছাড়া?

ত্রস্তকণ্ঠে কুচাক জবাব দেয়,—না না, কাশগড়িয়ায় যাবার আমার আর ইচ্ছে নেই। আমি মত পাল্টেছি, বাড়ি ফিরে যাব।

ইয়ার্কি পেয়েছিস!—কেউটে হুংকার ছাড়লে: তোল্! ঘাড়ে তোল্ সব মালপত্তর! আমরা হাঁপিয়ে গেছি।

বলতে বলতে সে কোমরে ঝোলানো ছোরার বাট চেপে ধরলে।

কুচাক কাঁদতে শুরু করে। কিন্তু কে শুনবে সে কান্না! জমিদাররা তার ঘাড়ে বিরাট সব বোঝা চাপিয়ে দিলে। আর বোঝার ভারে টলতে টলতে শুরু হলো কুচাকের তাদের সঙ্গে পথ চলা।

সঈদ আগে আগে যাচ্ছে। তার চোখে ভ্রূকুটি: কুচাকের সঙ্গে জমিদারদের এই ব্যবহার তার মোটেই ভাল লাগে নি। সবার পেছনে কেউটে। কুচাক যাতে পেছিয়ে না পড়ে, তার জন্য তার ঘাড়ে ছোরার ফলার খোচা মারতে মারতে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে সে।

পাঁচ দিন হলো, কুচাক জমিদারদের সঙ্গে চলেছে। তার ব্যাগের শুঁটকী মাংস সব শেষ—ওরাই সাবাড় করেছে, হাড়গুলো পড়ে আছে শুধু।

পর্বত-ঢালে পালে পালে ছাগল চরছে। সেদিকে দেখিয়ে কুচাক বললে,—আপনারা বন্দুক আনেন নি কেন? দেখছেন, কত ছাগল!

সঈদ বুঝিয়ে দিলে,—আসার পথে গাঁয়ের বাসিন্দাদের যাতে সন্দেহ না হয়, তার জন্যে ইচ্ছে করেই জমিদাররা বন্দুক আনে নি। সন্দেহ হলে, বাসিন্দারা তাদের আটকে রাখতে পারে।

কুচাক যাতে পালাতে না পারে, তার জন্যে কেউটে তাকে নিজের সঙ্গে বেঁধে রাত্রে তার পাশে শোয়।

সেদিন রাত্রিবেলায় ঘটলো এক কাণ্ড। সবাই ঘুমিয়ে। এককানী সেই ফাঁকে কৌশলে একখণ্ড মাংস সরিয়ে নিলে কেউটের মাথার নীচে থেকে। জমিদারদের সন্দেহ পড়লো কুচাকের ওপর, আর তার ফলে শুরু হলো মার—উত্তমমধ্যম প্রহার।

কুচাক আর্তনাদ করতে থাকে আর গোঙায়, বারবার দিব্যি কাটে আর বলে, তাকে এভাবে সন্দেহ করা অন্যায়। অকারণে কেন সে চুরি করতে যাবে! দরকার মতো খাবার সে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু তার শরীরে যে চর্বি আছে, তাতেই কাজ চলে যাচ্ছে। উলারের সুস্বাদু নরম মাংস খাওয়ার ফলেই এরকম চর্বি-জমা সম্ভব হয়েছে। তাই বিস্বাদ শুঁটকী মাংসে তার রুচি নেই।

জমিদাররা তার কথা যাতে বিশ্বাস করে, তার জন্যে সে উলারের মাংস কি রকম সরস ও

সুস্বাদু আর কতগুলো উলার সে খেয়েছে, তারই মনোগ্রাহী বর্ণনা দিয়ে চলে প্রাণের দায়ে।

বাঃ, বেড়ে রূপকথা তো!—বুনো শুয়োর টিপ্পনী কাটলে।

না, কুচাক ঠিকই বলেছে। সঈদ বাধা দিলেঃ আপনারা, উপত্যকার বাসিন্দারা এই যে ভাল রাস্তা দিয়ে চলেছেন, তাতেও খুশী নন। নীচে খাদে পড়ার ভয়ে হয় পর্বতের ধার সাপটে ধরে, নয়তো হামাগুড়ি দিয়ে এগোন। ওই ওখানে ওঠার সাহস আছে আপনাদের?—বলতে বলতে সঈদ একটা পর্বত দেখিয়ে দিলে, যার চিরন্তন বরফের চূড়া মেঘে ঢাকা পড়েছে: ওখানে ওই তুষার ও বরফের রাজ্যে প্রচুর উলার পাওয়া যায়। কিন্তু উপত্যকাব বাসিন্দা আপনারা কাশগড়িয়ার লোকদের মতো উলারের নামই কেবল শুনেছেন, কখনো চোখে দেখেন নি। কুচাক সত্যি কথাই বলছে। আকাশ-ছোঁয়া পর্বতে পর্বতে তার জীবন কেটেছে, উলারের মাংসও খেয়েছে প্রচুর।

ঘাড় সোজা করে কুচাক এবার সোজাসুজি তাকালো জমিদারদের দিকে। সঈদের কথা তারা বিশ্বাস করেছে।

কুচাকের ওপর সঈদ খুশী। সে জ্বালানি কুড়োয়, আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করে, জল বয়ে আনে, চা সেদ্ধ করে। কুচাক না করলে এসব তাকেই কবতে হতো।

তাদের খাদ্যাভাব চলেছে। সবারই পেটে ক্ষিদে, মেজাজও তাই তিরিক্ষে। সবচেয়ে কষ্ট কুচাকের—তার যে খাওয়া দরকার, জমিদারদের হাবভাবে তা মনে হয় না।

ওরা যখন খেতে বসে, কুচাক তখন ককায়,—দিনরাত আপনাদের মালপত্তর বইছি, আমার সমস্ত মাংসও আপনারা খেয়েছেন। তার বদলে এক টুকরো রুটিও কি আমি পেতে পারি নে? দিন না একটু।

এব ফলে কুচাকের ভাগ্যে খাওয়া জোটে নানা রকম—বেশির ভাগ সময় মারধোর চড়চাপড় ঘুষি, মাঝে মাঝে এক-আধ টুকরো রুটি।

সেদিনও রাত্রে এক টুকরো রুটি খেয়ে কুচাক শুয়েছে, পেটে দারুণ ক্ষিদে একটু তন্দ্রা এসেছে কেবল, এমন সময় শুরু হলো জমিদাবদেব ডাকাডাকি,—এই, ওঠ্ ওঠ্! কাশগড়িয়ার আর দেরি নেই, এক্ষুণি রওনা হতে হবে সীমান্ত পার হবার জন্যে। মাল তোল্।

অবসন্ন ক্ষুধার্ত কুচাক শুধুই ঘুমোতে চায়, ফিরে যেতে চায় নিজের গাঁয়ে। কান্না-ভেজা গলায় সে কেঁউ কেঁউ করে উঠলো,—আমার কাশগড়িয়ায় যাবার ইচ্ছে নেই। আমি বাড়ি ফিরে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটে কিল-থাপ্পড়-লাথি এসে পড়লো। অশ্রাব্য ভাষায় গালা-গালি করতে কবতে কেউটে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে বস্তাটা। আর, সে যাতে পালাতে না পারে, তার জন্যে তার গলায় একটা দড়ি বেঁধে দড়ির অন্য দিকটা কেউটে বেঁধে নিলে নিজের বেল্টের সঙ্গে।

রাত্রিবেলা। নিঃশব্দে হাঁটছে সবাই। থামার নাম নেই। সঙ্কীর্ণ গিরিখাতে তারা নেমে এল। কুচাকের অবাক লাগছে, এসব লুকোচুরির মাথামুণ্ডু কিছুই সে বুঝতে পারছে না। সে হাঁক ছাড়লে,—হেই সঈদ, এভাবে রাতে পথ চলাব মানেটা কি বলতে পা—

শ্-শ্ চুপ!—ফিসফিসিয়ে তর্জে উঠলো জমিদাররা। প্রচণ্ড এক রদ্দা এসে পড়লো তার ঘাড়ে।

ওরা থামছে বারবার, কি যেন শুনছে কান পেতে। একবার ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে যেতেই জমিদাররা চটপট মাটিতে শুয়ে পড়লো। কুচাককেও তাই করতে হলো।

অন্ধকারে ক্ষিপ্রপদে সে এগিয়ে যাচ্ছে সবার সঙ্গে। কোন্ গিরিশ্রেণীর ভেতর দিয়ে কোন্ পথে চলেছে, সেদিকে নজর দেবার ফুরসৎ নেই। কোন শব্দ কানে এলে, অন্যদের মতো তাকেও বিনা ওজরে মাটিতে শুয়ে পড়তে হচ্ছে।

চতুর্থ পর্ব ৩

পর দিন সূর্যাস্তের ঠিক আগে তারা এক উঁচু পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছলো। সীমান্ত পার হয়েছে তারা। এখান থেকে কাশগড়িয়ার শুরু।

কেউটে এবার কুচাকের বাঁধন খুলে দিলে। সীমাহীন অবসাদে কুচাক যেন আর চলতে পারছে না। হেঁট মাথায় কাতরাতে কাতরাতে জমিদারদের সে অনুসরণ করলে।

সকাল থেকেই সঈদ বলছে, এটাই শেষ বড় গিরিবর্ত্ম। গিরিবর্ত্মের মুখে দাঁড়িয়ে এবার সে বললে,—এই হলো সারিকল, কাশগড়িয়া। এক নজর দেখে নিন। এখানকার বাতাস দেখছেন কেমন স্বচ্ছ! একমাত্র এই শরৎকালেই এখানে ভারতীয় গ্রীষ্ম-বায়ু প্রবাহিত হয় বলে বাতাস এত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার।

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে।

দূরের তুষারশুভ্র উত্তুঙ্গ হিমগিরিশ্রেণীর দিকে হাতের লাঠিটা তুলে সঈদ বললে,—ওই যে দূরে দক্ষিণে ঐ পর্বতশ্রেণী দেখছেন, তার ওপারে হিন্দুস্থান—ভারত-বর্ষ। ওখানে যাবার পথ তিনটে। তার মধ্যে সপ্তগিরিবর্ত্মের যে পথ লেহ্ গেছে, সেইটাই প্রধান, দ্বিতীয়টা গেছে চিত্রলে, তৃতীয়টা গিলগিটে।

লেহ্ চিত্রল গিলগিট!—মনে রাখার জন্যে কেউটে বারম্বার উচ্চারণ করে কথাগুলো।

পূব দিক দেখিয়ে সঈদ বললে,—ওই ওদিকে পড়বে শহর ইয়ারকন্দ, তারপরেই শুরু হয়েছে ভয়ংকর তাকলামাকান মরুভূমি। আরো পূবে গেলে পড়বে লব মরুভূমি। এবার দেখুন ঐ উত্তর দিকে, ওখান দিয়ে গেছে স্বর্গীয় গিরিশ্রেণী তিয়েন-শান-পে-লু'র উত্তর শাখা। ওর ওপারেও চীন দেশ প্রসারিত, যা জুঙ্গারিয়া নামে পরিচিত। এবার তাহলে চলুন কর্তারা—চটপট চলুন। অন্ধকার হবার আগেই আমাদের সরাইখানায় পৌঁছতে হবে। সেখানে আমার এক দোস্তের ঐ সরাইখানায় মিলবে গরম চা আর উপাদেয় পোলাউ।

শান্ত নিরুদ্বেগ এখন সঈদের কণ্ঠস্বর। তার কথায় জমিদারদের মনেও ফুর্তি ফিরে এল।

ঝলে-পড়া দুই ঠোঁট চেপে সবুজরঙের পাগড়ীটা ঠিক করতে করতে মোল্লা জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা, কাশগড়িয়ায় মোল্লাদের সংখ্যা কি রকম?

সঙ্গে সঙ্গে জমিদাররাও নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলো এক সঙ্গে হৈ-হৈ করে। সঈদ জবাব দেয় না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললে,—আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া এখন সম্ভব নয়, দেরি হয়ে যাবে। পরে দেব। কিন্তু গোড়াতেই একটা কথা বলে রাখি। সোজাসুজি মূল চীনের ভেতর ঢোকা আপনাদের পক্ষে এখন সম্ভব নয়, উচিতও নয়। বরফে ঢাকা আকাশছোঁয়া ঐসব পর্বতে পর্বতে ঘুরে এক ডজনেরও ওপর বুট জুতো যে লোক ক্ষয়ে ফেলেছে, আমি সেই সঈদ—আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন। সেখানকার লোকেরা আপনাদের দেখে মোটেই খুশী হবে না।

একটুখানি থেমে আবার সে শুরু করে,—এখানে কাশগড়িয়ায় এই বহুদূর মরু-এলাকায় বসবাস করাই হবে আপনাদের পক্ষে এখন সবচেয়ে মঙ্গলদায়ক। এখানে এই সীমান্তের কাছে পাহাড়-পর্বতের মাঝে মাঝে এমন অনেক বিচ্ছিন্ন গ্রাম আছে, যার খোঁজ উঁচু মহলের কর্তারা নেবারও দরকার মনে করেন না। এখানকার কাজ-কর্ম চলে ইমাম বলবক আর তাঁর দক্ষিণহস্ত রাইস কিপচাকবে'র নির্দেশ মতো। তাদের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করুন। এসব এলাকার শাসন ও বিচার-ব্যবস্থায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পাওয়ার জন্য তাঁরা প্রচুর টাকা ঢেলেছেন। আপনারা গিয়ে ইমাম বলবককে কুর্নিশ জানান, তাহলে ভালভাবে থাকা-খাওয়ার আর কোন ভাবনা থাকবে না। যাই হোক, এখন চলুন—সরাইখানায় জলদি যাওয়া দরকার।

বলতে বলতে সঈদ নীচে গিরিখাতের দিকে পা চালিয়ে দিলে। স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডা গিরিখাতে সন্ধ্যাব আঁধার নামছে। ঠেলাঠেলি করতে করতে জমিদারের দলও অনুসরণ করলো সঈদকে।

কিন্তু কুচাক দাঁড়িয়ে থাকে। লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—নিশ্চল নির্বাক। যে দিকে সে তাকায়, নজরে পড়ে শুধু কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্ত আর দূরের তুষারমণ্ডিত শিখরশ্রেণী—অস্ত রবির সোনালী কিরণে ঝলমল করছে, তাকে যেন ডাকছে হাতছানি দিয়ে।

দূরে মিলিয়ে গেছে জমিদারদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। কুচাক তবু নিশ্চল—বিষণ্ণ ক্লিষ্ট চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। নিজের চিন্তায় ডুবে গেছে সে। অপরিচিত নির্বান্ধব বিরাট দেশ—এখানে ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুকানো আছে তার জন্যে? দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করার ও বুঝবার চেষ্টা করে কুচাক—কোথায় কোন্ দিকে কত দূরে সে পেছনে ফেলে এসেছে তার সেই আকাশছোঁয়া পার্বত্য গ্রাম?. . . . তার মন কাঁদে চির-পরিচিত জন্মভূমির জন্যে...কোথায় জুরা?...এত দিনের সুখ-দুঃখে ঘেরা পরিচিত জীবনে ছেদ পড়াতে চলেছে, সামনের সব কিছুই অজানা অপরিচিত, আর.

হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসের এক ঝাপটা এসে তার মুখে লাগলে, চোখে লাগালে হিমকণার ঝাপটা। কুচাক যেন চমকে জেগে উঠলো ঘুম থেকে। মুখের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে ভয়চকিত চোখে সে তাকালো চারদিকে। অন্ধকার ছায়া নামছে।

অ্যাঁ, সঙ্গীরা কোথায়! ওরা কোথায় গেল? পরক্ষণে দলবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত ভেড়ার মতো সঙ্গীদের নাগাল পাবার জন্যে সে দৌড়তে শুরু করলো নীচে গিরি-খাতের দিকে।

চতুর্থ পর্ব ৪

গিরিখাতের তলায় পেঁছে কুচাক নাগাল পায় জমিদারদের। পথের মোড়ে জটলা বেঁধে উত্তেজিত কণ্ঠে তারা কি যেন আলোচনা করছে।

কুচাককে দেখেই মধুমাখা কণ্ঠে মোল্লা বলে উঠলো,—এই যে কুচাক! কোথায় ছিলে, বাপ? ব্যাগটা রেখে একবার এগিয়ে গিয়ে দেখ তো বাপ, ঐ সরাইখানার ভেতরটায় কি আছে? যাও বাপ, পেট পুরে খেতে দেব।

পর্বতের কিনারা থেকে কুচাক উঁকি মারলে। সামনে ছোটখাট গাছপালার এক

বাগান, গাছগুলোর যেন বাড় নেই। বাগানের মধ্যে উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা বড় একটা কুঠি। বিকট মাংসপচা দুর্গন্ধ আসছে সেখান থেকে। উঁচু কয়েকটা ফটক। তার ওপরে বাঁকানো কার্নিশ দেওয়া ছাদ। সন্দিগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে কুচাক বললে,—ওখেনে ড্রাগনরা থাকে মনে হচ্ছে। তা সঈদ কোথায়?

একটা পোথো কুত্তার সঙ্গে কতক্ষণ আর মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলা যায়! মোল্লা ও জমিদাররা সমস্বরে তেড়ে উঠলো,—যা, যা বলছি এগিয়ে, নয়তো বরাতে তোর দুঃখ আছে। সঈদ গেছে সামনের রাস্তা পরখ করার জন্যে।

তখনো আলো আছে। কুচাক সতর্কভাবে এগিয়ে যায়। নিঃশব্দে প্রাঙ্গণে ঢুকেই সে চমকে উঠলো : দেয়াল ঘেঁষে মাদুরের ওপর বহু মৃতদেহ পড়ে আছে! লড়াইয়ের চিহ্ন নেই কোথাও, অথচ অনেক লাশের হাত-পা নেই।

আতঙ্কিত কুচাক—ত্রস্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। দেয়ালে একটা গর্ত—সাদা কি একটা স্বচ্ছপ্রায় পদার্থ দিয়ে ঢাকা। তার ভেতর দিয়ে সে উঁকি মারলে। ভেতরে আরো অনেক লাশ, কুকুরের পাল সেগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

ভেতরটা আরো ভালভাবে দেখার জন্যে কুচাক স্বচ্ছপ্রায় ব্লাডারের মতো সেই কাগজটায় চাপ দিতে থাকে। চাপটা একসময় একটু জোরে হতেই, ফট্ করে ফেটে গেল আবরণটা। আর কুচাক লাফিয়ে উঠেই আতঙ্কে মরিবাঁচি করে উঠোন পেরিয়ে ছুটলো জমিদারদের দিকে।

জমিদারের দল চেঁচিয়ে উঠলো,—খবরদার! খবরদার! কাছে আসিস্ নে।

দৌড়তে দৌড়তে কুচাক বললে,—কেন?

জমিদারের দল ততক্ষণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।

একটা পর্বতের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সঈদ। চোখে তার নির্বিকার উদাসীন দৃষ্টি। তাকে দেখে উৎফুল্ল কণ্ঠে কুচাক বললে,—এই যে তুমি, এর মধ্যে ফিরে এসেছ!

ক্লান্ত নীরস কণ্ঠে সঈদ বললে,—অবস্থা খুবই সঙ্গীন। সারিকলে বসন্তের মড়ক চলেছে। সর্বত্র বসন্ত। সরাইখানায় যাদের লাশ পড়ে আছে, তারা সবাই বসন্তে মরেছে।

কি করে জানলে?—কুচাক জিজ্ঞেস করলে।

—পরিচিত একজন শিকারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যেসব ঘোড়ার মালিক বসন্তে মরেছে, সেইসব বেওয়ারিশ ঘোড়া এক-একটা ধরে তার পিঠে চেপে উলার শিকার করাই তার কাজ। এমন লোকও আছে, যারা একটা উলারের জন্যে একশোটা ভেড়া দিতে রাজী। কেন, তা তুমিও জান। উলারের মাংস যে খায়, তার বসন্ত হয় না, উলারের মাংস খেলে বসন্ত রোগীও সুস্থ হয়।

জমিদাররা এদিকে হৈ-চৈ শুরু করেছে : কুচাককে তাড়িয়ে দাও সঈদ! ওকে বসন্তে ধরবে। ও মড়াগুলোর কাছে গেছলো।

সঈদ তাদের আশ্বস্ত করে,—না, সে ভয় নেই। মনে নেই, আমি বলেছিলাম ও উলারের মাংস খেয়েছে?

কথাটা মনে পড়তেই জমিদাররা পর্বতের আড়ালে আড়ালে গুটি গুটি ফিরে এল ওদের কাছে।

এখন তাহলে কি করা?—কেউটে জিজ্ঞেস করলে।

থুথু ফেলে বিরস মুখে সঈদ বললে,—এখান থেকে সরে পড়তে হবে। কয়েকটা

ইয়াক বা ঘোড়া কেনা দরকার এখুনি। সারিকলের দক্ষিণে পর্বত-এলাকায় যেসব কিরঘিজ গ্রাম আছে, সেখানে বসন্ত নেই। সেদিকে যেতে হবে আমাদের। শিকারীটার কাছে শুনলাম, শীতকালে যেমন মাছি মরে, সারিকলে তেমনি বসন্তে মানুষ মরছে গ্রামকে গ্রাম উজাড়। শিকারীমাত্রেই আজ উলার-শিকারে লেগেছে। কিন্তু উলার শিকার করা ভারী কঠিন, খুব উঁচু সব পর্বতে তাদের বাস। জোর গুজব, যে লোক উলার খেয়েছে, তার একটা আঙুলের জন্যে লোকে কুড়িটা ভেড়া পর্যন্ত দিচ্ছে। কারণ উলার-খাওয়া লোকের মাংসও বসন্ত রোগের দাওয়াই ও প্রতিষেধক।

সরে পড়ার ব্যাপারে সবাই একমত। জমিদারদের কাছ থেকে সঈদ পাওনাগণ্ডা সব বুঝে নিলে।

আবার রওনা হয় তারা। উষ্ণ রাত্রি। সঈদের পেছনে আসছে জমিদররা কিন্তু তাদের মনোবল একেবারেই ভেঙে গেছে। এত অবসন্ন ও মনমরা হয়ে পড়েছে যে, তারা রাতের মতো বিশ্রাম নেওয়া ঠিক করে।

পর দিন সকালে আবার শুরু হলো যাত্রা। উদ্‌গ্রীব চোখে কুচাক তাকাচ্ছে নতুন দেশের দিকে। অনুর্বর শ্রীহীন দেশ। এখানে ওখানে বিরল বনগোলাপের কাঁটাঝাড়, জুনিপার গাছ আর ফার্জলতার পাতলা ঝোপ। নীচে গিরিখাত দিয়ে খরস্রোতা এক পার্বত্য নদী বয়ে চলেছে। তার বিস্তার দেখে কুচাক বুঝলো, গিরিবর্ত্ম থেকে বহু দূরে তারা চলে এসেছে।

চতুর্থ পর্ব ৫

দলটি এগিয়ে চলেছে। গিরিখাত কখনো দক্ষিণে, কখনো পূবে বাঁক নিচ্ছে। দু পাশেই শুধু পর্বতঢাল। প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে গিরিখাতের বিস্তার বাড়ছে। খানিক পরে দেখা গেল, অদূরে বনময় এক পর্বত-ঢাল আর দূরে পর্বতে ঘেরা এক পাহাড়ী প্রান্তর।

আরো খানিকটা যেতে পথটা দু ভাগ হয়ে গেল : একটা নীচে দক্ষিণ দিকে নেমে গেছে, অন্যটা গেছে উত্তর দিকে। সব দিকেই শুধু টিলা, ঢিবি আর পাথর।

হঠাৎ গুলির আওয়াজ এল, সেই সঙ্গে এক অদৃশ্য কণ্ঠের হুকুম : দাঁড়াও! নড়ো না!

একটু পরে বাঁয়ের এক পাথর-চাংড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক বন্দুকধারী, বললে,—আর এগিও না, ফিরে যাও! বসন্ত-এলাকার লোকদের আমাদের গাঁয়ে ঢোকা বারণ।

সঈদ বললে,—আমরা পামীরের লোক। পামীরে আমরা বহু উলার খেয়েছি, তাই আমাদের বসন্তের ভয় নেই। যাই হোক, নটা ঘোড়া বিক্রি করো আমাদের কাছে। এ এলাকা ছেড়ে আমরা চলে যাব।

ইতিমধ্যে সশস্ত্র আর একজন পাহারাদার বেরিয়ে এসেছে আর এক টিলার পেছন থেকে। দুজনের মধ্যে কি যেন পরামর্শ হয়। শেষে প্রথমজন বললে,—চারটে ঘোড়া তোমাদের কাছে বেচতে পারি। কিন্তু শর্ত হলো, তোমাদের উলারের মাংস দিতে হবে।

উলার! উলার তো আমরা সঙ্গে আনি নি।—সঈদ বললে : উলার আমরা খেয়েছি।

এদিকে পাহারাদারের কথাটা কানে যেতেই জমিদারদের পরস্পরের মধ্যে অর্থব্যঞ্জক

দৃষ্টি বিনিময় শুরু হয়েছে, তাদের সবারই দৃষ্টি কুচাকের দিকে। চোখে তাদের কুটিল শয়তানী চাউনি।

কুচাক সঈদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ফিসফিস করে সঈদ বললে,—পালাও!

কোৎ করে ঢোক গিলে কুচাক কোমরের বেল্ট চেপে ধরলো। বেল্টের সঙ্গেই সোনটা বাঁধা আছে।

কুচাকের দিকে এগোতে এগোতে মধুঢালা কণ্ঠে মোল্লা ডাকলে,—এদিকে এস তো ভাই কুচাক, প্রাণের দোস্ত আমার! শোন তো একটিবার।

পালাও হাঁদারাম!—সঈদ আবার ফিসফিসিয়ে উঠলো ঃ পালাও এক্ষুণি, নয়তো জমিদাররা তোমায় মাংস হিসেবে বিক্রি করবে।

কুচাক লাফিয়ে উঠলো, পরক্ষণে বন্দুকধারী পাহারাওলার পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে ছুটলো মরিবাঁচি করে। এককানী ছুটলো তার পেছনে। জমিদাররা প্রথমে হক-চকিয়ে গেছলো, তারপরেই তারা ছুটলো ওকে ধরার জন্যে।

পা-বাঁধা অবস্থায় পাহারাদারদের একটা ঘোড়া পর্বত-ঢালে দাঁড়িয়ে আছে। কুচাক সেদিকে ছুটছে দেখে তারা চেঁচিয়ে উঠলো,—ধরো ধরো! ঘোড়া নিয়ে পালাবে!

কুচাক কিন্তু ঘোড়ার কাছে এসে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়লো, ঘোড়াটার ওপর নজর পড়তেই আতঙ্কে চিৎকার করে পেছিয়ে গেল লাফ মেরে, তার পরেই পথ ছেড়ে ছুটলো ডাইনের পর্বততলীর জঙ্গলের দিকে।

কুচাকের পেছনে সঈদ ছুটছে সবার আগে, ঘোড়াটার কাছে প্রায় এসে গেছে। ঘোড়াটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে সে বললে,—জঙ্গলের মধ্যে কুচাকের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না।

জমিদাররা মন্তব্য করে,—ওটা নীরেট গাধা। শেষে কিনা ঘোড়া দেখে ভয় পেলে!

সঈদ হেসে উঠলো ঃ জীবনে বোধহয় এই প্রথম ও ঘোড়া দেখলো। হয়তো ড্রাগনই ভেবেছে। যাক্ গে, ঘোড়াটার পায়ের বাঁধন খুলে আমি লাগাম পরিয়ে দিচ্ছি, মোল্লা সাহেব চড়তে পারবেন।

ঢিবি পাথরের ওপর জমিদাররা ততক্ষণে বসে পড়েছে। সঈদ ধীরে-সুস্থে ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে গেল। তার পায়ের বাঁধন খুলে জিন ও লাগাম পরিয়ে দিলে। তার পরেই হঠাৎ এক লাফে জিনের ওপর উঠে বসে হাঁক ছাড়লে জমিদারদের লক্ষ্য করে,—বিদায়, হুজুর, বিদায়! আমি চললাম, আমার বাড়ি যাবার তাড়া রয়েছে। আপনাদের কাশ-গড়িয়ায় পৌঁছে দিয়েছি, আমার কাজ শেষ। আল্লা আপনাদের রক্ষা করুন। প্রার্থনা জানাই, স্থানীয় বাসিন্দারা যেন উলার-খাওয়া লোক হিসেবে আপনাদেরই আবার খেয়ে না ফেলে।

বলতে বলতে সঈদ ঘোড়ায় চাবুক মেরে উৎরাই বেয়ে ছুটলো নীচে বনের দিকে।

ধরো ধরো!—জমিদাররা চেঁচিয়ে উঠলো।

ধরো ধরো!—নানা কণ্ঠের চিৎকার উঠলো চারদিকে। বন্দুক নিয়ে ছুটে গেল কয়েকজন।

প্রাণের দায়ে জমিদাররা তখন ছত্রভঙ্গ। বোঝা কমানোর জন্যে মালপত্র ফেলেই, তারা যে যেদিকে পারে দৌড়লো। তিনজন দৌড়লো একদিকে, তারা শেষ পর্যন্ত দক্ষিণে পালাতে পেরেছিল। কিন্তু মোল্লা সমেত অন্য তিনজন খরস্রোতা নদী পার হতে গিয়ে মারা পড়লো।

পথে জমিদারদের সঙ্গে কত লোকের দেখা হয়। সবারই জিজ্ঞাসা ঃ তাদের

সঙ্গে উলার-মাংস আছে কিনা বা সেই অলৌকিক তাজ্জব পাখির মাংস তারা কখনো খেয়েছে কিনা। জানের মায়ায় জমিদাররা বলে কুচাকের কথা ঃ অসংখ্য উলার সে খেয়েছে, তাই তারাও খুঁজছে কুচাককে।

যত রকমের উদ্ভট আজগুবী কাহিনী বানানো সম্ভব, সে সবই তারা কুচাক সম্পর্কে রটাতে রটাতে যায়। মড়কের ভয়ে তটস্থ পার্বত্য দেশের বাসিন্দা—জাদু, ভূতপ্রেত, জিনদানো, অপদেবতা আর প্রাচীন রীতিনীতির অলৌকিক ক্ষমতায় তাদের অখণ্ড বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করে জমিদারদের কথা।

দেখতে দেখতে জমিদারদের বানানো এইসব উদ্ভট গালগল্প পার্বত্য গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে, আরো রং মিশিয়ে ছড়াতে থাকে দাবানলের মতো। মুখে মুখে জনরব ছুটতে থাকে ঃ দুনিয়ার আখেরী কেয়ামৎ বা শেষ দিন ঘোষণা করতে করতে কুচাক নাকি ড্রাগনে চড়ে উড়ে চলেছে। ড্রাগনের নিশ্বাসে আগুন ঝরে। মনুষ্যরূপী কুচাক আর কেউ নয়—মূর্তিমান শয়তান। কাফেরদের নয়া শাসনব্যবস্থা কায়েম করে তুর্কিস্তান ইসলাম বরবাদ করেছে, আল্লা তাই কুচাককে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন বসন্ত ছড়িয়ে সেই পাপের শাস্তি দেবার জন্যে।

চতুর্থ পর্ব ৬

কুচাকের খোঁজ করতে করতে সঈদ ঘোড়া নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। জঙ্গল আরো গভীর হচ্ছে, ঘন হচ্ছে ক্রমেই। কিন্তু কুচাকের পাত্তা নেই।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য পাত্তা মিললো কুচাকের, আর তা গভীর রাতে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই। সঈদের কাছে রয়েছে রোস্ট-করা মাংস। বাতাসে তার গন্ধ শুঁকে শুঁকে হঠাৎ সদাক্ষুধার্ত এককানী এসে হাজির। এককানীর পেছন পেছন গিয়ে সঈদ কুচাককে আবিষ্কার করলো এক গর্তের মধ্যে। অন্ধকারে কুচাক আতঙ্কে হাউমাউ করে উঠেছিল, কিন্তু সঈদকে চিনতে পেরে শান্ত হলো।

পর দিন ভোর হবার আগে তারা রওনা হবার জন্যে তৈরী হয়েছে, হঠাৎ ঘোড়া দেখে কুচাক গেঙিয়ে উঠলো,—আঁা! আঁা! ওটা কি?

ঘোড়া।—শান্ত কণ্ঠে সঈদ বললে ঃ এই জানোয়ারগুলোর কথা কি আগে শোন নি কখনো?

ঘোড়া!—তাজ্জব জানোয়ারটার দিকে কুচাক অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে ঃ হ্যাঁ, ঘোড়ার কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু দেখিনি কখনো।

শেষ পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে দুজনে চেপে বসলো। কুচাক অবশ্য সহজে রাজী হয় নি। মনিব হিসাবে সঈদ বসেছে জিনের ওপর আর ত্রস্তশঙ্কিত কুচাক বসেছে তার পেছনে ঘোড়ার কোমরের ওপর। সঈদকে সে জোরে জাপ্টে ধরে আছে।

যেতে যেতে সঈদ বললে,—অত জোরে আমায় চেপে ধরো না। ভয় নেই, পড়বে না। আমার সঙ্গেই তুমি থেক, বুঝলে? একলা থাকলে তুমি নির্ঘাৎ বিপদে পড়বে। সব রকম কাজকর্মে তুমি আমায় সাহায্য করবে। তোমার যাতে বিপদ-আপদ না ঘটে, তা দেখার দায় আমার।

ধন্যবাদ, সঈদ।—পেটের নীচের কোমরবন্দের ভাঁজগুলোয় হাত বোলাতে বোলাতে কুচাক জবাব দিলে ঃ তা কি ধরনের কাজ তুমি করো?

সশব্দে ঠোঁট চাটে সঈদ। বলে,—এমন কোন কাজ নেই, আমি করিনি। নীল কাদা আর কাঁকর থেকে সোনা ধুয়ে বের করার কাজ করেছি। ভিখিরির কাজ করেছি, ভিক্ষেও করেছি। কিন্তু শেষ তক্ ভিখিরি দলের সর্দারের সঙ্গে ঝগড়া বাধে। কারণ আমার ন্যায্য পাওনাগণ্ডা দিতে সে অস্বীকার করেছিল। মড়া সরানোর কাজও আমি করেছি......

কী! কী বললে?—ত্রস্ত কণ্ঠ কুচাকের।

আঃ, কুচাক! কিছু জান না তুমি।—শান্ত কণ্ঠে সঈদ বললেঃ সামান্য এ কথাটাও কি জান না যে, প্রত্যেক কাজী তার জেলার প্রতিটি খুনের জন্যে দায়ী? কাজী যেখানে থাকে, তার থেকে বহু দূরে খুন হলে কাজীকে যে জরিমানা দিতে হয়, তার পরিমাণ খুব বেশী নয়। কিন্তু কাছাকাছি হলে, আর রক্ষে নেই—জরিমানার ঠ্যালায় কাজীর জীব বেরিয়ে যাবার জোগাড় হয়। তাই কাজীরা অনেকেই নিজেদের জেলায় খুন হলে লাশ অন্য জেলায় সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, এবং এ কাজ যে করে তাকে বেশ মোটা টাকা দেয়। রোজগারের এ পথটা বেশ ভালই। কিন্তু মুশকিল হলো, কাজটা হামেশা জোটে না। এ কাজ ছাড়া গুপ্তধনের খোঁজেও আমি ঘুরেছি। তাকলামাকানের জনহীন পরিত্যক্ত পুরনো শহরগুলোয় অনেক দামী দামী জিনিস পাওয়া যায়।

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে, ওখেনে মরুভূমি?—কুচাক জিজ্ঞেস করলে।

ঠিকই বলেছিলাম।—সঈদ সায় দেয়ঃ কিন্তু সেই মরুভূমিতে, তুমি বোধহয় জান না, আস্ত এক-একটা শহর বালির নীচে চাপা পড়ে আছে। তল্লাশ করে খুঁড়তে হয় সেইসব জায়গা। এই কাশগড়িয়াতেও এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে গুপ্তধনের খোঁজ চলতে পারে। এ ছাড়া চোরাচালানের কারবারটাও বেশ লাভের।

জঙ্গল পার হয়ে তারা ধূলিধূসরিত এক পথে এসে পেঁছিলো। পথটা নীচে সমতলের দিকে নেমে গেছে।

সারা দিন কেটে যায়। মাঝে একবার কিছু খেয়ে নিয়ে আবার রওনা হয় তারা।

সূর্য ডোবে ডোবে, এমন সময় অদূরে পর্বত-ঢালে এক গিরিখাতের মুখে কতকগুলো তাঁবু দেখা গেল। সেখান থেকে গোরু-মোষের ডাক কানে আসছে।

সঈদ ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে কুচাককে বললে,—শোন, এই কুড়িটা টাকা নাও। ওখান থেকে কিছু মাংস কিনে নিয়ে এস। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু এই কিরঘিজ 'তাইত' গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তেমন ভাল নেই।

'আচ্ছা' বলে কুচাক রওনা হলো।

পেছন থেকে সঈদ হাঁক ছাড়ে,—আগে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে নিও, ভেতরে ওরা কি আলোচনা করছে, তারপর ভেতরে যেও।

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে কুচাক এগিয়ে চললো।

চুপি চুপি প্রথম তাঁবুটার কাছে গিয়ে সে প্রবেশ পথের মুখে ঝুলন্ত পরদায় কান পাতলো. শুনলো ভেতরে কে যেন নীচু ভরাট গলায় বলছে,—হ্যাঁ, ওটা বেশ মোটা। ওকে খাওয়া যেতে পারে। ভালই হবে।

একটা ভেড়া সম্বন্ধে মেষপালকেরা আলোচনা করছে। কিন্তু কথাটা কানে যেতেই কুচাকের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো থরথর করে। এ পর্যন্ত এই অপরিচিত দুনিয়ার মানুষগুলো সম্বন্ধে তার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, যেসব ঘটনা ঘটেছে একের পর এক, তাতে সে দস্তুর মতো ঘাবড়ে আছে. সবসময়েই সশঙ্কিত। কথাটা কানে যেতেই তার ধারণা হলো, তাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার কম্পিত হাত থেকে ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল টাকাগুলো। সে দৌড়লো মরিবাঁচি করে।

অচেনা লোকের গন্ধ পেয়ে তাঁবুর বাইরে কুকুরের পাল ততক্ষণে ডাকতে শুরু করেছে। কিরঘিজরা বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। কুচাক তখন বহু দূরে চলে গেছে। তাকে ওরা দেখতে পেল না। দেখতে পেল সঈদকে, চিনতেও পারলো। বছর দুই আগে সে এই গাঁয়েরই একজনের ছেলেকে খুন করে টাকা-পয়সা লুট করে পালিয়েছিল।

ঘোড়ায় চেপে তারা তাড়া করলো সঈদকে। ধরা পড়তে পড়তে অতি অল্পের জন্যে সঈদ বেঁচে গেল সেবার।

কুচাক এদিকে খসখসে লম্বা ঘাসের মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছে। সেখানেই তার রাত কাটলো। পাশে শুয়ে রইল এককানী।

পর দিন ভোরে কুচাক ভাল করে পরখ করে অঞ্চলটা। নিরানন্দ এক কুশ্রী উপত্যকা। মাঝখানে জলাভূমি। জলার কিনারা বরাবর লম্বা চিয়া ঘাসের ঝাড়। জলার ধারের মাটি ফাটা আর লাল।

সমস্ত কিছু মিলে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় কুচাকের। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। চকচকে কালো জলের ছোট এক ডোবার ধারে গিয়ে সে দাঁড়ালো। আয়নার মতো জলের মধ্যে নিজের ছায়া পড়েছে। 'লোমশ কিরঘিজ!'—তার নিজের মুখ থেকেই বেরিয়ে এল কথাটা। জমিদাররাই তার এ নামকরণ করেছিল। বলেছিল, তার চেহারা নাকি মনে রাখার মতো, একবার দেখলে সহজে ভুলবার নয়। কয়েক মুহূর্তের জন্যে কুচাক অন্যমনস্ক হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে খানিকটা জল সে হাতে তুলে নিলে। কটু নোনা জল—মুখে দেওয়া যায় না।

দূরে আরো ভেতরে বড় আর একটা ডোবা দেখা যাচ্ছে। শক্ত কাদার ওপর দিয়ে সে এগিয়ে যায় সেদিকে। কাদার ওপরটা কিছু শক্ত হলেও তার দেহের ভারে ফেটে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে বসেও যাচ্ছে অল্পস্বল্প।

হঠাৎ কি খেয়াল হলো কুচাকের, দাঁড়িয়ে পড়ে মাটিতে সে জোরে লাথি মারলে। সঙ্গে সঙ্গে কাদার ওপরের আস্তরণটা ফেটে গেল, আর সে দেবে গেল মাটির মধ্যে।

'আরে, আরে! কি হলো! কি হলো!'—গোঙিয়ে উঠলো কুচাক। উঠে আসার চেষ্টা করে সে। কিন্তু যতই আঁকুপাঁকু করে নিজেকে টেনে তোলার জন্যে, ততই তলিয়ে যায় নীচের পাঁকের মধ্যে। শেষে সে কাদার ওপর উপুড় হয়ে পড়লো। আর কাছে বসে সমানে কঁকিয়ে চললো এককানী।

অনেকক্ষণ ধরে প্রাণান্ত চেষ্টার পর জলার ঘন পাঁক থেকে উঠে এল কুচাক। নিদারুণ পরিশ্রমে সারা দেহ তার থরথর করে কাঁপছে। কাদা ধোয়ার জন্যে সে এগিয়ে গেল ছোট ডোবাটার দিকে। কিন্তু জলের ওপর উবু হতেই ভয়ে পেছিয়ে এল : সর্বনাশ! ডোবার ভেতর থেকে অচেনা একটা মুখ তার দিকে চেয়ে আছে।

কিছু সময় সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরে ধীরে তার মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি : খাসা ছদ্মবেশ হয়েছে! নিজেই সে যখন নিজের মুখ চিনতে পারে নি, তখন অন্যের পক্ষে তো কথাই নেই।

সরু এক পাহাড়ী পথ ধরে এবার সে রওনা হলো। পেছনে এককানী। চড়াই বেয়ে তারা এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে।

কিন্তু বৃথা আশা কুচাকের। কোন ছদ্মবেশই তাকে রক্ষা করতে পারলো না।

কয়েক দিন পরে রাতে কুচাক তখন ঘুমুচ্ছে, হঠাৎ কিপচাকবের বাসমাচিদলের কয়েকজনের নজর পড়লো তার ওপর।

প্রথমে তারা ওকে কুষ্ঠরোগী বলেই মনে করেছিল। প্রকাশ্য স্থানে এভাবে কুষ্ঠ-

রোগীকে থাকতে দেয়া যায় না। তারা হইচই শুরু করলে। কিন্তু পরে তারা দেখলে, তা নয়—ওটা ছদ্মবেশ। তাদের সন্দেহ হলো। এবং সে সন্দেহ আরো জোরদার হলো ভিখিরিটার আবোলতাবোল কথায়।

একানীকে গুলি করে মেরে তারা পাকড়াও করলো কুচাককে। তাকেও গুলি করে মারতো, কিন্তু হতভাগা বাউণ্ডুলেটার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এক গাদা সোনা বের হওয়ায় তারা ওকে ধরে নিয়ে গেল কিপচাকবের কাছে।

কয়েক ঘণ্টা পরে—এক উঠোনের শেষ দিকে ছোট এক অন্ধকার গুদোমের মধ্যে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে কুচাক। গুদোমে কোন জানালা নেই, এমন কি ধোঁয়া বেবনোর একটা ছ্যাঁদা পর্যন্ত নেই। কুচাকের মুখের ওপর ঝুঁকে আছে ঘর্মাক্ত লাল-মুখো মোল্লা কিপচাকবে।

হিংস্র লোলুপ কণ্ঠে কিপচাকবে বলছে,—সোনা! এ সোনা তুই কোথায় পেলি? জবাব দে!

কিন্তু অজ্ঞানের ভান করে কুচাক পড়ে থাকে।

তার পাশে বসে পড়ে কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি মারতে মারতে কিপচাকবে আবার বললে.—শোন্ হতভাগা, এই নির্ভেজাল খাঁটি লাল সোনা কোথায় পেয়েছিস, তা যদি তোর কাছ থেকে বের করতে না পারি তো, আমি তিন-তিনটে বাসমাচি ফৌজের কাজীই নই। না বলিস তো, তোকে খতম করার হুকুম দেব বুঝেছিস?

এবাব কুচাকের তোতলামি শুরু হয় ঃ আ-আমি এ-এই এলাকারই বা-বাসিন্দা... দূ-দূ-দূরের এক দেশে ক্-ক্-কিছু গু-গুপ্তধন পেয়েছিলাম। আ-আরো স্-সোনা আছে সেখেনে আ-আপনাকে নিয়ে যাব......

হঠাৎ সশব্দে গুদোমের দরজা খুলে গেল, অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটি কণ্ঠ,—কাজী, সঈদ নামে এক বদমাশ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে বলছে, কয়েদীকে সে চেনে। ও নাকি পামীর থেকে এসেছে। সঈদ আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

দুরন্ত রাগে গর্জে উঠলো কিপচাকবে, কুচাকের মুখে এক লাথি মেরে ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললে,—অ্যাঁ, আমি কাজী, আমার কাছেই কিনা তুই মিথ্যে বললি! পামীর থেকে তুই এসেছিস! আজ তোর জান শেষ করবো। বল্, এ সোনা কোথায় পেয়েছিস।

বলতে বলতে আবার সে এক ঘুষি বসিয়ে দেয় কুচাকের মুখে।

কুচাকের চোখের তারা পাক খাচ্ছে। আর যন্ত্রণার মধ্যেও থেকে থেকে মনের মাঝে উঁকি মারছে একটা কথা—সোনা.. এই সোনাটাই যত নষ্টের মূল......সেই গোড়া থেকে.... আঃ! এবার বুঝি আর রেহাই নেই!......

ক্ষীণকণ্ঠে সে বললে,—একটু জল।

অন্ধকার কোণ থেকে বাসমাচি সেপাইটা আবার বললে,—কাজী, ওকে ছুঁয়ে হাত নোংরা করবেন না। সঈদ বলছে, সব কথাই সে আপনাকে জানাবে।

গর্জাতে গর্জাতে কিপচাকবে বেরিয়ে গেল। বলে গেল,—ছুঁচো শয়তান, মিথ্যে বলে থাকলে আজ আর তোর বাঁচোয়া নেই!

একটু পরেই সঈদ ঢুকলো গুদোমের মধ্যে। কুচাকের পাশে বসে তিরস্কারের সুরে বললে,—কুচাক, দোস্ত হিসেবে তুমি মোটেই নির্ভরযোগ্য নও। এখন বলো তো, সোনাটা কোথায় পেয়েছিলে?

দরদভরা শান্ত গলা সঈদের, কিন্তু মনে ঝড় চলেছে। এমন একটা শাঁসালো মাল মুঠোর ভেতর থেকে ফস্কে বেরিয়ে যাওয়ায়, নিজেকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না।

অনুগত কণ্ঠে কুচাক বললে,—বিলিয়াণ্ড-কীকে এক বরফ-ফাটলের মধ্যে। এখনো প্রচুর সোনা আছে সে......

শ্‌স্‌...আস্তে!—সঈদ ঘরটার চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয়। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে কাছে পিঠে কেউ আছে কিনা। শেষে ঝুঁকে পড়ে কুচাকের কানে কানে বললে ঃ শোন, যা বলি, সেই মতো চলবে। তোমায় আমি বাঁচাবো, কাজীকেও কলা দেখাব। বিলিয়াণ্ড-কীকে যে সোনা পাওয়া যাবে, তাতে তোমার-আমার আধাআধি বখরা রইলো, কেমন? কাজী কিপচাকবেকে বলবে, এ সোনা তুমি তাকলা-মাকান মরুভূমিতে বালির নীচে চাপা-পড়া জনহীন এক শহরে পেয়েছিলে—বুঝলে?

আচ্ছা।—কুচাক সায় দেয়।

কয়েক দিন পরে—কিপচাকবের কেল্লা থেকে পাঁচজন ঘোড়সওয়ার রওনা হলো পুবমুখো। সঈদ সবার আগে। তার পেছনে কুচাক—ঘোড়ার কেশর সাপটে ধরে আছে। পেছনে আসছে তিনজন সশস্ত্র বাসমাচি... ..

মাস কেটে যায়। সঈদ কথা দিয়েছিল, এক মাসের মধ্যেই ফিরবে। কিন্তু কারোই পাত্তা নেই। দ্বিতীয় মাসও পার হয়। কিপচাকবে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পেছনে কোন শয়তানী চক্রান্ত আছে বলে তার দৃঢ় সন্দেহ হয়। দলের আরো তিনজন সেপাইকে সে পাঠালো ওদের খোঁজ করতে।

দু সপ্তাহ পরে তারা ফিরে এল, বললে,—লোকে সঈদকে বেঁটে চেহারার একজন কিরঘিজের সঙ্গে যেতে দেখেছে। কিন্তু তারা কোথায় গেছে, কেউ জানে না। সঙ্গের বাসমাচি তিনজনেরও কোন পাত্তা নেই।

নিষ্ফল দুরন্ত আক্রোশে গুম হয়ে রইল কাজী কিপচাকবে।

পঞ্চম পর্ব ১

সুউচ্চ পর্বত-অধিত্যকায় রক্তের বন্যায় জুরার অচেতন দেহ পড়ে আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। শেষে একসময় তার জ্ঞান ফিরে এল। টীক চারপাশে ছুটোছুটি ও কেঁউ কেঁউ করছে আর জিব দিয়ে রক্ত চাটছে।

জুরা উঠবার চেষ্টা করতেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। পথ-শ্রমে এমনিতেই সে ছিল অবসন্ন, তার ওপর রক্ত-ক্ষরণে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, নড়াচড়ারও শক্তি নেই।

সন্ধ্যা নেমেছে। নীলাভ ছায়ায় ভরে গেছে অধিত্যকা। পর্বত-শিখরের উপরকার হিমবাহটি একসময় ঝলমল করে উঠলো। চাঁদ উঠছে। ধীরে ধীরে সেদিকে ঘাড় ফেরালে জুরা।

দিনের বেলায় যেসব অলৌকিক দৃশ্য দেখেছিল, সেসব তার মনে পড়ে। সে কি স্বপ্ন দেখছে? হাত বাড়াতেই রাইফেলটা হাতে ঠেকলো। নাঃ স্বপ্ন না। টীক তার আঙুল চাটছে, আবাব কেঁউ কেঁউ শুরু করেছে।

দুই ঠোঁট শুক্‌নো নীবস ক্ষীণ কণ্ঠে ফিসফিস করে জুরা বললে,—হে আল্লা! হে দেও! শোন, তোমাদের আমি ঘেন্না কবি। তোমাদের কাছে আমি সবচেয়ে সাদা ছাগলটা কোরবানি করেছিলাম, নিজে এক টুকরো মুখে দিইনি। তবু তোমরা আমায় সাহায্য করলে না। দুশমনরা যাতে আমায় খুন করতে পারে, তার জন্যেই কি ঐসব জাদু দেখিয়েছিলে? আল্লা, দেও! শোন, তোমরা আমার সঙ্গে চোরের মতো ব্যবহার করেছ। আমার কাছ থেকে তোমরা কোরবানি নিলে, আর তার বদলে দিলে মৃত্যু। আমার সবচেয়ে বড় দুশমনদেব খতম করার জন্যে তোমাদের সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা আমায় ঠকালে, জুয়োচুরি করলে। আল্লা, দেও, তোমাদের আর আমি বিশ্বাস করি নে! হ্যাঁ, তোমাদের আমি ঘেন্না করি...

জুরার চোখ রক্তবর্ণ। ক্ষতস্থানে নিদারুণ যন্ত্রণা। জ্বলন্ত বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে। চোখ ফেরাতে পারে না। আধা-অচেতন অব-স্থায় সে প্রলাপ বকছে। ফিসফিস করে বললে,—চাঁদের মেয়ে, শুনছো? ভাল করে তাকিয়ে দেখ আমার দিকে। আমার মরণ ঘনিয়ে আসছে!...

বলতে বলতে আবার সে জ্ঞান হারালো।

টীক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ভালুকের মতো প্রকাণ্ড মাথাটা চাঁদের দিকে তুলে ককিয়ে কেঁদে উঠলো সে।

ঘণ্টার পব ঘণ্টা আবার পার হয়। একসময় টীকের ভয়ঙ্কর চিৎকারে আবার জুরার জ্ঞান ফিরে এল। তার পাশে কয়েকজন লোক—কি যেন বলাবলি কবছে। তাদের একজন ওকে তুলে নিলে।

টীক চারপাশে লম্ফঝম্ফ করছে আর ডাকছে প্রাণপণে। মনিবকে সে উঠতে বলছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, নবাগত লোকগুলোকে কিছু বলছে না। যেভাবেই হোক, তার ধারণা হয়েছে, লোকগুলো ওদের দুশমন নয়—দোস্ত।

আচ্ছন্ন চেতনার মাঝে জুরার মনের গভীরে চিন্তা জাগে,—মৃত্যুদূতরা তাকে নিয়ে

যাচ্ছে। বাসমাচিদের ওপর আর বদলা নেওয়া হলো না। মৃত্যুর পর এজন্যে তাকে সাজা পেতে হবে।

ভাবতে ভাবতে আবার তার সংজ্ঞা লোপ পেল।

জালাই গিরিশ্রেণীর অদূরে বহু উঁচুতে পর্বত-ঘেরা এক সংকীর্ণ উপত্যকা। অনুর্বর নেড়া পাহাড়-পর্বত। সবুজশ্যামল বাগবাগিচা, গাছপালার জঙ্গল বা লতা-গুল্মের ঝোপঝাড় কিছুই নেই। আছে শুধু এক কেল্লা। হামলাকারী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কেল্লার দেওয়ালের গায়ে নানা ছোটবড় ফোকর। টিলা, পাথর, মাটি, কেল্লা—সব কিছুই হলদে পাঁশুটে রঙের।

অনেক অবরোধ-আক্রমণ অগ্রাহ্য করে পুরনো মজবুত কেল্লাটি দাঁড়িয়ে আছে সুদীর্ঘকাল। কেল্লাব বুরুজের মাথায় খুঁটি থেকে এক লালঝাণ্ডা উড়ছে। অবিরাম ঝড়েব দাপটে সেটা এখন কয়েকটা লম্বা ফালি মাত্র। জোরে বাতাস বইলে চাবুক মারার মতো শব্দ বের হয় সেগুলো থেকে।

বুরুজের মাথায় রাইফেল হাতে একজন সান্ত্রী গুনগুন করে গান কবতে করতে পায়চারি করছে। কজুবে-র উপত্যকারক্ষী পার্টিজান বাহিনীর লোক সে।

এ গান শুনে উপত্যকার যে কেউ বলতে পারে, গান করছে তাতার আখমেদ। পার্টিজান বাহিনীর সবচেয়ে আমুদে রসিক লোক তাতার আখমেদ। তার অনেক তাতার গান আর কথা পামীরে ছড়িয়ে পড়েছে। পার্টিজান ও চাষীরা তাকে ভালবাসে। অত্যন্ত তীক্ষ্ম নজর আখমেদের। নিশানা দেখে কোন কিছু খুঁজে বের করায় তার দক্ষতা অসাধারণ। এজন্য কজুবে পর্যন্ত তাকে যথেষ্ট খাতির করেন।

হুকের মতো বাঁকা নাক আর রোগাটে পাতলা চেহারা আখমেদের—এক মুহূর্তও সুস্থির থাকতে পারে না। গানেব সঙ্গে পা ঠুকে সময়ের তাল দিতে দিতে চারদিকে কড়া নজর রাখছে সে। অবশ্য নজর রাখার মতো নেইও কিছু। সব দিকেই সেই চেনা পর্বতশ্রেণী, উপত্যকার উল্টো দিকে কিবঘিজ গাঁয়ের সেই চেনা সব তাঁবু।

সহসা উপত্যকার ওপর দিয়ে দ্রুতগামী একটা ছায়া চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আখ-মেদের গান বন্ধ। আকাশের দিকে সে তাকালে। পর্বতের ওপর দিয়ে শকুনের ঝাঁক উড়ছে। উত্তরের গিরিবর্ত্মের ওপরে তারা পাক খাচ্ছে আর ছোঁ মারছে। আর প্রতি-বার ছোঁ মাবার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে কেল্লার দিকে। তার মানে, কোন লাশ ওদের নজরে পড়েছে, আর তা মাটিতে পড়ে নেই, তাকে বয়ে আনা হচ্ছে। তীক্ষ্ম নজর রাখে আখমেদ।

একটু পরেই একদল সশস্ত্র লোক বেরিয়ে এল গিরিবর্ত্ম থেকে। তাদের আগে আগে কালো রঙের এক তেজী ঘোড়ায় আসছে কালোদাড়িয়াল মুসা—গত শীতে ইভাস্কোর সঙ্গে যে গিয়েছিল পামীরের মিন-আরখার গাঁয়ে। নির্ভীক দুঃসাহসী পার্টিজান হিসাবে সে সর্বজনপরিচিত।

একই ঘোড়ায় মুসার ঠিক পেছনে ঘোড়ার কোমরের ওপর বসে আছে আর এক-জন তরুণবয়স্ক পার্টিজান জলিল। পেছনের একটা ঘোড়ার লাগাম তার হাতে। ঘোড়াটার পিঠে জিনের দুই পাশে দুটো দেহ বাঁধা। জিনের আগা থেকে দুটো রাই-ফেল ঝুলছে। তাদের পেছনে ঘোড়ার পিঠে আবো তিনজন পার্টিজান। আর যথেষ্ট পেছনে আসছে একটা কালো রঙের বিশালকায় কুকুর।

ধোঁয়া বেরোবার ফোকরের ওপর ঝুঁকে পড়ে আখমেদ নীচে হাঁক ছাড়লে,—কমরেড

সেনাপতি কজুবে, মুসার বাহিনী মারকান-সু থেকে ফিরে আসছে। সঙ্গে এনেছে দুটো মানুষের দেহ আর একজোড়া রাইফেল।

ঘোড়সওয়াররা কেল্লায় এসে পৌঁছলো। গম্ভীর ভারী গলায় মুসা আখমেদকে বললে,—কমরেড সেনাপতিকে বলো, বাসমাচি চিরের লাশ আর একজন অল্পবয়সী আহত শিকারীকে নিয়ে এসেছি। সে ম্যাচলক দিয়ে চিরকে মেরেছে। শিকারীর সম্বন্ধে কি করা হবে?

খবরটা দিতেই কজুবে বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে। কজুবে বয়সে প্রৌঢ়, সাধারণ কিরঘিজের তুলনায় লম্বা। মুখের আদল গোল মতন। গায়ে লম্বা সরু আস্তিনের কালো কোট। মাথায় শেয়াল-চামড়ার টুপি। পায়ে গোড়ালিহীন নরম বুট জুতো। কোমরে ছ পাক জড়ানো কাপড়ের কিরঘিজ কোমরবন্ধ থেকে কাঠের খাপে মশার-পিস্তল ঝুলছে।

চিরের মৃতদেহটা দেখে কজুবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন,—শয়তান চিরটা শেষ-পর্যন্ত খতম হলো। আহত শিকারীকে ডাক্তারের কামরায় নিয়ে রাখ। ডাক্তারকে ওর দিকে বিশেষ নজর দিতে বলবে। আখমেদ, তুমিই যাও। এখন পাহারা পাল্টা-নোরও সময় হয়েছে।

জুরা চোখ মেললে। চোখের ওপর ঘরের ছাদ। পাশে তিনজন লোক—ঝুঁকে আছে তার ওপর। তাদের একজন চকচকে একটা লোহার রড দিয়ে তার ক্ষতস্থানে খোঁচা মারছে। ভয়ংকর জ্বালা করছে জখমের জায়গাটা।

বাসমাচি! গুহায় বাসমাচিরা আগুনের মতো গরম টকটকে লাল লোহা দিয়ে তাদের মেরেছিল। আবার সেই বাসমাচি! আবার তারা আগুনের মতো গরম লোহার রড তার বুকে চেপে ধরছে!

অসহ্য যন্ত্রণায় ও রাগে জুরা ভয়ংকর চিৎকার করে উঠলো। হাত দুটো বাঁধা নেই। ডাক্তারকে সে মাথায় ঘুষি মেরে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে পড়লো খাট থেকে। পাশেই একজন পার্টিজান দাঁড়িয়ে আছে। তার বুকে ঘুষি মেরে, দেয়ালের গায়ে যে রাইফেলটা ঠেস দেয়া রয়েছে, সেটা সে ছোঁ মেরে তুলে নিলে। কিন্তু ততক্ষণে তার দুর্বল দেহের শক্তি নিঃশেষিত। দুই হাঁটু থরথর করে কেঁপে উঠলো। রাইফেল হাতে সে লুটিয়ে পড়লো মেঝের ওপর।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আখমেদ বললে,—কি ক্ষ্যাপা জোয়ান রে বাবা!

জুরাকে আবার খাটে শুইয়ে ব্যান্ডেজের কাপড় দিয়ে তার হাত-পা খাটের সঙ্গে ভাল করে বেঁধে দেওয়া হলো। জুরার জ্ঞান ফিরে এল বহুক্ষণ পরে। ততক্ষণে ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হয়ে গেছে।

রাগে জুরা দাঁতে দাঁত ঘষে,—ইতর বদমাশ বাসমাচি, তোরা জাহান্নামে যা!

কিরঘিজ ভাষায় আখমেদ বললে,—অকারণে কেন আমাদের গালাগালি করছো? আমরা বাসমাচি নই—পার্টিজান।

জুরা ফুঁসে উঠলো,—দুশমন না হবে তো আমায় বেঁধেছ কেন?

—বাঁধন খুলে দিতে পারি, যদি হলপ করো যে, চুপচাপ ঠাণ্ডা হয়ে শুয়ে থাকবে। আমরা তোমার দোস্ত।

জুরা বললে,—হলপ করছি, চুপ করে শুয়ে থাকবো, নয়তো যেন আগুনে পুড়ে মরি।

ওর বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। খুলে তিনজনেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার সময় ডাক্তার বললেন,—এখন ঘুমোও। তোমার কুকুরটা ঘরে রইল।

জুরা শুয়ে থাকে। বেশ উত্তেজিত।

পার্টিজান!—জোরে জোরে সে উচ্চারণ করে কথাটা। ইভাস্কোর কথা মনে পড়ে। শীতের সময় ইভাস্কোকে সে খুন করতে চেয়েছিল। এখন কি সে তার শোধ তুলবে?

পঞ্চম পর্ব ২

দিনের পর রাত, রাতের পর দিন—এমনি করে কত দিন কত রাত কেটে গেল, জুরা জানে না।

খুব সঙ্গিন অবস্থার মধ্যে কেটেছে বেশ কিছু দিন। কি-হয় কি-হয় অবস্থা—যাকে বলে যমে-মানুষে টানাটানি। আশঙ্কা ও দুর্ভাবনায় দিন কেটেছে কজুবে, ডাক্তার, আখমেদ প্রভৃতির। কিন্তু কী বিস্ময়কর প্রাণশক্তি তরুণ শিকারীর! একটু একটু করে তার অবস্থা মোড় নেয় ভালোর দিকে। ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসতে থাকে ক্ষতস্থানগুলো।

ঘুম আর ঘুম—পীড়িত অবসন্ন জুরা বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়েই কাটায়, এক খাওয়ার সময় ছাড়া।

শেষে তার ঘুম একদিন পুরোপুরি ভাঙলো। পূর্ণ জাগরিত চোখে সে তাকালো। তার সামনে মাদুরের ওপর বেশ মোটা বেঁটে একজন লোক বসে আছে। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। দূর থেকে ভেসে আসছে লোকজনের কথাবার্তা আর ঘোড়ার ডাক।

বেঁটে লোকটার মুখে ক্ষীণ হাসি ঝিলিক দিয়ে যায়। দরদী গলায় সে বললে,—আমার নাম শরফ। তুমি কে?

শরফের ভালমানুষী চেহারা ও হাবভাবে জুরা অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করে। বলে,—আমি জুরা। শিকারী। আরবাখ আমায় ঠকিয়েছে। আমায় যখন তিনি জাদু ও ভেল্‌কি দেখাচ্ছিলেন, খাঁদা তখন আমায় গুলি করে।

আরবাখ!—শরফ অবাক : কি সে?

—আরবাখ হলেন জন্তুজানোয়ারদের দেবতা।

শরফ হেসে ফেললে, ধূর্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে,—পর্বত-এলাকায় বুঝি অনেক দেও-দেবতা আছে?

ওঃ, বহুৎ!—জুরার কণ্ঠে গভীর আন্তরিকতা : সরেল, জিন, আলবেস্ট, জেস্টার-নাক, এমনি আরো কত আছে সেখানে!

হাসি গোপন করার জন্যে শরফ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। অবাক চোখে জুরা তার গমনপথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

ক্ষণ পরেই শরফ ফিরে এল বেশ কয়েকজন অল্পবয়সী পার্টিজানকে নিয়ে। তার-পর শুরু হয় তার প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সানন্দে জুরা বলে যায় জিন, আলবেস্ট, সরেল ও জেস্টারনাক সম্বন্ধে। সে লক্ষ্যই করছে না যে, তরুণ পার্টিজানদের তখন হাসিতে

ফেটে পড়ার মতো অবস্থা। শেষ পর্যন্ত শরফ আর সামলাতে না পেরে হা-হা করে হেসে উঠলো। দলের প্রাণখোলা অট্টহাসির মধ্যে ডুবে গেল জুরার কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে জুরার গল্প থেমে গেল। ওরা তাহলে এতক্ষণ তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল! দুঃসহ রাগে সে জ্বলে উঠলো। হাতের কাছে ছিল কাপ, পিতলের ট্রে, গরম চা ভরতি কেটলি। তাই সে ছুড়তে শুরু করলো শরফ আর অন্য পার্টিজান-দেব লক্ষ্য করে।

হাসতে হাসতে জড়াজড়ি করতে করতে ছোকরার দল ঘর থেকে সরে পড়লো। হিংস্র রাগে জুরা ফুঁসছে। ঘর ফাঁকা—সবাই চলে গেছে।

পরক্ষণে ঘরে ঢুকলো আখমেদ, জিজ্ঞেস করলো,—কি ব্যাপার? এত হৈ-চৈ কেন?

জবাব নেই। জুরা ঘুমের ভান করে পড়ে আছে।

অন্য পার্টিজানদের জেরা করে আখমেদ যা জানতে পারে, কজুবেকে গিযে বললো। কজুবে ডেকে পাঠালেন শরফকে।

হাসতে হাসতে শরফ বললে,—বুঝলেন কমরেড সেনাপতি, অসুস্থ লোকটা অদ্ভুত ধরনের। দেও-দানো-ভূতে ওর অখণ্ড বিশ্বাস। সে কি সব মজার গল্প!—বলতে বলতে জুবার গল্প মনে পড়তেই সে হা-হা করে হাসতে শুরু করে।

ভ্রূ কুঁচকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে কজুবে তাকিয়ে আছেন শরফের দিকে। শেষে নীরস কণ্ঠে বললেন,—তোমার অপরাধের সাজা একদিন সেলে আটক।

কে-ন?—শরফ কঁকিয়ে ওঠে।

—কত দিন হলো, তুমি নিজে দেও-দানো-ভূতে বিশ্বাস হারিয়েছ? একদিন সেলে আটক থেকে ভেবে দেখবে, একজন অসুস্থ আহত লোককে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ঠিক কি বেঠিক হয়েছে। যাও!

কজুবে গোরাকে ডেকে পাঠালেন।

কেল্লার পার্টিজানদেব মধ্যে যারা সবচেয়ে জনপ্রিয়, বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লবী সন্তান গোরা তাদের অন্যতম। তেমনি মুষ্টিমেয় যে কজন এখানে সবরকম হাতিয়ার চালাতে ওস্তাদ ও পাক্কা ঘোড়সওয়ার, গোরা তাদেরও একজন। কিন্তু সবচেয়ে যা বড় কথা, যা কজুবেকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে, তা হলো গোবার সততা ও তীক্ষ্ন ধীশক্তি এবং বিপ্লবের প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে এ সবের বাস্তব প্রমাণ তিনি পেয়েছেন বারবার। তাছাড়া স্বদেশে ও বিদেশে গোরা ঘুরেছে অনেক, বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডেব নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। তাই আখমেদের মতো এই ভারতীয় বিপ্লবী ছেলে-টিও কজুবের একান্ত প্রিয়পাত্র ও আস্থাভাজন।

দরজা খুলে গোরা কামরায় ঢুকলো। নামের সঙ্গে তার গায়ের রঙের মিল অনেক-খানি। তদুপরি পামীরের জলহাওয়ায় তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেহের গড়ন মোটা-মুটি বলিষ্ঠ, সাধারণ বাঙালীর তুলনায় একটু বেশীই লম্বা। কিন্তু সহজেই যে বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো তার নাক চোখ মুখের তীক্ষ্ন ধারালো গড়ন আর বাঙালীসুলভ মিষ্টত্ব।

কজুবে জুরা-শরফ সম্পর্কিত ঘটনাটা সংক্ষেপে তাকে জানালেন। গোরা অবশ্য আখ-মেদের কাছ থেকে একটু আগেই শুনেছে ব্যাপারটা। শুনে শরফেব এই অনুচিত ব্যবহারে দুঃখ বোধ করেছে। জুরাকে তার বলতে গেলে প্রথম থেকেই ভাল লেগেছিল। সত্যিকার জোয়ান বটে তরুণ শিকারীটি। তেমনি বন্দুকেও তাব লক্ষ্যভেদ অভ্রান্ত। সাংঘাতিক ডাকাত চিরুকে যে অতি সেকেলে ম্যাচলক বন্দুক দিয়ে অনায়াসে গুলি

করে মারতে পারে, তাকে হাজারবার সেলাম জানানো কর্তব্য। জুরার পরিচয় তারা এখনও অবশ্য কিছুই জানে না। কে সে, কোথা থেকে এসেছে, বাসমাচিদের সঙ্গে কেন তার বিরোধ—সে সবই অজ্ঞাত। তবু কেন জানি, গোরার দৃঢ় ধারণা হয়েছে, পামীরের এই তরুণ শিকারীটি অশিক্ষিত, বেপরোয়া ও একগুঁয়ে হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে কোন খাদ বা ভেজাল নেই—পুরোপুরি খাঁটি সোনা। তাই তার সঙ্গে শরফের এই ব্যবহারে সে স্বভাবতঃই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে। এ ব্যাপারে আখমেদও তার সঙ্গে একমত।

তাই কজুবে যখন জুরার তদ্বির-তদারক ও দেখাশোনার ভার তার ওপর ন্যস্ত করতে চাইলেন, তখন সে সানন্দে গ্রহণ করলো সে দায়িত্ব।

সন্ধ্যায় জুরার জন্যে খাবার এনে গোরা দেখে, সে ঘুমুচ্ছে। তাকে সে জাগানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুমের ভান করে জুরা পড়ে রইল। দুঃসহ রাগে ও মানসিক যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। তার পৌরুষ ও আত্মাভিমান আজ আহত, এই লজ্জায় কাউকে সে মুখ দেখাতে পারছে না।

গোরা ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। তবে অপরিচিত শিকারীটি যে চটে আছে, তা আঁচ করতে পারে। ধীর পায়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এখন কি করা যায়, অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে ভাবছে, এমন সময় মৃদু একটা শব্দ কানে যেতে সে ঘরের ভেতর উঁকি মারলে। যা দেখলে, তাতে না হেসে পারা যায় না। বিচিত্র দৃশ্য। শিকারীটি উঠে বসে গোগ্রাসে খেয়ে নিচ্ছে মাংসটা। চোখে তার সচকিত দৃষ্টি। খাওয়াটা কেউ দেখে ফেলতে পারে, সেই ভয়ে সে যে সন্ত্রস্ত, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

আড়ালে দাঁড়িয়ে গোরা দেখে সমস্ত ব্যাপারটা। অসংস্কৃত সহজসরল পাহাড়ী মানুষটির প্রতি মন তার মমতা ও সমবেদনায় ভরে ওঠে।

দিন যায়। জুরা প্রচুর ঘুমুচ্ছে, আর সেরে উঠছে খুব তাড়াতাড়ি। এখন সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে পারে। চারদিকে নতুন লোকজন, জন্তু-জানোয়ার, নতুন সব কিছু—আজব এ দুনিয়ার বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে তার এই প্রথম পরিচয়। যতই সে দেখে, বিস্ময় তার ততই বাড়তে থাকে। তেমনি শঙ্কাও বোধ করে। কিন্তু নিজের আত্মসম্মান ও পৌরুষ সম্বন্ধে এত সজাগ যে, অন্যের সাহায্য ছাড়াই সব কিছুর অর্থ বোঝার চেষ্টা করে।

গোরা তাকে খুবই খাতির-যত্ন করে। ফলে কিছু কালের মধ্যেই তার কাছে জুরার সংকোচভাব কেটে গেল।

জুরা সম্বন্ধে পার্টিজানরা তখনো কিছু জানে না। জুরা কিন্তু জানালার পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড়ালে লুকিয়ে থেকে শুধু প্রত্যেক পার্টিজানের নাম জেনেছে তাই নয়, তাদের ঘোড়াগুলোর নাম পর্যন্ত জেনে ফেলেছে। মুসাকে সে প্রথমে দেখেই চিনেছিল, কিন্তু প্রতিহিংসার কথা ভেবে তাকে সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলে। অবশ্য তাকেই শুধু নয়, সব পার্টিজানকেই সে এড়িয়ে চলে—এমন কি কজুবেকেও।

তারপর একদিন কজুবের সঙ্গে তার পরিচয় হলো। কজুবে তাকে নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে গেলেন। কামরার দেয়ালে অনেক রাইফেল টাঙানো রয়েছে। ছাদ থেকেও রাইফেল ঝুলছে। জুরা আড়চোখে সেদিকে তাকায়।

কজুবে তার নামধাম পরিচয় জিজ্ঞেস করতে জুরা নিজের নাম বললে, বললে গাঁয়ের নাম।

মিন-আরখার! সেটা কোথায়?—কজুবে জিজ্ঞেস করেন।

জুরা হাত নেড়ে পূব দিক দেখিয়ে বললে,—সৌকসাইয়ের উত্তরে।

ব্যাগ থেকে একখানা ম্যাপ বের করে কজ্‌বে বহুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, শেষে বললেন,—কই, ও নামের কোন গ্রাম তো নেই।

জুরার চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। তার কপালের শিরা ফুলে ওঠে। ভয়ঙ্কর চোখে সে তাকালো কজ্‌বের দিকে।

আরে, হলো কি? চটছো কেন?—কজ্‌বে বললেন: আমার নাম কজ্‌বে। বাসমাচি-দের সঙ্গে আমি লড়াই করছি। তুমিও লড়াই করছো তাদের সঙ্গে। চির নামে অতি-ধূর্ত মহাদুর্জন এক ডাকাতকে খতম করেছ। তার মানে, খাঁটি মরদ তুমি। তোমায় আমি একটা রাইফেল দেব, ঘোড়াও দেব। আমার ফৌজে তুমিও একজন পার্টিজান হবে। কেমন, রাজী আছ তো?

ভ্রুকুটি করে জুরা বললে,—তাগাই ডাকাত জয়নাবকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। তাকে আমি খুন করবো। আগুনের মতো গরম টকটকে লোহা দিয়ে খাঁদা আমায় সেঁকা দিয়েছে। তাকেও আমি খুন করবো।

ঠিক ঠিক! খাসা বাৎ!—আবেগের সঙ্গে কজ্‌বে বললেন। তারপরেই তিনি আর্দালিকে হুকুম করলেন পোলাউ আর কৌমিশ নিয়ে আসতে, আর বললেন গোরাকে খবর দিতে।

আগের কথার জের টেনে অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে জুরা বললে,—কিন্তু মিন-আরখার বলে গ্রাম আছে। দারাউত-কুরঘান থেকে পার্টিজানরা আমাদের গাঁয়ে গেছলো। আমার ম্যাচলকটা তারা কেড়ে নিয়ে গেছে।

কজ্‌বে অবাক হন। বললেন,—ইভাস্কো বলেই মনে হচ্ছে।

—বলতে পারবো না। তবে তার সঙ্গে একজন কিরঘিজ ছিল। সে হলো আপনা-দের ঐ মুসা।

আলবৎ! সে ইভাস্কো না হয়ে যায় না!—কজ্‌বে জোর দিয়ে বললেন: এবার মনে পড়েছে। তাহলে তুমিই ওদের খুন করতে চেয়েছিলে, কি বলো? ওহে কে আছ, মুসাকে একবার আসতে বলো।

ঠিক খুন করতে চাইনি, তাদের রাইফেল নিতে চেয়েছিলাম।—সহজ সরল কণ্ঠে জুরা বললে।

কজ্‌বে বললেন,—বদমাশ বাসমাচি চিরকে তুমি মেরেছ, তাই তার রাইফেলটা তুমিই পাবে, বুঝলে?

দেয়ালে যেখানে রাইফেলগুলো ঝুলছে, সেদিকে দেখিয়ে তিনি আবার বললেন,—ঐ দেখ, সেটা ওখানে। বাঁটে চিহ্ন দেওয়া। তাগাইকে তুমি খতম করতে চাও, খুবই চমৎ-কার কথা। কিন্তু মনে রেখ, তাগাই একজন বড় মাতব্বর। ভারী বিপজ্জনক ব্যক্তি। আর খাঁদা হলো তার ডান হাত।

মুসা, গোরা ও সেই সঙ্গে আরো কয়েকজন পার্টিজান ঘরে ঢুকলো। তাদের মধ্যে আখমেদ অন্যতম। কজ্‌বে মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন,—মিন-আরখারের পুরনো দোস্তকে চিনতে পার হে?

মৃদু হেসে মুসা বললে,—হ্যাঁ, চিনি।

কজ্‌বে বললেন,—বুঝলে জুরা, আমরা হলাম লাল পার্টিজান। জমিদার-বড়লোক-দের কাছ থেকে আমরা অতিরিক্ত ঘোড়া, গরু, ছাগল, ভেড়া, উট, রাইফেল, জমিজমা, ধনদৌলত কেড়ে নেই, বিলি করি গরিবদের মধ্যে। তুমিও গরিব, তাই আমাদের তুমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।

কিন্তু আপনি নিজেই কি জমিদার নন?—দুম্‌ করে জুরা হঠাৎ বলে বসে।

ও একটা আস্ত হাবা খ্যাপা!—রাগত কণ্ঠে মুসা বললে।

গোরা হেসে ফেলে। হাসতে থাকে অন্য পার্টিজানরাও।

জুরা তাকালে গোরার দিকে। চোখে তার ভ্রূকুটি।

হাসতে হাসতে গোরা বললে,—ওভাবে তাকাচ্ছ কেন?

তুমিই বা হাসছো কেন? তুমি না আমার দোস্ত! মুসাই বা আমাকে ও কথা কেন বললে?—জুরার কণ্ঠে রোষ ও বিভ্রান্তি দুই-ই ফুটে উঠেছে।

মুচকি হেসে কৌতুকতরল কণ্ঠে কজুবে বললেন,—ঠিক কথাই বলেছ, জুরা। দোস্ত কখনো দোস্তকে বে-ইজ্জং করতে পারে না। বেশ, বেশ। জুরা ও গোরা, নামেও কেমন মিল দেখেছ? যাক্ গে যা বলছিলাম,—আমি যে জমিদার, এটা কেন তোমার মনে হলো, জুরা?

সঙ্গে সঙ্গে জুরা জবাব দেয়,—আপনার কত ঘোড়া, ভেড়া, বলদ আমি দেখেছি। তা ছাড়া—

দেয়ালে যে রাইফেলগুলো ঝুলছে, সেদিকে দেখিয়ে সে বললে,—অত রাইফেল আপনার! ও থেকেও বোঝা যায়, কি রকম বড়লোক আপনি।

পার্টিজানরা আবার হো-হো করে হেসে উঠলো।

জুরার চোখমুখ আবার লাল হয়ে উঠছে দেখে কজুবে বাধা দিলেন। বললেন,—আহা, চটছো কেন? তুমি তো ভারী রগচটা দেখছি। কথায় কথায় অত চটলে কি চলে? ওরা কি তোমার দুশমন নাকি? তুমি না জেনে এমন সব কথা বলছো, যার জন্যে ওরা হাসছে। পরে তুমিও সেটা বুঝতে পারবে। এখন শোন, এই যে সব কিছু দেখছো, এর কোনটাই আমার একার নয়, সব কিছুই সর্বসাধারণের বা আমাদের সম্পত্তি। ঐ যে সব রাইফেল দেখছো, ওগুলো বাসমাচিদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ওর একটাও আমার একার নয়, আমাদের সকলের। সবই প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি।

জুরার চোখে বিহ্বল বিমূঢ় দৃষ্টি। ভ্রূ কপালে উঠে গেছে।

কজুবে তার অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন,—প্রজাতন্ত্র কাকে বলে বোধহয় বুঝতে পারছো না। খেটে-খাওয়া মানুষেরা যখন একত্র মিলিত হয়ে নিজেদের ভেতর থেকে, যারা সবচেয়ে বুদ্ধিমান, পুরনো, বিশ্বাসী ও কর্মঠ, তাদের নেতা হিসেবে পছন্দ ও বাছাই করে নেয়, এবং এইসব নেতাদের ভেতর যিনি আবার সবচেয়ে পুরনো ও সবদিক থেকে সবার ওপরে, তাঁকে নির্বাচন করে সর্বপ্রধান নেতা হিসেবে, আর নিজেরাই নিজেদের জন্য আইনকানুন তৈরি করে, তখন তাকে বলে প্রজাতন্ত্র। যারা খেটে খায়, তাদের সর্বপ্রকার ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা ও সুখসুবিধা বৃদ্ধি করাই প্রজাতন্ত্রের কাজ। বুঝতে পারছো?

রাত্রের খানাপিনা শেষ হতে হতে জুরার মন থেকে সন্দেহ ও অস্বস্তি দূর হয়ে যায়। পার্টিজানরা সবাই কজুবের কামরায় জড়ো হয়েছে। তাদের দেখিয়ে কজুবে বলেন,—এরা প্রত্যেকেই বীর, বিশ্বাসী বলশেভিক, সাহসী নির্ভীক। বন্ধুকে এরা কখনো ত্যাগ করে না। তোমার দোস্ত ঐ যে গোরাকে দেখছো, ও এসেছে সুদূর ভারতবর্ষ থেকে, আরাম ও সুখের ঘর ছেড়ে দুর্গম পথে পাড়ি জমিয়েছে। তোমাকেও এদের মতো হতে হবে।

সবাই বিদায় নিলে গোরা ও আখমেদকে কজুবে বললেন,—ছেলেটি একেবারেই বুনো, যাকে বলে দুর্দান্ত বুনো ঘোড়া। কিন্তু মন ওর আয়নার মতো স্বচ্ছ, কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। ধৈর্য ধরে তোমরা ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও।

গোরা ও আখমেদ মাথা নাড়লে।

কিন্তু সেই রাত্রেই ঘটলো এক গুরুতর ঘটনা। রাত্রি গভীর। সবাই ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ হৈ-চৈ চেঁচামেচিতে কজুবের ঘুম ভেঙে গেল। রিভলবার হাতে তিনি দৌড়লেন উঠোনের দিকে।

কি ব্যাপার? এত গোলমাল কি জন্যে?—তিনি হাঁক ছাড়লেন সান্ত্রীকে উদ্দেশ করে। কিন্তু বুরুজের মাথায় সাড়া দেবার কেউ নেই। শরফ ছিল পাহারায়, তাকে পাওয়া গেল নীচেয়—নিজের কোমরবন্ধ দিয়ে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে সে।

গোঙাতে গোঙাতে শরফ বললে,—জুরা এসেছিল, হাতের রাইফেলটা তাকে দেবার জন্য সে আমায় হুকুম করে। কিন্তু আমি রাজী না হওয়ায় ধস্তাধস্তি হয়। তার গায়ে ভালুকের মতো জোর। আমার হাত ভেঙে দিয়ে সে রাইফেল নিয়ে পালিয়েছে ....

কজুবে তার বাঁধন খুলে দিয়ে রিভলবারের ফাঁকা আওয়াজ করতেই, পার্টিজানরা রাইফেলের ঘোড়া তুলতে তুলতে যে যার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল।

কজুবের নির্দেশে একদল ঘোড়ার পিঠে তখুনি বেরিয়ে পড়লো জুরার খোঁজে—তাকে পাকড়াও করতে।

কজুবের তিরিক্ষি মেজাজ। গোরা আসতেই বললেন,—আমরা ভুল করেছি। জুরাকে সুস্থ করা মোটেই ঠিক হয়নি। রাত্রে সে শরফকে নিরস্ত্র করে তার হাত ভেঙে দিয়ে রাইফেল নিয়ে পালিয়েছে।

জুরা রাইফেল নিয়ে পালাবে,—গোরার কাছে এটা কল্পনারও অতীত। কিন্তু ঘটনাটাকেও তো সে অস্বীকার করতে পারছে না। বিষণ্ন বিহ্বল চোখে সে নীরবে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে।

ক্ষণ পরে ডাক্তার এসে হাজির। কজুবের কথা শুনে তিনি মাথা নাড়লেন,—না, তা তো নয়। জুরা তো নিজের কামরায় ঘুমিয়ে আছে।

অ্যাঁ! সে আবার কি?—কজুবে আবার দৌড়লেন। জুরার কামরার দরজা খুলে চৌকাঠে পা দিযেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন হতভম্বের মতো। একটা রাইফেলের ওপর মাথা রেখে জুরা নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

তাকে ঘুম থেকে টেনে তুলে রুদ্ধকণ্ঠে কজুবে জিজ্ঞেস করলেন,—রাতে এসব হুজ্জত-হাঙ্গামার মানে কি? রাইফেল নিয়েছ কেন? শরফকেই বা বাঁধলে কেন?

মাদুরের ওপর উঠে বসে জুরা কয়েক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। তারপর বললে,—আপনিই তো বলেছিলেন, চিরের রাইফেলটা এখন থেকে আমার। সন্ধ্যার সময় তখন ওটা নেই নি, ভেবেছিলাম কাল সকালে নেব। কিন্তু রাতে আর সবুর সইল না, তাই ওটা নেবার জন্যে আপনার কামরার দিকে গেলাম। বুরুজের মাথা থেকে সান্ত্রী হাঁক ছাড়লে, কে যায়? আমি ওপরে উঠে গেলাম। দেখি, আমার রাই-ফেলটা তার হাতে। বললাম, ওটা আমার রাইফেল, আমায় দাও। সে দিলে না। তাই ওটা নিযে নিয়েছি. ...

—কিন্তু ওর হাতের হাড় সরালে কেন, হাতটাই বা ভেঙে দিলে কেন?

হাত ভেঙে দিয়েছি!—জুরা যেন আর্তনাদ করে উঠলো ঃ না তো! আমি শুধু শক্ত করে হাতটা চেপে ধরেছিলাম।

কজুবে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন,—শোন, আমরা সবাই এখানকার প্রতিটি জিনিসের মালিক। তুমিও তাই। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র কম। সান্ত্রীকে রাইফেল দেওয়া হয়েছে পাহারা দেবার জন্যে। সে জানতো না যে, ওটা তোমার রাইফেল। আর তা জানতে হবে, এমন কোন কথাও নেই।

বলতে বলতে কজুবের মেজাজ আবার গরম হয়ে উঠলো। তিনি রাগে ফেটে পড়লেন,—আমায় জিজ্ঞেস করা তোমার উচিত ছিল। এরকম বে-আইনী কাজ করা তোমার উচিত হয় নি। বে-আইনী কাজ যারা করে, তাদের আমরা সাজা দেই। বে-আইনী কোন কাজ দেখলে দোষীকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। বুঝতে পারছো, হতভাগা বুনো কোথাকার!

বুঝেছি!—জুরা বলে।

—নিজের রাইফেল কাউকে দেবে না। বুলেট খরচের দিকে সতর্ক থাকবে। মনে রেখ, আমাদের বুলেট কম।

কঠোর কণ্ঠ কজুবের। এত কঠোর যে, জুরা আপনা থেকেই সসম্ভ্রমে মাদুরের ওপর উঠে দাঁড়ালে।

নিজের কামরায় ফিরে কজুবে গোরা ও আখমেদকে ডেকে পাঠালেন, বললেন,—যাই ঘটুক না কেন, আমার হুকুম ছাড়া তরুণ শিকারী জুরার ওপর যেন কোন জুলুম-অত্যাচার না হয়।

পঞ্চম পর্ব ৩

ঐ ঘটনার পর বেশ কিছু দিন কেটে গেছে। মুহূর্তের জন্যও জুরা রাইফেল হাত-ছাড়া করে না—এমন কি খাওয়ার সময়ও সেটা তার হাঁটুর ওপর থাকে। টিলা পাথর পাখির দিকে সে যখন-তখন রাইফেল তাক করে, কিন্তু গুলি ছোড়ে না। পর্বত-রাজ্যের অভ্যন্তরে সে মানুষ, প্রতিটি গুলির কদর সেখানে অপরিসীম। তাই অনর্থক গুলি খরচ করার কথা সে ভাবতেও পারে না।

শরফ জুরাকে ভয় করে। না, শুধু ভয় নয়, জুরার বিরুদ্ধে সকলের মন বিষিয়ে দেবার তার চেষ্টারও অন্ত নেই। তিলকে তাল করে নানারকম কুৎসা সে তৈরি করে। প্রবীণ পার্টিজানরা তার ঐসব রটনায় কান না দিলেও, যারা বাহিনীতে নতুন ভর্তি হয়েছে, সেই সব তরুণ রংরুটদের ওপর তার প্রভাব পড়ে। জুরা সম্পর্কে তাদের মনে দেখা দেয় সন্দেহ ও বিদ্বেষ।

জুরা কিন্তু ওদের এই হাবভাব ধরে নিয়েছে যে, ওরা তাকে ছোট মনে করে বলেই এভাবে এড়িয়ে চলে। এ জাতীয় অপমান হজম করা তার পক্ষে কঠিন। সে মনে মনে ফোঁসে আর সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। আর বেশির ভাগ সময় ঘোরে কজুবের পিছু পিছু, আর নয়তো গোরা বা আখমেদের সঙ্গে।

কজুবে সেদিন কেল্লার উঠোনে উপস্থিত, এমন সময় অল্পবয়সী দুজন পার্টিজানকে জুরা ঘাড়ে ধরে সেখানে নিয়ে এল। পার্টিজানদের সে ধাক্কা মেরে কজুবের পায়ের কাছে ফেলে দিতেই, তিনি রেগে উঠলেন,—এ কী! কি এ?

জুরা বললে,—এই হতভাগা নীরেট গাধা দুটো পাথর তাক করে গুলি ছুড়ছিল। বাসমাচিদের চেয়েও এরা পাজী। আপনি বলেছেন, বিশেষ নজর রেখ যাতে অনর্থক বুলেট খরচ না হয়, একটা বুলেট মানে একটা ডাকাত। তাছাড়া বলেছেন, দোষীর গায়ে নিজে কখনো হাত দিও না, তাদের আমার কাছে ধরে নিয়ে আসবে। তাই ওদের নিয়ে এসেছি।

কজুবে তীক্ষ্ম সন্ধানী চোখে তাকালেন জুরার দিকে। দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে সে দাঁড়িয়ে আছে। কজুবে বললেন,—আচ্ছা জুরা, তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন কি পাথর ছুড়ে পাখি মারতে শিখেছিলে?

—হ্যাঁ।

অ্যাঁ!—কজুবের গলা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল শব্দটা। জুরার এ উত্তরের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি কি বলতে চাও, পাথর ছুড়ে তুমি হাতের টিপ ঠিক করেছিলে?

এতে অবাক হবার কি আছে, জুরা ভেবে পায় না। ঘাড় নেড়ে সহজ গলায় বললে,—হ্যাঁ।

ইতিমধ্যে গোরা এসে উপস্থিত। ঘটনাটা শুনে সে পার্টিজানদের দেখিয়ে বললে, —কিন্তু জুরা, এরা তো শিকারী নয়, এরা মেষপালক। আগে এরা কখনো বন্দুক ছোড়ে নি, বুঝলে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে কজুবে নির্বাক হয়ে গেছলেন। জুরার কথায় যে কোন অত্যুক্তি নেই, তাতে তিনি নিঃসন্দেহ। কাজেই কী যে বলবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। গোরার কথায় তিনি যেন খেই ফিরে পেলেন, জোরে ঘাড় নেড়ে বললেন,—ঠিক, ঠিক।

জুরা বুঝতে পারে, আবার সে একটা ভুল করেছে। নিজের ওপর সে চটে উঠলো। উত্তেজিত কণ্ঠে বললে,—শিকারে গিয়ে আমি কিন্তু এক-একটা বুলেটে দুটো করে ছাগল মারি। আর এরা কিনা এক মিনিটেই পাঁচটা কার্তুজ নষ্ট করলো!

ক্রুদ্ধ পার্টিজানরা ফুঁসে ওঠে,—বটে! মারুক তো! ছয় শো হাত দূরের একখানা পাথরে ও গুলি মেরে দেখাক তো! বুঝবো ওর কেরামতি!

দূরে পর্বতের গায়ে একখানা সাদা পাথর রোদে ঝকমক করছে। সেটা দেখিয়ে কজুবে বললেন,—ওরা ঠিকই বলেছে। পার তুমি ঐ পাথরখানায় গুলি লাগাতে?

চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে পার্টিজানরা জুরার দিকে তাকালে। জুরা রাইফেলটা কাঁধের ওপর ফেলেই গুলি ছুড়লো। ধুলো উড়লো পাথরখানা থেকে, সেটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে।

শাবাশ! শাবাশ!—বলতে বলতে কজুবে একটা ঈগল দেখিয়ে দিলেন। আকাশে বহু উঁচুতে ঈগলটা উড়ছে।

জুরা আবার গুলি ছুড়লো। ঈগলটা সামনের দিকে ছুট দিয়েই একটা পাক খেল। তার পরেই পড়তে শুরু করলো নীচের দিকে। একটা ডানা সে ঝাপ্‌টাচ্ছে। অন্য ডানাটা গুলিতে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেছে।

তাচ্ছিল্যের চোখে জুরা তাকায় নতুন পার্টিজানদের দিকে। পার্টিজানরা হতভম্ব। দুনিয়ার বিস্ময় তাদের চোখে।

পার্টিজানদের আবার গুলি ছুড়তে হুকুম দিয়ে কজুবে জুরাকে নিয়ে স্থান ত্যাগ করলেন। চিন্তান্বিত তিনি। বললেন,—বুনো বেয়াড়া তুমি। কি করে যে তোমায় ফৌজে নেব, বুঝতে পারছি নে। আমায় ভাবতে হবে।

ভাবুন।—বেকুবের মতো জুরা বলে ফেলে কথাটা।

ঘটনাটা গোরাকে নির্বাক করে দিয়েছে। নিজে সে ওস্তাদ লক্ষ্যভেদী। কিন্তু আজকের এ ঘটনাটা যে অচিন্তনীয়! অথচ তা নিয়ে জুরার কোন দম্ভ-গর্ব নেই, মাথাব্যাথাও নেই। শিশু-সুলভ সারল্যের সে এক প্রতিমূর্তি যেন—বয়স্ক এক শিশু বলা যায়। কাজেই অপরিসীম স্নেহ-মমতা-ভালবাসায় গোরার মন ভর ওঠে জুরার জন্যে। নিন্দামন্দ-কুৎসা ও কুটিল ষড়যন্ত্রের জালে জুরা যাতে জড়িয়ে পড়তে না পারে, তার

সঙ্কল্প আরো জোরালো হয় তার মনে। এ কাজে, সে জানে, আখমেদেরও পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

জুরা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ঘা শুকিয়ে গেছে, জ্বরের ঝামেলাও আর নেই। কিন্তু গোরা ও আখমেদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও কজুবেকে তার জন্যে প্রায় রোজই একটা-না-একটা নতুন ঝামেলা পোহাতে হয়। জুরার কৌতূহলের অন্ত নেই, প্রশ্নেরও শেষ নেই। নিত্য নতুন ফ্যাসাদ বাধে সেজন্যেও।

জুরার ঘনিষ্ঠতা সবচেয়ে বেশী দলের তিনজনের সঙ্গে—কজুবে, গোরা ও আখমেদ। অন্যদের সঙ্গেও তার অসদ্ভাব নেই—একমাত্র শরফ ছাড়া। জুরাকে শরফ সব সময় এড়িয়ে চলে, তাকে বেইজ্জৎ করার মতলব যেন তাকে পেয়ে বসেছে।

গোরা ও আখমেদের জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ—বিচিত্র বহুধাবিস্তৃত। তারা ঘুরেছে অনেক, দেখেছে অনেক, শুনেছেও অনেক। শুধু তাই নয়, আখমেদ ওস্তাদ কারিগর। গোরা তার সুযোগ্য শাগরেদ।

বর্তমানে বেশির ভাগ সময় জুরা কাটায় আখমেদের কামারশালায়। সেখানে ভাঙা বন্দুক মেরামত করতে করতে বা ছোরাছুরি বানাতে বানাতে গোরা ও আখমেদ জুরাকে বলে আজব কত ঘটনা। তাদের কাছ থেকে জুরা সেই প্রথম শোনে তাসখন্দ নগরীর আর সুদূর ভারতবর্ষের দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি মহানগরীর জীবনযাত্রা, সেখানকার দালান-কোঠা, কল-কারখানার কথা। শোনে আমুদরিয়ায় আর গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা ইত্যাদি নদীতে ও সাগরে সাগরে ভাসমান চলন্ত বিরাট বিরাট কুঠরির মতো স্টীমার-জাহাজ, আকাশে উড্ডীন প্রকাণ্ড শকুনের মতো এরোপ্লেন, সিনেমা-থিয়েটার, বিশালকায় লোহার গিরগিটির মতো রেলগাড়ি ইত্যাদির কাহিনী।

সেই সঙ্গে আখমেদ বলে, জমিদাররা কেমন করে চাষীদের জল চুরি করতো, তাদের ওপর কি রকম নির্যাতন চালাতো, আমিরদের শাসনে কী নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে সাধারণ মানুষদের জীবন কাটাতো। আর গোরা শোনায়, কিভাবে ইংরেজরা তার দেশ অধিকার করে রয়েছে এবং কি জাতীয় অমানুষিক শোষণ ও নির্যাতন চালাচ্ছে সেখানে। বিপ্লবীরা সেখানে কিভাবে হাসতে হাসতে দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দেয়, তা-ও সে জানাতে ভোলে না।

গোরা ও আখমেদকে কাজে সাহায্য করতে করতে প্রচণ্ড কৌতূহল ও বিস্ময়ে জুরা শোনে এসব কথা। জীবনে এই প্রথম সে শুনলো এমন অনেক বিচিত্র নতুন ঘটনা, যা সে কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। এ যেন অভিনব এক আধুনিক যুগের রূপকথা। ওদের কাছ থেকে সে এই প্রথম বুঝতে পারলো, দেও-দানো-ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই, সোকসাইয়ের উজানে উৎসের কাছে সে যে জাদু দেখেছিল, তা মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়। মরুভূমিতে এটা প্রায়ই ঘটে। মরুভূমির ব্যাপারটা অনুমান করতেও তাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়—যখন সে শুনলো, মরুভূমি এমন একটা সুবিস্তীর্ণ অত্যন্ত গরম এলাকা যেখানে দশ দিন ঘোড়ার পিঠে চলেও এক ফোঁটা জল মিলবে না, সর্বত্র শুধু বালি আর পাথর। যাই হোক ও ব্যাপারটা সে শেষ পর্যন্ত কিছুটা আন্দাজে বুঝে নেয়।

আখমেদ ও গোরার সহযোগিতায় সে এখন একজন ভাল ঘোড়সওয়ারও বটে।

কজুবে সেদিন ভোরবেলা বাইরে বেরিয়ে গেলেন কয়েক দিনের জন্যে। আর দক্ষিণের লম্বা সফর সেরে সেদিনই কেল্লায় ফিরলো কজিৎজুকি। ফৌজে কজুবের পরেই কজিৎজুকির স্থান। কেল্লার সব খবর তাকে দেওয়া হলো, বিশেষ করে দেওয়া হলো সোকসাই অঞ্চল থেকে আগত শিকারী জুরার খবর।

সঙ্গে সঙ্গে কজিৎজ্কি জুরা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠলো। পামীরের সুদূর অভ্যন্তরভাগের খবর জানতে তার আগ্রহ অসীম। পার্টিজানদের কাছ থেকে তরুণ শিকারীর স্বভাব, কথাবার্তা ও চালচলন সম্বন্ধে যা সে শুনলো, তাতে তার কোন সন্দেহ থাকে না যে জুরাই তার সেই এতকালের আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি যার কাছ থেকে সে পেতে পারে পামীরের সুদুর্গম অজ্ঞাত অঞ্চলের নির্ভরযোগ্য প্রকৃত খবর। কিন্তু শিকারীটা যেরকম বুনো ও একগুঁয়ে বলে শুনছে, তাতে প্রথমেই দরকার তার অন্তরঙ্গ হওয়া, বিশ্বাস অর্জন করা। অতএব এগোতে হবে খুব সাবধানে—ভেবেচিন্তে।

কজিৎজ্কি জাতিতে পোল। অনেক কথা শোনা যায় তার সম্পর্কে। শোনা যায়, সে নাকি এক সময় বিপ্লববিরোধী হোয়াইট বা শ্বেত উরুষ ফৌজের সেনাপতি ছিল। অনেক ভাষাও জানে। তবে নিশ্চিত ভাবে কেউ কিছু বলতে পারে না—একটা বিষয় ছাড়া। সেটা হলো, পামীর সম্পর্কে তার জ্ঞান দলের সবার চেয়ে বেশি, এবং বাসমাচিদল পাকড়াও করতে একাধিকবার সে সাহায্য করেছে—যার ফলে এখন সে কজুবের আস্থাভাজন। কজুবের নির্দেশেই ফৌজে তাঁর পরে ওর স্থান।

কজিৎজ্কি আকারে বেঁটে, মুখে ছুঁচলো কালো দাড়ি, সাজপোশাক কিরঘিজ ধরনের, মাথাও কামানো। অর্থাৎ সব দিক থেকে বর্তমানে সে একেবারে পাক্কা কিরঘিজ।

সেদিন কেটে গেল। কিভাবে এগোতে হবে তা স্থির করার জন্যে কজিৎজ্কির সময় দরকার।

পরদিন বিকেলে জুরাকে সে ডেকে পাঠালো। অনেকক্ষণ ধরে চললো তাদের অন্তরঙ্গ কথাবার্তা। জুরার কথা থেকে বেরিয়ে এল তাগাই ও বাসমাচিদের প্রতি তার বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ। সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা শুনে কজিৎজ্কি তাকে সমবেদনা জানায়। জুরাকে তোয়াজে রাখতে হবে—কারণ সোকসাই এলাকার খুঁটিনাটি সবরকম খবর জানার এ সুযোগ সে হাতছাড়া করতে নারাজ।

জুবা ওখানে সোনা পেয়েছে এবং ফাটলে আরো ব্যাগ আছে শুনে সে বিষম চমকে উঠলো। তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়, অতীতে ঐ এলাকায় কোন অভিযান বা ঐ জাতীয় কিছু হয়েছিল, সেই ব্যর্থ অভিযানের সোনাই জুরা পেয়েছে। কে জানে, ওটা হয়তো মার্কো পোলোর অভিযানের অংশও হতে পারে।

সোনার কাপডিসগুলোর ওপরে আঁকা ছবি-নকশা ও আধ গজ লম্বা সোনার বারকোশ আর তার উপরকার উৎকীর্ণ লিপির বর্ণনা শুনতে শুনতে অধীর উত্তেজনায় কজিৎজ্কি যেন ভেতরে ভেতরে টগবগ করে ফুটতে থাকে।

সোকসাই নেমেছে হিমবাহ থেকে। তার স্রোতে একদা আশরফির সন্ধান পেয়ে তার মনে সন্দেহ জেগেছিল, ওখানে বোধহয় সোনা আছে। নিজে গিয়ে সন্ধান করার বাসনা তার সেই থেকেই। আজ তার সেই সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হচ্ছে।

কজিৎজ্কি একখানা ম্যাপ বের করলো। তারপর সেখানে যাবার নিশানা জানার জন্যে জুরাকে সে শুরু করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। পথের খুঁটিনাটি সবই ম্যাপে চিহ্নিত করে নিলে।

শেষ পর্যন্ত একসময় কাজ শেষ হলো কজিৎজ্কির। মানচিত্রটা সযত্নে ভাঁজ করে হাই তুলতে তুলতে সে তাকালো জুরার দিকে। সাপ যেমন ব্যাঙের দিকে তাকায়, তেমনি কুটিল সে দৃষ্টি।

সে দৃষ্টি জুরার নজর এড়ায় না। অস্বস্তিতে তার মন ভারী হয়ে ওঠে। সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙে কজিৎজ্কির। টেবিলের ওপর একটা আরশোলা ঘুরছে।

টাকে মেঝেয় ফেলে দিতে দিতে বিড়বিড় করে উঠলো,—পচা আবর্জনা! ছ্যাঃ, ঘেন্না ধরে গেছে এ জীবনে! কী অবস্থায় পৌঁছেচি—পাগল করার পক্ষে যথেষ্ট।

দিন কয়েক পরে শরফকে ডেকে পাঠালো কজিৎজ্‌কি। বললে,—জুরা তোমাকে বেইজ্জৎ করেছে, মারধোর করেছে, সবই শুনেছি আমি। চ্যাংড়া বর্বরটাকে এজন্যে সাজা পেতে হবে। তোমাব ঐ অপমানের সান্ত্বনা হিসেবে তোমায় একটা রিভলবার দিচ্ছি। কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, পাশের গাঁয়ের খানাতল্লাশি করতে গিয়ে ওটা তুমি পেয়েছ।

শরফ মহাখুশী। কোমরবন্ধে রিভলবারটা ঝুলিয়ে ভারিক্কী চালে সে বেরিয়ে গেল।

রিভলবারটা দেখেই জুরা উদ্‌গ্রীব। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, কোথায় সে ওটা পেয়েছে?

সদর্পে শরফ বললে,—পেয়েছি পাশের গাঁয়ে। কজুবেকে আমি থোড়াই তোয়াক্কা করি। পাশের গাঁয়ের এক সর্দারের কাছ থেকে এটা আমি কেড়ে নিয়েছি। আগে সে বাসমাচি ছিল।

সেদিন বিকেলেই কজুবে কেল্লায় ফিরে এলেন। আর কজিৎজ্‌কি বেরিয়ে পড়লো পর্যবেক্ষণ-সফরে।

সন্ধ্যার দিকে কজুবে খবর পেলেন, জুরা পাশের গাঁয়ের সর্দারের ঘরে খানাতল্লাশি করেছে। রাগে ও বিস্ময়ে কজুবে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যান। খবর পেয়ে গোরা ও আখমেদ ছুটে এল। হতভম্ব তারাও। কী সাংঘাতিক কাণ্ড! অথচ জুরা তাদের ঘুণাক্ষরেও কিছু জানায় নি। কজুবে তখুনি গাঁয়ে ছুটলেন। সঙ্গে গোরা, আখমেদ ও জনা দশেক পার্টিজান। জুরাকে কয়েদ করা হলো।

কেল্লায় ফিরে কজুবে ডেকে পাঠালেন জুরাকে। বহুক্ষণ তাদের মধ্যে আলোচনা হলো। আলোচনার মাঝামাঝি সময়ে এল গোরা ও আখমেদ। জুরা কিন্তু একটিবারও বললো না, কেন এই কাণ্ড করার ইচ্ছা তার মনে জেগেছিল, শরফের নামও সে উচ্চারণ করলো না বারেকের জন্যে। নিজের কৃতকর্মের জন্য অপরকে দোষী করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। নিজেব অন্যায় স্বীকার করতেই সে অভ্যস্ত। শেষে কজুবের নির্দেশে ঠিক হলো, জুরা পর্বতে ভেড়া শিকার করতে যাবে, সঙ্গে যাবে জনা পাঁচেক পার্টিজান।

গোরা ও আখমেদকে তিনি বললেন,—কে কে যাবে, সেটা বাছাই করে দাও। আর গ্রামবাসীদের ও সর্দারের সঙ্গে দেখা করে বলো এবং আমিও বলবো, এটা প্রথম অপরাধ বলে জুরাকে তাদের মাপ করতে হবে। বলবে, আইনকানুন তার এখনো সড়গড় হয় নি, জনসাধারণের সঙ্গে ঠিকমতো পরিচয়ও হয় নি।

কজুবে থামলেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে ভাবিত কণ্ঠে বললেন,— এখনো ছেলেটিব মধ্যে বুনো বেপরোয়া ভাব ও একগুঁয়েমি যথেষ্ট রয়েছে। এ অবস্থায় তাকে এখুনি ফৌজে নেওয়া চলে না। তবে বন্দুকে সে যেহেতু অসাধারণ ওস্তাদ, তাই শীতের দিনের জন্য ভাঁড়ারে মাংস মজুদ করার কাজটা তাকে দিতে চাই। সে হবে শিকারীদের নেতা। তোমরা কি বলো?

গোরা ও আখমেদ সোৎসাহে পূর্ণ সমর্থন জানালো। বললে,—খুব ভাল হয়। জুরা সম্বন্ধে আপনি যা বললেন, তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না।

কজিৎজ্‌কি ফিরে এলে কজুবে তাঁকে জুরার ব্যাপারটা খুলে বললেন।

কজিৎজ্‌কি মন্তব্য করলো,—অনর্থক আপনি এইসব ঝামেলা পোয়াচ্ছেন। আমি হলে, অন্যদের শিক্ষা দেবার জন্যে ওকে গুলি করে মারতাম।

কজুবে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন কজিৎজ্কির দিকে, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

পর দিন অন্ধকার থাকতেই, জুরা উটে করে শিকারীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে ফিরলো সে। সঙ্গে শিকারীর দল আর শিকারের বিরাট বোঝা।

জুরা খুব খুশী, গোরাকে বললে,—একা আমি আঠারোটা ভেড়া মেরেছি। আর ওরা প্রতিজনায় মেরেছে একটা কি দুটো।

কিন্তু সঙ্গের শিকারীরা খুবই অসন্তুষ্ট। কজুবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে গোরা তাঁর কামরার দরজা খুলতেই কানে এল বহুজনার ক্রুদ্ধ মিলিত কণ্ঠস্বর। একটু পরে মুসা ও আখমেদও ঘরে ঢুকলো।

শিকারীরা সমস্বরে বলছে,—জুরা আমাদের সঙ্গে মিলে মিশে শিকার না করে, একলাই শিকার করেছে। অন্যদের সঙ্গে মিলে সে শিকার করতে পারে না। তাছাড়া যেমন মনিব, তেমনি কুকুর। টীক কিনা আমাদের কুকুরগুলোর ওপর হামলা করে, যেদিকে জুরা রয়েছে সেই দিকেই তাড়িয়ে দিলে ভেড়াগুলোকে। জুরার সঙ্গে আর আমরা শিকারে বেরবো না।

কজুবে নীরবে শুনলেন সমস্ত, শেষে ধীর কণ্ঠে বললেন,—যাও, তোমরা বিশ্রাম করো গে।

তারা চলে যেতে, তিনি বললেন,—এ সম্পর্কে তোমাদের কি মনে হয় বলো তো? জুরাকে নিয়ে কি করা যায়? পার্টিজানদের সঙ্গে তার বনে না, শিকারীদের সঙ্গেও সেই অবস্থা। বড্ড একগুঁয়ে একলসেঁড়ে, নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ছাড়া কিছু বোঝে না। ভারী আপসোসের কথা!

মুসা বললে,—সত্যিই তাই। এক কাজ করা যাক, ও একলাই শিকাবে যাক।

কথাটা গোরার মনঃপূত হয় না। জুরাকে একলা ছাড়তে তার আপত্তি। কিন্তু তার মুখ খোলার আগেই আখমেদ বললে,—না, ওটা বোধহয় ঠিক হবে না। গোরাকে ও সঙ্গে নিতে পারে। গোরার সঙ্গে ওর দোস্তিও খুব।

মুচকি হেসে কজুবে বললেন,—ওটা তোমার সঙ্গেও কম নয়।

শেষ পর্যন্ত আখমেদের প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

খবরটা শুনে জুরা খুব খুশী হলো। বলা বাহুল্য, খুশী গোরাও।

এর পর থেকে ওরা দুজন রোজই শিকারে বের হয়। পথে যেতে নানা আলোচনা চলে। নিজের কথা জুরা কমই বলতে চায়। ওটা তার স্বভাব। কিন্তু গোরার তাড়নায় মুখ না খুলে পারে না। সে বলে মিন-আরখার গাঁয়ের কথা, তার নিষ্করুণ জীবনযাত্রা, অনাহার ও দুঃখকষ্টের কথা। গভীর বেদনায় গোরা বুঝি বেশ কিছুক্ষণের জন্যে বোবা হয়ে যায়।

এই সময়েই সে শুনলো জয়নাবের পুরো কাহিনী। স্বল্পবাক্ জুরা যেটুকু বললে, তা-ই যথেষ্ট। এই প্রথম গোরা বুঝতে পারে, কী প্রচণ্ড জ্বালা জুরার অন্তরে অবিরত জ্বলছে। আর তা থেকে সে সহজে আন্দাজ করতে পারে জুরাব সেই ভয়ঙ্কর শপথের গুরুত্ব।

এমনি করে, জুরা ও গোরা, দুজনের মধ্যেকার নিবিড় বন্ধুত্ব নিবিড়তর হয়ে ওঠে।

সেদিন যেতে যেতে গোরা গান ধরলো—প্রথমে গুনগুন কণ্ঠে, তারপর গলা ছেড়ে। সে গাইতে জানে, জুরা এই প্রথম জানলো। গানের ভাষা সে বোঝে না, কিন্তু গোরার সতেজ মিষ্টি কণ্ঠ ও সুর তাকে মুগ্ধ করে।

একসময় গান শেষ হয়। খোশমেজাজে জুরা বললে,—ভারী চমৎকার তো! এত মিষ্টি গলা তোমার! সুরও বড় সুন্দর। কুচাকও ভাল গাইতে পারে। কিন্তু তোমার গান তার থেকেও ভাল।

কুচাকের কথা গোরা আগেই শুনেছে। সে হাসতে থাকে।

জুরা আবার বললে,—কি গাইছিলে? গানের সুরে মন কেড়ে নেয়, কিন্তু ভাষা তো বুঝি নে। বুঝিয়ে দেবে?

বেশ,—গোরা বললে : শোন, ঐ গানই আবার আমি কিরঘিজ ভাষায় গাইছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে গান ধরলে :

মহামানবের এই মুক্তিতীর্থ হতে
কোথায় সে কতদূরে দক্ষিণে
অসংখ্য গিরি-দরি নদনদী লঙ্ঘিয়ে
সেথায় আমার পুণ্য ভারতভূমি,
কোমলে কঠোরে যেথা অরূপ সম্মিলন।
মাথায় তাহার তুষার-মুকুট মহাদ্যুতিময়,
কোমরে মেখলা দোলে, পদতলে নীলাম্বু গর্জায়,
সেই তো আমার স্বপ্নের দেশ প্রাণে জাগায় গান
আর দুর্নিবার করে আকর্ষণ।

আমারে ডাকিছে সেই পদানত ভারতের জনতা,
ডাকে মোরে চাষী ও মজুর আর বুভুক্ষু মানুষের একতা।

মহাজাগরের এই হোমানল হতে প্রাণমন্ত্র উঠিয়াছে জাগি,
দিকে দিকে ঘোষে তার উদাত্ত আহ্বান—
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত! জাগো সর্বহারা,
জাগো যত দুনিয়ার নিপীড়িত প্রাণ।

অগ্নিগর্ভ সে মহাসংগীত কি শুনিবারে পাও?
তূর্য তার বাজে মন্দ্ররবে—
ওঠো, জাগো, দাসত্বের কেল্লা ভেঙে ফেল,
গড়ে তোল জীবনের মুক্ত বনিয়াদ,
শোধ করো যত রক্ত-ঋণ, চুকাইয়া ফেল ফরিয়াদ।

ওগো মহাভারতের জনতা—
ধরো হাতিয়ার, গড়ো একতা,
দেখ, ঐ কালবৈশাখীর ঘূর্ণিবাত্যা জাগে,
ঝড়ের কোপে শোষণের ঐ জীর্ণ কেল্লা কাঁপে,
মৃত্যুভয়ে কাঁপে যত নিশাচরের দল।
দিনবদলের পালা এল—দিনবদল—!

অপূর্ব!—মুগ্ধ জুরার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কথাটা।

প্রথম পাঁচ দিনে জুবা ছাব্বিশটা ভেড়া শিকার করলে। গোরা শিকার করলে দশটা। জুরা সেদিন কজুবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাঁর কামরায় গেছে। কজুবের

বিছানার পাশে তাঁর ইংলিশ রাইফেলটা টাঙানো থাকে। রাইফেলটার দিকে আড়চোখে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে জুরা একসময় বললে,—আপনার ঐ রিপীটিং ইংলিশ রাইফেলটা আমায় দিন। তাহলে রাইফেলে বার বার কার্তুজ ভরার ঝামেলা থাকবে না। কথা দিচ্ছি, দৈনিক আপনাকে সতেরোটা করে ভেড়া এনে দেব।

গম্ভীর কণ্ঠে কজুবে বললেন,—না, তা সম্ভব নয়। চেকিস্ট কুজমিন ওটা আমায় দিয়েছেন। লালফৌজের একজন নামকরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হলেন চেকিস্ট কুজমিন। আগুন বলো আর জলই বলো, কোন কিছুকেই তিনি পরোয়া করেন না। ওটা কোনভাবেই দেওয়া যাবে না. আমাদের এখানে ও জাতীয় রাইফেল ঐ একটাই আছে। তবে একটা কথা বলছি, বাসমাচিদের কাছ থেকে যা তুমি অধিকার করবে, তা তোমারই হবে।

সাচ্চা বাৎ বলছেন, নড়চড় হবে না ?—তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে জুরা তাকালে কজুবের দিকে।

—না, এক জবান।

—বেশ, দেখুন তাহলে।

পঞ্চম পর্ব ৪

জুরা রোজই শিকারে বেরোয়। আবহাওয়া যাই থাক—ঝড় হোক, তুষারপাত হোক আর হিমঝঞ্ঝা হোক—উটের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। গোরা অবশ্য সঙ্গে থাকে। মহানন্দে টীক ছোটে আগে আগে।

কারা-কুল হ্রদের ধারে গিরিশ্রেণীর ওপরে দলে দলে ছাগলের পাল এসে জমা হচ্ছে, পামীরের অন্য অংশে পাড়ি দেওয়াই তাদের মতলব। ওরা সরে পড়ার আগেই যতদূর সম্ভব মাংসের ব্যবস্থা করতে জুরা উঠে পড়ে লেগেছে। আড়াই শো ভেড়া বা ছাগলের মাংসের ব্যবস্থা করতে পারলে কজুবে তাকে একটা 'মসার' বন্দুক দেবেন কথা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে এক শো আশিটার ব্যবস্থা হয়েছে।

ভোরের আলো তখনো ফোটে নি, জুরা ও গোরা কিজিল-আর্ট গিরিবর্ত্মের দিকে রওনা হলো। কিজিল-আর্ট গিরিবর্ত্ম পার হলেই মারকান-সু মরুভূমি। কারা-কুল হ্রদ ছাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে পর্বতশ্রেণীর ওপরে ছাগলের পাল চরছে। শিকারীদের দেখেই তারা সরে গেল। জুরার কিন্তু কোন তাড়া নেই।

সন্ধ্যার দিকে তারা এসে পেঁছিলো এক জনহীন পরিত্যক্ত কুঠরিতে। গ্রীষ্মকালে ফেরঘানা উপত্যকা থেকে কাশগড়িয়ায় যাবার পথে কাফেলাবাহিনী সাধারণতঃ এখানে রাতের জন্য আশ্রয় নেয়। ওরাও আশ্রয় নিলে সেখানে।

পথে আসার সময় জুরা একটা ছাগল শিকার করেছিল। পাত্রে রান্না হচ্ছে তার মাংস। জুরা বললে গোরাকে,—কাল দেখবে ছাগল-শিকার কাকে বলে। 'ভল্লুক' পর্বত চেন তো ? রাত্রিবেলায় সেই পর্বতে উঠে 'চক্ষু' পাহাড়ের কাছে গিয়ে আমি লুকবো। ভোরের আলো ফুটতেই তুমি দেখবে, ছাগলের পাল নীচে চরছে। তোমার কাজ হবে ওদের সেখান থেকে তাড়িয়ে আমার দিকে পাঠানো। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা ?

হ্যাঁ।—গোরা মাথা নাড়ে।

পর দিন। ভোরের আলোর আভাস জাগছে। মারকান-সু'র ওপরে কুয়াশা জমে আছে।

দূর থেকে আসছে নেকড়ের চিৎকার। গোরা রওনা হলো। টীককে নিয়ে জুরা রাত থাকতেই বেরিয়ে গেছে।

গোরা নির্দিষ্ট জায়গায় পেঁৗছে একটা টিলার পেছনে গিয়ে আত্মগোপন করলো। কুয়াশা কাটতে শুরু করেছে। কাছেই দলে দলে চরছে ছাগলের পাল। চারদিক আরো পরিষ্কার হতে গোরা বন্দুক ছুড়লো। একটা ছাগল মারা পড়লো। বাদবাকী গোটা দলটা পর্বত বেয়ে ছুটলো ওপবের দিকে।

ছাগলটার যথোচিত ব্যবস্থা রুরে গেরা চুপচাপ বসে রইল—কি ঘটে দেখার জন্য। বহু দূরে ছাগলগুলোকে দেখাচ্ছে ধূসর বিন্দুর মতো। দুর্লঙ্ঘ এক খাড়াইয়ের ধারে এসে তারা হাজির হয়েছে। খাড়াইয়ের গা বেয়ে অতি সরু একটা থাক চক্ষু পর্বত পর্যন্ত গেছে। থাকটা এত সরু যে, প্রায় নজরে আসে না। ছাগলের পাল লাইন বেঁধে একের পর এক সেই সরু থাক বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে।

পরক্ষণে রাইফেলের ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পায় গোরা। সামনের ছাগলটা শূন্যে লাফ মেরেই নীচে গড়িয়ে পড়লো। আবার এল গুলির শব্দ—আবার...আবার... আবার...

ছাগলের পাল পড়ছে একের পর এক। পেছনের গুলো পিছু হটার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেদিকে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে টীক।

সামনের থাক বেয়ে ওপরে ওঠা ছাড়া ছাগলের দলের গত্যন্তর নেই। কিন্তু ওপর থেকে সমানে জুরার গুলিবৃষ্টি চলেছে। নিরুপায় ছাগলের দল শেষে গুলিবৃষ্টির মধ্যেই জুরার পাশ কাটিয়ে পালাতে শুরু করলো।

গোরার ভারিক্কী ভাব ইতিমধ্যে কোথায় উবে গেছে!

বিস্ময়েব ধাক্কায় প্রথমে সে প্রায় বোবা হয়ে গেছলো। চোখে সম্মোহিত দৃষ্টি। তার পরেই সে বিড়বিড় করে উঠলো,—কী তাজ্জব! কী তাজ্জব! অত্যদ্ভুত! অত্যদ্ভুত! অচিন্তনীয়!

শেষে নিজেকে সে আর সামলাতে পারলো না। চিৎকার কবে লাফিয়ে উঠলো,—কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ! দেখে যারে দেখে যা, জুরার শিকার দেখে যা! এক সকালেই এত ছাগল, দেখে যারে দেখে যা!

রুদ্ধশ্বাসে সে ছুটলো ওপর দিকে। একশটা ছাগল মারা পড়েছে। জুরা কিন্তু এত বড় শিকাবেও খুশী নয। বিষম উত্তেজিত সে, দূর থেকে চিৎকার করে গোরাকে বললে, —তাড়াতাড়ি যাও, পর্বত থেকে ওদের তাড়িয়ে নীচে নামাও। আমি স্মাগলার্স গিরি-বর্ত্মে যাচ্ছি। ছাগলের পাল আবার আমার দিকেই আসবে।

গোরা ছুটলো। শীগ্‌গীর ধরে ফেললে ছাগল-পালের নাগাল, তাদের তাড়িয়ে নামালো গিরিবর্ত্মের দিকে।

ছাগলের দল আবাব সোজা ছুটছে জুরার দিকে। গোরা তাকিয়ে থাকে। ছাগলগুলো জুরার খুব নিকটে এসে গেছে। এইবার—এইবার—

কিন্তু কী কাণ্ড! ব্যাপার কী! জুরা এখনো গুলি ছুড়ছে না কেন?

গোরা হতভম্ব। গুলি ছুড়ে সে জুরাকে সংকেতও কবলো। কিন্তু বৃথা আশা—জুরার পাত্তা নেই। ছাগলের পাল ধীরে সুস্থে পাহাড় অতিক্রম করে চলে গেল। বিস্ময়ে ক্ষোভে গোরা স্তব্ধ।

কয়েক মুহূর্ত পরেই হঠাৎ তার মনে হলো—এত বড় অস্বাভাবিক কাণ্ড জুরার পক্ষে কি করা সম্ভব? তার কোন বিপদ ঘটলো না তো?

কথাটা মনে হতেই সে ছুটলো ঊর্ধ্বশ্বাসে।

এদিকে জুরা কিন্তু সবই দেখছে, সংকেতও শুনেছে। তবু সে নিশ্চুপ। অদ্ভুত এক বিস্ময়কর দৃশ্য তার চোখের সামনে তখন উদ্ঘাটিত হচ্ছে। আর তাই গুলি ছোঁড়ার ইচ্ছা তাকে দমাতে হচ্ছে অনেক কষ্টে।

নীচে—বহু-বহু নীচে দুজন ঘোড়সওয়ার পাহাড়সারির ভেতর দিয়ে কিজিল-আর্টের দিকে আসছে। আর পাহাড়সংকুল পথ ধরে তাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে তিনজন পার্টিজান। ঘোড়সওয়ার দুজনকে ওরা দেখতে পায়নি মনে হচ্ছে। জুরা ঘোড়া তিনটে চিনতে পারে—প্রথমটা কজিৎজ্‌কির সাদা রঙের ঘোড়া, দ্বিতীয়টা শরফের কটা রঙের আর তৃতীয়টা আখমেদের তামাটে রঙের।

জুরা দেখে, পার্টিজান তিনজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, আর শরফ ও আখমেদকে সেখানে রেখে কজিৎজ্‌কি এগিয়ে গেল ঘোড়ার পিঠে।

ছাগলের পাস জুরাকে অতিক্রম করে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। শিকারী জুরার হাত নিশপিশ করতে থাকে, কিন্তু নিজেকে সে সংযত রাখে অনেক কষ্টে। পার্টিজান ও ঐ লোক দুটোর গতিবিধি সে লক্ষ্য করছে রুদ্ধশ্বাসে। হঠাৎ গোরার বন্দুকের শব্দে শরফ ও আখমেদ কজিৎজ্‌কির পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে।

সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার দুজন সীমান্ত পার হয়ে এসেছে, বোঝা যায়। গুলির শব্দে তারাও চকিত হয়ে উঠলো, রাইফেল নিয়ে তৈরী হলো মোকাবিলা করার জন্যে।

শরফ ও আখমেদ কজিৎজ্‌কিকে ধরে ফেলেছে। কিন্তু কজিৎজ্‌কি হাত নেড়ে আবার তাদেব পেছনে সরে যেতে বলছে।

দূরে একটা হাতিয়ার ঝলসে উঠলো। আখমেদ দেখতে পেয়েছে মনে হয়। সে গুলি ছুড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তাব জবাব এল আগন্তুকদের কাছ থেকে।

পার্টিজানদের হাত-পা নাড়া দেখে জুরা বুঝতে পারে, দু দলে ভাগ হয়ে ঘুরে উভয় দিক থেকে আগন্তুকদের বেড় দেবার পরামর্শ দিচ্ছে আখমেদ, কিন্তু কজিৎজ্‌কি হুকুম দিচ্ছে সোজা যেতে। তিনজনেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। আখমেদ টুপিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে রাইফেল উঁচিয়ে সোজা এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

জুরা ছটফট করতে থাকে ওদের সাহায্য কবার জন্যে—বিশেষ করে আখমেদের পাশে দাঁড়াতে। কিন্তু বহু দূরে উঁচুতে রয়েছে সে।

কজিৎজ্‌কি যাচ্ছে আখমেদের সঙ্গে। জুরা দেখে, অপর পক্ষের বুলেটগুলো আখমেদের চারপাশে মাটিতে এসে বিঁধছে, ধুলো উড়ছে বুলেটের ঘায়ে। কিন্তু কজিৎ-জ্‌কির ধাবে কাছে কোন বুলেট পড়ছে বলে মনে হয় না। শরফ লুকিয়েছে একটা পাহাড়েব পেছনে।

জুবা আব সহ্য কবতে পারে না, ঢাল বেয়ে ছুটলো নীচের দিকে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়। আখমেদ উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। শরফ দৌড়ে গেল তার দিকে। তারপব সে ও কজিৎজ্‌কি ধরাধবি করে আখমেদকে টেনে তুললো ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়াগুলো যেভাবে পিছিয়ে গেল, তাতে জুরার সন্দেহ থাকে না, আখমেদেব জীবন শেষ হয়ে গেছে।

আখমেদ নেই!—কথাটা মনে হতেই জুবা যেন কেমন হয়ে যায়। এই প্রথম এক-জন মানুষের মৃত্যু তাকে এভাবে বিচলিত করে। তার বন্য নিষ্ঠুর পাহাড়ী জীবনে দেবদূতের মতো আখমেদ ও গোরা এসেছিল আলোর ঝলকানি নিয়ে। এ যে কী স্নেহ-ভালবাসা, এ যে কী দীপ্তি, এই মুহূর্তে জুরা যেন তা অনুভব করতে পারছে সমস্ত অন্তর দিয়ে। তাদের দুজনের মধ্যে আখমেদ আজ চলে গেল আর তা এমনিভাবে! তীব্র শোকের আঘাতে জুরা বিমূঢ় হয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

তার পরেই সে লাফিয়ে উঠলো। বেইমানি! বেইমানি!—দুঃসহ রাগে ও ঘৃণায় দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে সে ছুটলো নীচের দিকে।

শরফ ও কজিৎজুকি ফিরে চলেছে ঘোড়ার পিঠে। যে ঘোড়ার পিঠে আখমেদের লাশ রয়েছে, সেটাকে টেনে নিয়ে চলেছে পেছনে।

প্যান্থারের মতো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঝড়ের বেগে জুরা নামছে ঢাল বেয়ে। পাহাড় ও টিলার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে, গুড়ি মেরে, কুঁজো হয়ে ছুটতে ছুটতে একসময় সে বাসমাচিদের সঙ্গে সমান রেখায় এসে গেল। এবার পাহাড়ের ফাটল দিয়ে সে উঁকি মারলে সামনের দিকে।

বাসমাচিদের একজন দুঙ্ঘান জাতের, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, মুখে বসন্তের দাগ। একখানা চিঠি দোলাতে দোলাতে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বললে সঙ্গীকে।

অন্যজন জাতে উজবেক, মোটাসোটা, প্রৌঢ়বয়স্ক, তীক্ষ্ম সরু মেয়েলী কণ্ঠে কি যেন বললে জবাবে। সে ভাষাও দুর্বোধ্য। জুরা শুধু বুঝতে পারে একটা নাম—ইমাম বলুক!

মোটাসোটা উজবেকটা এক পায়ের বুটজুতো খুলে ফেললে, চিঠিখানা তার মধ্যে লুকিয়ে রেখে আবার পরে নিলে জুতোটা।

হঠাৎ তাদের কানে এল,—খবরদার, নড়বে না!

চকিতে ফিরে দাঁড়াতেই তারা দেখে, পাশের পাহাড়টার পেছন থেকে একটা রাইফেলের মুখ তাদের দিকে তাক করে আছে। দুঙ্ঘান নিজের কারবাইন রাইফেলটা চেপে ধরতেই একটা বুলেট ছুটে এল, রাইফেলটা ছিটকে পড়লো তার হাত থেকে।

রাইফেল তাক করে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ংকর কণ্ঠে জুরা হুকুম করলে,—খবরদার! হাত তোল!

বাসমাচিরা হাত তুললো। তার পরেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো জুরার হুকুমে। টীক ওদের পিঠে গিয়ে উঠলো, রাগে সে গরগর করছে।

দুজনের কোমরবন্ধ থেকে ছোরাগুলো বের করে নিয়ে জুরা তাদেব পিছমোড়া দিয়ে বেঁধে ফেললে। তারপর তার হুকুম মতো ওরা ঢাল বেয়ে আগে আগে রওনা হলো পশ্চিম দিকে। ঘোড়াগুলো নিয়ে সে নিজে রইলো ওদের ঠিক পেছনে রাইফেল উঁচিয়ে।

ফেবার পথে দেখা হলো গোরার সঙ্গে। হাঁফাতে হাঁফাতে রুদ্ধশ্বাসে সে ছুটে আসছে।

শোকাহত বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে জুরা বললে,—যাক্, তুমি এলে! শোন, বদমাশ এই বাসমাচি দুটোকে কয়েদ করেছি। আখমেদকে এরা খুন করেছে। আখমেদের সঙ্গে কজিৎজুকি ও শরফ ছিল। আমায় তারা দেখে নি। আখমেদের লাশ নিয়ে চলে গেছে।

আঁ, কি বলছো? আখমেদ খুন হয়েছে!—গোরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। খবরটা এত আকস্মিক যে, সে বিশ্বাস করতে পারছে না।

জুরা তার দেখা ঘটনাটা সবিস্তারে খুলে বলে। আর গোরা! নিঃসীম ব্যথায় নির্বাক সে দাঁড়িয়ে থাকে স্থাণুব মতো। আখমেদের মতো এত বড় উদার মন, এমন বিশ্বস্ত বন্ধু আর এরকম ধীরস্থির বিপ্লবী অভিজ্ঞ যোদ্ধা হামেশা চোখে পড়ে না! সেই আখমেদ হঠাৎ চলে গেল!

বাধ্যতামূলক মৃত্যুর মুখে পা দেবার আগে আখমেদের অসহায় নিরুপায় অবস্থাটা কল্পনাপ্রবণ গোরা যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। মাথা নীচু করে সে অনেক কষ্টে শোকের আবেগ ও চোখের জল রোধ করে।

জুরার মনও বেদনায় ভারাক্রান্ত। সে-ও জানে, আখমেদের অভাব সহজে পূরণ হবার

নয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে,—দেরি করা ঠিক হবে না, গোরা। কেল্লায় তাড়াতাড়ি পেঁছনো দরকার।

আচ্ছন্নতা থেকে গোরা জেগে উঠলো। ধীরে ধীরে বললে,—ঠিকই বলেছ। কি ইচ্ছে করছে জান? ইচ্ছে করছে, শয়তান দুটোকে কুচিকুচি করে কাটি। কিন্তু তা তো আর করা চলে না! সেটা বেআইনী হবে।

সে ইচ্ছে আমারও হয়েছিল,—জুরা বললে : কিন্তু ঐ যে বললে, সব ব্যাপারেই আইন মোতাবেক চলতে হবে। বদমাশ দুটোকে দিয়ে পর্বত থেকে ছাগলগুলো বয়ে এনে উটের পিঠে বোঝাই করাব।

কিছুক্ষণ পরে ছোট্ট কাফেলাটি রওনা হলো কেল্লার উদ্দেশে। আখমেদের মৃত্যুতে জুরা ও গোরা দুজনের মনই বিকল। কারো মুখে কথা নেই।

পর্বতের ঢাল বেয়ে তারা নামছে। হঠাৎ বহু দূরে মারকান-সু'তে নিঃসঙ্গ একজন ঘোড়সওয়ারের ওপর জুরা ও গোরার চোখ পড়ে। সাদা ঘোড়ার সওয়ার—কজিৎজুকি ছাড়া আর কেউ নয়। তারা ভেবে পায় না, কজিৎজুকি কেন একা একা ফিরছে।

সন্ধ্যা নাগাত কাফেলাটা কেল্লায় পেঁছলো। আর সেই মুহূর্তে আখমেদের লাশ নিয়ে শরফও এসে গেল অন্য দিক থেকে।

কালো দাড়িওলা দীর্ঘকায় মুসা ফটক থেকে বেরিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। খনখনে তীক্ষ্ম মেয়েলী গলায় মোটা উজবেকটি এবার কথা বলে,—আমাদের বাঁধন খুলে দাও। আমরা চাষী। তুষার-ঝড়ে আমাদের ভেড়াগুলো হারিয়ে গেছে, তাদের খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।

মুসা কয়েদীদের হাতের দড়ি কেটে দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালে পার্টিজানদের দিকে। জুরা তখনো বাসমাচিদের দিকে রাইফেল তাক করে আছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গোরা বললে,—এরাই আখমেদকে খুন করেছে।

মুসা অত্যন্ত চমকে উঠলো,—অ্যাঁ, বলো কি! আখমেদ খুন হয়েছে? এরা খুন করেছে?

জুরার কাছ থেকে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনতে শুনতে মুসার কপালের শিরা ফুলে ওঠে। বিনা বাক্যব্যয়ে খাপ থেকে রিভলবার টেনে নিয়ে বাসমাচিদের হুকুম দিলে ভেতরে ঢুকতে।

মোটা উজবেকটা চাষীর অভিনয় করতে করতে গোঙাচ্ছে বটে, কিন্তু দীর্ঘকায় দুঙ্ঘানীটির বিরূপতা গোপনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। তার ভ্রূকুটিকুটিল চোখে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

দাঁড়াও, মুসা!—বলতে বলতে জুরা ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে নিজের রাইফেলটা এগিয়ে দিলে গোরার দিকে। তার পরেই মোটা উজবেকটার ডান পায়ের বুট ধরে মারলে টান। বুটটা সহজেই খুলে এল, আর টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়লো ডাকাতটা।

বুটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে জুরা টেনে বের করলে চিঠিখানা। সেটা শূন্যে নাড়তে নাড়তে সে বললে,—এই দেখ।

হঠাৎ চোখের পলকে ছুটে এল দুঙ্ঘান ডাকাতটা, চিঠিখানা ছোঁ মেরে জুরার হাত থেকে কেড়ে নিয়েই মুখে পুরে দিলে। দ্রুত সে চিবোতে শুরু করে চিঠিখানা।

সবাই হকচকিয়ে গেছে। চোখের পলকে জুরা ঝাঁপিয়ে পড়লো ডাকাতটার ওপর। বাঁ হাতে তার মাথা আর ডান হাতে চোয়াল চেপে ধরে তার দাঁত ফাঁক করার জন্যে আঙুল

দিয়ে সে তার গাল দুটো টিপে ধরলো। মুখ ফাঁক হয়ে গেল। আর মুসা টেনে বের করলে কোঁচকানো চিঠিটা।

ডাকাতটা প্রচন্ড গুঁতোগুঁতি করছে ছাড়া পাওয়ার জন্যে। কিন্তু জুরার বজ্রবাঁধন থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা বৃথা। সে গর্জে উঠলো—কুত্তার বাচ্চা, শেয়ালের বিষ্ঠা! আমার সবচেয়ে বড় এক দোস্তকে তোরা খুন করেছিস। এবার তোরা নির্ঘাত খুন হবি আমার হাতে।

গোরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বাসমাচিটাকে ছাড়িয়ে নিলে জুরার কবল থেকে। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ দুশমনের জিভ বেরিয়ে গেছে।

এরই মধ্যে হুকুম ভুলে গেলে?—মুসা বললে জুরাকে ঃ সব কিছুই আইনমাফিক করতে হবে। বাসমাচিদের ভেতরে ঢুকতে দাও। তুমি, শরফ আর গোরা গিয়ে ঘটনাটা খুলে বলো কজুবেকে।

পার্টিজানরা নীরবে তাদের কমরেডের মৃতদেহের বাঁধন খুলে ফেলে। শোকাচ্ছন্ন সবাই। একখানা কম্বলের ওপর দেহটি রেখে নীরবে তারা বয়ে নিয়ে চলে ফটকের ভেতর দিয়ে। মৃতদেহের আগে আখমেদের ঘোড়া, পেছনে তার অস্ত্রশস্ত্র।

প্রত্যেক পার্টিজানের মনে একই বিষণ্ণ প্রশ্ন—তারা ভেবে পায় না, কি করে দুজন মাত্র ডাকাত আখমেদের মতো একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে খুন করতে পারে। অতীতে চোরাচালানদারদের একটা দলকে সে একাই আটকে রেখেছিল। আখমেদের শৌর্যবীর্যের এমনি আরো নানা ঘটনার স্মৃতি তাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। আর এবার আখমেদ তো একা ছিল না, কজিৎজ্কির নেতৃত্বে তিনজনের বাহিনীর সে ছিল অন্যতম। তাই সমস্ত ব্যাপারটা তাদের কাছে খুবই রহস্যজনক মনে হয়।

মুসা বুরুজের মাথায় পাহারা দেবার জায়গায় গিয়ে উঠলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে চারদিকে। পুব দিকের পর্বতের ঢালে ভেড়ার পাল সচকিত হয়ে উঠেছে। সাদা ঘোড়ার পিঠে আসছে একজন সওয়ার। কজিৎজ্কিকে চিনতে মুসার ভুল হয় না।

কজুবের কামরায় ঢুকতে যাচ্ছে কজিৎজ্কি, হঠাৎ শরফ ফিসফিস করে কি বলতেই থমকে দঁাড়ালো। শরফ বললে,—ইমাম বল্বক আপনার কাছে যে দূতদের পাঠিয়েছিলেন, জুরা তাদের কয়েদ করেছে।

কজিৎজ্কি না ফিরেই তেমনিভাবে ফিসফিস করে বললে,—যাও, হুকুম তামিলের জন্যে তৈরী থাক।

তারপর চর্বিসিক্ত ভারী দরজায় সন্তর্পণে আঙুলের ঠেলা দিয়ে ভেতরে পা বাড়ায় সে।

বড় একখানা খাটে বিছানার ওপর প্যান্থার ও পার্বত্য ছাগলের চামড়া বিছানো। তার ওপর আসনপিঁড়ি করে শান্ত নির্বিকার মুখে বসে আছেন কজুবে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মোটা উজবেকটি ঘুষি আস্ফালন করে প্রাণপণে চিৎকার করে চলেছে, বোঝাতে চাইছে, তারা চাষী, ভেড়া খুঁজতে বেরিয়েছিল, তাদের ছেড়ে না দিলে কজুবেকে বিষম ফ্যাসাদে পড়তে হবে।

কজিৎজ্কি এগোনোর জন্যে পা বাড়াতেই, কজুবে ভ্রূ নেড়ে তাকে ইসারায় বুঝিয়ে দিলেন—যেখানে আছ, সেখানেই থাক। আর এগোনো চলবে না।

আধ ঘন্টা কেটে যায়। কজুবে তেমনি বসে আছেন—আত্মসমাহিত ও বাহ্যতঃ নির্বিকার।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উজবেক বাসমাচিটা শেষ পর্যন্ত বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়লো, সে বুঝতে পারছে, চেঁচিয়ে ফল হবে না।

কজুবে মাথা নেড়ে ইসারা করতে জুরা চিঠিখানা কজুবের হাতে দিলে।

ওদের হাজতে নিয়ে যাও।—জুরাকে বললেন তিনি।

সবাই বেরিয়ে যায়। ঘরের মধ্যে দুজন, কজুবে ও কজিৎজুকি। চিঠিখানা আরবীতে লেখা। কজুবে আরবী জানেন না। ওটা কজিৎজুকির হাতে দিয়ে তিনি বললেন,—ডাকাতটার বুটের মধ্যে পাওয়া গেছে, গিলে ফেলারও চেষ্টা করেছিল।

চিঠিখানা খুললো কজিৎজুকি। তীক্ষ্ন চোখে কজুবে তাকিয়ে আছেন। কজিৎজুকি কিন্তু বাইরে শান্ত।

বাজে!—নিস্পৃহভাবে চিঠিখানা দলামলা করে আগুনের দিকে ছুড়ে ফেলে হাই তুলতে তুলতে কজিৎজুকি বললে : সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে বাপ লিখেছে ছেলের কাছে।

দরজা খুলে গোরা ঘরে ঢুকলো। সম্পূর্ণ খোলা রইল দরজা। জিজ্ঞাসু চোখে কজুবে তাকাতে, গোরা বললে,—আপনার সঙ্গেই শুধু কথা বলতে চাই।

এখানেই বলতে পার।—কজুবে বললেন।

সন্দেহ ও অবিশ্বাসভরা চোখে কজিৎজুকির দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে গোরা বললে—পার্টিজানরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ উত্তেজিত। তারা বলছে, আখমেদের সঙ্গে কজিৎজুকির ঝগড়া ছিল, বনিবনা হতো না। তাই ইচ্ছে করেই কজিৎজুকি আখমেদকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। জুরা আমাকে আগেও বলেছিল এবং এখনও বলছে, সে যা দেখেছে তাতে মনে হয়েছে, দুশমন যে সামনে লুকিয়ে আছে আখমেদ তা বুঝতে পেরেছিল, তাই সে চেয়েছিল তাদের বেড় দিয়ে ঘুরে যেতে। কিন্তু কজিৎ-জুকি তাকে বাধ্য করেছিল সোজা যেতে। আর তার ফলে দুশমনেরা তাকে সামনা-সামনি গুলি করতে পেরেছিল।

কজুবে তাকালেন কজিৎজুকির দিকে,—গোরা কি সত্যি বলছে?

হ্যাঁ!—কজিৎজুকির নির্বিকার কণ্ঠ : সোজা যেতে না চাওয়ায় আখমেদকে আমি কাপুরুষ বলেছিলাম।

দরজার বাইরে পার্টিজানদের ক্রুদ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

এটা কবার মানে?—কজুবে জিজ্ঞেস করেন।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পার্টিজানদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কজিৎজুকি বললে,—আমি নিজেও গেছলাম আখমেদের সঙ্গে।

শরফের ডাক পড়ে। শরফ সমর্থন করে কজিৎজুকির কথা।

কজিৎজুকি উঠে দাঁড়ালো, শিরদাঁড়া ছান করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। পার্টি-জানরা সরে গিয়ে ছেড়ে দিলে।

যে যার কাজে যাও।—কজুবে বললেন।

সবাই চলে যায়। ইতিমধ্যে জুরা আবার ফিরে এসেছে। ঘবে শুধু জুরা ও কজুবে। জুরা চিন্তামগ্ন। আগুনের দিকে মাথা হেলিয়ে বিষাদখিন্ন কণ্ঠে সে বললে,—জানেন কমরেড, এক গোরা ছাড়া আখমেদের মতন অমন দোস্ত আর হয় না। অনেক ভেবেছি, এখনও ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি নে, ডাকাতরা কজিৎজুকিকে গুলি না করে আখমেদকে কেন গুলি করলে। আখমেদের কাছেই শুনেছি, বাসমাচিরা নেতা বা ঐ ধরনের মাতব্বর ব্যক্তিদেরই আগে গুলি করে। আব একটা ব্যাপারও ঠিক বুঝতে পারছি নে, কজিৎজুকি আবার ওখানে ফিরে গেল কেন?

কজুবে নির্বাক। ঠোঁটে ঠোঁট চাপা।

হঠাৎ আগুনের ধারে দোমড়ানো চিঠিখানার ওপর চোখ পড়তেই জুরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। নিভে যাওয়া দুখানা কাঠের ওপর চিঠিখানা রয়েছে, নড়ছে আগুনের তাপে। জুরা অবাক চোখে দেখলে, কতকগুলো কালো হরফ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে কাগজখানার গায়ে।

কি দেখছো?—কজুবে জিজ্ঞেস করেন।

—দেখুন।

কজুবে দেখলেন ব্যাপারটা, কিন্তু ভান করলেন, যেন গুরুতর তেমন কিছু নয়। বললেন,—জানি, ওটা একখানা চিঠি। যাই হোক ও নিয়ে মাথা ঘামিও না, কাউকে কিছু বলোও না। এখন যাও।

দরজা বন্ধ করে জুরা চলে যেতেই কজুবে বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে চিঠিখানা কুড়িয়ে নিলেন। চিঠিখানার হরফ আরবীও না, রাশিয়ানও না।

পরক্ষণে দরজায় শব্দ হতেই, চিঠিখানা কজুবে অতিদ্রুত কোমরবন্ধে লুকিয়ে ফেললেন। ঘরে ঢুকলো কজিৎজ্‌কি। সতৃষ্ণ দৃষ্টি তার আগুনের চুল্লির দিকে—কি যেন খুঁজছে সেখানে।

কি খুঁজছো?—কজুবে জিজ্ঞেস করেন।

—খুঁজছি সেই চিঠিখানা। ওখানেই ফেলেছিলাম। তামাক খেতে হবে, অথচ সিগারেট পাকানোর কাগজ নেই, তাই ওখানা খুঁজছি।

—বোধহয় পুড়ে গেছে। বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে কজিৎজ্‌কি বললে,—কী যে বিরক্তিকর ব্যাপার, কহতব্য নয়!

মুসা ঘরে ঢুকলো। বললে,—ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। তাদের আমি বলেছি, সমস্ত ঘটনা খুলে না বললে তাদের গুলি করে মারা হবে। এর ফলে মোটা উজবেক বাসমাচিটা ভয় পেয়ে গেছে। ধোঁয়া বেরোবার ফোকরে কান পেতে শুনলাম, সে বসন্তদাগওলা দুঙ্ঘান বাসমাচিটাকে সব স্বীকার করার জন্যে পেড়াপীড়ি করছে, কিন্তু দুঙ্ঘান শাসাচ্ছে তাকে।

ব্যস্তসমস্তভাবে কজিৎজ্‌কি উঠে দাঁড়ালো।

ওদের আমি এক্ষুণি জেরা করবো।—বলতে বলতে কজুবের সম্মতির অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল সে।

কজিৎজ্‌কির গমন পথের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে চিন্তিত কণ্ঠে মুসা বললে,—একটা ভাল খবর পেলাম। পর্বতের ওপারের গাঁয়ে আখমেদের এক দোস্ত থাকে। তার কাছ থেকে জানতে পেলাম, ওশ যাবার পথে আইভ্যান তাদের গাঁয়ে আস্তানা নিয়েছে।

—কোন্ আইভ্যান?

—দারাউত-কুরঘানে গ্রাম সোভিয়েতের সভাপতিকে যে কাজকর্মে সাহায্য করতো।

—ওহো বুঝেছি, হিসাবরক্ষক আইভ্যান। জবর খবর, খুব ভাল হলো। ঘোড়া ঠিক করো। এখুনি রওনা হবো। গোরা আমার সঙ্গে যাবে। তুমি এখানকার দায়িত্বে থাকবে।

পূর্ণিমার রাত। গিরিখাতের ভেতর দিয়ে জোর কদমে ছুটে চলেছে কজুবে ও গোরার ঘোড়া দুটো। পথ চলতে অসুবিধা নেই। কিন্তু পর্বত পার হয়ে গ্রামে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত দুপুর গড়িয়ে গেল।

আইভ্যানকে ঘুম থেকে তুলে কজুবে তার হাতে চিঠিখানা দিয়ে বললেন,—পড়ে বলুন তো, কি আছে। আপনার সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যে দরকার হলে আমি সীমান্ত ফৌজের ঘাঁটি পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সে বহু দূরের পথ। জোর বরাত, আপনাকে হাতের কাছেই পেয়ে গেলাম।

নাকে চমশা এ'টে আইভ্যান চিঠিখানা খুলে ধরলো। ক্ষণপরে বললে,—চিঠিখানা বিদেশী ভাষায় লেখা। দুধ দিয়ে লেখা, গরম করলেই সব বেরিয়ে পড়ে। এটা একটা সাধারণ পরিচিত কৌশল। চিঠিতে লেখা আছে ঃ মিঃ কজিৎজ্কি 5, XI। সর্দার শো-কে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে N. B. 123।

নিস্তব্ধ কামরা। কজুবের দুই ঠোঁট দৃঢ়সম্বন্ধ। চোখ দুটো কিঞ্চিত কুঁচকে গেছে। নীরবে চিঠিখানা নিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে একটা চামড়ার মানিব্যাগে ঢুকিয়ে ব্যাগটা তিনি বুকপকেটে রেখে দিলেন। তারপর আইভ্যানের সঙ্গে সাদর করমর্দন করে গোরাকে নিয়ে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন কেল্লার দিকে।

পথে যেতে যেতে নিজের মনেই বলেন তিনি,—নোংরা পাতিশেয়াল! আজই সব-কিছুর বোঝাপড়া হবে। কয়েদীদের তক্ষুণি জেরা না করে বড্ড ভুল করেছি। ফিরেই ওটা করে ফেলতে হবে। সমস্ত টেনে বের করবো।

কেল্লায় পেঁছে কজুবে শুনলেন, ডাকাতদের গুলি করে মারার জন্যে কজিৎজ্কি পরোয়ানা লিখছে।

বটে! দ্রুত পায়ে তিনি চললেন কজিৎজ্কির কামরায়। গোরা পেছনে। কজিৎ-জ্কি কামারায় নেই। হঠাৎ গোলমাল কানে এল ডাক্তারের কামরা থেকে। ওখানেই জুরা থাকে।

পঞ্চম পর্ব ৫

পার্টিজান বাহিনীতে বয়সে ট্যাগ সর্বকনিষ্ঠ। জুরার প্রতি তার শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও আনুগত্যের বুঝি সীমা নেই। অসাধারণ লক্ষ্যভেদী হাত, শিকারের অদ্ভুত ক্ষমতা, প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি আর সর্বোপরি অসামান্য আত্মমর্যাদাবোধ—সব কিছু মিলে জুরা ট্যাগের কাছে এক আদর্শ পুরুষ। জুরার পেছনে সে ঘোরে ছায়ার মতো আর তাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। জুরার সঙ্গে শিকারে যাবার ঐকান্তিক শখ তার প্রথম থেকেই। কিন্তু হুকুম ছাড়া যায় কি করে?

বলা বাহুল্য, জুরাও সবিশেষ স্নেহ করে ট্যাগকে। সেদিন শিকার থেকে ফিরতেই, উত্তেজিত ট্যাগ আখমেদের খুনের ব্যাপারটা ভাল করে শোনার জন্যে তার কাছে গিয়ে হাজির হলো।

ঘটনাটা সংক্ষেপে দু-চার কথায় বলতে বলতে জুরা, বাসমাচিদের কাছ থেকে যে জার্মান কারবাইন রাইফেলটা সে কেড়ে নিয়েছিল, সেটা ট্যাগের হাতে দিয়ে বললে,—এটা তুমি নাও, ট্যাগ। তোমার বন্দুকটা খুবই পুরনো। সাবধানে রেখ।

কারবাইনটা দেখে ট্যাগের চোখ আনন্দে চকচক করে উঠলো। সস্নেহে রাইফেলটায় হাত বুলোতে বুলোতে জুরার অনুকরণে গটগট করতে করতে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কয়েক ঘণ্টা পরে—

কজুবে বেরিয়ে যেতেই ট্যাগ জুরাকে গিয়ে জানালে, সে তাকে যে জার্মান কারবাইনটা দিয়েছিল, কজিৎজ্কি তা কেড়ে নিয়েছে।

জুরা অবাক, অপমানিতও বটে। সে গোরার খোঁজ করলো। কিন্তু গোরা কেল্লায় নেই। এরপর সে গেল কজিৎজ্কির কাছে, ব্যাপার কি জানতে। কিন্তু প্রতিদানে পেল শুধু চূড়ান্ত অপমানকর ব্যবহার।

কজিৎজ্কির এটা পূর্ব-পরিকল্পিত। ইচ্ছে করেই সে এই দুর্ব্যবহার করেছে জুরার সঙ্গে—জুরাকে চটানোই তার মতলব।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জুরা বেরিয়ে এল এবং ভাঁড়ার-ঘর থেকে শিকার-করা একটা আস্ত ভেড়া কাঁধে ফেলে সোজা রওনা হয়ে গেল পাশের গাঁয়ের বৃদ্ধ সর্দারের বাড়ি। এই বাড়িতেই সে কিছুদিন আগে খানাতল্লাশি করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে বৃদ্ধ সর্দার আর তরুণ শিকারীর মধ্যে অদ্ভুত এক অন্তরঙ্গ দোস্তি গড়ে উঠেছে।

সর্দারের তাঁবু। চুল্লির পাশে বসে জুরা আগুনে হাত সেঁকছে। পাত্রে রান্না হচ্ছে ভেড়াটা। মাঝে মাঝে জুরা কথা বলছে—ছাড়াছাড়া অসংলগ্ন কথা। বৃদ্ধ বসে আছে, নীরবে শুনছে তার কথা।

শেষে জুরা বললে,—বুঝলেন সর্দার, ট্যাগকে আমি একটা কারবাইন দিয়েছিলাম। কজুবে কথা দিয়েছিলেন, বাসমাচিদের কাছ থেকে যা আমি কেড়ে নিতে পারবো, সে সবই আমার। কিন্তু কজিৎজ্কি ওটা কেড়ে নিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কজিৎজ্কি একটা বেইমান। সে-ই ষড়যন্ত্র করে আখমেদকে খুন করেছে। কিন্তু তার কোন বিচার হলো না। বেশ, তাই হোক। আমিও আর শিকারে যাচ্ছি না। আমার এই সিদ্ধান্ত ঠিক কি না?

সর্দার চোখ বুজে আগুনের ধারে নীরবে বসে আছেন। তাঁর ভাঁজ-পড়া কোঁচকানো মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জুরা আবার জিজ্ঞেস করলে,—কি বলেন সর্দার, আমি যা বললাম ঠিক কিনা?

না।—চোখ না খুলেই শান্তকণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন: ভুল করছো। ওটা ঠিক নয়।

লম্বা রোগাটে গড়ন সর্দারের। বয়সের ভারে কুঁজোও কিছুটা। হঠাৎ তাঁর পাতলা দাড়ি আর গোঁফের বিরলপ্রায় চুল কয়টা কাঁপতে শুরু করলো। চোখের পাতা সামান্য ফাঁক করে ঝাঁঝালো গলায় বৃদ্ধ বললেন,—বুঝলে, আজ আমার বয়েস হয়েছে, বুড়ো হয়েছি। এই দীর্ঘ জীবনে কি না দেখেছি! তোমার ঠাকুর্দার বাবা বুড়ো ডমবুলকেও দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো এরকম বাঘা দুঃসাহসী জোয়ান আমি কখনো দেখিনি। তোমার কথা আমি আগেও শুনেছি। আকাশছোঁয়া গিরিচূড়ার দুরন্ত ঈগল তুমি। জান দোস্ত, আমার পঁচিশটা ছেলে ছিল? সবাই লড়াইয়ে খতম হয়েছে। এখন আপন বলতে আছে শুধু এক নাতনী।

ক্ষণেক চুপ করেন সর্দার। তারপর দম নিয়ে আবার শুরু করেন,—তোমায় আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, জুরা। তোমার মঙ্গল কামনা করি সদাসর্বদা। তাই বলছি, তোমার এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। কেন নয়, পরে আরো জানতে পারবে। তোমায় এবার একটা গুরুতর কথা বলবো। আগামী পরশু বাসমাচি-দলের অন্যতম প্রধান নেতা শো'র প্রধান সহকারী সর্দার আজিম তার দলবল নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে মারকান-সু আসছে। পীরের দরগা চেন তো—যেটা ফি বছর কয়েক ইঞ্চি করে উঁচু হয়? সেই দরগা পার

হয়ে তারা যাবে। এই বুড়ো লোকটাকে একটু মেহেরবানি করবে, জুরা—আজিমকে মেরে তার মাথাটা আমায় এনে দেবে? আমার সবচেয়ে ছোট আদরের ছেলেটিকে সে খুন করেছে। এ কাজের জন্যে তোমায় আমি একটা রিপীটিং রাইফেল দেব।

জুরা ততক্ষণে অত্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছে, তার দুই চোখ ঝকঝক করছে তীক্ষ্ন ছুরির ফলার মতো। উত্তেজিত কণ্ঠে সে বললে,—তাই হবে, সর্দার! কবুল করছি, আজিমের মাথা আপনাকে এনে দেব।

সর্দার উঠে গিয়ে তাঁবুর এক কোণে পশমী কাপড়-চোপড়ের গাদা থেকে একটা ইংলিশ রিপীটিং রাইফেল ও ছোট এক ব্যাগ কার্তুজ নিয়ে এলেন।

সর্দারের হাত থেকে ওগুলো নিতে নিতে কঠিন নীচু গলায় জুরা বললে,—সর্দার আবার বলছি, আজিমের গর্দান আপনি পাবেন।

খাওয়াদাওয়া সেরে জুরা যখন কেল্লায় ফিরলো, রাত তখন অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলেছে, সর্দারের-দেওয়া এ খবর সে কাউকে ঘুণাক্ষরেও জানাবে না, একাই ডাকাতদলকে খতম করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে, দেখাবে তার হিম্মৎ কতখানি।

হাঁটু গেড়ে জুরা ডাক্তারের কামরায় বসে আছে। হঠাৎ টীকের চিৎকার তার কানে এল, তার পরেই উপর্যুপরি গুলির আওয়াজ। কিন্তু জুরা নিশ্চল।

আধ ঘণ্টা কেটে যায়। হঠাৎ বাতির শিখাটি কেঁপে উঠলো। এক দমকা ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকতেই জুরা ঘাড় ফেরালে। দেখে, দরজার চৌকাঠে পা রেখে কজিৎজুকি দাঁড়িয়ে আছে।

তোমায় আমার সহকারী করতে চাই, পছন্দ করো?—কজিৎজুকি বললে: তুমি আর আমি দুজনে বাসমাচিদের সঙ্গে লড়াই করতে যাব, কি বলো?

জুরা নির্বাক।

চোখ কুঁচকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কজিৎজুকি আবার বললে,—ভয় পেয়েছ, মনে হচ্ছে। কাপুরুষ!

জুরা চমকে ওঠে। সোজা তাকায় কজিৎজুকির দিকে। রাগে ফুঁসে উঠলো সে,—তুমিই কাপুরুষ!

কী! এত বেয়াদপি তোমার!—কজিৎজুকি গর্জে উঠলো, এগিয়ে গেল জুরার দিকে। জুরার পেছনে ইংলিশ রাইফেলটা রয়েছে, তার ওপর নজর পড়তেই সে ওটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে: কোথায় পেলে এটা?

জুরা জবাব দেয় না।

রাইফেলটা বাতির সামনে নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে কজিৎজুকি সবিস্ময়ে বললে,—অ্যাঁ! একেবারে আনকোরা নতুন ইংলিশ রাইফেল! ভারী তাজ্জব ব্যাপার তো? কোত্থেকে হাতিয়েছ এটা?

বলবো না।—ঠাণ্ডা ইস্পাত-কঠিন কণ্ঠ জুরার। চোখে ভ্রূকুটি।

কজিৎজুকি চেঁচিয়ে উঠলো,—বটে! আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার সাহস তোমার! বড্ড বেড়ে গেছ, দেখছি। রাইফেলটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।

দরজার দিকে সে পা বাড়ায়।

হেই!—দুঃসহ রাগে জুরা হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো: আমার রাইফেল নিয়ে যাচ্ছ কোথায়? কজুবে বলেছেন, যে যা রাইফেল পাবে, সেটা তার। রেখে যাও বলছি।

কজিৎজুকি জবাব না দিয়ে এগিয়ে যায়।

বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে জ়ুরা রাইফেলটা কেড়ে নিলে তার হাত থেকে।

তীক্ষ্ম চিৎকার ছেড়ে কজিৎজ্‌কি রিভলবার টেনে বের করলো। চোখের পলকে জুরাও সোজা রাইফেল তাক করলো কজিৎজ্‌কির বুক লক্ষ্য করে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সশব্দে দরজা খুলে গেল, কজুবে এসে দাঁড়ালেন চৌকাঠের ওপর।

রিভলবার, রাইফেল সরিয়ে নাও!—ভয়ংকর কণ্ঠ কজুবের।

জুরা ও কজিৎজ্‌কি সঙ্গে সঙ্গে হাতিয়ার সরিয়ে নিলে। খাপে রিভলবার ঢোকাতে ঢোকাতে রুশ ভাষায় কজিৎজ্‌কি গর্জে ওঠে,—অসহ্য! এ অসহ্য! চাষীদের ঘরে বেআইনী হামলা ও খানাতল্লাশি আর বেআদপির জন্যে অনেক আগেই ওকে গুলি করে মারা উচিত ছিল!

কজুবের চোখে ভ্রূকুটি দেখা দেয়। তবু যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে তিনি বললেন কজিৎজ্‌কিকে,—তোমার সঙ্গে কথা আছে। এস আমার সঙ্গে।

বলতে বলতে তিনি বাইরে পা বাড়ালেন। পেছনে কজিৎজ্‌কি ও গোরা।

নিজের কামরায় ঢুকে কজুবে ফিরে দাঁড়ালেন কজিৎজ্‌কির দিকে,—রিভলবারটা গোরার হাতে দাও।

ভীষণ চমকে ওঠে কজিৎজ্‌কি। নিদারুণ ঘাবড়ে গিয়ে বললে,—মানে! কী আজে-বাজে বকছেন? একটা গেঁয়ো বেতমীজের জন্যে সারা ফৌজের কাছে আমায় বেইজ্জত করছেন?

রিভলবারের ওপর হাত রেখে কজুবে বললেন,—হুকুম দেওয়া হয়েছে, তামিল করতে হবে।

গোরা এগিয়ে এসে কজিৎজ্‌কির রিভলবারটা বের করে নিলে। তারপর কজুবের ইশারায় আবার গিয়ে দাঁড়ালেন ঘরের বাইরের দরজার সামনে।

ঘরের মাঝখানে কজুবে আর কজিৎজ্‌কি। দুজনে নিঃশব্দে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে।

বাসমাচি দুজনকে গুলি করে মারলে কেন?—শেষে কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন কজুবে।

কজিৎজ্‌কি জবাব দেয় না। চোখ কুঁচকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কজুবে বুক পকেট থেকে একটা চামড়ার ব্যাগ বের করে তার থেকে বের করলেন দোমড়ানো একটি চিঠি।

কুত্তা ডাকাত, কবুল কর্‌!—ফিসফিস করে উঠলেন কজুবে। তাঁর মুখ কালো হয়ে গেছে, গলার শিরাগুলো ফুলে উঠেছে।

কজিৎজ্‌কি ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। সে শুরু করলে কৈফিয়ৎ। তার ফন্দি-ফিকির ও কলাকৌশলের জন্যে এ পর্যন্ত কত বাসমাচি ডাকাত ও চোরাচালানদার ধরা পড়েছে যার জন্যে কজুবে নিজে তাকে প্রধান সহকারী হিসাবে বাছাই করেছেন, তার এক লম্বা ফিরিস্তি সে দিয়ে গেল। শেষে বললে,—তাহলে দেখুন, ফৌজে আপনার পরেই যার স্থান, ডজন ডজন ডাকাতকে যে পাকড়াও করেছে, গুলি করে মেরেছে, সেই আমি কেন একজোড়া বাসমাচিকে গুলি করতে পারবো না, বিশেষ করে সবচেয়ে সেরা পার্টিজান-দের একজন আখমেদকে যারা খুন করেছে?

কিন্তু এটা কি? ছেলের কাছে বাপের চিঠি?—তীক্ষ্ম নীচু গলায় কজুবে বললেন।

পাল্‌টা জবাব এল কজিৎজ্‌কির কাছ থেকে,—কি হয়েছে তাতে? ওটা একটা ফাঁদ। সর্দার শো'র সঙ্গে আমার কথাবার্তা চলছিল, তাকে কথা দিয়েছিলাম আজিমের দলকে

পার হয়ে যেতে দেব। এইভাবে ওদের আমি ফাঁদে ফেলতে চেয়েছি। আগের মতো এটাও ফন্দি, বুঝতে পারছেন না?

মাথা নাড়তে নাড়তে কজুবে বললেন,—তা বটে!

এই দেখুন, আপনার দুশমনই যদি হতাম...— বলতে বলতে কজিৎজ্‌কি পকেট থেকে ছোট একটা রিভলবার বের করে সোজা তাক করলো কজুবের দিকে।

দু হাত পেছনে নিতে নিতে ধীর কণ্ঠে কজুবে বললেন,—হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।

রিভলবারটা তাঁর হাতে দিতে দিতে কজিৎজ্‌কি অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বললে,—এটা আপনার। আপনাকে সওগাত দিচ্ছি।

কজুবে জিজ্ঞেস করলেন,—ডাকাতরা কবে কোন্ পথে সীমান্ত পার হবে?

কজিৎজ্‌কি একটু চমকে উঠলো, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে,—আগামী পরশু কারা-কুল হ্রদ এলাকায় উটের নাক বলে যে পর্বতটা আছে, তার ঢালের পাশে। আমার এই গোপন ফাঁদে তারা এসে পড়বে আর তার ফলে আপনার হাতে আসবে চল্লিশটে ইংলিশ রাইফেল, তিরিশটে জাপানী কারবাইন, মশার পিস্তল, কোল্ট পিস্তল ইত্যাদি। নিজেদের মধ্যে আমরা কেন ঝগড়া করবো, কমরেড কজুবে? আসুন, করমর্দন করা যাক!

বলতে বলতে কজিৎজ্‌কি হাত বাড়িয়ে দিতেই, কজুবে তার হাত চেপে ধরলেন। কজুবের হাতে ঝাঁকানি দিতে দিতে কজিৎজ্‌কি বললে,—সেই ভাল যার শেষ ভাল!

কজুবে কিন্তু তার হাত ছাড়লেন না, চোখও সরালেন না তার ওপর থেকে। কজিৎজ্‌কি বললে,--আচ্ছা, এইবার তাহলে আসি।

কজুবে হাঁক দেন,—গোরা, কজিৎজ্‌কিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও!

তার মানে?—আবার ভীষণ চমকে উঠলো কজিৎজ্‌কি ঃ গোরা কেন? আমি তো নিজেই যেতে পারি।

কজিৎজ্‌কির হাত তখনো কজুবের মুঠোর মধ্যে। নীরস হেসে তিনি বললেন,—তা বটে। কিন্তু তোমার পেছনে দরজা বন্ধ করবে কে?

—কোন্ দরজা?

—গারদের!

কি বলছেন আপনি?—পাতলা দুই ঠোঁট সজোরে চাপতে চাপতে কজিৎজ্‌কি জিজ্ঞেস করলে। তার দম যেন আটকে আসছে।

বুঝতে পারছো না, ঘৃণ্য পাতিশেয়াল? বলছি, গারদে যেতে হবে!—কঠিন কণ্ঠ কজুবের। গোরাকে হুকুম করলেন ঃ ওর পেছনের পকেটে আর একটা রিভলবার আছে, সেটা বের করে নাও।

কজিৎজ্‌কি ধস্তাধস্তি করতে থাকে। কিন্তু তার হাত তখনো কজুবের মুঠোর মধ্যে। গোরা তার চোরাই পকেট থেকে টেনে বের করলো ছোট একটা ব্রাউনিং রিভলবার আর খুদে এক ধাতব কৌটো।

কজিৎজ্‌কির হাত ছেড়ে দিয়ে কজুবে রিভলবার আর কৌটোটা নিলেন গোরার হাত থেকে। তীব্র বিষ কৌটোটায়।

কজিৎজ্‌কির কাছে এগিয়ে গিয়ে কজুবে বললেন,—শোন কাঁকড়া-বিছে, দুশো রাইফেলের জন্যেও আমি আখমেদকে হারাতে রাজী নই। ডাকাতদের সম্বন্ধে যা বললে, তা মিথ্যে হলে মনে থাকে যেন—

বলতে বলতে কজিৎজ্‌কির গলার ওপর আড়াআড়িভাবে আঙুল বুলিয়ে বললেন, —বুঝতে পারছো?

কজিৎজর্ক দুলে উঠলো। গোরার দিকে ফিরে কজুবে বললেন,—তুমি, মুসা, শরফ ও জুরা ছাড়া আর কেউ জানবে না, কুত্তাটা গারদে আছে। চাবিটা শরফের হাতে দিও। ওর সঙ্গে বোধহয় খুবই নরম ব্যবহার করা হচ্ছে। ওকে নিয়ে যাও।

ভাঁড়ারের পাশেই গারদ। কজিৎজর্ককে সেখানে আটক করে গোরা নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে চাবিটা দিলে শরফের হাতে।

বিভিন্ন অতীত ঘটনার মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে আখমেদের হত্যার সাম্প্রতিক ঘটনাটা বিশ্লেষণ করে গোরার ধারণা হয়েছে, বিপ্লবের প্রতি শরফের আনুগত্য সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু জোরালো প্রমাণ ছাড়া একজন পার্টিজান কমরেড সম্পর্কে এ সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না।

জুরাকে ডেকে দাও।—কজুবে হুকুম করেন একজন আর্দালীকে।

কয়েক মিনিট পরে খবর এল, জুরা শিকারে বেরিয়ে গেছে—একলাই।

একলা শিকারে বেরিয়ে গেছে! তাজ্জব ব্যাপার!—অত্যন্ত অবাক হন কজুবে। আগুনের ধারে গিয়ে বসলেন তিনি। নিজের মনে বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন ঃ ভারী তাজ্জব ব্যাপার তো!

গভীর চিন্তায় তিনি ডুবে যান।

আর গোরা? বিভ্রান্ত বিচলিত সে। তাকে সঙ্গে না নিয়ে, কাউকে কিছু না বলে জুরার এইভাবে শিকারে যাওয়ার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে? যতই সে ভাবে, ব্যাপারটা ততই অস্বাভাবিক রহস্যজনক মনে হয়। নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে, যার জন্যে জুরা গোপনে একলাই শিকারে বেরিয়েছে। কিন্তু কি সেটা? গোরা তন্নতন্ন করে খোঁজ করে, যদি কোন খবর পাওয়া যায়। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারে না। কোন্ দিকে সে গেছে, তা-ও কেউ জানে না।

কি এক অজানা শঙ্কায় গোরার বুক কাঁপে। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দুই কমরেড—এক আখমেদ, সে তো চিরকালের মতো চলে গেছে! দুই জুরা—সে-ও কি হারিয়ে গেল!

এই আশঙ্কাটাই বারবার গোরাকে উতলা করে তোলে। আর নিরুপায় অন্তর্যাতনায় সে ছটফট করে বেড়ায়।

পঞ্চম পর্ব ৬

অন্ধকার কালো রাত্রি। পুঞ্জীভূত মেঘ নীচুতে নেমে এসেছে। সন্ধ্যা থেকে তুষার পড়ছিল, সকালের দিকে তা বন্ধ হলো। পর্বতশ্রেণী ঢেকে ফেলে মেঘপুঞ্জ গড়িয়ে নেমে এসেছে মারকান-সু'র ওপর।

কিজিল-আর্ট গিরিবর্ত্মের কাছে পর্বত-ঢালের ওপরে টিলা ও পাথর-স্তূপের ফাঁকে জুরা ঘুমিয়ে আছে। তুষারে আচ্ছন্ন সে। টীক শুয়ে আছে পাশে। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা। তার গায়ে তুলোর মোটা আবরণ।

স্তব্ধ নিদ্রামগ্ন মরুভূমি। দূর পূব থেকে মাঝে মাঝে শুধু ভেসে আসছে নেকড়েদের চিৎকার।

ফরসা হচ্ছে, তবু কুয়াশা সরে না। হঠাৎ টীক কান খাড়া করেই লাফিয়ে উঠলো, জুরার কাছে ছুটে গিয়ে নাক দিয়ে নিঃশব্দে ঠেলতে শুরু করলো তাকে।

জুরা জেগে যায়। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে কম্বল পেতে তার ওপর শুয়ে পড়লো সে। পাশে রাখলে কার্তুজের প্যাকেট। তারপর পাহাড়ের ফাটল দিয়ে রাইফেলটা এগিয়ে দিলে সামনের দিকে।

এই পাহাড়ের মাথায় ঘাঁটি করেছে সে। গাদা গাদা টিলা ও পাথরের চাংড়ায় মাথাটা সব দিকে ঘেরা। উত্তর দিক থেকে সে নিরাপদ। সেদিকে রয়েছে এক বিশাল পর্বতের দুর্লঙ্ঘ্য খাড়াই। আর পূবে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ধূ-ধূ করছে দিগন্তবিসারী ঘূর্ণিবাতাসের মরুভূমি—মারকান-সু।

দমকা হাওয়ায় কুয়াশা সরে যেতেই দেখা গেল, কয়েক ডজন সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার এলোমেলোভাবে দল বেঁধে পূব দিক থেকে এগিয়ে আসছে।

সংগে সংগে শিকারীর উত্তেজনা জুরাকে পেয়ে বসলো। ঘোড়সওয়ারদের সে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে। আজিমকে খুঁজছে সে। শেষে দলের মাঝখানে সাদাদাড়িওলা সর্দারকে সে দেখতে পায়।

সাবধানে সে রাইফেল তাক করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর এক সময় ঘোড়সওয়ারদের মাঝে সর্দারের মাথাটা পেছন থেকে একবার দেখা যেতেই তার রাইফেল গর্জে উঠলো। সর্দার আজিম গড়িয়ে পড়লো মাটিতে।

বেইমানি ! বেইমানি !—দলের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। কিছু লোক ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আবার চম্পট দিলে পূবমুখো। অন্যেরা ধাওয়া করলো সামনের দিকে। ঘোড়া থেকে নেমে টিলা-পাথরের পেছনে গা ঢাকা দিয়ে জুরাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করলো।

শুরু হলো লড়াই। একদিকে জুরা একা, অন্য দিকে বাসমাচি বহুজন।

বুলেট ছুটছে হিস্-হিস্ শব্দে, পাহাড়ে পাথরে ঘা খেয়ে ছিটকে পড়ছে। সমানে গুলি চালাচ্ছে জুরা। তিনজন লোক চেষ্টা করছিল সর্দার আজিমের দেহটা ঘোড়ার পিঠে তোলার জন্যে। জুরার রাইফেল গর্জে উঠলো। খতম তিনটি।

জুরা ওৎ পেতে থাকে অবশিষ্ট ডাকাতদের জন্যে। তার তীক্ষ্ন দৃষ্টি ওদের সন্ধান করে ফেরে। সামনের পাহাড়-টিলা-পাথরের আড়ালে ওরা লুকিয়েছে। টিলা বা পাথরের টিবির পেছন থেকে কোন মাথা উঁকি মারলেই, জুরার অব্যর্থ রাইফেল গর্জে উঠছে।

বাসমাচিরা প্রথম ভেবেছিল, ওৎ-পেতে-থাকা লোকটাকে পাকড়াতে কষ্ট হবে না তাদের। কিন্তু যখনই বুঝলো যে, রাইফেলধারী লোকটা মাত্র একজন এবং সে ঐ সামনের পাহাড়ে লুকিয়ে আছে, তখনই তাকে ঘিরে ফেলার মতলবে তারা টিলা থেকে টিলায় লাফিয়ে পড়ে ছুটতে শুরু করলো। আর জুরার গুলিও সাইজ মাফিক অব্যর্থ লক্ষ্যে। ফলে বাসমাচিরা আবার টিলা ও ঢিবির পেছনে গা ঢাকা দিলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল সংখ্যালঘু এক দল বাসমাচি দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ঘুরে গিরিবর্তের মধ্যে।

জুরা এবার টীককে লেলিয়ে দিলে বাসমাচিদের ওপর। গোলাগুলি চলার ফলে এমনিতেই টীক উত্তেজিত, তার ওপর দেখলো সে মালিকের আদেশ। মালিকের হাত থেকে সে ছুটলো ঝড়ের বেগে। টিলা ও ঢিবির পেছনে ডাকাতদের সে খুঁজে বের করে। ঘাড় ভেঙে, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে। আতঙ্কিত ডাকাতের দল পাথরের পেছন থেকে দৌড়ে পালিয়ে আসতেই পড়ে যায় জুরার রাইফেলের মুখে। পরমুহূর্তেই খতম।

বাসমাচিদের অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। নিরুপায় তারা। শেষ পর্যন্ত

প্রধান যে দলটি পাহাড়ের এক বড় গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, তার থেকে তিনজনকে তারা পাঠালো জুরাকে পেছন থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্যে।

উত্তর দিক সম্বন্ধে জুরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। উত্তরে দুরারোহ খাড়া পর্বত প্রায় সোজা উঠে গেছে। কিন্তু লোক তিনটি সেই খাড়াই বেয়েই ওপরে উঠতে শুরু করলো।

তারা দ্রুত উঠছে। পর্বতের দিকে মুখ করে, যেখানে যেটুকু সংকীর্ণ পা রাখার জায়গা পাচ্ছে, সেখানে আঙুলের ভর দিয়ে, পর্বতের ফাটল আঁকড়ে ধরে দম আটকে তারা উঠছে। আর বারবার পেছনে ঘাড় বেঁকিয়ে জুরার প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে দারুণ আতঙ্কে। পর্বতের খাড়া গায়ে সম্পূর্ণ অরক্ষিত তারা। একবার শুধু জুরার নজরে পড়ে যাওয়া, পরক্ষণে বসে-থাকা তিতির পাখির মতো সে তাদের গুলি করে মারবে।

কিন্তু জুরা তখন সামনের ডাকাতদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে, পেছনের পর্বতটার দিকে একবার তাকাবারও দরকার মনে করছে না। একবারও লক্ষ্য করছে না, পেছনে থেকে কিভাবে বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

একবার সে কার্তুজ নেবার জন্যে পেছনে ঘাড় ফেরাতেই, একটা ডাকাত দারুণ ভয়ে হাত ফসকে নীচে আছাড় খেয়ে পড়লো টিলা-ঢিবির ওপর। তখনো লড়াই চলছে। সেই উত্তেজনায় জুরা এটা লক্ষ্যই করলো না।

শেষ পর্যন্ত গোলাগুলি বন্ধ হলো একসময়। লড়াই ফতে হয়েছে। টিলা-ঢিবির পেছনে আর কোন বাসমাচি নেই। দূরে গুহার সামনে থেকে টীকের ক্রুদ্ধ চিৎকার কানে আসছে। ওখানে গুহার ভেতরে কিছু ডাকাতের সন্ধান সে পেয়েছে।

ঘর্মাক্ত দেহে বিজয়ী জুরা টিলা-ঢিবির আড়াল থেকে উঠে দাঁড়ালো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে ছুটে এল একটা বুলেট, পাথরে ঘা খেয়ে সবেগে ঠিকরে গিয়ে লাগলো তার মাথায়।

জুরার হাত থেকে রাইফেল খসে পড়লো। কাত হয়ে পড়ে গেল সে। একবার শুধু তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল,—এবার খতম...আর রেহাই নেই......

জুরা পড়ে যেতেই, বাসমাচি-দলের যে কজন তখনো অক্ষত ও বেঁচে আছে বা গুরুতর আহত হয় নি, হিংস্র চিৎকার ছেড়ে তারা ছুটে এল। দৌড়তে দৌড়তে একজন লম্বা একটা ছোরা টেনে বের করলো। তার চোখে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিহিংসার আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলছে। জুরার বুকে সে ছোরাখানা বসাতে যাবে, দলেরই আরেকজন—নাম বোয়া—পেছন থেকে তার হাত চেপে ধরলো, বললে,—থাম, পাগলামি করো না। এ কয়েদীকে যদি এভাবে খুন করো, সর্দার শো তাহলে তোমায় জ্যান্ত কবর দেবেন, বুঝলে?

শেষ পর্যন্ত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বন্দী জুরা এবং হতাহত সঙ্গীদের নিয়ে অবশিষ্ট বাসমাচি কজন রওনা হলো সারিকলের দিকে।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পর্ব ১

এক নিঃসঙ্গ মুসাফির।

গ্রীষ্মের অশান্ত পশ্চিমা বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। এখন উত্তুরে হাওয়ার দাপট। মাঝে মাঝে ঝিরঝির করে অল্প অল্প তুষার পড়ছে। বাতাসে ঘুর্ণিপাক খাচ্ছে তুষারের ফলকগুলো। তাদের তীক্ষ্ন ফলা, গিয়ে লাগছে মুসাফিরের চোখেমুখে।

সিলেস্টিয়্যাল বা স্বর্গীয় হিমগিরিশ্রেণী থেকে বেরিয়ে তিয়েন-শান-পে-লু গিরিমালা উত্তর দিকে চলে গেছে। তারই কাছের এক গিরিশ্রেণীর পার্বত্য পথ ধরে লাঠিতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে চলেছে নিঃসঙ্গ পথিক বা মুসাফির।

ভীতচকিত পথিকের চোখের দৃষ্টি। বেশির ভাগ সময় চোখ মাটির দিকে। ক্ষত-বিক্ষত পা দুখানাকে পাথরের হোঁচট থেকে বাঁচানোর চেষ্টায় সে ব্যস্ত। তাই হাঁটছে সন্তর্পণে। পথশ্রমের ক্লান্তি আর অনাহারে ঘাড়-মাথা বুকের ওপর নুয়ে পড়েছে।

আঃ কী তকলিফ! ভারী তকলিফ জান রাখা!—অস্ফুট আর্তনাদ করে মুসাফির মাঝে মাঝে থেমে যায়। লাঠিতে ভর দিয়ে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরেই হয়তো বাতাসের ঝাপটায় বা পাখির ডাকে হঠাৎ তার সংবিৎ ফিরে আসে। পিঠ বেঁকিয়ে কুঁজো হয়ে সন্ত্রস্ত চোখে সে তাকায় চারদিকে। আতঙ্কে সারা দেহ কাঁপতে থাকে থরথর করে।

কিছু দিন যাবৎ একটা নেকড়ে তার পেছু নিয়েছে। হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে ভয়ংকর জানোয়ারটা।

পর্বত-রাজ্যের ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা ভারী পাথরের মতো যেন চেপে বসেছে মুসাফিরের মনের ওপর। ঈগলের ছায়া মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, ভূতুড়ে রহস্যময় নানা শব্দ আসে আশপাশ ও ওপব থেকে। এই পরিবেশে নিঃসঙ্গ পথ-চলা এমনিতেই আতঙ্কজনক, তার ওপর নেকড়েটা আসছে পায়ে পায়ে। নির্ঘাত ওটা ওত পেতে আছে, অপেক্ষা করছে, সে কখন অবসাদে লুটিয়ে পড়বে।

পর্বত-রাজ্যের গভীরে ঢুকেছিল মুসাফির। এখন আঁকুপাঁকু করছে গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। তার চারদিকে আকাশছোঁয়া তুষারশুভ্র শিখরমালা আদিগন্ত দাঁড়িয়ে আছে জমাটবাঁধা সমুদ্র-তরঙ্গের মতো।

অনাহারক্লিষ্ট মুসাফির গোধূলির আগেই গিরিসংকট থেকে বেরিয়ে চওড়া এক গিরিখাতে এসে পড়লো। অদূরে পাহাড়সমাকীর্ণ অনুচ্চ এক এলাকা—হেমন্তের শুকনো বা প্রায় শুকিয়ে-আসা ঘাসে ঢাকা। এখানে ওখানে বুনো লতা-ঝোপঝাড়। পাশে এক ঝরনা।

কিছু বুনো ফলমূল যোগাড় করলে মুসাফির। একটা তাম্রর পাত্রে সেগুলো

সেদ্ধ করে নিলে। পাত্র বলতে এখন ঐটাই তার একমাত্র সম্বল। আর একটা চামচ। চামচ দিয়ে জিনিসটা সে খেতে শুরু করে। খেতে বিস্বাদ লাগছে বটে, কিন্তু উপায় নেই।

ঝরনার কাছে সাবেক আমলের গম্বুজাকৃতি এক কুঠি দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বুড়ো মুসাফির কুঠির ভেতরে ঢুকলো। হঠাৎ তার নজর পড়লো এক শেয়ালের গর্তের ওপর। টাটকা মল থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, গর্তটাতে তখনো শেয়ালের বাস আছে। গর্তের কাছে বড় বড় পাথর গাদা করে শেয়ালটাকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাতলো সে।

আঁধার রাত্রি গভীর হয়। ধারে কাছে কোথাও নেকড়েটা বিষণ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে চলেছে। পর্বতের ঢালে বসে নিঃসঙ্গ বুড়ো নেকড়ে ক্ষিদের জ্বালায় ডেকে চলে সারা রাত। আজ আর তার শিকার করার ক্ষমতা নেই। তাই বুড়ো লোকটা কখন মরবে, কখন তার মাংসে সে ক্ষিদে শান্তি করবে, সেই আশায় তাকে সে অনুসরণ করে আসছে দিনের পর দিন।

কুঠির ভেতরে পেছনের দেয়াল ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে মুসাফির। দুই হাতে হাঁটু দুটো মুড়ে তার ওপর মাথা রেখে বলের মতো গোল হয়ে আছে সে।

ভোর না হওয়া পর্যন্ত সে বসে রইল ঐভাবে। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে তার সাহসও ফিরে এল। বেরিয়ে এল সে কুঠি থেকে। যাক্, ফাঁদে একটা শেয়াল ধরা পড়েছে। শেয়ালটাকে মেরে সাবধানে সে তার চামড়া ছাড়িয়ে নিলে। লোকে শেয়ালের মাংস খায় না। কিন্তু মুসাফির নিরুপায়।

এইভাবে দিনের পর দিন নিঃসঙ্গ ক্লান্ত মুসাফির এগিয়ে চলে একভাবে।

তারপর সব জিনিসেরই যেমন শেষ আছে, তেমনি পথও শেষ হলো একদিন।

হঠাৎ একসময় দেখা গেল, পথ খাড়া নেমে গেছে নীচের দিকে। ক্রমশঃ নীচে নামছে মুসাফির—অনুচ্চ পাহাড়গুলোর দিকে। দিনে দিনে গরম বাড়ছে। ঘাসের ডাঁটা রঙ পাল্‌টে হলদে থেকে হলদে-সবুজে পরিণত হচ্ছে।

মুসাফিরের মনে হয়, শীতকে পেছনে ফেলে আবার সে যেন ফিরে যাচ্ছে বসন্তের উষ্ণতায়। গত রাত থেকে নেকড়েটার ডাকও বন্ধ। হয় সে মারা গেছে, নয়তো ভয়ে সরে গেছে। এ পথে লোক-সমাগম অনেক বেশী। নেকড়েদের কণ্ঠস্বর আর ঘণ্টার টুং-টাং ঝন্‌-ঝন্‌ আওয়াজ হামেশা কানে আসে।

বুড়ো মুসাফিরের মেজাজ খুশিতে ভরে উঠলো। অবশ্য সন্ধ্যার আঁধারে পথ চলতে এখনও সে ভরসা পায় না।

রাস্তার ধারেই নিভন্ত এক আগুনের কুণ্ড তার চোখে পড়ে—কোন পথচারীর দল জ্বেলেছিল নিশ্চয়ই। সে রাতটা সে আগুনের ধারেই কাটালো। তার এই দীর্ঘ পথযাত্রায় এই প্রথম সারা রাত সে ঘুমলো নিশ্চিন্ত শান্তিতে নাক ডেকে।

পরদিন ভোরবেলা। পাণ্ডুর আকাশের পটভূমিতে গিরিশ্রেণী ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাদের পিছনে আলোর খেলা শুরু হয়। প্রথমে দেখা যায় ফিকে আলো, তার পরেই দেখা দেয় গোলাপী উচ্ছ্বাস। মেঘে ঢাকা শিখরমালা। নীল ও বেগুনী মেশানো রক্তিম দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে মেঘের ওপর।

পর্বতের ছায়ায় শিশির-জমা সাদাটে তুষার আগেই গলে গেছে। রোদে কম্পমান শিশিরবিন্দুও উধাও।

দু হাত ছড়িয়ে চিৎ হয়ে মুসাফির ঘুমিয়ে আছে। মাছি উড়ছে মুখের ওপর।

চোখে মুখে রোদ এসে পড়তেই সে উঠে বসলো। চারদিকে তাকিয়ে মন তার খুশিতে চন্‌মন্‌। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সে রওনা হলো আবার।

দূরে দেখা যাচ্ছে বাগানের পর বাগান আর তাদের শ্যামশোভা। বাগানের কোল ঘেঁষে পাহাড়ের তলা দিয়ে পথ চলে গেছে দূরে—দিগন্তে কোথায় হারিয়ে গেছে একসময়।

লম্বা সার বেঁধে উটের কাফেলা চলেছে। পা ফেলার তালে তালে তাদের মাথাও দুলছে ছন্দে ছন্দে। লাল নীল হলদে পশমের স্তবক ও ঝুমকোর সাজ তাদের মাথায়। গলায় বাঁধা ঘণ্টা থেকে উঠছে একটানা টুং-টাং ঝুন-ঝুন শব্দ।

নিজের অজ্ঞাতেই শহরে যাবার সোজা পথ ধরে মুসাফির হাঁটছে। রাস্তার মাঝে তাকে আরো ছোট মনে হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অসংখ্য কাফেলা যাতায়াত করছে এই পথে। তাই রাস্তার অবস্থা হয়েছে সংকীর্ণ গভীর খাতের মতো। বুড়োর হাঁটু পর্যন্ত তার মধ্যে অদৃশ্য। ধুলোর মেঘে বেশীদূর দৃষ্টি চলে না।

শহর যত এগিয়ে আসে, সূর্য ততই ওপরে ওঠে। আর পথে হাজারো রকমের বিচিত্র শব্দের গোলমাল বাড়ে ততোধিক। ঘণ্টার শব্দ, উট-গাধার ডাক, গাড়োয়ানের চেঁচামেচি, বাঁশির শব্দ, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ—সবকিছু মিলে পথ সরগরম।

ঘোড়ায় চড়ে এইমাত্র চলে গেল জাঁকালো পোশাক-পরা একজন উঁচুদরের লোক। গায়ে নীলরঙের কোট, টুপিতে ছোট একটা বল বাঁধা। জলের পাত্র নিয়ে ভিস্তি-ওয়ালারা চলেছে। ক্ষুর হেঁচড়ে যাচ্ছে গাধার দল। দুজন করে চাষী তাদের পিঠে।

মুসাফিরের বুক ঢিবঢিব করে, হৃৎপিণ্ডের বেতাল ওঠা-নামা বেড়েই চলেছে। পথের দুধারে উঁচু মাটির পাঁচিল। উত্তেজনায় উৎকণ্ঠায় উদ্‌ভ্রান্ত মুসাফির। ঘোড়ার পায়ের নীচে পড়তে পড়তে একবার সে বেঁচে গেল অল্পের জন্যে।

শেষ পর্যন্ত প্রশস্ত কোলাহলমুখর বাজারে এসে সে পৌঁছলো। খোলা জায়গাটা উট, ঘোড়া, গাধা, কুকুর ইত্যাদি আর নানা জাতের লোকজনে ঠাসা। কিরঘিজ, দুঙ্গান, চীনা, উজবেক, আফগান, পার্শী, হিন্দুস্থানী, সমস্ত ভাষার কলরব একাকার হয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকারের মতো কানে আসছে।

ফলের গোলাকার ঝুড়ি কাঁধে বেসাতীরা ছুটোছুটি করছে। ভিস্তিওয়ালারা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ঠাণ্ডা জলের গুণপনা জাহির করতে করতে জল ফেরি করছে। হুঁকোওয়ালারা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে তামাকখোর খরিদ্দারের আশায়। হুঁকোয় অবশ্য এক-একবারে একটা বা দুটোর বেশী টান দেবার উপায় নেই। তাহলেই শুরু হয়ে যায় খোঁচাখুঁচি।

অগণিত ভিখারির দল বসে আছে দেয়াল ঘেঁষে, ভিক্ষের জন্যে একনাগাড়ে কঁকিয়ে চলেছে। দরবেশের দল নিজেদের বাহাদুরি ও ওস্তাদি দেখাতে মত্ত। মক্তবের অল্পবয়সী ছেলেরা, এমন কি মাদ্রাসার বয়স্ক ছাত্রদের দলও বাদ নেই, সুবিধা মতো যা পায় হাতানোর মতলবে ঘোরাফেরা করছে।

জানোয়ারের বিষ্ঠা, কাঁচা মাংস, পোলাও, মাছির ঝাঁক, ধুলো-আবর্জনা আর ঘোড়া-গাধা-উটের ঘামের মিলিত গন্ধে নাক-চোখ জ্বালা করে।

ভীড়ের ভেতর দিয়ে ঠেলা আর ধাক্কা খেতে খেতে মুসাফির এগোচ্ছে আস্তে আস্তে অন্ধের মতো। সে দিশেহারা।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো—চোখে অপার বিস্ময়। সামনেই এক গালিচা-ব্যবসায়ীর দোকান। রঙ-বেরঙের বাহারী গালিচার কী অপূর্ব সমাবেশ সেখানে! এক কোণে গাদা করা রয়েছে নামাজ-পড়ার কম্বল—নানা রঙের বিচিত্র নকশা-কাটা। মেঝেয় বিছানো রয়েছে নানা রঙের নানা নকশার বড় বড় গালিচা। উটের আভরণ-সজ্জা ইন্দ্র-

ধূসর সমস্ত রঙ নিয়ে ঝলমল করছে। খরিদ্দারের ভিড় লেগেছে লাল-নীল রঙের ছোট-বড় নানা মনোহারী থলির সামনে—ঘোড়সওয়ারী থলি, মালপত্র নেবার থলি, ঘোড়াকে চানা দেবার জন্যে মুখে বাঁধার থলি।

মুসাফিরের সারা জীবন কেটেছে একঘেয়ে ধূসর পর্বতের দেশে। তাই দোকানের সামনে এসে তার পা যেন আটকে গেল। রঙের এত বাহার—সে আত্মহারা! বিহ্বল চোখে তার পলক পড়ে না। জনতার ধাক্কাধাক্কি, কনুইয়ের গুঁতো, চেঁচামেচি, কোনদিকেই তার হুঁশ নেই। বাজারের গোলমাল যে আচমকা থেমে গেল, খেয়াল নেই সেদিকেও। তার কল্পনাপ্রবণ শিল্পীমন তখন বুঝি কোন্ এক স্বপ্নরাজ্যে উধাও!

ইসলাম ধর্মের অন্যতম মুরুব্বি রাইস কিপচাকবে বাজারে এসেছেন। দীনদার অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে তিনি মূর্তিমান সন্ত্রাস। তারা তটস্থ হয়ে উঠলো। চীনা, হিন্দু প্রভৃতি অমুসলমানরা অবশ্য এসব ধর্মীয় আইনকানুনের আওতার বাইরে, তাই তাদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই।

কিপচাকবেকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা মাথা নুইয়ে তসলিম করলো। দীনদারদের পক্ষে এটাই দস্তুর। মেয়েরা গিয়ে পুরুষদের পেছনে লুকোলো। একজন স্ত্রীলোককে দেখা গেল বোরখাহীন। কিপচাকবেকে দেখেই সে আতঙ্কে গোঙিয়ে উঠলো : সর্বনাশ! বোরখা না পরে সে বেরিয়েছে। গুরুতর শাস্তি থেকে আর বুঝি রক্ষা নেই! তীরবেগে সে ছুটলো বাজারের ভেতর দিয়ে।

কিপচাকবের সঙ্গে ঘোড়সওয়ার পাহারাদাররা তার পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে ভিড়ের পরোয়া না করেই। ঘোড়ার ধাক্কা লেগে লোকজন ছিটকে পড়ছে এদিক-ওদিক। মেয়েছেলেটি বুঝলো, আর রেহাই নেই। হাউমাউ করতে করতে ধরা দিলে সে।

ততক্ষণে অনেকেই সরে পড়েছে—বিশেষ করে বখাটে চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলো। বদমেজাজী কিপচাকবেকে তারা ভয় করে শয়তানের চেয়েও।

রাইস কিপচাকবে—কাজিগিরির ভারও তাঁর ওপর—সযত্নে লালিত এক কটা রঙের প্রকাণ্ড ঘোড়ার পিঠে ধীর কদমে বাজারের ভেতর দিয়ে চলেছেন। পুরু গদী-আঁটা নরম জিনের ওপর তাঁর মেদবহুল ভারী দেহ দুলছে। নীচের ঠোঁট কুঁচকে, আধবোজা রাগত চোখে তিনি দীনদারদের নুয়ে-পড়া মাথার দিকে তাকাতে তাকাতে চলেছেন। আর অতিরিক্ত চর্বি-দেওয়া খানা খেয়ে হিক্কা তুলছেন বারবার। তাঁর ডান হাতে চামড়ার চাবুক। রাইসের কর্তৃত্বের ওটা নিদর্শন।

একজন স্ত্রীলোককে তাঁর সামনে হাজির করা হলো। তার অপরাধ, সে শরীয়ত লঙ্ঘন করেছে। স্থূলকায় কিপচাকবে চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। চাবুকের এক ঘা পড়লো মেয়েলোকটির ওপর। যন্ত্রণায় কেঁদে উঠলো সে। তাকে আরো চাবুক মারার হুকুম দিয়ে ধীর কদমে এগিয়ে চললেন কিপচাকবে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভিড়ের ভেতর থেকে হঠাৎ শোনা গেল এক তরুণ কণ্ঠের চিৎকার,—লড়াই করার হিম্মৎ আছে তোমার?

কে? কে বললো? কে বললো কথাটা?—কিপচাকবে চেঁচিয়ে উঠলেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। দীনদাররা সব নীরব।

রাগে বেসামাল কিপচাকবে। ঘোড়া চালিয়ে দিলেন ভিড়ের দিকে। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

কিপচাকবে রাগে টগবগ করে ফুটছেন। ডাইনে বাঁয়ে এলোপাথাড়ি চাবুক চলছে সমানে, আর ঘোড়া ছুটছে ভিড়ের ভেতর দিয়ে। বাছবিচার নেই, আওতার মধ্যে যে

পড়ছে, তারই মুখে পিঠে মাথায় চাবুক পড়ছে সপাসপ। বাধা দেবার কেউ নেই। যাদেরই ওপর চাবুক পড়ছে, তারাই ব্যথায় কুঁচকে গিয়ে মাথা আরো নুইয়ে দিচ্ছে।

গালিচা-ব্যবসায়ীর দোকানের সামনে আসতেই কিপচাকবের নজর পড়লো মুসাফিরের ওপর। ঘোড়ার লাগাম টানতে টানতে তিনি জিজ্ঞেস করেন,—তোমার নাম কি, বুড়ো?

মুসাফির চমকে ফিরে কিপচাকবেকে দেখেই পিঠটা আরো কুঁজো করে দিলে।

কিপচাকবের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে : লোকটা নির্ঘাত কুচাক না হয়ে যায় না!

ক্ষীণ কণ্ঠে মুসাফির বললে,—খোদার মেহেরবানী হোক! আমি একটা ভিখিরি। আমার নাম জুরা।

হো হো হো!—হেসে উঠলেন কিপচাকবে : জুরা আবার কোথায় রে? ওঃ, তাহলে তুই জুরার দোস্ত? তুই তো কুচাক!

মুসাফির কেঁপে উঠলো।

হিংস্র কণ্ঠে হিস্‌হিস্‌ করে ওঠেন কিপচাকবে,—হতে পারে তুই জুরা, অথবা ঝুট বাত বলছিস! তুই-ই পালিয়েছিলি আমার হাত থেকে এমনি ঝুট বাত বলে! তোর সাঙাত সেই ছুঁচো চোরাচালানী সঈদকে আগেই পাকড়াও করেছি। এবার তোকে পেলাম।

বলতে বলতে তিনি ডাক দেন অনুচরদের। তারা ইতিমধ্যে আরো দুজন মেয়ে-ছেলেকে বোরখাহীন অবস্থায় বাজারে পাকড়াও করেছে। মুসাফিরকে উদ্দেশ করে কিপচাকবে বললেন,—ধরে নিচ্ছি, তুই কুচাক নোস। কিন্তু ঘাবড়াও মাৎ, তোর খাঁটি পরিচয় কি করে বের করতে হয় জানি। তোকে আমি গ্রেপ্তার করছি।

কিপচাকবে যখন এমনিভাবে শাসাচ্ছেন, মুসাফিরের চকিত দৃষ্টি তখন কিন্তু এদিক-ওদিক ঘুরছে। হঠাৎ কোথায় গেল তার জরাগ্রস্ত জবুথবু অবস্থা! চোখের পলকে সে তড়াং করে লাফিয়ে উঠেই অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ধেয়ে গেল সামনের দেয়ালটার দিকে।

সবাই হকচকিয়ে যায়। হকচকিয়ে গেছেন কিপচাকবেও। তার পরেই 'ধর্‌ ধর্‌' বলতে বলতে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন মুসাফিরের পেছনে।

দেয়ালে একটা বড় গর্ত। তার ভেতর দিয়ে মুসাফির ততক্ষণে অদৃশ্য। কিপ-চাকবে তাঁর দলবল সমেত দেয়াল বেড় দিয়ে যখন ওদিকের উঠোনটায় এলেন, মুসা-ফিরের তখন পাত্তা নেই। পাতিপাতি করে খোঁজা হলো সর্বত্র। কিন্তু কোথায় কে!

কি আর করা! রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ফিরে গেলেন কিপচাকবে।

মুসাফির এদিকে দৌড়চ্ছে তীরবেগে। ছুটতে ছুটতে বেশ কিছু দূর চলে এসেছে, হঠাৎ তার পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে সেঁটে গেল। সামনেই এক খাবারের দোকান। পোলাও আব সব্‌জী-দেওয়া গোস্তের মনমাতানো খোশবুতে বাতাস মাতোয়ারা। সুগন্ধি মশলার সঙ্গে ভাপে সেদ্ধ গোস্তের ধোঁয়ায় ক্ষুধার্ত মুসাফিরের পা যেন আর চলতে চায় না, মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। পায়ে পায়ে সে গিয়ে দাঁড়ালো দোকানীর সামনে। কম্পিত হাতে একটা শেয়ালের চামড়া সে এগিয়ে দেয়। দোকানী চামড়াটা নিয়ে সহকারীর দিকে ছুড়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো তার দিকে।

খানা চাই!—রুদ্ধকণ্ঠে মুসাফির বললে : শর্ত হলো, হিক্কা না তোলা পর্যন্ত খেতে দিতে হবে।

বলতে বলতে সে কোর্মা, কাবাব, কালিয়া, কোপ্তা, গোস্ত, পোলাও ও আরো যে সব উপাদেয় খানা সাজানো রয়েছে, সেগুলো দেখিয়ে দিলে।

দোকানী চামড়াটা এক নজর দেখে মাথা নাড়লে,—না, হবে না।

মুসাফির চটে যায়। হেমন্তকালের হলেও চামড়াটা সত্যিই ভাল। গজগজ করতে করতে সে এবার মালিকেব হাতে দিলে আশমানী রঙের পান্না বসানো ছোট একটা সোনার আংটি। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলো দোকানী।

তার পরেই গরম জল নিয়ে একজন চাকর এগিয়ে এল। ভাল করে হাত ধুয়ে কোমরবন্ধে পুছতে পুছতে মুসাফির গিয়ে জাঁকিয়ে বসলো একখানা গালিচার ওপর। তার সামনে নানা রকম খানা সাজানো। মুসাফির খাওয়া শুরু করে......

খাচ্ছে মুসাফির। আর তার চারপাশে ভিড় জমছে একটু একটু করে। কিন্তু সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই মুসাফিরের। একমনে খেয়ে চলেছে সে।

যত সময় যায়, ততই ভিড় বাড়ে। আর ততই অস্থির হয়ে ওঠে দোকানী। শেষ পর্যন্ত সে গোঙাতে থাকে ঃ কী তাজ্জব! কী তাজ্জব! বুড়োটা শেষতক লোকসানই করলো দেখছি! আমার ধারণা ছিল, ওটা মানুষ। এখন দেখছি, না, তা নয়, একটা আস্ত অতল খোল। ওরে বাপ্! দেখতে লম্বা-চওড়া না হলে কি হয়, গিলছে জোয়ান রাক্ষসের মতো।

দোকানী কপাল চাপড়ায় আব হিসেব দিয়ে চলে, ঐ খোলের মধ্যে এ পর্যন্ত তার দোকানের কতটা অংশ ও কি কি ঢুকেছে।

দর্শকরা একে একে এসে খোলটা অর্থাৎ ভুঁড়িটা টিপে পরখ করলো। শেষে মাতব্বর একজন বললে,—না, এখনো শক্ত হয় নি। আরো অনেক ঢুকবে!

দোকানীর মেজাজ বিগড়ে গেল। হাউমাউ করে উঠলো সে ঃ অ্যাঁ, আমাকেও তাহলে ঢুকতে হবে নাকি ওর মধ্যে! ওবে বাবা বে—

দেখতে দেখতে পেটুকেব খবর বাজারময ছড়িয়ে পড়ে। জনতাব চাপ বেড়েই চলেছে। মুসাফির কিন্তু নির্বিকাব। তার অখণ্ড মনোযোগ খানার দিকে, অন্য কোন দিকে সে একবার তাকিয়েও দেখছে না। দোকানেব অনেক খানা ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। পোলাও সাবাড়। কালিয়া-কাবাব বেপাত্তা। গোস্তের শুরুয়া এক চুমুকেই খোলে ঢুকে গেছে। তবু কিন্তু খাওয়াব বিবাম নেই। দুষ্টু চোখ তার চকচক করছে—আরো ঢের এখনো যথেষ্ট জায়গা আছে আরো ঢোকাবার!

ধীরে ধীরে নাহোরের বুকে গোধূলি নামে। তেলের বাতির আলো এসে পড়েছে বুড়োর ঘর্মাক্ত মুখের ওপর। ঘটনাটা দেখার জন্যে শেষে বাজারের যাবতীয় মাতব্বর ব্যক্তিরাও এসে হাজির হয়।

আরে, এ যে দেখছি!—হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠলো। বক্তা আর কেউ নয় খাঁ। নহলো সে নাহোরের একজন মাতব্বর গোছের লোক। কিপটাকঞ্জুসকে জোয়ালে বাঁধার জন্যে চেরাগ-ভিখিরি ধরে ধরে রইসের বাগানের নালা কাটার কাজে লাগিয়ে দেওয়ার দিকেই তার নজর সবচেয়ে বেশী।

ক্রুর হেসে খাঁ জিজ্ঞেস করে,—কি বুড়ো, আমায় চিনতে পার?

খানেক ভুরু কুঁচকে মুসাফির মাথা নাড়ে,—না।

দোকানী শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসলো ঃ মুসাফিরকে সে আর খাওয়াতে পারবে না। এটা বেআইনী, চুক্তিমাফিক সে খাওয়াতে বাধ্য। তবু সাফ জানিয়ে দিলে,—আর খাওয়াতে হলে দোকানপাট সমেত তাকেই ঐ খোলের মধ্যে ঢুকতে হবে।

দর্শকরা কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে রাজী হয় না। গাঁটের পয়সা খরচ করে তারা মুসাফিরকে খাইয়ে চলে। আর মাঝে মাঝে ভুঁড়িটা টিপে দেখে—না, এখনো ঠিক আছে, আরো ঢুকবে!

ভুঁড়িটা এখন বড় এক কুমড়োর মতো ওপর দিকে ঠেলে উঠেছে।

খাঁদা কিন্তু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে বুড়োর দিকে, আর নিজের মনে বিড়-বিড় করে চলেছে,—নির্ঘাত কুচাক! কুচাক না হয়ে যায় না!

আরো কিছুক্ষণ কেটে যায়। মুসাফির শেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একসময় উঠে দাঁড়ালো।

দাঁড়াও, আসছি। এসেই আবার শুরু করবো।—বলতে বলতে সে চারপাশের ভিড় ঠেলে উঠোনের দিকে পা বাড়ালো।

খাঁদার ইচ্ছে, ওর পেছন পেছন যায়। কিন্তু একজন যাচ্ছে বিশেষ একটা দৈহিক প্রয়োজন সারতে, আর সে কিনা যাচ্ছে তার পেছু পেছু!—এটা শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, যথেষ্ট হাস্যকরও বটে। তাই যাওয়া আর হয় না।

আধঘন্টা কেটে যায়—মুসাফিরের পাত্তা নেই। খাঁদা ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠলেও নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

কিন্তু প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষার পরও বুড়ো যখন ফিরলো না, দারুণ উত্তেজনায় খাঁদা তখন চেঁচিয়ে উঠলো,—পালিয়েছে, ও পালিয়েছে! পাকড়াও, পাকড়াও! ও ভয়ংকর লোক। ওর মাথা আনতে পারলে বকশিশ মিলবে।

আর বকশিশ! মুসাফির ততক্ষণে হাওয়া। সত্যিই সে কুচাক।

সেবার সঙ্গীদের ফন্দিফিকিরে কিপচাকবের কবল থেকে পালিয়ে কুচাক সঙ্গীদের সংগেই আবার রওনা হয়েছিল বিলিয়ান্ড-কীকের দিকে। বিলিয়ান্ড-কীকে গর্তের মধ্যে যে সোনা তখনো মজুত আছে, কুচাকের সাহায্যে তা উদ্ধার করাই ছিল সঙ্গীদের উদ্দেশ্য। আর কুচাকের ইচ্ছে ছিল, ওখান থেকে সে গাঁয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু বরাত খারাপ, গভীর পর্বতরাজ্যে পার্টিজান বাহিনীর বন্দুকের পাল্লায় তারা পড়ে যায়। অতি অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়ে তারা সোভিয়েত এলাকা ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে কাশগড়িয়ার দিকে। এই পালানোর সময় সঙ্গীদ ও কুচাকের মধ্যে ঘটনাচক্রে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

কুচাক শেষ পর্যন্ত নিজের অজান্তেই আবার ফিরে এল কিপচাকবের এলাকায় এবং ধরা পড়তে পড়তে কোনরকমে রেহাই পেয়ে গেল কিপচাকবের হাত থেকে। কিন্তু সঙ্গীদের নসিব মন্দ, কুচাকের আগেই তার মোলাকাত হলো রাইসের সৈন্যদের সংগে। সৈন্যরা তাকে পাকড়াও করে নিয়ে গেল কিপচাকবের সামনে! সঙ্গীদকে দেখে ভয়ংকর হিংস্র রাগে রাইস কিপচাকবের মুখ দিয়ে বুঝি কিছুক্ষণের জন্যে কথা সরে না। তারপর হঠাৎ প্রকান্ড জালার মধ্য থেকে যেন বেরিয়ে এল ভয়াল গর্জন,—বেইমান বদমাশ! শাস্তি কাকে বলে তোকে এবার টের পাইয়ে দেব!......

প্রথম পর্ব ২

মাসের পর মাস কেটে যায়। বিশাল এই দুনিয়ায় কুচাক নিঃসঙ্গ নিরুপায়—বিপদ-আপদের ঝাপ্‌টার পর ঝাপ্‌টায় নাজেহাল বিপর্যস্ত। এমনি করে আবার এক সময়

ফিরে এল ঠাণ্ডা হেমন্ত কাল। কুচাক একদিন এক পাহাড়ী নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো—দারুণ ক্ষুধার্ত। মুখে তার লম্বা দাড়িগোঁফ গজিয়েছে। চোখ কোটরগত। আরো কাহিল ও বেহাল দেখাচ্ছে তাকে।

খরস্রোতা চওড়া পাহাড়ী নদী—সময় সময় দুর্দান্ত। মানুষজন পারাপারের জন্য নৌকোর খেয়া সেখানে অচল। তার বদলে গরুর চামড়ার তৈরী বাতাসভরতি ভেলা—সেই ভেলার খেয়ায় একদল লোক মানুষজন পারাপারের কাজে ব্যস্ত। চওড়া ঢিলে ইজের তাদের পরনে। ভেলা যাতে উল্টে না যায়, সেজন্যে ভেলার পাশে পাশে তাদেরও সাঁতার কাটতে হয়।

পাটনীদের কাছে কুচাক খাবার চায়। ওরা মাথা নাড়ে : উঁহু, খেতে হলে কাজ করতে হবে। আমরা একজন কমতি আছি, কিছু দিন আগে একজন জলে ডুবে মারা গেছে।

দুরন্ত হিমেল জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে কুচাক শিউরে ওঠে। প্রথমে জলাতঙ্ক রোগী হিসেবে নিজের পরিচয় দেয় সে। কিছু পরে নিজেকে সে জাহির করে জাদুকর হিসেবে।

কিন্তু কোন জারিজুরিই খাটে না। শেষ পর্যন্ত পেটের ধান্দায় ঐ পাটনীর কাজেই নামতে হলো তাকে।

হিমেল ঠাণ্ডা জল। সেই জলে ভেলার খেয়া কুচাক এপার-ওপার করে। সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা দেখা দেয়, হাড় পর্যন্ত টাটাতে থাকে। কিন্তু রেহাই নেই তবুও।

এমনি করে দিন কাটে। মাসের পর মাস পার হয়।

সে দিনটা ছিল হিমাচ্ছন্ন কনকনে ঠাণ্ডা। দুর্দান্ত ফেনিল নদী গর্জন করছে—রাগে ফুঁসছে যেন।

সেদিনও কুচাককে জলে নামতে হলো দলের সঙ্গে। উঁচুদরের একজন আমিরী লোককে ঘোড়া সমেত পার করতে হবে। অনেক টাকা মিলবে।

অনেক কষ্টে ক্ষ্যাপা নদীর সঙ্গে বহুক্ষণ প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তারা যখন ওপারে খাড়া পাহাড়ের তলার পারঘাটায় গিয়ে ভেলা বাঁধলো, কুচাকের অবস্থা তখন যৎপরোনাস্তি শোচনীয়। ঠক ঠক করে শীতে কাঁপতে কাঁপতে সবাই যখন চা-খানায় ছুটলো শরীর গরম করার জন্যে, কুচাক তখন গিয়ে সটান শুয়ে পড়লো। সন্ধ্যার দিকে কম্প দিয়ে তার সারা শরীরে খিচুনি দেখা দিলে। বুকে-পিঠে নিদারুণ ব্যথা, হাড়গোড় পর্যন্ত টাটাচ্ছে।

গুরুতর অসুস্থ কুচাক পড়ে রইলো চা-খানায়। তার কাছ থেকে চা-খানার মালিক যত দিন পয়সা পায়, তত দিন তাকে ঠাঁই দেয়, খেতেও দেয়।

কিন্তু টাকা ফুরিয়ে গেল একদিন। মালিকও তাকে বের করে দিলে ঘর থেকে।

অসুস্থ ক্ষুধার্ত কুচাক অতি কষ্টে গোঙাতে গোঙাতে লাঠি ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। টলতে টলতে কোনরকমে দেহ টেনে নিয়ে রওনা হলো পুবমুখো।

আগে পিছে তার নৈরাশ্যের নিবিড় অন্ধকার। যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তার কাতর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে,—হা আল্লা, বড় কষ্ট! নসিবের ধারালো পাথরের ওপর দিয়ে জানটাকে এভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আর যে চলতে পারছি নে, খোদা!

প্রথম পর্ব ৩

ভয়ঙ্কর ঝড়ের রাত্রি। তিয়েন-শান-পে-লু পর্বতরাজ্যে ঝড়ের তাণ্ডব চলেছে। যেমন তুমুল ঝোড়ো গর্জন, তেমনি প্রচণ্ড তুষারপাত। তুষারের ফলাগুলো শূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, থামছে না কোথাও।

আর পূর্বাঞ্চলে কাশগড়িয়ার এক বাজারে এক ভিখিরি পড়ে আছে—মরণোন্মুখ। ভিখিরিটি আর কেউ নয়—কুচাক।

চা-খানা থেকে বিতাড়িত হবার বেশ কয়েক মাস পরে সে ঘুরতে ঘুরতে এই বাজারে এসে পৌঁছয়। তারপর বাজারের মাঝখানে খোলা জায়গাটায় শুয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে ভিখিরিকে মাদুর দান করাই রেওয়াজ। সেই মতো লোকে তার দিকে মাদুর ছুড়ে দিতে শুরু করে।

এক সময় মাদুরের গাদা জমা হয়। তাই দিয়ে কুচাক মরতে মরতে কোনরকমে খোঁড়লের মতো একটা ডেরা গড়ে নেয়।

এই ধরনের মাদুরের তৈরী আরো অনেক ডেরা বাজারের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সবই ভিখিরিদের ডেরা। দিনের বেলায় তারা ভিখ মাগে, আকুতি জানায়, আর রাতে মাদুরের খোঁড়লের মধ্যে ঢুকে ঠক ঠক করে শীতে কাঁপে আর ককায়।

বাজারে অসংখ্য কুকুরের বাস। তারাও ভিখ মাগে, শীতে কাঁপে আর না খেতে পেয়ে অনাহারে কষ্ট পায়।

মাঝে মাঝে কিন্তু তাদের বড় ভোজ জুটে যায়। কোন ভিখিরি মরলে এটা ঘটে। ওরা তার লাশটা খেয়ে সাবাড় করে। তারপর ওদেরই কেউ কেউ ভিখিরির তৈরী ঐ মাদুরের ডেরায় গিয়ে আস্তানা গাড়ে। পরবর্তী কালে হয়তো আর একজন ভিখিরি এসে ওদের তাড়িয়ে দিয়ে খালি 'কামরা' দখল করে নেয়।

সে রাত্রে তুমুল ঝঞ্ঝার তর্জনগর্জন আর ছুঁচের মতো ধারালো তুষারপাত মাথায় নিয়েও এমনি এক মাদুরের খোঁড়লের সামনে একপাল কুকুর বসে আছে নীরবে শান্তভাবে। পুরু সাদা পরদার মতো তুষারে তাদের সারা দেহ ঢেকে গেছে। কিন্তু সেদিকে তাদের গ্রাহ্যও নেই। ভিখিরিটা কখন মরবে, সেই আশায় তারা বসে আছে। মরবে সে নির্ঘাত। একটু আগে বা একটু পরে—মরতে তাকে হবেই।

মাঝে মাঝে ছাইরঙা একটা কুকুর সন্তর্পণে মাদুরের খোঁড়লে ঢুকছে। গায়ে তার কোঁকড়ানো লম্বা শক্ত লোম। সে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরা উঠে দাঁড়াচ্ছে, কান খাড়া করে অপেক্ষা করছে। আর তুষার জমছে তাদের দেহের ওপর।

বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে কুচাক। ছাইরঙা কুকুরটা এগিয়ে গিয়ে তার মুখ শোঁকে, নাক চাটে। কুচাক তখনো বেঁচে আছে বুঝতে পেরে মাদুরের খোঁড়ল থেকে বেরিয়ে আসে, খোঁড়লের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। অন্যেরাও এগিয়ে আসে গুঁড়ি মেরে।

ছাইরঙা কুকুরটা আবার একসময় ঢুকলো খোঁড়লের মধ্যে, অন্যেরাও উঠে দাঁড়ালো আবার।

কিন্তু ভিখিরি কুচাক মরতে চাইছে না। বড় কড়া জান তার!

মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকছে সে......

দ্বিতীয় পর্ব ১

মাথা নীচু করে মাটি শুঁকতে শুঁকতে পথ দিয়ে ছুটছে প্রকাণ্ড এক কালো কুকুর। কপালে তার মস্ত এক সাদা টিপ।

মাঝে মাঝে সে টিলার ওপর গিয়ে উঠছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে কান খাড়া করে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকছে দূরের দিকে। সামনে প্রসারিত কাশগাড়িয়ার আধা মরু পাহাড়ী ঊষর প্রান্তর। পথ গেছে নানা দিকে।

চারদিক থেকে নানা শব্দ আসছে। কুকুরটি অনেকক্ষণ কান পেতে শোনে সেগুলো।

পথে যেতে যেতে কত বিচিত্র গন্ধ আসে বিভিন্ন দিক থেকে। কুকুরটি সাগ্রহে শোঁকে সে সব গন্ধ।

কিন্তু নাঃ! সে সবের মধ্যে তার মনিব ও দোস্ত জুরার শব্দ, গন্ধ বা হদিস কোন-টাই নেই।

জুরাকে তল্লাশ করে বেড়ানো টীকের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই এক জায়-গায় সে বেশী দিন থাকতে পারে না। চাষীরা কিন্তু তার চেহারা ও শক্তি দেখে এত মুগ্ধ হয় যে, তাকে শেকলে বাঁধার চেষ্টা করে।

মারকান-সুতে বাসমাচিদের সঙ্গে লড়াইয়ে জুরার জখম হওয়ার পর এক বছর কেটে গেছে। সারিকলের পার্বত্য অঞ্চলের ছোট শহরটার দিকে এগিয়ে আসছে টীক। সন্ধ্যা নাগাত শহরের উপকণ্ঠে এক গাঁয়ে এসে পৌঁছলো সে। সারা রাত ঘুমলো এক ঝোপের মধ্যে।

পর দিন খুব ভোরে খালে জল খেয়ে আবার সে রওনা হলো। কিছু দূর যেতেই হঠাৎ বহু কুকুরের চিৎকার কানে এল তার। সচকিত টীক—এক টিলার মাথায় গিয়ে উঠলো। দূরে বহু ঢিবি, সেখানে অসংখ্য কুকুর দেখা যাচ্ছে। ত্রস্ত অবাক চোখে টীক তাকিয়ে থাকে।

এ জায়গাটা ও অঞ্চলে 'কুকুরের শহর' নামে পরিচিত। শত শত কুকুরের আস্তানা এখানে—ছাইরঙা, হলদে, সাদা, লাল, বাদামী, ডোরাকাটা, ছোট, বড় নানা রঙের নানা আকারের কুকুর।

দলে দলে কুকুর বসে আছে ঢিবির ওপর। লোম চাটছে, আচড়াচ্ছে। অনেকে নদীতে গেছে—নাইতে, জল খেতে।

লড়ুয়েরা ঘা চাটছে, ঘা সারার লতাপাতার খোঁজে ছোটাছুটি করছে। বুড়ো কুকুরগুলো ঢিবির ওপর শুয়ে ঠাণ্ডায় অসাড় হাত-পা রোদে গরম করছে বা হাড় চিবোচ্ছে। বিষণ্ণ মনমরা তারা। তাদের আগেকার হিম্মৎ আর নেই।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে হিংস্র নির্মম লড়াইয়ের মারফত দলের মাতব্বরির জরুরী প্রশ্নের ফয়সালা হয় এইখানে—এই পড়ো পতিত জমিতে। কুকুরের সাদা চকচকে মাথার খুলি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কাছাকাছি উঁচু সব পাহাড়ের মাথায় লুব্ধ শকুনের দল ওত পেতে বসে আছে নতুন শিকারের আশায়।

পড়ো জমিটার পাশে গাঁয়ের প্রায় কোল ঘেঁষে জঞ্জাল ফেলার জায়গা। হাড়গোড়, ছাই, নেকড়া, লোহার টুকরো, ভাঙা কাঠ প্রভৃতি অনেক কালের পুরনো হরেকরকম জঞ্জালের গাদা সেখানে।

কুকুরদের ক্রুদ্ধ চিৎকার টীকের কানে আসে। ওকে দেখে মাতব্বররা পাঁয়তারা কষছে। সন্দিগ্ধভাবে টীক বাতাস শোঁকে, তারপর ছোটে শহরের দিকে।

কিন্তু শহরেও সে তিষ্ঠোতে পারে না। সেখানেও অসংখ্য কুকুর। কাঁহাতক আর একলা সবার সঙ্গে লড়াই করা চলে!

সে ফিরলো গাঁয়ের দিকে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলেও অবস্থার ইতরবিশেষ নেই। অন্য কুকুরদের জ্বালায় এবারও তাকে লোকালয় ছাড়তে হলো।

কয়েক দিন পরে। ক্ষুধার্ত টীক এক ঘন ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। আরো ভেতরে ঘন কাঁটা ঝোপের মধ্যে খরগোশদের বাসা। তাদের পেছনে সে বহুক্ষণ ছোটাছুটি করেছে, কিন্তু একটাকেও ধরতে পারে নি। একার পক্ষে পারা সম্ভব নয়, সে বুঝতে পারে।

ভেতরে ঘন ঝোপের মধ্যে সে দু-একবার ঢোকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু থাবা ও নাক কাঁটায় জখম হওয়ায় সে নিরস্ত হয়ে আড়ালে ওত পেতে বসে আছে। আশা, অসতর্ক মুহূর্তে যদি কোন খরগোশ ধরা পড়ে। কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা।

হঠাৎ এক পাল কুকুরের মিলিত চিৎকার তার কানে এল। হলদে রঙের এক মাদী কুকুর এই পালের গোদা। তারা দল বেঁধে এসেছে খরগোশ শিকার করতে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ঝোপটাকে ঘিরে সমস্ত পথ আটকে তারা কাজ শুরু করে এবং খরগোশ শিকার করতে থাকে একের পর এক।

টীক বোঝে, তার একলা থাকলে চলবে না, তাহলে উপোস করে থাকতে হবে। সে দলে যোগ দেয়। ওকে দেখে অন্য কুকুরগুলো খনখনে ভাঙা গলায় হিংস্র চিৎকার করতে থাকে, শাসায় সরে পড়ার জন্যে।

যে ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে তারা চিৎকার করছে, হঠাৎ তার ভেতর থেকে একটা খরগোশ লাফিয়ে উঠলো। ভয়ে সে পাগলের মতো। টীক সমেত সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। কাজ সেরে আবার সবাই টীকের ওপর হম্বিতম্বি করতে যাবে, এমন সময় বেরিয়ে এল আরও একটা খরগোশ। আবার সবাই ছুটলো। সহজাত শিকারী স্বভাবের গোলাম তারা।

এমনি করে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে খরগোশ-শিকার। সূর্য ডুবতে সবাই ফেরে শহরের দিকে। সঙ্গে টীক। ভরপেট, খোশমেজাজ সবার। টীকের ওপর দাঁত খেঁচুনি বন্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু শহর যত এগিয়ে আসে, টীকের গতি ততই মন্থর হয়। শেষ পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে পড়ে। দলটি কিন্তু লোকালয়ের দিকে গেল না। ফিরলো সাবেক কালের জন-হীন শহরটার দিকে। বহু শতাব্দী আগে শহরটা ধ্বংস হয়ে গেছে। দালান কোঠার বদলে এখন সেখানে শুধু মাটির ঢিবি আর চুন, সুরকি, ভাঙা ইট ও রাবিশের গাদা।

টীক আবার পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। রাবিশের গাদার বাইরে ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে চারদিক তাকাতেই ধ্বংসস্তূপটা সে এবারে চিনতে পারে। এটাই সেই 'কুকুরের শহর'। ধ্বংসস্তূপের ঢিবিগুলোর ভেতর থেকে শত শত কুকুরের ডাক ও চিৎকার কানে আসছে। অসংখ্য রকমের বিচিত্র শব্দ।

টীক কান খাড়া করে থমকে দাঁড়িয়ে হাওয়ায় গন্ধ শোঁকে, ধরার চেষ্টা করে, কি

ধরনের কুকুর আছে ওখানে। কিন্তু এত রকমের গন্ধ আসছে যে, সে নিদারুণ ঘাবড়ে যায়, খেই হারিয়ে ফেলে। নির্জনে সে বড় হয়েছে, তাই কুকুরের শহরে যেতে ভরসা পায় না। ধীরে ধীরে আবার সে ফিরে গেল সেই ঝোপের নীচে।

পর দিন সকালে টীক একা-একাই আবার চেষ্টা করে খরগোশ শিকার করতে। কিন্তু সুবিধে হলো না। সে এবার হাড়ে হাড়ে টের পেল, দল বেঁধে শিকার করা ছাড়া পথ নেই। কাজেই কয়েক দিন পরে সেই দলটা আবার ফিরে এলে, আর সে দল ছাড়লো না, শিকারের পর তাদের সঙ্গে চললো কুকুরের শহরে।

কিন্তু যতই এগোয়, উদ্বেগ তার ততই বাড়তে থাকে। বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে তাকায় চারদিকে। কুকুরের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে চিৎকার। নানা আকারের, নানা চেহারার, নানা রঙের কুকুর আর কুকুর। অসংখ্য অগুনতি যেন। তারা ডাকছে, শুয়ে আছে, ছুটোছুটি করছে, বাতাস শুঁকছে, জড়াজড়ি করছে।

ঢিবিগুলোর মাঝ দিয়ে টীক এগিয়ে যায় দলের সঙ্গে। আশঙ্কায় উত্তেজনায় তার গায়ের লোম শক্ত খাড়া হয়ে উঠেছে। ঢিবির গায়ে অনেক গর্ত। কোন কোন গর্তের ভেতর থেকে কুকুরের মাথা বেরিয়ে আসছে। অপরিচিত টীককে দেখে ভয়ঙ্কর গর্জাচ্ছে তারা।

হঠাৎ লাললোমওলা একটা কুকুর গুড়ি মেরে বেরিয়ে এল এক গর্ত থেকে, খোশমেজাজে ছুটে গেল টীকের দিকে। গা শুঁকেই টীক তাকে চিনতে পারে। তারও মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে চাঙা হয়ে ওঠে। কয়েক মাস আগে এক কাফেলার সঙ্গে চলার সময় ওর সঙ্গে দোস্তি গড়ে উঠেছিল। সবাই ওর নাম দিয়েছিল 'হোঁৎকা-কাটালেজ'। টীককে পেয়ে হোঁৎকা-কাটালেজের ভারী ফুর্তি। তার পাশের এক গর্তেই টীক আড্ডা গাড়লো।

কয়েক দিন পরে টীক রওনা হলো শহরের বাজারের দিকে। বাজারের কুকুরের পাল তো তাকে দেখে মারমুখো। টীক এজন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। গোটা দলের সঙ্গে একা লড়াই করার পথ সে এড়িয়ে যায়। দ্বৈত-লড়াইতে নামে। কিন্তু একক দ্বৈত-লড়াইয়ে দুর্ধর্ষ শক্তিমান টীকের সঙ্গে কে পারবে? পালের গোদারা একে একে নতি স্বীকার করলো। তাদের মধ্যে যে বিশেষ হিংস্র ও শক্তিমান, টীক তাকে শুধু হারালোই না, খোঁড়া করে ছাড়লো। এর পর থেকে বাজারে টীক সর্বেসর্বা।

যত দিন যায়, বাজারে টীকের দখল ততই জোরদার হয়। সে বুঝে নিয়েছে, খাবার চাও তো করুণ গলায় কেঁউ কেঁউ করে ভিখ মেগ না, তর্জন গর্জন করো, লোকে খাবার দেবে। বাজারময় সে দল বেঁধে চক্কর দিয়ে বেড়ায়—বেপরোয়া। ব্যাপারীদের সামনে দাঁড়িয়ে গজরাতে থাকে। তার ফলে কিছু দিনের মধ্যেই টীক আর তার দলবলকে নিয়মিত দানখয়রাত করা দস্তুর দাঁড়িয়ে গেল। এমন কি কসাইদের বিরাট বিরাট দুর্দান্ত কুকুরগুলো পর্যন্ত, খুনখারাপি করা যাদের ডালভাত, টীকের সামনে তারাও চুপ মেরে যায়। চেঁচিয়ে টীককে চটাবে, সে সাহসটুকুও নেই।

দিন দিন টীকের দল বাড়তে থাকে। অন্যান্য দল ভেঙে সবাই তার দলে এসে যোগ দেয়। আরো বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকে দলটা। ব্যাপারীরা দেখলে, খয়রাতের পরিমাণ না বাড়ালে আর চলে না। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তারা যৎসামান্য পয়সায় মরা ঘোড়া কেনার বন্দোবস্ত করলে। মরা ঘোড়াগুলোকে আগে গাড়িতে করে শহরের উপকণ্ঠে কুকুরের শহরে নিয়ে ফেলা হতো। কিন্তু এখন সেগুলোকে বাজারের মধ্যে এনে ফেলার ব্যবস্থা হলো।

কুকুরের শহরে টীকের পাশেই তার বিশাল দলটি আড্ডা গেড়েছে। এরই মধ্যে টীকের কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছে তিনটি ঢিবির ওপর। অন্যান্য ঢিবির অনেক কুকুরও নিত্য এসে যোগ দিচ্ছে তার দলে।

শহরের বাইরে জন্তুজানোয়ারদের লাশ ফেলা বন্ধ হওয়ায় অন্যান্য কুকুরদলের সর্দারদের কিন্তু মহামুশকিল। টীকের ওপর তারা মহাখাপ্পা। টীককে দেখলেই তারা চেঁচাতে থাকে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানায়। এই সব বিপক্ষ সর্দারের মধ্যে সব-চেয়ে যে বড় শক্তিমান, সে হচ্ছে বাঘা। হিংস্র ভয়ঙ্কর সে। বলতে গেলে গোড়া থেকেই চলেছে টীকের সঙ্গে তার রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

টীক কিন্তু অনর্থক লড়াইয়ের ঝামেলায় যেতে চায় না। ওদের ক্রুদ্ধ গর্জন ও তড়পানিকে সে গ্রাহ্যও করে না, নিজের কাজে চলে যায়।

কিন্তু খুব বেশী দিন চললো না এভাবে। শেষ পর্যন্ত এল বাঘার সঙ্গে টীকের লড়াইয়ের সেই শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ।

দ্বিতীয় পর্ব ২

বহু দূর থেকে গরুর ব্যাপারীরা এসেছে গরু বেচতে। ব্যস্তসমস্তভাবে গরু-গুলোকে বেচে দিয়েই তারা সরে পড়লো। তিনশোর ওপর গরু বেচলো একদিনে।

দুপুরে ছুটতে ছুটতে কয়েকজন চাষী বাজারে এসে হাজির। তারা যে গরু-গুলো কিনেছিল, সবই মারা পড়েছে। লোকসানের হাত থেকে কিপচাকবে নিজেও রেহাই পান নি। ব্যাপারীদের পাকড়ানোর জন্যে তখুনি লোক ছুটলো। কিন্তু ছুটোছুটিই সার। তাদের পাত্তা মিললো না কোথাও।

সবসুদ্ধ প্রায় একশো গরু মারা পড়েছে। কুকুরে খেয়ে মহামারী ছড়াতে পারে, সেই ভয়ে সবগুলোকে এক জায়গায় গোর দেওয়া ঠিক হলো।

এত বড় ঘটনা যখন-তখন ঘটে না। সামনেই বিরাট ভোজের ব্যাপার। কুকুরের শহরে তাই সর্বত্র বিষম উত্তেজনা।

ভোরবেলা এক দল উট এল বাজারে। মড়ার গাড়িগুলো নিয়ে রওনা হলো তারা। তাদের পেছনে কুকুরদের সুবিশাল এক পাল। টীকের নেতৃত্বে 'হোঁৎকা-কাটালেজ', 'পোড়ানাক' আর 'কোঁকড়াশক্তলোম' দলের খবরদারি করছে। বাইরের কুকুরদের হটিয়ে দিচ্ছে তারা।

মড়ার গাড়িগুলো এসে থামলো শহরের বাইরে এক খাদের সামনে। লোকজন সেখানে গর্ত খুঁড়ছে। টীকের দল তখনো আসে নি, তাদের আগেই কুকুরের শহরের আর সব কুকুর সেখানে উপস্থিত। ভয়ালদর্শন এক জানোয়ার তাদের মাতব্বর। এই সেই বাঘা, টীকের যে সবচেয়ে শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী। দলবল নিয়ে টীকও এসে হাজির হলো একটু পরে।

ভোর থেকে মজুরেরা গর্ত খুঁড়ছে। দশ ফুট মতো বোধহয় খোঁড়া হয়েছে, এমন সময় একজনের গাঁইতিটা হঠাৎ মাটিতে বসে গেল, হাত ফসকে ঢুকে গেল ভেতরে। সন্ত্রস্ত মজুরেরা দেখে, নীচে এক অন্ধকার গহ্বর। একখণ্ড পাথর ফেলা হলো

ভেতরে। গহ্বরটা যথেষ্ট গভীর সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে পরামর্শের পর গরুগুলোকে তারা গহ্বরের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে গর্তটা ভরাট করে দিলে।

এবার এগিয়ে এল কুকুরের পাল—গর্তটা খোঁড়ার জন্যে। পাহারাদার কজন ছাড়া আর সবাই চলে গেছে। পাহারাদাররা গুলি ছুড়লো। কতকগুলো কুকুর মারা পড়লো বটে, কিন্তু অন্যেরা পালালো না, কিছুদূর হটে গিয়ে বসে পড়লো।

পাহারাদার মাত্র পাঁচজন। তাদের সামনে মুখোমুখী বসে আছে উপোসী বুভুক্ষু কুকুরের সুবিশাল বাহিনী। পাহারাদার একজন বললে,—ওরা একসঙ্গে আক্রমণ করলে কি হবে বলো তো? আমাদের পক্ষে এঁটে ওঠা অসম্ভব।

দলের মুরুব্বি বাধা দিলে,—থামো! কেন বাজে ঘাবড়াচ্ছ?

কিন্তু আক্রমণের কথায় পাহারাদাররা ততক্ষণে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। তাদের তীক্ষ্ন দৃষ্টি গিয়ে পড়ে কুকুরগুলোর ওপর। আগের পাহারাওলাটা আবার বললে,—দেখছো, একটা কুকুরও পালায় নি! সবাই যেন কি এক সংকেতের জন্যে ওত পেতে বসে আছে।

সত্যি, ঢিবির দু পাশে অপেক্ষা কবছে প্রকাণ্ড দুই কুকুরবাহিনী।

রাত্রি নামে। ত্রস্ত-উদ্বিগ্ন পাহারাওলারা আগুনের কোল ঘেঁষে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ কুকুরদলের ভেতর থেকে একটা কুকুর আকাশে মাথা তুলে ডাক শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরাও প্রায় সবাই যোগ দিলে তার সঙ্গে। তাদের খনখনে ভয়ংকর চিৎকার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলে মিশে একটানা ঐকতানে পরিণত হয়—চলতে থাকে নিরবিচ্ছন্ন আর্ত গর্জন, কোথাও যেন ছেদ নেই।

পাহারাদারদের মনে আতংক চেপে বসছে। একে লোকালয় থেকে বহুদূরে নিস্তব্ধ কবরখানা, তায় কালিঢালা রাত্রি, অন্ধকারের ভেতর থেকে শত শত হিংস্র জ্বলন্ত শ্বাপদ-চক্ষু তাদের ওপব নিবন্ধ, তার ওপর এই ভয়ংকর একটানা চিৎকার—এ অবস্থা বেশীক্ষণ সহ্য করা কঠিন। প্রথমে তাবা কিছুদূর পেছু হটে গেল। তার পরে পেছন ফিরেই দে ছুট।

দুই দল ফৌজের মতো এবার কবরখানার পাশে জড়ো হলো কুকুরের দুই বাহিনী। বাঘা গজরাতে গজরাতে দলের সামনে চক্কর দিতে শুরু করে।

টান-করে-ধরা দড়ার মতো টনটন করছে টীকের লেজ, দুই কান পেছনের দিকে। মাথা উঁচু করে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বাঘার দিকে। রাগে দুজনারই ঘাড়ের চুল ফুলে উঠেছে।

বড় বড় সাদা দাঁত বের করে বাঘা মারাত্মকভাবে গজরে উঠলো। টীকও জবাব দিলে। আস্তে আস্তে ভয়ঙ্কর পাঁয়তারা কষছে তারা। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকার ভান করছে, যেন কেউ কাউকে দেখছে না।

বাঘা হঠাৎ টীকের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে হিংস্র কণ্ঠে গর্জে উঠলো। তার মুখ থেকে গাঁজলা ছিটকে পড়ছে। নিঃশব্দে ঝকঝকে দাঁত বের করে টীক জবাব দেয়।

সহসা চোখের পলকে বাঘা ঝাঁপিয়ে পড়লো টীকের ওপর। টীক এক লাফে পাশ কাটিয়ে উলটে আক্রমণ করলো বাঘাকে, তাকে মাটিতে চেপে ধরলো। ধস্তাধস্তি করে বাঘা ছাড়িয়ে নিলে নিজেকে। তারপরেই দেখা গেল, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দুজনে

উঠে দাঁড়িয়েছে কুস্তিগীরের মতো। দুজনেই দুজনের টুঁটির নাগাল পেতে ব্যগ্র। কিন্তু সংঘাত চলেছে দাঁতে দাঁতে।

তারা কখনও বসছে, কখনও বা উঠে দাঁড়াচ্ছে, যতদূর সাধ্য নিজেদের লম্বা টান করে দিচ্ছে। কিন্তু কেউই অন্যকে বাগে আনতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত বাঘা টীককে মাটিতে ফেলে দিলে। এই বুঝি তার দাঁত টীকের টুঁটি কামড়ে ধরে!

পরক্ষণে টীক ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ালো বটে, কিন্তু বাঘা ততক্ষণে তার পিঠের ওপর লাফিয়ে উঠেছে। সামনের দুই থাবা দিয়ে টীককে জড়িয়ে ধরে সে তার কাঁধের ওপর দিকটায় দাঁত বসিয়ে দিলে।

এইবার টীকের মোক্ষম প্যাঁচ। চোখের নিমেষে স্প্রিংয়ের মতো টীক ওপর দিকে লাফ দিয়েই ডিগবাজী খেল, আর সেই সংগে তার পেছনের থাবার এক প্রচণ্ড আঘাতে হতভম্ব দুশমনের পেট ফেঁড়ে গেল লম্বালম্বিভাবে। সংগে সংগে মাতব্বরির ফয়সালা হয়ে গেল চিরতরে।

সারা রাত মাটি খুঁড়ে চলে কুকুরের পাল। সকাল নাগাত লম্বা এক সুড়ঙ্গ তৈরী হলো। হঠাৎ একটা কুকুরের পায়ের তলার মাটি ধসে যেতেই সে পড়ে গেল এক গভীর গর্তের মধ্যে। নীচে থেকে ভেসে এল তার ভীত আর্তনাদ।

এবার পায়ে পায়ে টীক এগিয়ে যায়। গুড়ি মেরে ঢোকে সুড়ঙ্গ-পথে। নীচে ভূগর্ভে সুপ্রশস্ত প্রকাণ্ড এক ফাঁকা জায়গায় এসে পথ শেষ হয়েছে। তার ডাক শুনে অন্য কুকুররাও ছুটলো তার পিছু পিছু।

চারদিনের দিন একজন পাহারাওলাকে পাঠানো হলো—ঢিবি ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যে। সে তো অবাক। কুকুরের পাল ভেতরে ঢুকেছে ঢিবির অন্য দিক থেকে। কিন্তু কি করে? কি করে তারা গরুগুলোর নাগাল পেল?

ঘোড়ার পিঠে সে ঢিবিটাকে চক্কর দিতে শুরু করে। একটা সরু পথ পড়ে সামনে। নদী পর্যন্ত কুকুর চলাচলের ফলে তাদের পায়ে পায়ে তৈরী হয়েছে পথটা।

হঠাৎ সে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লো। পথের ওপর একটা আশরফি পড়ে আছে! ওটা সে তুলে ধরে চোখের সামনে। নাঃ, কোন ভুল নেই—সাবেক আমলের খাঁটি সোনার মোহর!

দ্রুত সে এদিক-ওদিক তাকায়ঃ আরে আরে! একই রকমের আরো কতকগুলো আশরফি যে পড়ে আছে পথের পরে! কী ব্যাপার! পথ ছেড়ে সে একটু পাশে সরে দাঁড়ালো ব্যাপারটা বোঝার জন্যে।

ঢিবির ভেতব থেকে কুকুরের দল মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে আসছে। নদীর দিকে যেতে যেতে তাবা গা ঝাড়া দিচ্ছে। আর সময় সময় তাদের গা থেকে ঝকঝকে সোনার চাকতি ছিটকে পড়ছে মাটিতে!

পাহারাওলার চোখ ছানাবড়া। ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠেই সে তীরবেগে ঘোড়া ছোটাল রাইস কিপচাকবেকে খবর দেবার জন্য।

তৃতীয় পর্ব ১

কিজিল-আর্ট গিরিবর্ত্মের কাছে মারকান-সুতে বাসমাচিদের সঙ্গে লড়াইয়ের শেষ পর্যায়ে জুরা মাথায় গুলি লেগে পড়ে যেতেই অবশিষ্ট বাসমাচিরা ছুটে এসে তাকে বন্দী করলো। টীক তখন সেখানে অনুপস্থিত—দূরে অন্যত্র সে উত্তেজিত কণ্ঠে ডেকে চলেছে, ডাকছে জুরাকে।

অনেকক্ষণ পরে জুরা জ্ঞান ফিরলে দেখে, ঘোড়ার পিঠে সে চলেছে, ঘোড়ার গলার নীচে দিয়ে হাতের কবজি দুটো বাঁধা, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। নিজের উপর রাগ হয় তার : কত্তো বড় গাধা আমি! কজুবে, গোরা বা মুসাকে কেন বললাম না ডাকাতদের কথা? তাহলে তো এ অবস্থা হয় না। নিজের আহাম্মুকি আর হামবড়ামির জন্যেই এবার আমায় মরতে হবে। কিন্তু টীকই বা গেল কোথায়?

এদিক-ওদিক সে তাকায়। কিন্তু টীকের পাত্তা নেই।

ঘোড়ার পিঠে সঙ্গীদের লাশ ও হাতিয়ারগুলো চাপিয়ে অবশিষ্ট বাসমাচি কজন সারিকলে ফিরে চলেছে। সন্ধ্যার দিকে তারা নিজেদের ছাউনিতে পেঁছিলো।

গোলমাল চেঁচামেচি শুনে বড় তাঁবুটা থেকে বেরিয়ে এল জরির-কাজ-করা কোট গায়ে দীর্ঘকায় একজন ব্যক্তি। সর্দার আজিম ঘায়েল হবার পর দল-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল বোয়া। ঘোড়া থেকে নেমে কুর্নিশ করে গোঙাতে গোঙাতে সে এগিয়ে গেল,—শরীফ মালেক, সর্দার শো, দেখুন হুজুর, শয়তান বদমাশটা আমাদের কি হাল করেছে! সর্দার আজিম সমেত ফৌজের আদ্দেকই ঘায়েল হয়েছে ওর হাতে।

অ্যাঁ, বলছো কী?—সর্দার শোর ক্রুদ্ধ বিমূঢ় চোখে বিস্ফারিত দৃষ্টি। কিন্তু জুরার ওপর নজর পড়তেই নিজের অজ্ঞাতে সে পেছু হটে গেল কয়েক পা।

আর জুরা! সর্দারকে দেখেই সে প্রচণ্ড টানে হাতের বাঁধন ছিঁড়ে ফেললে। পাশের এক ঘোড়সওয়ারের খাপ থেকে একখানা ছোরা টেনে নিয়েই 'তাগাই!' বলে ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছেড়ে সে লাফিয়ে পড়লো ঘোড়া থেকে।

শুরু হলো ধস্তাধস্তি। জনা বারো ডাকাত চেপে ধরেছে জুরাকে। তার চিৎকার শোনা যায়.—বল্ শয়তান, কোথায় আমার জয়নাব! তোর রক্ত দেখবো আমি!

চেঁচামেচি কানে যেতেই তিনজন লোক বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। তাদের একজন কিপচাকবে, অন্য দুজন কজিৎজুকি ও শরফ।

কজিৎজুকিকে লক্ষ্য করে সর্দার শো ওরফে তাগাই গর্জন করে উঠলো,—বেইমানি, চূড়ান্ত বেইমানি করেছ তুমি! কথা ছিল, পার্টিজানদের তুমি অন্য দিকে ভুল পথে নিয়ে যাবে। তার বদলে কিনা আমাদের দলটি পড়লো গিয়ে গোপন ফাঁদে. আজিম সমেত অর্ধেক লোক খতম হলো! আজিম ছিল আমাদের গর্ব।

কজিৎজুকি বুক চাপড়াতে চাপড়াতে হাউমাউ করে উঠলো। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে তার। কম্পিত হাতে খাপ থেকে রিভলবার বের করতে করতে সে চেঁচিয়ে উঠলো, —আমি কসম খাচ্ছি, হলফ করে বলছি, পরিকল্পনা মতোই সব ঠিক করা হয়েছিল।

কিন্তু আমাকে গারদে কয়েদ করার ফলে পরে কি ঘটেছে, কিছুই জানতে পারি নি। শরফ না ছাড়ালে এতক্ষণে আমি এ দুনিয়া ছেড়েই চলে গেছি!

বেইমান! জুরা ওয়াক করে থুতু ফেললে কজিৎজুকির মুখে। রাগে পাগল হয়ে ওঠে কজিৎজুকি। খাপ থেকে ঝটকা মেরে বের করলো রিভলবার। ডাকাতরাও হৈ-হৈ করে উঠলো,—খুন করো, খুন করো ওকে! ও মানুষ না, জ্যান্ত শয়তান।

সবচেয়ে বেশী চেঁচাচ্ছে শরফ। জুরাকে এ অবস্থায় দেখেও তার আতঙ্কের যেন শেষ নেই। হাত-পা গলা কাঁপছে।

কাজী কিপচাকবে বাধা দিলেন,—না, এখুনি দরকার নেই খুন করার। কিছুকাল আগে কুচাক নামে একটা লোক আমার হাত ফস্‌কে পালিয়েছে। তার কাছেই আমি শুনেছিলাম এ লোকটার কথা। সোনাদানার গোপন জায়গার খবর এ জানে। একে খুন করার সময় পরেও যথেষ্ট পাওয়া যাবে। এখন থাক।

জুরাকে গারদে রাখার হুকুম হলো। দূরে পর্বতশ্রেণীর কাছে কয়েদখানা। পরদিন ভোরবেলা জুরাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে বোয়া রওনা হলো। সঙ্গে আরো পাঁচজন বাসমাচি। তন্মধ্যে শরফ অন্যতম।

সন্ধ্যা নাগাদ এক গাঁয়ে এসে তারা পেঁছিলো। ইতিমধ্যে বোয়া আর শরফ মনের ঝাল মিটিয়ে জুরাকে চাবকেছে বেশ কয়েক বার। জুরা একটা শব্দ পর্যন্ত করে নি, দাঁতে দাঁত চেপে থেকেছে।

সে দেখে, গাঁয়ের প্রান্তে আবর্জনার বিরাট বিরাট ঢিবি। শুয়ে শুয়ে কুকুর থাকে সেখানে, তাদের চিৎকার কানে আসছে। এটাই সেই 'কুকুরের শহর'।

গভীর বড় একটা গর্তের ধারে বাসমাচিরা এসে দাঁড়ালো। গর্তের ভেতরটা নাশপাতির মতো। জুরাকে তারা বগলে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দিলে সেই কয়েদখানায়। তারপর মুখে গরাদে এঁটে দিলে।

জুবার চেহারা শোচনীয়—ভয়ঙ্করও বটে। তার-জড়ানো চাবুকের ঘায়ে মাথার টুপি ছিন্নভিন্ন। ক্ষত স্থান থেকে যে রক্ত পড়েছে, তা জমাট বেঁধে সেঁটে গেছে চুলের সঙ্গে। ডান চোখ ফুলে উঠেছে। ওপরের ঠোঁট কাটা। ঘাড়ে মুখে বুকে, সর্বত্র জমাট-বাঁধা চাপচাপ রক্ত। বাঁ পা খালি, তাগাইয়ের তাঁবুর বাইরে ধস্তাধস্তির সময় বুটটা কে যেন খুলে নিয়েছে।

গর্তের মধ্যে অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই জুরা দেখে, ভেতরে আরো দুজন লোক। তাদের একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো,—আরে আরে, এ যে জুরা!

জুরা কিন্তু তাকে চিনতে পারে না।

আমি সঈদ!—লোকটা বললে। শতছিন্ন জামাকাপড়-পরা ভিখিরির মতো অনশনক্লিষ্ট রোগা লোকটাকে সঈদ বলে চেনা দায়। তার তেরছা চোখ দুটো ধক্‌ধক্ করছে অন্ধকারে—আগের থেকে তা অনেক বেশী উজ্জ্বল।

তোমার কাছে খাবারদাবার কিছু আছে?—সঈদ বললে ঃ এখানে আমাদের দৈনিক বরাদ্দ, একপাত্র পাতলা লপ্‌সি আর এক জগ জল—দিনে মাত্র একবার দড়ি বেঁধে নামিয়ে দেওয়া হয়। কুচাকের খবর জানো? আমি কিন্তু জানি কিছু কিছু।

কোথায় সে?—জুরা সঙ্গে সঙ্গে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্যে। সঈদ তার হাতের বাঁধন খুলে দিতেই বুনো জানোয়ারের মতো সে গর্তময় ছুটোছুটি শুরু করলে। ক্ষতবিক্ষত মাথায় অস্বাভাবিক যন্ত্রণা। কি সে করছে, সে কাণ্ডজ্ঞানও বোধহয় লোপ পেয়েছে।

গর্তে আর একজন লোক—দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নাম 'চাও'। জাতে সে চীনা বাপের দিক থেকে, মা অন্য জাতের।

গর্তময় ছুটোছুটি করতে করতে জুরার হঠাৎ নজর পড়লো ওপর দিকে। সে ছুটে এল চাও ও সঈদ যেখানে বসে আছে। বললে,—ওপরে গরাদের দিকে আমায় তুলে ধরো। দেরি নয়—এক্ষুণি।

সঈদ মাথা নাড়ে,—ওতে সুবিধে হবে না।

অস্বাভাবিক জুরার চোখের দৃষ্টি—যেন জ্বলছে আগুনের মতো। চাও বোঝে, তার অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নয়।

দারুণ আক্রোশে জুরা ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে সঈদের ওপর, চাও বাধা দিলে, শান্ত-কণ্ঠে বললে,—করছো কি? এদিকে এস।

দেয়ালে হাতের ভর দিয়ে সে কুঁজো হয়ে দাঁড়ালো। জুরা উঠে দাঁড়ালো তার পিঠে। তারপর গর্তের মুখে কাঠের যে গরাদে ছিল, সেটা ধরে ফেললে ওপর দিকে লাফ মেরে। গরাদে ধরে সে ঝুলতে থাকে। ঝুলতে ঝুলতে দম নেয়। তারপর দেয়ালে পা আটকে চেষ্টা করে গরাদের পাশে ঠেলে দিতে। সামান্য সরেও গেল ওটা।

গর্তের পাহারায় যে লোকটা ছিল, গরাদেটা নড়ে উঠতেই সে ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। পরক্ষণে ফাঁক দিয়ে বন্দুকের কুঁদো ঢুকিয়ে সজোরে জুবার মাথায় মারলে এক ঘা। সঙ্গে সঙ্গে জুরার মুঠি আলগা হয়ে গেল, নীচে গিয়ে আছড়ে পড়লো সে।

আতঙ্কে সঈদ চেঁচিয়ে উঠলো,—পাগল! ও বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে! ওকে খুন না করলে, আমাদের ও গলা টিপে খুন করবে।

দেয়াল ঘেঁষে চাও বসে আছে। আস্তে আস্তে বললে,—না। ওকে বাঁচাতে হবে।

পর দিন। জুরা জ্বরে অচৈতন্য। বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছে। সঈদের কাছ থেকে চাও ক্ষুরের খণ্ডটা চেয়ে নিলে। সঈদ ওটা বুটের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। ক্ষুর দিয়ে চাও জুরার মাথা কামিয়ে ফেললে। তারপর জল দিয়ে ক্ষতটা সাফ করে, দেয়াল থেকে মাকড়সার জাল জোগাড় করে তা দিয়ে ঢেকে দিলে ক্ষতটা।

দিন চারেকের মধ্যে জুরা অনেকটা সুস্থ হয়, হাঁটাচলার ক্ষমতাও হয়। দেয়ালের গা ঘেঁষে শুয়ে সে তাকিয়ে থাকে কালচে নীল আকাশের পানে। বিষাদ ও নৈরাশ্য তার মনে চেপে বসছে।

পর্বত-রাজ্যের উদার উন্মুক্ত আকাশ-প্রান্তর আর তার প্রাণ-সঞ্জীবনী নির্মল ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য মন তার আকুলিবিকুলি করে, প্রাণ কাঁদে হারানো স্বাধীনতার জন্যে। আর বাসমাচিদের কথা মনে পড়লেই গজরায় চাপা আক্রোশে।

আবেগপ্রবণ খামখেয়ালী জুরা—স্বল্পভাষী স্বভাব-গম্ভীর। আত্মমর্যাদা-বোধ এত প্রবল যে, নিজের দুঃখবেদনা ও আকুলতার কথা বারেকের জন্যও প্রকাশ করে না সঈদ বা চাওয়ের কাছে। মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠে সে গর্তময় হাঁটতে শুরু করে, তারপর দৌড়তে থাকে দুরন্ত আবেগে। মনশ্চক্ষে সে যেন দেখতে পায়, কেমন করে দশ, বিশ, একশো, হাজার ঘোড়সওয়ারের এক বাহিনী নিয়ে সে তাগাইয়ের শিবির আক্রমণ করেছে, পাকড়াও করেছে তাগাই, খাঁদা আর কজিৎজ্কিকে। নিজের মনেই দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে ফিসফিস করে,—বদলা কাকে বলে জানিস? তোদের এবার তা টের পাইয়ে দেব বুঝলি, শয়তান বজ্জাত জানোয়ারের দল!

এমনি ভাবে প্রতিহিংসার স্বপ্নে আচ্ছন্ন সে এক-এক সময় চাও ও সঈদের উপ-স্থিতির কথাও ভুলে যায়, স্বপ্নচালিত অন্ধ মানুষের মতো দীর্ঘ পদক্ষেপে গর্তের

মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ওদের ওপর, আর কি যেন বকতে থাকে বিড়-বিড় করে।

মোলায়েম কণ্ঠে চাও বলে,—সাবধানে চলো, জুরা। অন্ধের মতো যেখানে-সেখানে ধাক্কা খাচ্ছ। আমাদের বলো, কি কষ্ট তোমার, রাতেও কেন ঘুমোও না।

চাওয়ের গলা কানে যেতে সে শান্ত হয়।

একদিন সে বললে, কেমন করে সে নির্যাতন চালাবে তাগাইয়ের ওপর, ভয়ঙ্কর বদলা নেবে গোটা বাসমাচিদলের ওপর। তার কথাবার্তা অসংলগ্ন, গলা শুকনো কর্কশ, হাত-পা নাড়ছে পাগলের মতো।

দুর্গন্ধময় অন্ধকার গর্ত। সূর্যের আলো প্রায় ঢোকেই না। দুপুরের দিকে গরাদে ভেদ করে একফালি আলো এসে পড়ে সরু তরোয়ালের মতো।

জুরার চোখের ক্লান্ত বিষণ্ণকাতর দৃষ্টি চাওয়ের নজর এড়ায় না।

ছোটখাট, রোগা পাতলা গড়নের মানুষ চাও। বয়সে প্রবীণ। কালো চোখে তীক্ষ্ন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। একমনে সে শোনে জুরার কথা আর অন্তর দিয়ে অনুভব করে, স্বাধীনতাপ্রিয় শক্তিমান এই তরুণ শিকারী কী নিদারুণ অন্তর্যাতনায় ছটফট করছে গর্তের মধ্যে। অব্যক্ত ব্যথায় ভরে ওঠে চাওয়ের মন।

দিন যায়। একঘেয়ে জীবন—কোন বৈচিত্র্য নেই। রাতে কয়েদীদের শীতে জমে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। শরীর গরম রাখার জন্যে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে গায়ে গায়ে জড়া-জড়ি করে তারা পড়ে থাকে। মাঝের জনই যা একটু ঘুমোতে পারে। পাশের দুজন কখনো অর্ধ-অচেতন তন্দ্রায় ঢোলে, কখনো বা আশা-ভরসাহীন অন্ধকার ভবিষ্যতের চিন্তায় ডুবে যায়। বারে বারে নিজেদের মধ্যে তারা জায়গা বদল করে, কিন্তু পুরো ঘুম কারো কপালেই জোটে না। দিনে তাপ বাড়লে ঢুলতে থাকে।

রোজ সকালে কয়েদীদের জন্যে কিছু লপ্‌সি আর জল নামিয়ে দেওয়া হয়। সঈদ চেঁচায়,—এই কুত্তা চোর! তোরা কেন আদ্দেকটা খেলি?

ওপর থেকে পাহারাদারের গলা শোনা যায়,—বেশ করেছি। আমাদের কুকুরগুলোকে খাওয়াতে হবে না? তোরা তো মরবিই। পাশের গর্তে তোদের মতো একজোড়া তো একটু আগেই মরলো। ও ছাড়া তোদের বরাতে আর কি জুটবে রে, হতভাগা?

এর পর শুরু হয় সঈদের একটানা গালাগালি—পাহারাওলাদের ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন চোদ্দ পুরুষের সে শ্রাদ্ধ করে ছাড়ে।

মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হলে ওদের জীবনে বুঝি কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আসে। সময় সময় তর্ক বাধে সঈদ ও জুরার মধ্যে। আগে কোন লোকের সংস্পর্শে এলে জুরা তাকে নির্বিচারে গ্রহণ করতো, তার কথাও বিশ্বাস করতো নির্বিচারে। কিন্তু এখন বাছবিচার করে এবং একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাত বোঝানোর জন্যে বুনো জানোয়ারের সঙ্গে তাদের তুলনা করে।

সে বলে,—বুঝলে সঈদ, তুমি হলে খ্যাঁকশেয়াল। তোমার মাথা ও জিভ সাপের। আর জানই তো, সাপ হলো গিয়ে মিথ্যেবাদী। বলতে পার, তুমি মিথ্যে কথা কেন কও? আর চাও, তুমি হলে দাঁড়কাকের মতোই জ্ঞানবান। বলতে পার, সঈদ কেন এ রকম মিথ্যে কথা বলে?

এর পর সঈদের ঝগড়া বাধে চাওয়ের সঙ্গে। সঈদের ধারণা, নিজের সম্বন্ধে চাও আজ পর্যন্ত অনেক কিছুই গোপন রেখেছে। মাথা নাড়তে নাড়তে এক সময় সে খেঁকিয়ে

ওঠে,—হু, জুরার মতে তুমি নাকি সত্যবাদী জ্ঞানবান! বাজে কথা। আগাগোড়া তুমি ঝুট বাত্‌ বলে আসছো। আমরা সবাই দোস্ত। অথচ তুমি কে, তোমার আসল নাম ও পরিচয়, এ সবই তুমি গোপন রেখেছ। কেন বলো তো? এ সম্বন্ধে আমার কি মত, জান? এক সঙ্গে আমরা কয়েদখানায় আটক রয়েছি, তাই আমরা সবাই দোস্ত। আমি ভাড়াটে দালাল হতে পারি, যে কোন লোকের সঙ্গে বেইমানিও হয়তো করতে পারি, কিন্তু দোস্তদের ক্ষতি আমি করি নে। দোস্তি খুব পবিত্র ব্যাপার।

মুচকি হেসে চাও বলে,—না সঈদ, তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। কারো সঙ্গে বসে খানাপিনা করলেই সে দোস্ত হয় না। দোস্ত সে-ই, যার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বড় কোন আদর্শের জন্যে তুমি লড়াই করছো। তোমার কি মত, জুরা?

জুরা কিন্তু চাওয়ের কথার সরাসরি জবাব দেয় না, ধীরে ধীরে বলে,—কিছুকাল আগে পর্যন্তও আমি নিজের খেয়ালখুশি মতো চলতাম, যা কিছু একলাই করতাম। নিজেকে ছাড়া আর কারো ক্ষমতার ওপর আমার আস্থা ছিল না। এটা যে কত বড় ভুল, তা আজ বুঝছি। বাসমাচিদের বিরুদ্ধে আমি একলাই লড়াই করতে গেছলাম। তার ফলে তারা আমায় বন্দী করলো। কজুবে অথবা গোরা বা মুসা আমার সঙ্গে থাকলে, ডাকাতরা সব কটাই সাবাড় হতো। কিন্তু একজনের পক্ষে এটা করা কঠিন। যাই হোক, এসব কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? এ সব আলোচনায় আজ আর কি লাভ? আজ হোক কাল হোক, এবার মরতে আমাদের হবেই।

বলতে বলতে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরায়।......

মাসের পর মাস কেটে যায়। জুরা ক্রমেই শুকিয়ে আসছে, দুর্বল হয়ে পড়ছে।

সঈদ বলে,—ও নিজের মধ্যে নিজে পুড়ছে, ওর অন্তরাত্মায় আগুন জ্বলছে। আর বড়জোর এক মাস, তার মধ্যেই সব শেষ। ওরা এখানেই ওকে কবর দেবে।

চাও সাধারণতঃ স্বল্পবাক্‌। কিন্তু এইসময় হঠাৎ দেখা গেল, সে ছাতারে পাখির মতো বাচাল হয়ে উঠেছে। ছেঁড়া কাপড়চোপড় ন্যাকড়া মাথায় জড়িয়ে জুরা দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়লেই, চাও তার পাশে গিয়ে বসে। নিজের চমকপ্রদ বিচিত্র জীবনের কাহিনী বলে চলে—বলে, কি করে সে রসুইকার হয়েছে, নাবিক হয়েছে, গোলন্দাজ হয়ে মেসিনগান চালিয়েছে, কাঁকড়া খেয়ে বেঁচে থেকেছে এবং জাহাজে মাল বোঝাই ও খালাসের কাজও করেছে।

চাওয়ের দেখাদেখি সঈদও এগিয়ে আসে। চাও থামলে সে শুরু করে নিজের রহস্যময় জীবনের কথা—কি করে সে চোরাই চালানের কারবার করেছে বা কেমন করে ভিখিরি-দলের সর্দার হয়ে পয়সা কামিয়েছে।

ফৌজের নেতা, দুঃসাহসী মরদ, সামরিক কলাকৌশল আর রক্তঝরা লড়াইয়ের কাহিনীর দিকেই জুরার স্বাভাবিক ঝোঁক। না খেয়ে না ঘুমিয়ে, সামরিক বীরত্ব আর বিজয়-অভিযানের গল্প-কাহিনীর মধ্যে সে ডুবে থাকতে পারে। এ সব গল্পের তৃষ্ণা তার অফুরন্ত।

গল্প বলতে বলতে গভীর নিশীথে চাও বা সঈদ একসময় থেমে যায়—হয় ক্লান্তিতে, না হয় কাহিনী শেষ হওয়ায়। নিস্তব্ধ চরাচর। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বাতাসের করুণ আর্তনাদ ভেসে আসে। আর জুরা চেঁচিয়ে ওঠে,—বলে যাও, বলে যাও, থেম না। দরকার হলে বানিয়ে বলো।

ধীরে ধীরে জুরার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাকে। একদিন লপ্‌সির পাত্রটা চাটতে চাটতে ছেলেমানুষের মতো সে বললে,—আঃ, আস্ত একটা ভেড়া খেয়ে ফেলতে পারি!

গর্তের এক অন্ধকার কোণে চাও বসে আছে। জুরার কথাটা কানে যেতেই, তীব্র ব্যথায় তার বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। সারাক্ষণ সে বসে রইল নির্বাক নিশ্চল। তারপর হঠাৎ একসময় ওপরের পাহারাদারের কাছে অদ্ভুত এক প্রস্তাব দিয়ে বসলো। কি করে কিছু উপরি পয়সা কামানো যায়, তারই প্রস্তাব। প্রস্তাবটা হলো, সে পাহারাদারের সঙ্গে বাজারে যেতে চায়, সেখানে সে ভিক্ষে করবে। যা মিলবে তার সিংহভাগ পাহারা-ওলা নেবে, বাকীটা তার।

তার এ প্রস্তাব যে ফালতু বাজে নয়, তা বোঝানোর জন্যে সে বললে,—একটু আধটু কবিতা আমি জানি, লোকে তা শুনলে নির্ঘাত পয়সা দেবে। শোন এই কবিতাটা :

রাত্রি তখন—গভীর নিশীথ। দক্ষিণ বাতায়নে
একলা আমি, দৃষ্টি কোথায় দূরে দিগন্ত পানে।
গাঁয়ের চোখে নিদ নেমেছে, নীরব চরাচর,
দুঃখী শুধু একটি মানুষ, ঘুম নেই চোখে তার।
পেছনে আমার জ্বলিছে চেরাগ, কম্পিত শিখা কাঁপে,
একলা আমি, অন্তরে মোর বিষাদের ঢেউ জাগে।
তুষারকণার ঝড়ের মাঝে বিলাপ শোনা যায়,
পথহারা সে বনহংসী একলা কাঁদে হায়!

কি বলছো তুমি?—জুরা জিজ্ঞেস করে।

কিরঘিজ ভাষায় চাও আবার আবৃত্তি করে :

পেছনে আমার জ্বলিছে চেরাগ, কম্পিত শিখা কাঁপে,
একলা আমি, অন্তরে মোর বিষাদের ঢেউ জাগে।
তুষারকণার ঝড়ের মাঝে বিলাপ শোনা যায়,
পথহারা সে বনহংসী একলা কাঁদে হায়!

স্তব্ধ নির্বাক জুরা। তার মনশ্চক্ষে গিরিশ্রেণী, তুষার-ঝঞ্ঝা, দলভ্রষ্ট পথহারা এক নিঃসঙ্গ পাখির ছবি ভেসে ওঠে। সাথীহারা বিপন্ন বনহংসীর জন্যে মন তার বুঝি আকুলিবিকুলি করতে থাকে। শেষে ব্যাকুল কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা, বন-হংসী কি শেষ পর্যন্ত সঙ্গীদের খুঁজে পেয়েছিল?

ওপর থেকে পাহারাওলার গলা ভেসে এল,—বেশ, ঠিক আছে। কথা রইল, আসছে কাল তোমায় নিয়ে যাব।

মহা আনন্দে সঈদের চোখমুখ ঝলকে ওঠে। তার দৃঢ় ধারণা হয়, এ অঞ্চলের চোরাই-চালানদার ও পাহারাওলাদের মধ্যে যে গোপন সঙ্কেত-শব্দ চালু আছে, চাও তা জানে। ফিসফিস করে সে বললে,—বাঃ বাঃ! সত্যি চাও, ভারী চালাক তুমি। সঙ্কেত-শব্দটা তাহলে জান দেখছি!

না।—চাও বললে : তুমি যা মনে করছো, তা আমি নই।

কিন্তু সঈদ তার কথা বিশ্বাস করতে রাজী নয়। সে যত পীড়াপীড়ি করে সঙ্কেতটা শোনার জন্যে, চাও ততই মাথা নাড়ে। বিষণ্ণ কণ্ঠে বারবার বলতে থাকে,—না সঈদ, বিশ্বাস করো, ও সব সঙ্কেত-টঙ্কেত আমি সত্যিই কিছু জানি নে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! সঈদ শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো,—

তুমি দোস্ত নও চাও, দুশমনেরও অধম! আমাদের তুমি পালাতে সাহায্য করতে পার, কিন্তু করবে না। দেখছো জুরা, দেখছো চাওয়ের কান্ডটা!

চাওয়ের কণ্ঠে আবার জাগে কবিতা। হাত তুলে সঙ্গীদকে থামিয়ে দিয়ে সে আবার শুরু করে আবৃত্তি :

বিষাদ, বিষাদ—বিষাদ সবার মনে।
দুর্ভাগা মোরা, মরণ শিয়রে কঠিন দৃষ্টি হানে॥
মরণের পরে কিবা রবে অবশেষ!
সব মুছে গেছে—কুয়াশায় ভরা দেশ।
নীলাভ কুয়াশা জাগে, ওঠে ঐ এ'কেবে'কে
ছায়া প্রান্তরের তুহিনশীতল অগ্নিকুণ্ড থেকে॥

পর দিন থেকে শুরু হলো চাওয়ের বাজারে যাওয়া। সপ্তাহে মাত্র একদিন। সশস্ত্র প্রহরায় বাজারে গিয়ে সে ভিক্ষে করে, পায় রুটির খন্ড, মাংস, মুঠো মুঠো ভাজা ভুট্টা, মাংসজড়ানো হাড়গোড় আর খুচরো পয়সা। তার বেশির ভাগ পাহারাদার পকেটস্থ করে, আর সঙ্গীদের জন্যে চাও নিয়ে আসে ভুট্টা আর হাড়গোড়॥ তার বেশির ভাগ সে দেয় জুরাকে।

এমনি করে দিন কাটে। শেষে এল হেমন্ত ঋতু।

সেদিনটা ছিল হেমন্তের এক উষ্ণ দিন। হঠাৎ সকালের দিকে কয়েকজন পাহারাদার এসে জুরাকে গর্ত থেকে টেনে তুললো। দুই হাত বে'ধে তাকে নিয়ে রওনা হলো ঘোড়ার পিঠে।

জুরার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে চাও ছটফট করে। তার অনুনয় ও কাকুতিমিনতিতে শেষ পর্যন্ত পাহারাওলারা জানিয়ে গেল, জেরা করার জন্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিপচাকবের কাছে।

সারা দিন কেটে যায়। গভীর রাতে গর্তের ওপরকার গরাদে একপাশে সরে গেল। তার পরেই জুরার অচেতন ক্ষতবিক্ষত দেহ চাও ও সঙ্গীদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে এসে পড়লো গর্তের মধ্যে। কিপচাকবে তার মুখ থেকে একটা কথাও বের করতে পারে নি। উপরন্তু তলপেটে খেয়েছে জুরার প্রচণ্ড লাথি। অসহ্য রাগে তারপর সে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে জুরার ওপর।

তৃতীয় পর্ব ২

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়। গরাদে দিয়ে বরফ পড়ে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে কয়েদীরা গর্তের দেয়াল ঘে'ষে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকে।

জুরার কথাবার্তা আরো কমে গেছে। আরো গম্ভীর, আরো খিটখিটে হয়ে উঠেছে সে। সঙ্গীদ তাকে রীতিমতো ভয় করে। রেগে গিয়ে জুরা তাকে ইতিমধ্যে মেরেছে কয়েকবার।

পিতার স্নেহ নিয়ে চাও জুরাকে ভালবেসেছে। ভালবেসেছে নিজের ছেলের মতো। জুরা তা বোঝে, তবু তার ওপরও সে রুখে ওঠে সময় সময়।

অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়ালো যে, রাগ করার শক্তিও বুঝি জুরার শেষ হয়ে আসে। আরো রোগা আরো শীর্ণ হয়ে পড়ে সে। কাশি শুরু হয়। দিনরাত চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে অসাড় নির্জীবের মতো।

আজাদির জন্যে, মুক্ত স্বাধীন জীবনের জন্যে তার মন পোড়ে, আকুলিবিকুলি করে আর অন্তরাত্মা হাহাকার করে চলে। সে তীব্র আকুলতায় সঙ্গীদও স্থির থাকতে পারে না। মারের ভয় উপেক্ষা করে জুরাকে সে বোঝায় নানা ভাবে। চাও কত সান্ত্বনা দেয়, জোর দিয়ে বলে,—মন শক্ত করো জুরা, নির্ঘাত জেনো, দিন আসবেই যখন আমরা ঘরে ফিরতে পারবো।

কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়—জুরার মন সান্ত্বনা মানে না।

জুরা কিপচাকবেকে মারার পর থেকে কয়েদীদের লপ্সির বরাদ্দ আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাওয়ের ভিক্ষায় যাওয়াও বন্ধ।

সঙ্গীদ সেদিন অনেকক্ষণ ধরে কিছু খাবারের জন্যে কাকুতিমিনতি করেছে পাহারা-ওলার কাছে। শেষ পর্যন্ত গরাদেটা একসময় সরে গেল। শোনা গেল, পাহারাদারের হেঁড়ে গলা,—এই টেরা-চোখো, কুত্তাখেকো! এই নে!

বলতে বলতে সে মরা এক কুকুর-ছানা নীচে ছুড়ে দিলে ওকে লক্ষ্য করে।

এত বড় অপমান! নিদারুণ চটে গিয়ে সঙ্গীদও বাচ্চাটার পা ধরে আবার ওপর দিকে ছুড়ে মারলে পাহারাওলাকে তাক করে। কিন্তু গরাদে ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। বাচ্চাটা সেখানে ঘা খেয়ে নীচে জুরার মাথার ওপর এসে পড়লো।

এসব দিকে জুরার এতক্ষণ ভ্রুক্ষেপ ছিল না। কিন্তু বাচ্চাটার দিকে হঠাৎ নজর পড়তেই সে লাফিয়ে উঠলো। ওটাকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সে তার দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষ চোখে। কালো বাচ্চাটার কপালে বড় এক সাদা টিপ।

দেখতে দেখতে জুরার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সঙ্গীদ আতঙ্কে পেছিয়ে যায় ঃ আর যাই হোক, জুরা শেষ পর্যন্ত মরা কুকুরের ছানা খাওয়ার মতলব করছে না তো!

বাচ্চাটাকে দোলাতে দোলাতে জুরা তখন বিড়বিড় করছে,– টীক! টীক! টীক বেঁচে আছে!

চাও ও সঙ্গীদকে বাচ্চাটার কপালের সাদা টিপটা দেখিয়ে সে বললে,—আমি হলফ করে বলছি, এটা টীকেরই ছেলে। টীক বেঁচে আছে। আর বেশী দূরেও সে নেই, এখানে কোথাও আছে।

সঙ্গীদের দিকে চোখ টিপে চাও ফিসফিস করে বললে,—ও রকম গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা আছে এখানে। কিন্তু ওর যখন বিশ্বাস হয়েছে যে এটা টীকের বাচ্চা, তখন তাই হোক। এতে ও শান্তি ও সান্ত্বনা দুই-ই পাবে।

মাথা নাড়তে নাড়তে সঙ্গীদ চেঁচিয়ে উঠলো,—আলবৎ, আলবৎ! টীক নিশ্চিত বেঁচে আছে। ভারী জোর বরাত বলতে হবে!

ওদের হৈ-হল্লা ফুর্তি কানে যেতে পাহারাদার অবাক হয়। গরাদেটা একটু সরিয়ে, কি ঘটছে দেখার চেষ্টা করে সে। সঙ্গীদও তৈরী হয়ে ছিল। মরা বাচ্চাটা সে ছুড়ে মারলে পাহারাদারকে তাক করে। ওটা গিয়ে লাগলো ঠিক তার হাঁ-করা মুখে।

তোবা! তোবা!—পাহারাওলা গোঙিয়ে উঠলো। পরক্ষণে দারুণ রাগে সে যেন ক্ষেপে যায়। কাছেই রয়েছে ভেড়ার হাড়গোড়ের এক গাদা। ওগুলো সে ছুড়তে শুরু করলো কয়েদীদের উদ্দেশ করে। হাড় শেষ হয়ে গেল, পাথরও আর হাতের কাছে নেই।

হোৎকা পাহারাওলার ঘেন্নার খেদোক্তি আর রাগ তবু যায় না। থুতু ফেলতে ফেলতে আর 'তোবা, তোবা' করতে করতে সে এবার বড় বড় কাঠের খণ্ড ছুড়তে শুরু করলো। রাতে আগুন জ্বালানোর জন্যে ওগুলো জড়ো করা ছিল।

উৎসাহ-উত্তেজনায় জুরা তখন যেন টগবগ করে ফুটছে। ভেড়ার কাঁধের একখানা হাড় আর একখণ্ড কাঠ বেছে নিয়ে সে একটা কুকুর খোদাই করতে বসে গেল। একসময় কাজ শেষ হলে সে বললে,—এই দ্যাখ, এই হলো আমার টীক!

কাজটি দেখে চাও ও সঈদের চোখে দারুণ বিস্ময় ফুটে ওঠে। চমৎকৃত তারা। ভারী সুন্দর হয়েছে কাজটি, অদ্ভুত তার কমনীয়তা!

সঈদ বাস্তববাদী, বিষয়বুদ্ধিতে পাকা। বললে,—বুঝলে জুরা, এরকম একটা কাঠের কুকুরের জন্যে তুমি অনায়াসে পাঁচ টাঙ্গা পেতে পার।

চাও সায় দেয়। বলে,—আলবৎ! এবার আমাদের সবার খোরাকের ব্যবস্থা তুমি করতে পার, জুরা। তুমি কাঠের মূর্তি খোদাই করবে, আর আমি সেগুলো বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচে আসবো।

জুরা এবার একটা শেয়াল, ভালুক আর একটা খাটাশ তৈরি করলে। পর দিন পাহারাদার বদল হতে চাও বললে, সে বাজারে যেতে চায়। পাহারাদার জানালে, ওটা আর চলবে না, ওপরওলা কড়া নজর রেখেছে।

চাও তখন মূর্তিগুলো ওপরে তার কাছে ছুড়ে দিয়ে বললে,—এগুলো বিক্রি করে যা রোজগার হবে, তা থেকে আমাদের জন্যে কিছু খাবার এন। বাকী সব তোমার।

দু দিন কেটে যায়, পাহারাওলাটার পাত্তা নেই। তিন দিনের দিন তার গলা শোনা গেল,—পুতুলগুলো বিক্রি করেছি। আচ্ছা চীজ হয়েছে। এই নাও।

ওদের দিকে সে একটা বাণ্ডিল ছুড়ে দিলে। বাণ্ডিলটা খুলতে ওরা দেখে, তাতে আছে তিনখানা বড় রুটি, তিনখণ্ড রান্না-করা মাংস আর কিছু ভাত।

সঈদ চেঁচিয়ে ওঠে,—এবার আমাদের জান বাঁচবে!

পাহারাওলা বললে,—আরো কিছু খেলনা দিও, বিক্রি করে আসবো।

মহা উৎসাহে জুরার শিল্পী মন এবার খোদাইয়ের কাজে লেগে যায়। সে তৈরি করলে বরফদেশের এক লেপার্ড বা চিতা, তার পা নাড়ানো যায়। তৈরি করলে একটা ঈগল, খুশিমতো তার মাথাটা সরিয়ে নিয়ে সেখানে মানুষের মাথা বসানো যায়। ছেলেবেলায় কাঠের ঈগল নিয়ে সে খেলেছে, কিন্তু বরফদেশের চলন্ত পা-ওলা লেপার্ড তার নিজের আবিষ্কার। এমনি করে যা সে চোখে দেখেছে, যেসব চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে তার জীবনে, সে সবই সে খোদাই করে চলে।

সেদিন অনেকগুলো পুতুল বিক্রি করে এসে পাহারাওলা বললে,—শোন হে শিকারী! তোমার সেই পুতুলটার জন্যে ভাল দাম পেয়েছি—সেই যে পুতুলটা, যাতে একটা মেয়ে দুজন শিকারীর সঙ্গে এক আগুনের কুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছো কোন্ পুতুলটার কথা বলছি? সেই যে, যাতে শিকারীদের একজন মেয়েটির বুক তাক করে বন্দুক তুলেছে, আর অন্যজন দুটো কুকুর নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এই নাও—ভাল দাম পেয়েছি বলে খাবারও আজ বেশী।

চাও জিজ্ঞেস করে,—পুতুলটা কে কিনলে?

গরাদেটা বন্ধ করতে করতে পাহারাওলা বললে,—খুপসুরৎ জয়নাব বিবি, সর্দার শো সাহেবের বেগম!

নিদারুণ চমকে উঠলো জুরা। বিহ্বল হতভম্ব সে।

চতুর্থ পর্ব ১

গুহায় জুরা ও কুচাকের ওপর যখন প্রচণ্ড নির্যাতনে চলেছে, বাসমাচিরা তখন তাগাইয়ের নেতৃত্বে বয়ে নিয়ে চলেছে জয়নাবকে। ভারী কঠিন কাজ। মেয়েটি যেমন বেপরোয়া, শক্তিও রাখে তেমনি। হুটোপুটি করছে সে ছাড়া পাবার জন্যে। সেই সঙ্গে চলেছে তার চিৎকার। ডাকাতরা হিমসিম খেয়ে যায়।

জয়নাবের কেশপাশ আলুথালু। বেশভূষা ছিন্নভিন্ন। দুই চোখ রক্তবর্ণ। পাগলিনীর মতো চেহারা।

জয়নাবের ওপর থেকে তাগাই কিন্তু চোখ ফেরাতে পারে না : হ্যাঁ, সুন্দরী বটে। সারিকলে গিয়ে এ খুবসুরতের কথা বললে কেউ বিশ্বাসই করতো না। আর সে বলতোই বা কি? এ রূপ কি বলে বোঝানো যায়! কিন্তু নিজের চোখে সবাই যখন দেখবে, তখন? হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরবে অনেকে। কিন্তু কী বিষম বদমেজাজী মেয়ে রে, বাবা!

মিষ্টি কথায় জয়নাবকে শান্ত করার জন্যে তাগাই এগিয়ে যায়। দু-একটা কথা কেবল বলেছে, হঠাৎ জয়নাব তার হাত কামড়ে ধরলো। দারুণ যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো তাগাই, তার পরেই চাবুকের বাঁট দিয়ে বিষম জোরে তার মাথায় মারলে এক ঘা।

এক পাহাড়ী নদীর পাড়ে এসে বাসমাচিরা জয়নাবকে নামালো কাঁধ থেকে। জয়নাব অচেতন। তার হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো।

একটু পরেই জ্ঞান হয় জয়নাবের। সে চোখ মেলে তাকালে। পরক্ষণে অদূরে তাগাইয়ের গলা কানে যেতেই সমস্ত ঘটনা মনে পড়লো তার। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটলো বিরাট এক পাথর-ঢিবি লক্ষ্য করে।

মুচকি হেসে তাগাই এগিয়ে যায় তার দিকে। ঢিবির পেছন থেকে জয়নাব শাসিয়ে উঠলো,—খবরদার বলছি, এগিও না!

বলতে বলতে সে একখানা পাথর ছুড়ে মারলে।

পাথরটা তাগাই এড়াতে পারলো না। বেশ জোরেই এসে পড়লো তার কাঁধের ওপর। রাগে ও যন্ত্রণায় তার চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। একখানা পাথরের ওপরে গিয়ে বসলো সে। এ অবস্থায় ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায় কি!

ঢিবির পেছন থেকে জয়নাব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। তার হাতে আর একখণ্ড পাথর। তাগাই আবার উঠে দাঁড়াতেই সে চেঁচিয়ে উঠলো,—খবরদার, এদিকে এস না বলছি! জুরার তোমরা সবচেয়ে বড় দুশমন। তার হাতে তোমরা খুন হবে।

তাগাই থমকে দাঁড়ালো। খুব যেন অবাক হয়েছে এমনি ভান করে বললে,—অ্যাঁ, কি বলছো! কে তোমায় বললে, আমি জুরার দুশমন? তরুণ শিকারী সে, খুব বড় শিকারীও বটে—সে তো আমার দোস্ত। সে যখন শিকার করছিল, সেই সময় তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। সে বললে, শোন তাগাই, জামিন হিসেবে তুমি এখন জয়নাবকে নিয়ে গিয়ে রাখ। তোমার কাছে আমরা যে সোনা ধারি, তা শোধ করার পর ওকে আমি খালাস করে আনবো। সাবধানে রেখ ওকে।

মাটিতে লাথি মেরে তীক্ষ্ন কণ্ঠে জয়নাব চেঁচিয়ে উঠলো,—ঝুট বাৎ বলছো তুমি!

ধীরে সুস্থে তাগাই একটা ব্যাগ থেকে একখানা পাঁউরুটি বের করলো। সেটাকে টুকরো টুকরো করে ভাঙতে ভাঙতে বললে,—ঝুট বাৎ যদি বলে থাকি, তাহলে আমার বরাতে যেন এই রুটিও আর না জোটে, আর আসমানের বাজ যেন আমার মাথায় ভেঙে পড়ে।

আতঙ্কিত বিস্ফারিত চোখে জয়নাব কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। এ রকম ভয়ঙ্কর শপথে বিশ্বাস করার শিক্ষা সে পেয়ে এসেছে সারা জীবন ধরে। লোকটা তাগাই হলেও তা অবিশ্বাস করে কি করে? তার হাত থেকে পাথরখানা খসে পড়লো। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লো সে।

দ্রুত পায়ে তাগাই এগিয়ে গেল তার কাছে। তাকে নিয়ে এল পর্বত-ঢালুতে, ঘোড়াগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে নজর পড়তেই জয়নাবের যেন হুঁশ ফিরে আসে। সে রুখে দাঁড়ায়। ধস্তাধস্তি করতে করতে আবার সে একসময় তাগাইয়ের বাঁ হাতটা কামড়ে দিলে।

কাঁহাতক আর সহ্য হয়! বিষম রাগে দিব্যি কাটতে কাটতে তাগাই তার পিঠে বসিয়ে দিলে এক ঘা চাবুক।

আঘাতটা এত প্রচণ্ড ও আকস্মিক যে, কাঁপতে কাঁপতে জয়নাব বসে পড়লো।

চাবুক উঁচিয়ে ক্ষিপ্ত তাগাই গর্জন করে উঠলো,—ওঠ্, এগো বলছি!

জয়নাবকে নিয়ে তাগাই চলেছে পুবমুখো। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন—তাদের চলার বিরাম নেই। কত আকাশছোঁয়া তুষারমৌলী পর্বতশ্রেণী, কত দুর্লঙ্ঘ্য চড়াই-উৎরাই, কত অতলস্পর্শী খাদ ও বন্ধুর গিরিখাত তারা পার হলো, পেছনে ফেলে এল কত দুরন্ত খরস্রোতা নদ-নদী। তবু চলার যেন শেষ নেই।

দুর্গম পর্বতরাজ্য এই পামীরেরই মেয়ে জয়নাব। তবু চলার পথের এই সব চিরন্তন বরফে ঢাকা স্তব্ধমৌন মহাগিরিশ্রেণী আর ভয়ংকর চড়াই-উৎরাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে বিস্ময়ে তার বুকের স্পন্দন যেন থেমে আসতে চায়। সামনের মহাপর্বতটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, ওটাই বুঝি দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু পর্বত। কিন্তু ওটা পার হতেই দেখে আর একটা, তারপরেই আবার আর একটা—প্রত্যেকটাই আগেরটার চেয়ে অনেক-অনেক উঁচু।

এমনি করে কত দিন কেটে যায়, জয়নাবের হিসেব নেই। তার মনে হয়, চিরকাল ধরে সে যেন চলেছে, আর দুনিয়ার শেষ কিনারায় ফেলে এসেছে মধুর স্মৃতিবিজড়িত তার প্রিয় জন্মভূমি মিন-আরখার গ্রাম আর জুরাকে আর স্বপ্নের আনন্দে ঘেরা সেই পর্বত-গুহাকে।

কয়েকবার সে পালানোর মতলব করেছিল। কিন্তু কোথায় কিভাবে পালাবে? চারদিকে শুধু পর্বত আর পর্বত, চড়াই-উৎরাই আর খাত আর ফেনিল নদ-নদী—কোথায় কোন্ দিকে গেছে তার গাঁয়ে ফেরার পথ! বিভ্রান্ত দিশেহারা জয়নাব। তাছাড়া বাসমাচিদের সতর্ক দৃষ্টি তাকে ঘিরে আছে সবসময়। সে দৃষ্টি এড়িয়ে সে পালাবেই বা কি করে? অসহায় জয়নাব কাঁদে ঃ আর কোন দিনই সে বুঝি ফিরতে পারবে না সুখস্বপ্নে ভরা আনন্দময় তার পুরনো জীবনে! জুরা এখন কোথায়? এমনি করেই কি চিরকালের মতো সে তার কাছে মধুর স্মৃতি হয়ে গেল? জয়নাবের চোখের জল শুকোয় না। ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয় সে নিজেকে।

চতুর্থ পর্ব ২

শেষ পর্যন্ত পথের বিরতি ঘটে এক সময়। জয়নাবকে নিয়ে তাগাই সারিকলে পৌঁছলো।

ইতিমধ্যে জয়নাব মনস্থির করে ফেলেছে। বাকী যে কয় দিন সে বাঁচবে, চলবে নিজের মতো। তাগাইয়ের মতো নরপিশাচের কোন কথাই সে বিশ্বাস করবে না, তার কথামতোও চলবে না।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সে চারদিককার পরিবেশ লক্ষ্য করে। চোখে ভ্রূকুটি। সর্বত্রই চোখে পড়ছে কাঁটা ঝোপে ভরা নিরানন্দ বেলেপাথরের পাহাড়ের সারি।

ধনীর ঘরে বাস করতে পেরে জয়নাব যে খুশী হবে, সে সম্পর্কে তাগাইয়ের কোন সন্দেহই নেই। কয়েক দিন হয়তো বেয়াড়াপনা করবে, হা-হুতাশ করবে দেশের জন্যে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। তখনই সে ওকে তিন-নম্বর বিবি হিসেবে গ্রহণ করবে। এখন ওকে সে আমলই দেবে না। নিজের খুশিমতো ও চলুক, খাপ খাইয়ে নিক নতুন অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে।

ধুলোভরা চওড়া রাস্তা চলে গেছে গাঁয়ের দিকে। পথ দিয়ে চলেছে গরুর পাল। বাতাসে দুধের মিষ্টি গন্ধ। উট ও গাধার পিঠে চলেছে নানা জাতের মানুষ—দুঙ্গান, উজবেক, কিরঘিজ। এত সব জন্তু-জানোয়ার আর এত জাতের লোক জয়নাব দেখেনি কখনো। বিস্ময়ে সে চেঁচিয়ে উঠছে বারে বারে।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে লোকে তাগাইকে আদাব জানায় আর মুগ্ধ চোখে তাকায় জয়নাবের দিকে। সরবে তার রূপের তারিফ করে। তাগাইয়ের এটা বরদাস্ত হয় না। তাই বারবার তাকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানতে হচ্ছে লোকজনের ওপর।

গ্রামের শেষে নদীর ধারে মাঠের মধ্যে বেশ কিছু তাঁবু। বড় সাদা একটা তাঁবুর সামনে এসে তাগাই ঘোড়ার লাগাম কষলো।

সঙ্গে সঙ্গে আদাব জানাতে জানাতে ছুটে এল বাসমাচিরা। কেউ তার ঘোড়ার লাগাম ধরে, কেউ ধরে পায়ের রেকাব। কিন্তু সবারই মুগ্ধ দৃষ্টি জয়নাবের ওপর। তাগাই বিব্রত বোধ করে। ঘোড়া থেকে নামতে নামতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে হুকুম করলে,—একটা বোরখা নিয়ে এস।

হাঁফাতে হাঁফাতে এক বুড়ো বাসমাচি একটা বোরখা নিয়ে এল তার বৌয়ের কাছ থেকে।

বোরখাটা জয়নাবের হাতে দিয়ে তাগাই বললে,—বোরখাটা পরে নাও। মুসলমান জেনানার পক্ষে পুরুষের কাছে মুখ দেখানো বেআদবি। এখানে কোরআন মানা হয়।

রাস্তার ধুলোয় বোরখাটা ছুড়ে ফেলে জয়নাব ফুঁসে উঠলো,—না, পরবো না কিছুতেই। কক্খনো না।

পরে নাও বলছি!—তাগাই গর্জে ওঠে ঃ নয়তো সবাই তোমায় বেলেল্লা ভাববে।

—কক্ষনো পরবো না। আমি কিরঘিজ মেয়ে। বোরখা আমার মা পরেনি, দিদিমা পরেনি, দিদিমার মাও পরেনি। ওটা আমি কিছুতেই পরবো না।

দাঁতে-দাঁত পিষে তাগাই অনুচরদের হুকুম দিলে,—বোরখাটা আমার হাতে দাও। আর ওকে নিয়ে এস এদিকে।

বাসমাচিরা জয়নাবকে ঘোড়া থেকে টেনে নামালে। তার দুই হাত চেপে ধরে নিয়ে এল সর্দারের কাছে।

জয়নাবের মাথার ওপর দিয়ে ধুলোমাখা বোরখাটা তাগাই চাপিয়ে দিলে জোর করে। তারপর তার হুকুমে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো উচ্চপদস্থ বাসমাচিদের বিবিদের তাঁবুতে।

তাগাইয়ের মেজাজ বিগড়ে গেছে। এমন মেয়ে সে জীবনে দেখেনি—যেমন বেহায়া দজ্জাল, তেমনি একগুঁয়ে। অপরিচিতদের সামনে তার কথার জবাব দিতে ওর বাধে না, তাকে অমান্য করতেও পিছ্‌পা নয়!

মানী মাতব্বর বাসমাচি বিবিদের তাঁবু। ভেতরে তাঁবুর পরদার দেয়াল ঘিরে বেশ কিছু স্ত্রীলোক গম্ভীর মুখে বসে আছে। জয়নাবের রূপ দেখে তারা চমকে গেছে। মনে মনে তারা তাগাইয়ের চোখের তারিফ করে।

জয়নাবের সামনে গালিচা বিছিয়ে নানারকম সুস্বাদু খানা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবেশন করছে বাসমাচি সেনাপতি আজিমের বিবি। 'এটা খাও' 'ওটা খাও' বলছে বারবার।

ঈর্ষায় জ্বলছে মেয়েরা। জয়নাবের চেহারায় ও চালচলনে খুঁত ধরতে সবাই ব্যস্ত। তাদের কথাবার্তা ও মন্তব্য সবই চলছে ফিসফিসিয়ে—কিন্তু এমনভাবে, যেন জয়নাব শুনতে পায়।

প্রথম দিকে জয়নাব ওসবে আমল দেয় নি, বরং সংকোচ বোধ করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর চুপ করে থাকতে পারলো না, যখন শুনলো একজন মেয়েছেলে বলছে,—ওর আরো একজন মরদ আছে, কোথাকার কে এক শিকারী সে!

লজ্জায় ও রাগে জয়নাবের চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। রেগে গেলে সে কাউকেই পরোয়া করে না—এমন কি বুড়ো সর্দার ইস্কান্দারকেও নয়! ঝাঁঝালো কণ্ঠে সে বললে,—আমার শাদি হয়ে গেছে। পর্বত-মুল্লুকের সবচেয়ে বড় শিকারী জুরা আমার স্বামী। মাত্র কিছু দিনের জন্যে আমি এখানে এসেছি—তাগাই আমার কেউ নয়।

মেয়েরা প্রথমে হকচকিয়ে যায়। তারপরেই শুরু হয় জয়নাবের সঙ্গে তাদের তর্কা-তর্কি, কথা-কাটাকাটি। আজিমের বৌও যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। তারা প্রমাণ করতে চায়, ধনে মানে সাহসে বীরত্বে বাসমাচি-দলপতি তাগাই সর্দার জুরার তুলনায় অনেক বড়, অনেক উঁচুদরের লোক!

তাগাইয়ের গুণপনা শুনতে শুনতে জয়নাব যেন ক্ষেপে যায়, তীব্র তিক্ত কণ্ঠে বলে,—ছোঃ! জুরার যে ধনদৌলত আছে, তাগাইয়ের তার একশো ভাগের একভাগও নেই। যত্তো সব বাজে কথা!

বলতে বলতে সে জামার আস্তিন গুটিয়ে ফেললে, যাতে সোনার যে জড়োয়া ব্রেসলেট দুটো সে হাতে পরেছে, তা সবাই দেখতে পায়। একটায় লাল পাথর, অন্যটায় সবুজ পাথর বসানো ঝলোমলো ব্রেসলেট দুটো দেখে মেয়েদের চোখ ছানাবড়া।

জয়নাব সমানে বলে চলে,—হুঁ, তাগাই আবার জোয়ান! জুরা তার চেয়ে অনেক বেশী জোয়ান। সাহসে বীরত্বে তাগাই তার কাছে নেহাৎ বাচ্চা। আর বন্দুকের টিপ! জুরা উড়ন্ত উলার মারতে পারে।

মেয়েরা নির্বাক হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত নাচার কণ্ঠে আজিমের বৌ বললে,—কিন্তু

তাগাই সর্দার একজন খাঁটী মুসলমান দীনদার। সবাই তাঁকে কি রকম খাতির করে, তসলিম জানায়, দেখনি?

জয়নাব ফুঁসে উঠলো,—ছোঃ, দীনদার! দীনদার না ছাই! বোরখা আমি কক্ষনো পরবো না। ঘোড়ার লেজের চুল দিয়ে তৈরী হয়েছে ও জালটা। আমাদের ধর্মে কোথাও ওই বোরখা পরার হুকুম নেই।

তর্কে না পেরে রুষ্ট হতভম্ব মেয়ের দল হুড়মুড় করে ঝটিতি তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

পর দিন সকালে বিরক্ত কণ্ঠে কিপচাকবে তাগাইকে বললেন,—বিখ্যাত দলপতি শো আপনি, আর আপনিই কিনা নিজের বিবিকে বাগে রাখতে পারেন না! একজন আওরৎ আপনার ইজ্জৎ নষ্ট করছে!

সমস্ত ঘটনা শুনে দুঃসহ রাগে তাগাই আগুন হয়ে উঠলো। ঘোড়ায় চড়ে সে ছুটলো জয়নাব যে তাঁবুতে আছে।

একটা বেলেল্লা ছুঁড়ি কিনা আমার ইজ্জৎ নষ্ট করছে!—চেঁচাতে চেঁচাতে সে তাঁবুতে ঢুকলো। আগুনের পাশে জয়নাব বসে আছে। তার দিকে চাবুক উঁচিয়ে তাগাই গর্জে উঠলো,—বজ্জাত দজ্জাল, তোর জন্যে আজ আমার বেইজ্জতি ও শরমের শেষ নেই! তোর এতই কেরদানি যে বলতে পারিস, জুরা আমার চেয়ে পয়সাওলা আর জোয়ান! বল্, বলেছিস কিনা?

তাগাইয়ের রাগ দেখে জয়নাব হকচকিয়ে গেছে। কোন জবাব দেয় না।

তার কাঁধে আস্তে চাবুকের ঘা মেরে তাগাই আবার চেঁচিয়ে উঠলো,—আমার বাঁদী তুই! কোন জুরাই আসছে না এখানে, বুঝতে পারছিস! আমার লোকেরা তাকে কুত্তার মতো গুলি করে মেরেছে, তার সব সোনা লোপাট করেছে। আমাকে খুশী কর্, তাহলে আমার বিবিদের একজন হতে পারবি। নইলে তোকে আমি বাঁদী করবো, বুঝলি?

ভয়ানক চমকে উঠলো জয়নাব ঃ ও বলে কি!

সোজা সে তাকালো তাগাইয়ের চোখের দিকে, বিহ্বল কণ্ঠে বললে,—কিন্তু রুটি নিয়ে তুমি যে কসম খেয়েছিলে, সেটা কি?

একখানা পাঁউরুটি নিয়ে তাগাই আবার সেটা টুকরো টুকরো করে ভাঙতে ভাঙতে বললে,—আমার লোকেরা যদি জুরাকে খতম না করে থাকে এবং তার সমস্ত সোনা লোপাট না করে থাকে, তাহলে আসমানের বাজ যেন আমার মাথায় পড়ে! এখন থেকে তুই আমার বাঁদী, বুঝলি?

মুহূর্তে তপ্ত রক্তের স্রোত যেন জয়নাবের মাথায় উঠে যায়, মাথা ঘুরে ওঠে। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে সে পিছু হটতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাঁবুর দেয়ালে এসে তার পিঠ ঠেকলো। তাগাইও পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। তার কাঁধে হাত রাখলো।

দুনিয়া টলছে জয়নাবের চোখের সামনে। হঠাৎ আগাইয়ের বেল্টে ঝোলানো ছোরার বাঁটে তার হাত ঠেকলো। দারুণ ঘৃণা, আক্রোশ আর হতাশায় সে ঝটকা মেরে ছোরাটা টেনে নিয়েই মারলো তাগাইয়ের বুক লক্ষ্য করে। চোখের পলকে সরে গেল তাগাই। আর মুহূর্ত দেরি হলে সে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু একেবারে অক্ষত অবস্থায় রেহাই পেল না। ছোরাটা গিয়ে বিঁধলো তার কাঁধের কাছে বাঁ বাহুতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো।

ছিটকে পেছিয়ে গেল তাগাই। দুরন্ত রাগে ও যন্ত্রণায় তার মাথায় বুঝি খুন চেপে যায়। শুরু হয় মার। দাঁতে দাঁত চেপে বেধড়ক সে চাবকে চললো জয়নাবকে—নির্মম অমানুষিক।

জয়নাবের মুখে কিন্তু টুঁ শব্দ নেই। তার চোখে দুনিয়ার আলো নিভে গেছে। কাঁপছে সে থরথর করে। শেষ পর্যন্ত সে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তার অচেতন দেহ।

ক্ষতস্থানটা হাত দিয়ে চেপে ধরে টলতে টলতে বেরিয়ে গেল তাগাই।

চতুর্থ পর্ব ৩

শীত আসছে। পর্বতশ্রেণী থেকে তুষারের পুরু আস্তরণ দিনের পর দিন নেমে আসছে নীচের দিকে।

তাগাইয়ের বড় সাদা তাঁবুটা ও বাসমাচিদের তাঁবুগুলো ছাড়া বিস্তীর্ণ পশু-চারণভূমি বা মাঠটা ফাঁকা। পশুর পাল নিয়ে তাদের মালিকেরা তাঁবু গুটিয়ে গাঁয়ে ফিরে গেছে।

ওপরওয়ালা যে ব্যক্তিটির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র, রসদ আর টাকাপয়সা আসে, তারই গোপন নির্দেশে চলে সব অভিযান। তার সর্বশেষ নির্দেশমতো তাগাইয়ের হুকুমে বাসমাচিদের কাপ্তেন আজিম একশো ডাকাতের এক দল নিয়ে দক্ষিণমুখো রওনা হয়ে গেছে। বাসমাচি-কাপ্তেন আজিম বয়সে বুড়ো আর চেহারায় হাড্ডিসার হলে কি হয়, স্বভাবে মূর্তিমান শয়তান। মারকান-সু পার হয়ে সে কিজিল-আর্ট যাবে। সেখান থেকে হানা দেবে ফেরগানা উপত্যকায়। ওপর থেকে নির্দেশ গেছে কজিৎজ্কির কাছেও—মিঃ কজিৎজ্কি 5, XI. সর্দার শো-কে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে...N.B. 123.

তাগাইকে ছুরি মারার পর থেকে, আজিমের স্ত্রী ও অন্যান্যদের নজরবন্দী জয়নাব। তার ওপর কড়া শাসন—বিনা হুকুমে তাঁবুর বাইরে যাওয়া চলবে না।

সেদিন কেউ কোথাও নেই, জয়নাব ধীর পায়ে কেবল বেরিয়েছে তাঁবু থেকে, হঠাৎ ছোট একটা ছেলে তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল আরো কিছু ছেলে, ঘিরে দাঁড়ালো জয়নাবকে।

আজিমের বিবিও ছুটে এল, জয়নাবের হাত চেপে ধরে বললে,—বড্ড বেয়াড়া তো! পই পই করে তোমায় বলেছি, কোথাও যাবে না, চুপচাপ বসে থাকবে। তোমার সাহেবের বিবিজানদের বাঁদী সমরু বুড়ি আজ বা কালের মধ্যে এসে যাবে, তার হাতে তোমায় সঁপে দেবার পর আমার দায়িত্ব শেষ। তারপর যা দিল্ চায়, করো।

কিন্তু তার কথায় জয়নাবের তখন কান নেই। সে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, তাঁবুগুলোর পাশ দিয়ে ধীর কদমে এগিয়ে চলেছে এক ঘোড়সওয়ার বাসমাচি। নাকের দিকে নজর পড়তেই জয়নাব চিনতে পারে তাকে। সে আর কেউ নয়—খাঁদা।

আজিমের বিবি বাধা দেবার আগেই সে ছুটে গিয়ে খাঁদার পায়ের রেকাব ধরে ফেললো। ঘোড়ার পাশে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলো,—জুরা! জুরা কোথায়? তোমরা কি তাকে খুন করেছ?

ক্ষণেকের জন্যে ধাঁধা হকচকিয়ে যায়, পরক্ষণে রাইফেলের বাঁটে চাপড় মারতে মারতে দম্ভের সঙ্গে বললে,—আমার হাতে রাইফেলের তাক কখনো ফসকায় না। আরে, তাগাই সর্দারের নেকনজর যখন পেয়েছ, তখন হাবাগোবা এক পুঁচকে ছোঁড়ার জন্যে এত মাথাব্যথা কেন? ছোঃ!

বলতে বলতে সে ঘোড়ায় চাবুক মারলে। টাল সামলাতে না পেরে জয়নাব পড়ে গেল মাটিতে। আজিমের বিবি যখন তাকে টানতে টানতে নিয়ে চললো তাঁবুতে, জয়নাবের চোখের জলে দুনিয়া তখন ঝাপ্সা। বিনা বাধায় আচ্ছন্নের মতো সে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলো।

সন্ধ্যার দিকে সমরু এসে পৌঁছোয়। আজিমের বিবি ও অন্যদের কাছে সে শোনে সব কথা। কঠিন কণ্ঠে তাগাই তাকে বললে,—বেয়াড়া দজ্জাল ছুঁড়ীটা যত দিন ঠিক পথে না আসবে, তত দিন আমার দুই বিবির খিদমৎ করবে সে, তাদের ফাইফরমাশ খাটবে। কোনরকম আস্কারা দিবি নে।

বদমেজাজী ঝগড়াটে বুড়ি সমরু। চেহারা কুৎসিত। শণের নুড়োর মতো সাদা উস্কোখুস্কো চুলের বোঝা মাথার ওপরে, কপালের সামনে, কানের দুপাশে ও পেছনে ঘাড়ের ওপর ছড়িয়ে আছে। সারা মুখে বসন্তের দাগ আর সর্বাঙ্গে ছোট ছোট শক্ত খাড়া লোম। চুল্লি থেকে একখানা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে সে চললো জয়নাবের কাছে, তার সঙ্গে জান-পহ্চান করতে।

তাঁবুর এক অন্ধকার কোণে জয়নাব বসে আছে। চোখেমুখে ভবিষ্যৎহীন বোবা নিরুপায় কান্না যেন জমাট বেঁধে আছে। ঘোলাটে নিষ্প্রভ চোখে সে তাকিয়ে আছে অদূরবর্তী আগুনের শিখার দিকে। আজ সে নিঃসংশয়ে বুঝেছে, জুরা বেঁচে নেই, দুনিয়া ছেড়ে গেছে চিরকালের মতো।

জ্বলন্ত কাঠটা জয়নাবের মুখের ওপর তুলে ধরতেই ভয়ানক চমকে উঠলো সমরু। আগুনের শিখায় জয়নাবের ডাগর কালো দুই চোখ, অপূর্ব ভ্রূজোড়া ও সারা দেহ আলোকিত হয়ে উঠেছে।

সমরু চোখ ফেরাতে পারে না। এ পর্যন্ত সে যা শুনেছে, তাতে তার ধারণা হয়েছিল, জয়নাব হলো জংলী বুনো বেপরোয়া ধরনের এক জানোয়ার, মরদদেরও যে ছোরা মারতে পারে এবং মারেও।

কিন্তু তার বদলে এ কী! তার সামনে বসে আছে ভীরু লাজুক প্রকৃতির অল্প বয়সী এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। মুগ্ধ সমরুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে,—আঃ, এ যে পরী! আজ পর্যন্ত এত রূপ তো চোখে পড়ে নি! সত্যিই পরী! মেঘের ওধারের পর্বত-মুলুক থেকে সর্দার যে একে ধরে এনেছে, এখন বুঝছি তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

পর দিন সকালে জয়নাবকে নিয়ে সমরু রওনা হলো। সঙ্গে দুজন সশস্ত্র বাস-মাচি। বেশ কিছু দূরে সারিকলের বিজন পর্বত-এলাকার মধ্যে এক শহর। সেই শহরে তাগাইয়ের বাড়ি। ওদের গন্তব্য স্থল সেখানে।

ঘুমের ভেতর দিয়ে যেন চলেছে জয়নাব। আচ্ছন্নের মতো সমরুর প্রতিটি হুকুম সে নীরবে তামিল করে চলেছে। বিনা প্রতিবাদে সে বোরখা পরলো, ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চললো সমরুর সঙ্গে। কোন দিকে নজর নেই।

তারা চলেছে তো চলেইছে। জয়নাবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে সমরুর চেষ্টার ত্রুটি নেই। কে সে, কোথা থেকে এসেছে, কি করে এল—সে জানতে চায়। কিন্তু জয়নাব নির্বাক—মুখে তার কথা নেই।

সেদিন আর শহরে পেঁছনো গেল না। রাত্রে তারা থামলে এক সরাইখানায়। নির্বাক জয়নাবের একগুঁয়েমিতে সমরুর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। আর সহ্য হলো না। মুখ ভেংচে সে বললে,—ইস্, রূপের কি দেমাক! অত দেমাক ভাল নয়। পারেছে তো দুটো নকল ব্রেসলেট, তার গুমরে মাটিতে যেন পা পড়ছে না!

সমরুর এই রাগ দেখে জয়নাব হকচকিয়ে যায়। তারপর বাঁ হাতের ব্রেসলেটটা খুলে নিয়ে সমরুর হাতে দিতে দিতে বিষন্ন করুণ কণ্ঠে সে বললে,—এটা তুমি নাও। আমার ওপর গোসা করো না।

বড় প্রিয় ব্রেসলেট জয়নাবের। জুরা ভারী ভালবাসতো তার এই ব্রেসলেট-পরা হাত। আজ আর ওতে কি দরকার!

ব্রেসলেটটা ভালভাবে পরীক্ষা করতে করতে খুশিতে সমরু যেন উপচে পড়ে,—অ্যাঁ, এ যে খাঁটী সোনা!

হাড্ডিসার হাত দিয়ে জয়নাবের পিঠে চাপড় মারতে মারতে সে বললে,—এই তো চাই! সত্যিকার ভাল মেয়ের মতো কথা বলছো এখন। সমরুর সঙ্গে দোস্তি থাকলে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বদ লোকেরা বলে, জিনদের সঙ্গে নাকি আমার খুব দোস্তি, আমি নাকি নানা তুকতাক ও জাদু জানি।

অমন দুর্লভ ব্রেসলেটটা পেয়ে আর জয়নাব কথা বলেছে দেখে ততক্ষণে সমরুর দিল্ খুলে গেছে। আগুনের ধারে বসে তাগাইয়ের দুই বৌ সম্পর্কে নানা মজার মজার কাহিনী সে বলতে শুরু করে।

বলে,—তাগাইয়ের পয়লা বিবি এসেছে ভারতবর্ষ থেকে। ইয়া মোটা, চর্বির আড়ৎ যেন। খাঁদানাকী এক খুদে মোটা কুকুরকে নিয়েই তার যত মাথাব্যথা। ওটাকে নিয়ে সে ঘুমোয় পর্যন্ত। তার নাকডাকার ফোঁসফোঁসানি যদি শুনতে...হা-হা-হা...

হাসি থামলে আবার সে শুরু করে,—সারাক্ষণ ও খায় আর ঘুমোয়। যখন ঘুমোয় না, বসে বসে শাপ-শাপান্ত করে। ওরই দৌলতে বাড়িতে নতুন ধরনের আদবকায়দা চালু হয়েছে, আমাদের কিরঘিজ আদবকায়দা থেকে তা একদম আলাদা। আমরা ওর নাম রেখেছি 'শুয়োরী'। তুমি কিরঘিজ তো?

জয়নাব মাথা নাড়ে: হ্যাঁ।

—ব্যাস, ভাল হলো, খুব ভাল! যাক, শোন তারপর। সর্দার এর পর আনলো দোসরা বিবি—উজবেক মেয়ে। ওর নাম আমরা রেখেছি 'খুদে সাপ'। ও আসার পর থেকেই শুরু হলো তুলকালাম। ওদের দুজনের ঝগড়া, চেঁচামেচি আর দাপাদাপিতে বাড়ির ভিতসুদ্ধ কাঁপতে লাগলো। কিন্তু দু বছর আগে সর্দার যখন অল্পবয়সী এক চীনা মেয়েকে ধরে আনলো, ওরা দুটোয় তখন আপসরফা করে ফেললে। চললো সলাপরামর্শ। তারপর তিন দিনের দিন ওরা তাকে বিষ খাইয়ে মারলে। বুঝলে জয়নাব, পরীর মতো রূপ তোমার, হুঁশিয়ার থেক খুব। আমি নিজে কিরঘিজ, তুমিও তাই। তোমায় ওরা বিষ খাইয়ে মারলে বা পিন দিয়ে খুঁচিয়ে তোমার চোখের ডেলা বের করে দিলে আফসোসের অন্ত থাকবে না।

করুক গিয়ে!—নির্জীব নির্লিপ্ত কণ্ঠে জয়নাব বললে: আমার কাছে সবই সমান।

কি বলছো তুমি?—চোখ কপালে তুলে সমরু বললে: পাগল হয়েছ নাকি?

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। ধীরে ধীরে জয়নাব যেন আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে ওঠে কিছুটা—অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে তো বটেই। ক্ষীণ কণ্ঠে সে এবার বলতে শুরু করে নিজের কথা। বলে চলে তার অতীত জীবন আর জুরার সঙ্গে সম্পর্কের কাহিনী।

সমরু অবাক। ব্রেসলেটটা বাহুতে নাড়াচাড়া করতে করতে জয়নাবের কথায় 'ওঃ! আঃ!' করে শুধু সায় দিয়ে যায়, কোন মন্তব্য করে না।

শেষে সে বললে,—কিন্তু একটা কথা শুনে রাখ। তাগাইকে তুমি চেন না। এমনি-ভাবে চললে সে তোমার চোখের রঙ পর্যন্ত পাল্‌টে দেবে।

কথা বলতে বলতে ভোর হয়ে যায়। নীরবে চোখের জল ফেলে জয়নাব। বিরাট দুনিয়ায় সে একলা অসহায়। কোথাও একবিন্দু আলো চোখে পড়ে না।

তাগাইয়ের বাড়ি। তার দুই বেগমের বাঁদীগিরিতে বহাল হয়েছে জয়নাব। ফাই-ফরমাশের অন্ত নেই। তেমনি দুর্বাক্য, গালাগালি, এমনি কি শারীরিক নির্যাতনেরও বুঝি শেষ নেই। কিন্তু জয়নাব নির্বিকার। মন তার অবসন্ন বিকল। চারদিকে কি ঘটছে না ঘটছে, সেদিকে খেয়াল নেই, আগ্রহও নেই।

সেদিন তাগাই বাড়ি আসবে। শুয়োরী আর খুদে সাপের ভারী ফুর্তি।

শুয়োরীর চিৎকার শোনা গেল,—এই, গরম জল কোথায়? গরম জল দিয়ে কুকুর-টাকে ঠিকমতো সাফ করবি, কত বার বলতে হয় এ কথা?

চুল্লির ওপর কেটলিতে গরম জল ফুটছে। সমরু সেদিকে এগিয়ে যেতেই, নিজের কামরার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল শুয়োরী, চেঁচিয়ে উঠলো,—তুই না, তুই না! ঐ নচ্ছার বেলেল্লা বেটিকে বল্‌ নিয়ে আসতে। ও কি আয়েস করছে নাকি?

ফুটন্ত জল নিয়ে জয়নাব শুয়োরীর ঘরে ঢুকলো। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই ভেসে এল তার অসহায় কণ্ঠের আর্তনাদ ঃ ও-হো-হো! আমার পা! উঃ আমার পা!

সমরু দৌড়ে ঘরে ঢুকলো। ধোঁয়ায় ঘর ভরতি। মেঝেয় বসে আছে জয়নাব। মুখ ফ্যাকাসে। যন্ত্রণায় কাঁপছে সে থরথর করে। খালি নগ্ন পা দুটো চেপে ধরে আছে দু হাত দিয়ে। কাছেই পড়ে আছে কেটলিটা।

সমরুর বুঝতে কিছু বাকি থাকে না।

শুয়োরী চেঁচাচ্ছে,—নিজেকেই ও নিজে ছেঁকা দিয়েছে। আমাকেও তুই ছেঁকা দিতি। আমার বাঁদীগিরি কিভাবে করতে হয় শিখে নে।

বলতে বলতে একটা পিন নিয়ে সে জয়নাবের বুকে খোঁচা মারতে থাকে। রক্ত বেরিয়ে আসে।

খুদে সাপ এগিয়ে আসে। পাতলা রোগাটে তার গড়ন, গায়ের রঙ ময়লা, বিদ্বেষে ভরা দুই চোখ। পায়ের চটি দিয়ে জয়নাবকে মারতে মারতে সে চেঁচাতে থাকে,—গেণ্ডাস নে, ময়লামুখী! বাবুর্চিখানায় থাক গিয়ে দজ্জাল হারামজাদী!

জয়নাবের দুই বাহু ধরে সমরু তাকে নিয়ে যায় বাবুর্চিখানায়। পেছন পেছন তর্জন করতে করতে আসে শুয়োরী ও খুদে সাপ।

ঠিক সেই সময় তাগাই এসে হাজির। কি ঘটেছে, সে দেখেই বুঝতে পারে। বাবুর্চিখানা [illegible]কে শুয়োরী ও খুদে সাপকে তাড়িয়ে দিয়ে জয়নাবের পাশে গিয়ে সে বসে পড়ল[illegible] অসহ্য যন্ত্রণায় জয়নাব কাতরাচ্ছে। সারা পায়ে ফোস্কা।

তাগাই [illegible]লে, -দেখতে পাচ্ছ, বাঁদী হওয়া কত খারাপ! আমার বেগম হও, ঝগড়াটে ঐ ছু[illegible]রা তোমার পা চাটবে। কি বলো, রাজী আছ?

ম[illegible]তে নাড়তে জয়নাব হঠাৎ তাগাইয়ের গালে জোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলে। [illegible] খাবি খেয়ে উঠলো। আর রক্ষে নেই! আর রক্ষে নেই জয়নাবের! দারুণ ভ[illegible] উপুড় হয়ে পড়লো সে।

[illegible]জব ব্যাপার! ব্যাপারটা মোটেই সে রকম কিছু ঘটলো না। তাগাই

হঠাৎ হেসে উঠলো হা-হা করে। তীক্ষ্ন নীরস হাসি। বললে,—বাঁদীই থাকবি তুই। চোখের জলের স্বাদ কি রকম, তোকে ভাল করে টের পেতে হবে। তার পরেই তুই পথে আসবি, পোষ মানবি। এখন থেকে সবচেয়ে কঠিন আর নোংরা কাজ তোকে দিয়ে করানো হবে, বুঝলি?

তাগাই চলে গেলে সমরু কড়া চায়ের জল দিয়ে জয়নাবের পা ধুয়ে তেলের মালিশ লাগিয়ে দিলে। বললে,—সবুর করো। দিন এভাবে যাবে না। কিন্তু তুমিই বা এরকম বেয়াড়া একগুঁয়ে কেন!

চতুর্থ পর্ব 8

জয়নাবের পা সেরে গেছে। কিন্তু কোথায় সেই জয়নাব—সেই চঞ্চলা, আবেগময়ী, স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে উচ্ছলা জয়নাব! তার জায়গায় আজ যে মেয়েটি, চোখের জল তার শুকোয় না, নির্জীব নিষ্প্রভ তার চোখের দৃষ্টি।

তাগাইয়ের বৌয়েরা কোন হুকুম দিলেই সে উঠে পড়ে, আস্তে আস্তে চলতে থাকে যেন ঘুমের ভেতর দিয়ে হাঁটছে। যত নোংরা কাজ তাকেই করতে হয়।

অত্যাচার-নির্যাতন চলেছে সমানে। শুয়োরী আর খুদে সাপ পালা করে তাকে পিন দিয়ে খুঁচিয়ে তামাসা করে। কিন্তু সে তামাসা রক্ত ঝরায়, জয়নাবের জামায় শুকনো রক্তের দাগ রেখে যায়। তবু তারা ওর মুখ থেকে গালমন্দ বা নালিশ, এমন কি একটু কাতরানি পর্যন্ত শুনতে পায় না। তাদের খুবই আশাভঙ্গ হয়। ছুঁড়ীটার হলো কি অ্যাঁ! ওরা ভেবে পায় না।

মাঝে মাঝে সমরু দুঃখ করে,—হায় রে, ওরা তোকে তুকতাক করেছে! ওরে হত-ভাগী মেয়ে, কেন তুই কথা বলিস না? কেন বুঝছিস না, কষ্ট দিয়ে দিয়ে ওরা তোর জান শেষ করবে?

কোন জবাব দেয় না জয়নাব। তার কাছে আজ বাঁচা-মরা সমান। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ, যন্ত্রণা ও হতাশার অন্ধকার অতল গহ্বরের ভেতর দিয়ে যেন সে চলেছে। সময় কেটে যাচ্ছে কি ভাবে, সেদিকে হুঁশ নেই।

এমনি করে মানসিক আচ্ছন্নতার ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস জয়নাবের পার হয়ে চলে।

তাগাই বেশ কিছুকালের জন্যে লম্বা সফরে বেরিয়ে গেছে, অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী সোভিয়েত শাসনাধীন অঞ্চলে গেছে হামলা করতে—গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বাসিন্দাদের খুন করে তাদের যা কিছু সব লুটতরাজ করে আনতে।

বসন্ত কাল আসতেই জয়নাবের কাশি শুরু হলো। প্রায় রাতেই সে কাশতে কাশতে উঠে বসে। বিবিজানরা শেষে একদিন খেঁকিয়ে উঠলো,—এই হতচ্ছাড়ী, কাশি থামা। তোর জ্বালায় রাতে কি ঘুমুতেও পারবো না? যা, উঠোনে যা, উঠোনে গিয়ে কাশ্!

উঠোনেই যেতে হয় জয়নাবকে। রাতে কনকনে শীত, বরফও পড়ে মাঝে মাঝে। জয়-নাব ঠকঠক করে কাঁপে আর সারাক্ষণ শুধু কাশে আর কাশে। শেষে ওর কাশির সঙ্গে একদিন থুতুতে দেখা দিল রক্ত।

শুয়োরী আর খুদে সাপ একদিন সে রক্ত দেখে আঁতকে উঠলো। শুয়োরী বললে,—

ওর থুথুর সঙ্গে রক্ত পড়ছে। হুঁশিয়ার না হলে ও রোগ শেষতক আমাদেরও ধরতে পারে। ও কিরকম কাহিল হয়ে পড়েছে দেখতে পাচ্ছ! হাত থেকে পেয়ালা-প্লেট পর্যন্ত পড়ে যায়, চলবার সময় টলতে থাকে। ও এখন থেকে চালায় গিয়ে থাকুক। সেখানেই ও থাকবে, ঘুমোবে আর জঞ্জাল সাফাই ও নোংরা কাজকামই শুধু করবে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।—খুশিতে ডগমগ কণ্ঠে খুদে সাপ সায় দেয় : ওর দিন শেষ হয়ে আসছে।

এই ব্যবস্থা মতো মে মাস থেকে জয়নাবকে আর ওদের খিদমৎ করতে হয় না। এটা তার পক্ষে যেন শাপে বর হলো। কাজ শেষ করে জয়নাব সারাক্ষণ বসে বসে দড়ি পাকিয়ে ল্যাসো তৈরি করে আর ভাবে জুরার কথা। ল্যাসো ছোড়ায় জুরার দক্ষতার নানা ঘটনা মনে পড়ে তার। ভাবতে ভাবতে মিন-আরখার গাঁয়ের আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে।

অতীতের সুখ-চিন্তায় ডুবে থাকাই এখন জয়নাবের একমাত্র কাজ। রোজ সন্ধ্যায় কাজ শেষ করে সমরুও এসে তার পাশে বসে, মজার মজার গল্প বলে যায় একের পর এক। এর ফলে ধীরে ধীরে জয়নাবের কাশি কমে এল, রক্তপড়া বন্ধ হলো। ক্ষয়রোগের দাগগুলোও একটু একটু করে মিলিয়ে গেল গণ্ড থেকে।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন ঘটলো এক অভাবিত ঘটনা।

সেদিন খানদানী ঘরের দুজন স্ত্রীলোক এল তাগাইয়ের বৌদের সঙ্গে দেখা করতে। এজন্যে আগে থেকেই ভাল ভাল খানার ব্যবস্থা হয়েছে।

তাগাইয়ের বৌয়েরা তখন বাগানে। তারা হাঁক পাড়ে,—এই ময়লামুখী! টেবিল! টেবিল আন্! খানায় বসবো আমরা।

জয়নাব টেবিল আনলো। বাসনকোসন আনলো। খানাও এল থরেথরে।

ভোজ চলেছে। বাড়ির চারপাশে মাটির পাঁচিল। হঠাৎ পাঁচিলের বাইরে দূর থেকে বহু কণ্ঠের হৈ-হল্লা কানে এল। কুকুর লেলিয়ে দেবার, শিস দেবার আওয়াজও শোনা যায়। পরক্ষণে গুলির আওয়াজ হলো। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাঁচিলের খোলা দরজা দিয়ে তীর বেগে বাগানের দিকে ছুটে এল প্রকাণ্ড এক কালো কুকুর। কপালে তার মস্ত এক সাদা টিপ।

পরিষ্কার বোঝা যায়, তাড়া খেয়ে খেয়ে কুকুরটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে। লালা ঝরছে তার মস্ত লালচে জিভটা থেকে।

সেদিকে নজর পড়তেই, খুদে সাপ 'পাগলা কুত্তা!' 'পাগলা কুত্তা!' বলে হাউমাউ করতে করতে ছুটলো ঘরের দিকে।

ঠেলাঠেলি জড়াজাড়ি করতে করতে মেহ্‌মানরাও দৌড়লো তার পেছনে। ছুটতে গিয়ে শুয়োরী আছাড় খেয়ে পড়লো। ভয়ে তার আর নড়ার ক্ষমতা থাকে না। সমরু তাকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে ফেললে।

একমাত্র জয়নাবই শুধু পালায় নি। নিষ্পলক চোখে সে তাকিয়ে আছে কুকুরটার দিকে। সহসা নিজের অজ্ঞাতেই সে চেঁচিয়ে উঠলো,—টীক! টীক!

চমকে লাফিয়ে উঠে কুকুরটা কান খাড়া করলো। তারপর জয়নাবের দিকে নজর পড়তেই জিভ ভেতরে টেনে নিয়ে এত জোরে মুখ বন্ধ করলো যে, দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হলো বেশ জোরেই।

সম্ভবত স্মৃতিশক্তি টীকের। জয়নাবকে সে চিনতে পেরেছে। সেইসঙ্গে তার মনে পড়েছে, গুহা থেকে মাংসের খণ্ড নিয়ে পালাবার সময় জয়নাব তাকে তাড়া

করেছিল। শুধু কি তাই? অন্য কুকুরদের সঙ্গে যখন তার লড়াই চলছিল, তখন এই জয়নাবই পাথর ছুড়েছিল তার দিকে।

নিঃশব্দে সে দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো।

জয়নাবের কিন্তু সেদিকে নজর নেই। অপ্রত্যাশিত খুশির আবেগে তার চোখমুখ ঝলমল করছে। নিজের মনে বলে চলেছে সে,—টীক! টীক! এ টীক না হয়ে যায় না। কপালে ঠিক ঐ রকম বড় সাদা টিপ অন্য কুকুরের হয় কি করে! আয় টীক, আয়! খা, খা!

দ্রুত পায়ে টীক এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। গোগ্রাসে গিলতে থাকে সে খাবারগুলো।

আর আবেগচঞ্চল কণ্ঠে জয়নাব তখন যেন মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে,—খা টীক, খা! খা, টীক, খা!

কিছুক্ষণ পরে বাড়ির মনিব ও মেহ্‌মানরা সাবধানে গলা বাড়ালো জানলা দিযে। কালো প্রকাণ্ড কুকুরটা টেবিলের কিনারায় সন্তর্পণে দুই থাবা রেখে ভাল ভাল খানাগুলো প্রায় সাবাড় করে এনেছে।

কুকুরটা তো তাহলে পাগলা নয়!

দূর হ!— দূর হ বজ্জাত!—তীক্ষ্নকণ্ঠে তারা চেঁচাতে শুরু করে।

ভয়ঙ্কর দাঁত খিঁচিয়ে টীক বারেকের জন্যে গবগর করে উঠলো। ক্রীম কেকটা কেবল সে চেখেছে, তাছাড়া মুরগীর ঠ্যাংটা এখনও কিছুটা বাকী। এ সব না বুঝে চেঁচালেই হলো! ইয়ার্কি নাকি!

তাগাইয়ের বিবিরা চেঁচায়,—এই জয়নাব, দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে কি দেখছিস র‍্যা? দূর কর্ ওকে।

ও সব চেঁচামেচি জয়নাবের কানে ঢুকছে না। এত আনন্দ সে যেন চেপে রাখতে পারছে না। কোথায় উবে গেছে তার চোখের সেই নিষ্প্রভ ঘোলাটে দৃষ্টি!

জুরা বেঁচে আছে!—সে এখন নিঃসন্দেহ। শুধু বেঁচেই নেই, টীক যখন এখানে, তখন কাছে পিঠে কোথাও আছে।

হঠাৎ বন্দুক নিয়ে ছুটতে ছুটতে পাহারাওলা এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে আলোর মাঝে কালো বিদ্যুতের ঝিলিক যেন—দেয়াল টপকে টীক অদৃশ্য।

তবে রে!—তম্বি করতে করতে কিল উঁচিয়ে শুয়োরী তেড়ে এল জয়নাবের দিকে। কিন্তু সে দিকে গ্রাহ্য নেই জয়নাবের। বাহু টান করে সে আড়মোড়া ভাঙলে, তারপর দুই হাত মাথার পেছনে দিয়ে হাই তুললে আরামের সঙ্গে। ভাব মনে হচ্ছে, অনেক-অনেক কাল সে যেন ঘুমিয়ে ছিল, এইমাত্র জাগলো।

আঁই আঁই!—ভয়ে হাউমাউ করে উঠলো শুয়োরী ঃ ময়লামুখী আমার দিকে হাত টান করছে। এত আস্পদ্দা! অ্যাঁ এত আস্পদ্দা ওর!

উঠি-পড়ি করে সে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

খিলখিল করে খুশির হাসিতে ফেটে পড়লো জয়নাব। সবাই দারুণ চমকে উঠলো। এমন কি সমরু পর্যন্ত দু পা পেছিয়ে গেল ঃ এই প্রথম জয়নাবকে সে হাসতে দেখলো। তার ওপর কিনা এমন প্রাণখোলা হাসি!

চোখ বড় বড় করে জয়নাব চারদিকে তাকায়। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। গাছপালাগুলো যেন ডাল নেড়ে নেড়ে মোবারকবাদ জানাচ্ছে তাকে। বুক ভরে গভীর নিশ্বাস নিয়ে সে চলে গেল বাগানের দিকে।

খানিকক্ষণ পরে ফিরলো সে। খুদে সাপ দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে। জয়নাব দেখে, নিজের লাল-পাথর-বসানো ব্রেসলেটটা ওর বাঁ হাতে পরা।

হাত বাড়িয়ে সে বললে,—আমার ব্রেসলেটটা দাও।

সঙ্গে সঙ্গে দোল খাওয়া থেমে গেল খুদে সাপের। ক্রুদ্ধ চোখে কিছুক্ষণ সে তাকিয়ে রইল হাঁ করে, শেষে তীক্ষ্ন কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লে,—ক্-কী! কি বললি? এত আস্পর্দ্ধা হয়েছে তোর!

জয়নাবের মুখে অবজ্ঞার হাসি। এগিয়ে গিয়ে খুদে সাপের বাঁ হাতটা সে চেপে ধরলে। দারুণ ভয়ে গোঙিয়ে উঠলো খুদে সাপ। জয়নাব তার হাত থেকে ব্রেসলেটটা টান মেরে খুলে নিয়ে পরলে নিজের ডান হাতে।

ঘর থেকে শুয়োরী তখন তর্জনগর্জন করছে। সেদিকে আমল না দিয়ে জয়নাব এগিয়ে গেল গাছগুলোর দিকে। সেখানে হাঁড়িতে ভেড়ার মাংস রান্না হচ্ছে। আতঙ্কিত মেয়েদের বিস্ফারিত চোখের সামনে হাঁড়ি থেকে সে মাংসের সবচেয়ে ভাল ভাল খণ্ড-গুলো তুলে নিয়ে খেতে শুরু করলো।

শুয়োরী ফিসফিস করে বললে,—ওর মাথা বিগড়ে গেছে, পাগল হয়ে গেছে!

খুদে সাপ মাথা নেড়ে সায় দেয়। সমরু বলে,—আমারও তাই মনে হয়। হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

জয়নাবের পাগলামি কিন্তু চলতে থাকে। তাগাইয়ের বৌদের সে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তাদের কোন কাজই সে করতে পারবে না। শুধু কি তাই! খুদে সাপের ভাল ভাল জামাকাপড়গুলো পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে সে নিজে পরেছে।

আতঙ্কে সেদিন ওরা মরে আর কি, যখন শুনলো, ময়লামুখী গান গাইছে। গভীর গাঢ় সুললিত কণ্ঠ। সন্ধ্যায় সমরু ফিসফিস করে জয়নাবকে অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বললে,—ঠিক পথে চলেছ মেয়ে। এমনি পাগলামির ভান করে যাও। এরই মধ্যে ওরা তোমায় ভয় করতে শুরু করেছে।

কিছু দিনের মধ্যেই জয়নাবের স্বাস্থ্যের লক্ষণীয় উন্নতি দেখা গেল। সমরুকে সে একদিন জানালে, সওদা করার জন্যে সে বাজারে যেতে চায়। ওর স্বাস্থ্য ও চেহারা দেখে শুয়োরী ও খুদে সাপের তো দুর্ভাবনার অন্ত নেই। তাগাই এবার ফিরে এসে ওই নচ্ছার ছুঁড়ীটাকেই না তার সবচেয়ে পিয়ারের বিবি করে নেয়, এই তাদের ভয়।

শেষে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সমরুকে একদিন ধরে বসলো,—শোন্ সমরু, জয়নাবের হাত থেকে যাতে রেহাই পাই, তার ব্যবস্থা তোকে করতে হবে। ঠিক বিহিত যদি করতে পারিস তো অনেক টাকা পাবি। জামাকাপড়, গয়নাপত্রও পাবি।

আগাম হিসেবে প্রত্যেকে ওরা বেশ কিছু টাকাও দিলে সমরুকে।

সমরু প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার পাকা বুদ্ধি যথাস্থানে ফিরে এল। এক ঢিলে তিন পাখি মারার নানা মতলব ঝিলিক খেলে গেল তার মাথায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে,—বুঝতে পারছি সব। কিন্তু বড় কঠিন কাজ। দেখি, কতদূর কি করতে পারি। তবে ময়লামুখীকে এখন ঘাঁটানো ঠিক হবে না। ওর মাথার যা অবস্থা, তাতে সবাইকে খুন করে বাড়িতে ও আগুন ধরিয়েও দিতে পারে। জিনিসপত্র সওদা করতে সে বাজারে যেতে চাইছে। ওকে বাধা না দেওয়াই উচিত বলে মনে হয়।

তাগাইয়ের বৌয়েরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলো।

সুতরাং আর বাধা নেই। গাধার পিঠে চড়ে জয়নাব রোজ বাজারে যায়। সমরু যায় তার সঙ্গে। লোকজনের কৌতূহলী নজর এড়াবার জন্যে জয়নাব বোরখা পরে নিয়েছে।

বাজারে এত লোকজন ও ধনদৌলত আর হরেকরকমের এত জিনিসের ছড়াছড়ি দেখে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

পুরো একমাস সে বাজারে গেল সমরুকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর সে একাই যেতে শুরু করে। ব্যাপারীদের সঙ্গে ইতিমধ্যে তার কিছু আলাপ-পরিচয় হয়েছে। তাদের কাছ থেকে সে টাটকা খবর শোনে। কিন্তু জুরার খবর কেউ বলতে পারে না।

এমনি করে কেটে যায় দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। কিন্তু জুরার কোন খবর নেই। জয়নাবের মনে চলেছে তুমুল ঝড় ঃ কোথায় গেল জুরা? সে কি তাহলে সত্যিই বেঁচে নেই! জয়নাবের দিন যেন আর কাটতে চায় না। উদ্বেগ ও নৈরাশ্য আবার ধীরে ধীরে চেপে বসছে তার মনের ওপর।

ধীরে ধীরে এল হেমন্ত ঋতু। হেমন্তের এক বিশেষ দিন—দিনটা ঝকঝকে, কিছুটা গরমও বটে। সেদিনও জয়নাব বাজারে গেছে। ভিড়ের মধ্যে খেলনা খুঁজছে সে। প্রতিবেশীর এক ছেলেকে সওগাত দেবার ইচ্ছে।

হঠাৎ দেখে, এক ব্যাপারী দাঁড়িয়ে আছে ভিড়ের মধ্যে। তার হাতে এক অদ্ভুত খেলনা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে লোকজনের নাকের ডগায় নাচাচ্ছে কাঠের খোদাই করা এক ঈগল পাখি। পাখিটার মাথা একবার হচ্ছে ঈগলের, একবার মানুষের।

জয়নাবের পরিচিত খেলনা। বাচ্চা বয়সে এ ধরনের খেলনা নিয়ে সে খেলেছে। লোকটার কাছ থেকে সে ঈগল পাখিটা আর একটা চিতাবাঘ ও কুকুর কিনে নেয়। কিন্তু কে এই খেলনার খোদাইকারী শিল্পী? জয়নাব অতীত স্মৃতির মাঝে ডুবে যায়।

কয়েক দিন পরে বাজারে আবার তার সেই ব্যাপারীর সঙ্গে দেখা। এবার সে বেচতে এসেছে কাঠের খোদাইকরা আর এক আজব খেলনা।

খেলনাটা দেখে জয়নাব চমকে উঠলো। ব্যাপারীর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সে একমনে দেখতে থাকে খেলনাটা। আগুনের কুণ্ডের ধারে একটা মেয়ে। কিছু দূরে একজন শিকারী দুটো কুকুর পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছেই এক গাছতলায় আর একজন শিকারী মেয়েটার বুক তাক করে বন্দুক তুলেছে। মেয়েটার গায়ে ওড়না, পায়ে হাই-হীলের বুট জুতো।

দেখতে দেখতে জয়নাবের হঠাৎ স্মৃতির দুয়ার খুলে যায়। এ তো সেই ঘটনা, সে যখন মাংস আনার জন্যে বিলিয়ান্ড-কীকে জুরা ও কুচাকের কাছে গিয়েছিল! এটা যে সেই সন্ধ্যার ঘটনা তা পরিষ্কার বোঝা যায়, যখন কুচাক দূরে থেকে তাকে জেস্টারনাক মনে করে গুলি করেছিল।

ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে জয়নাবের। খেলনাটা সে বুকে চেপে ধরলো। এবার সে বুঝতে পেরেছে, কে এই খোদাইকার শিল্পী! আগের খেলনাগুলো দেখেই তার এটা বোঝা উচিত ছিল। জুরা বেঁচে আছে আর এখানেই আছে কোথাও। কাঠ-খোদাইয়ে এ রকম দক্ষতা জুরা ছাড়া আর কারো থাকার কথা নয়।

আবেগে উত্তেজনায় জয়নাব কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। শেষে একসময় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো,—কে তৈরি করেছে এটা?

এক শো টাঙা দেন তো সব বলতে পারি।—ব্যাপারী বললে। ব্যাপারটার মধ্যে সে রহস্য ও দাঁও মারার গন্ধ পেয়েছে।

বিনা ওজর-আপত্তিতে জয়নাব তক্ষুণি টাকাটা তার হাতে দিতেই ফিসফিস করে ব্যাপারী বললে,—লোকটা ভয়ংকর জাতের আসামী। অমানুষিক জোর তার গায়ে। তার দিকে একবার শুধু তাকালেই আপনার আক্কেলগুড়ুম হয়ে যাবে। এখানকার বাসিন্দা সে নয়। তার নাম জুরা।

জয়নাবের দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। টেনে টেনে সে জিজ্ঞেস করলে,—কোথায় সে ?

ব্যাপারী বললে,—গর্তের মধ্যে গারদে আটকা আছে। আমিই তাকে পাহারা দেই। শীগগীরই তাকে ফাঁসিতে লটকানো হবে।

জয়নাবের চোখের সামনে দুনিয়া যেন ঘুরে ওঠে। আচ্ছন্নের মতো সে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। শেষে নিজের মনকেই সে যেন প্রবোধ দেয়,—শান্ত হও। মাথা ঠিক রাখতে হবে। সাহসে বুক বাঁধতে হবে। সর্বনাশের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঘাবড়ালে চলবে না।

পাহারাওলাটার দিকে ফিরে যথাসাধ্য শান্ত সংযত কণ্ঠে ফিস ফিস করে সে বললে,—চলো, একটু নিরিবিলি জায়গায় যাই। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। বহুৎ টাকা তুমি রোজগার করতে পার। করবে ?

শো সাহেবের পেয়ারের বেগম মেহেরবান! তাঁর মর্জি হলে কেন করবো না ?—শুকনো ঠোঁট চাটতে চাটতে পাহারাওলা জবাব দেয়।

চতুর্থ পর্ব ৫

বাজার থেকে জয়নাব ফিরে এসেছে। মনে মনে বিষম উত্তেজিত সে। টাকার বিনিময়ে পাহারাওলা তার কথায় কাজ করতে রাজী হয়েছে। এবার জুরার পালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। পালাবে সে নিজেও।

কিন্তু—কিন্তু বড় অসহায় বোধ করে জয়নাব। মুখের হাসি তার মিলিয়ে গেছে। নির্বান্ধব এই অপরিচিত এলাকায় সে একা। কারো সাহায্য ছাড়া এত বড় ব্যাপারটা কি করে সে গোপনে সমাধা করবে ? এক সমরু ছাড়া এমন আর কাউকেই তো সে চেনে না, যাকে এ ব্যাপারে সে বিশ্বাস করতে পারে!

সুতরাং বাধ্য হয়েই জয়নাব সন্ধ্যার পরে সমরুকে একান্তে খুলে বললে সমস্ত কিছু। হেঁট মাথায় ব্যাপারটা শুনতে শুনতে সমরুর চোখে মুখে চাপা আনন্দ ফুটে ওঠে। মনে মনে বলে,—খোদার কি মেহেরবানী! এক ঢিলে তিন পাখি মারার মতলবটা বিনা চেষ্টায় আপনা থেকেই রূপ নিচ্ছে।

কিন্তু মনের ভাব গোপন করে বিমর্ষ চিন্তিত কণ্ঠে সে বললে,—কিন্তু এজন্যে যে প্রচুর টাকার দরকার! সে টাকা কোথায়?

নিজের শেষ ব্রেসলেটটা খুলে নিয়ে সমরুর হাতে দিতে দিতে জয়নাব বললে,—আর তো আমার কিছু নেই!

দুর্লভ দুটো ব্রেসলেটই এখন সমরুর পকেটে। এ আনন্দ সে যেন চেপে রাখতে পারে না। কাঁপা গলায় বললে,—তা জানি, বেটি।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে তার পরামর্শ চললো জয়নাবের সঙ্গে।

পর দিন সকাল থেকেই আবার অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল জয়নাবের। ছেঁড়া ময়লা পুরনো পোশাক পরে আবার সে হেঁট মাথায় তাগাইয়ের বিবিদের সবরকমের হুকুম তামিল করে চলেছে।

...যে অভাবনীয়! বিস্ময়ে আনন্দে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বিবিরা আবার শুরু করে দিল চামেচি।

...দিন পরে হঠাৎ খবর এল, তাগাই আসছে। যে লোক খবরটা আনলো, সে

তাগাইয়ের কাছ থেকে সওগাত হিসেবে সঙ্গে এনেছে রুপোর নানা জিনিসপত্র আর দামী দামী চমৎকার সব কাপড়চোপড়।

সাহেব আসছে!—বিবিজানদের তাই সাজগোজ যেন আর শেষ হতে চায় না। শেষে গয়নার বাক্সে হাত দিতেই তারা চমকে উঠলো : এ কী!

চোখ তাদের ছানাবড়া। একখানা গয়নাও নেই—সব লোপাট।

হুলুস্থুল চেঁচামেচি আর কান্নাকাটিতে গোটা বাড়ি যেন কাঁপতে থাকে। সমরুও তাতে যোগ দিয়েছে। শেষে একসময় কিছুক্ষণ কি বিড়বিড় করে সে বললে,—হুঁ, বুঝতে পারছি, কে করেছে এটা!

কে? কে? জয়নাব?—দুই বিবি ছুটে গিয়ে সমরুর দুই হাত চেপে ধরলে।

—না, না। জয়নাব কেন করতে যাবে? জিন! জিনে করেছে।

অ্যাঁ, জিন?—আঁতকে ওঠে খুদে সাপ, আর নিদারুণ ভয়ে শুয়োরীর চোখের পাতা নাচতে থাকে।

ওহো, মাংসের সুরুয়াটা বুঝি শেষ হয়ে গেল!—বলতে বলতে সমরু ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চালায় এসে জয়নাবকে সে বললে,—গাধী দুটো সবই বিশ্বাস করেছে। ভারী যুৎসই মতলব তোমার মাথায় এসেছিল, বেটি। এখন শোন, এ পর্যন্ত কি করেছি। পাহারাওলাদের ঘুষ দিয়েছি। যেখানে যা দেবার, তাও দেওয়া হয়েছে। ঘোড়া কিনতে হবে। অনেক দাম। যা কিছু জোগাড় হয়েছে, সেসব ওতেই খরচ হবে। একটা টাঙাও আর হাতে থাকবে না। তবু আমি নিজের পকেট থেকে এক শো টাঙা দেব তোমায় সফরের জন্যে। তৈরী থেক, আমি বললেই বেরিয়ে পড়বে। জুরার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না। পরে সে তোমার সঙ্গে যোগ দেবে।

পর্বত-মুল্লুকের মেয়ে জয়নাব। সোজা সরল বুদ্ধি তার। সমরুর কথায় সে খুব খুশী। মাথা নেড়ে সায় দিলে।

হঠাৎ রব উঠলো,—সর্দার শো! সর্দার শো এসেছেন!

সমরু সরে গেল জয়নাবের কাছ থেকে। যে বিরাট পরিমাণ টাকা-পয়সা, রুপো, সোনাদানা ও দামী কাপড়চোপড় সে হাতিয়েছে, তা প্রায় সবটাই থেকে গেছে। সেই পাহারাওলাটাকে ঘুষ দিতে আর ঘোড়া কিনতে হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে খরচ হয়েছে যৎসামান্যই। এখন জালটা ঠিকমতো টেনে তোলা নিয়েই কথা!

তার মতলব তিনটে। এক, জয়নাবের পালানোর ব্যবস্থা করা। দুই, এই কাজের জন্যে বিবিদের কাছ থেকে প্রচুর বকশিশ আদায় করা। ইতিমধ্যে চাপ দিয়ে সে হাতিয়েছেও বেশ কিছুটা। তাছাড়া তার নিজের স্বার্থেও জয়নাবকে সরানো দরকার। নয়তো জয়নাব থাকলে, ভবিষ্যতে কোন দিন তার এইসব কাণ্ডকারখানা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। আর তিন—এবং এই তৃতীয় মতলবটাই সাংঘাতিক, তাগাইয়ের কাছ থেকেও সে বকশিশ আদায় করতে চায়। ইমানদারি বা বেইমানি শব্দ দুটোর কোন মানে নেই সমরু-জাতীয় মানুষদের কাছে।

তাগাই ততক্ষণে সোজা জেনানা-হারেমে গিয়ে হাজির হয়েছে। জয়নাব চালাঘরে আছে শুনে সে পা বাড়ালো সেদিকে। কয়েক পা যেতেই তার কানে এল—'শ্-শ্' ফিরে তাকাতেই দেখে, দূরে এক গাছের আড়াল থেকে সমরু আঙুল নেড়ে তাকে ডাকছে।

তাগাই এগিয়ে গেল তার কাছে—কি ব্যাপার?

একটু আড়ালে চলুন, হুজুর!—সমরু ফিসফিস করে বললে : এমন একটা [illegible] পান

খবর বলবো, যা শুনলো জনাবের রক্ত জমে যাবে। এর জন্যে আমায় কিন্তু বহুৎ বকশিশ দিতে হবে। বলুন, দেবেন।

ভ্রূ কুঁচকে তাগাই বললে,—বল্ না, কি খবর। সাচ্চা খবর হলে আলবৎ বকশিশ পাবি।

খুদে চোখে দুটো যথাসাধ্য বড় করে সমরু ফিসফিস করে বললে,—জুরা যাতে পালাতে পারে, তার জন্যে জয়নাব জুরার পাহারাওলাকে ঘুষ দিয়েছে!

ভয়ানক চমকে উঠলো তাগাই। পরক্ষণে যতদূর সম্ভব শান্ত গলায় বললে,—সাচ্চা বাত বলছিস?

কসম খেয়ে বলছি।—বুড়ি জবাব দিলে। তারপর জুরার পালানোর ব্যাপারটা নিজের দরকার মতো কাটছাঁট করে বলে গেল একের পর এক।

শুনতে শুনতে তাগাইয়ের কপালের শিরা ফুলে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে,—বহুৎ আচ্ছা! খবর যদি ঠিক হয়, তাহলে তোকে দেব নটা রেশমী ঘাগরা, মখমলেরও দেব নটা, আর রুপোর ভারী তাগাও পাবি নটা। একটা কথাও যেন ফাঁস না হয়। সব যেমন চলছে, তেমনি চলবে। বাকিটুকুর ফয়সালার ভার আমার।

তাগাইয়ের কোটের প্রান্তে চুমু খেয়ে সমরু বললে,—আপনার হুকুমের নড়চড় হবে না, হুজুর। সমরু আপনার চিরকালের বাঁদী। কিন্তু আমার একটা আরজি আছে। জয়নাবের সঙ্গে আপনি এখন দেখা করবেন না। বা এ ব্যাপারে তাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করবেন না। তাহলে সব ভেস্তে যেতে পারে।

ভ্রূ কুঁচকে তাগাই রাজী হলো। সে চলে যেতেই সমরু ছুটলো জয়নাবের কাছে। বললে,—ভুলে যাস নে বেটি, কাল রাত, আজকে-রাতের পরের রাত। তৈরী থাকিস।

এদিকে তাগাইয়ের নির্দেশে তার লোকেরা তদন্ত করে এসে জানালে,—সমরুর খবর ঠিক, জয়নাব বিবি পাহারাওলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে জুরার পালানোর বন্দোবস্ত করেছেন। কিন্তু সমরুও নির্দোষ নয়। সে এ কাজে মদত দিচ্ছে জয়নাবকে।

ঘোড়ার পিঠে তাগাই ছুটলো কিপচাকবের কাছে।

জয়নাব যে পাহারাওলাকে ঘুষ দিয়েছিল, সে ইতিমধ্যে জুরার সঙ্গে যোগাযোগ করে তার পালানোর সব ব্যবস্থা শেষ করে ফেলেছে।

নির্দিষ্ট রাত। উদ্বেগ নিয়ে জুরা, চাও আর সঈদ বসে আছে গর্তের মধ্যে। সংকেতের অপেক্ষা করছে। শেষে মাঝ রাতে গরাদে সরে গেল। ওপরে তিনটি মাথা জেগে উঠলো আ[illegible]নের পটভূমিকায়।

চটপট দড়ি ফেলে দাও!—চাপা গলায় জুরা হাঁক ছাড়লে। ব্যঙ্গের হাসি ভেসে এল ওপর [illegible]। পরক্ষণে গোল একটা জিনিস এসে পড়লো গর্তের মধ্যে। জুরা তাড়াতাড়ি তুলে [illegible]। সেটা—মানুষের কাটা মাথা একটা।

ও[illegible]র থেকে তাগাইয়ের গলা শোনা গেল,—হেই জুরা, বুদ্ধিতে আমায় হারাতে চেয়েছিস, তাই না রে কুত্তার বাচ্চা?

মাথাটায় দ্রুত হাত বোলাতে বোলাতে জুরা চেঁচিয়ে উঠলো,—অ্যাঁ, জয়নাবকে খুন করেছিস?

—না, ওটা এক বেইমানের গরদান! জয়নাব বাড়িতে আমার জন্যে তৈরী হয়ে বসে অ[illegible] তোদেরও দিন ঘনিয়ে এসেছে, বুঝলি! আর মাত্তর কটা দিন সবুর কর্। ত[illegible] খোশমেজাজে ফাঁসিতে ঝুলবি—যাকে বলে একেবারে চিরকালের আজাদি, তাই ন[illegible]

বলতে বলতে গরাদে বন্ধ হয়ে গেল। তাগাই ফিরলো বাড়িতে। জয়নাবকে এবার সে শাদি করবেই, দরকার হলে জোর করেই করবে।

কিন্তু কোথায় জয়নাব! হঠাৎ তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। কিন্তু কোথাও সে নেই। তবে কি পালালো? তাগাইয়ের নির্দেশে তখুনি দিকে দিকে ছুটলো ঘোড়সওয়ার।

সমরুকে ডেকে কঠিন কণ্ঠে তাগাই জিজ্ঞেস করলে,—জয়নাব কোথায়?

বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সমরু কেঁদে ফেললে। এমনি অপূর্ব তার অভিনয় যে, শেষ পর্যন্ত তাগাই বুঝলো, জয়নাবের পালানোর ব্যাপারে সমরুর কোন হাত নেই। আর সত্যিই তো, জয়নাব পালালে সমরুর কি লাভ?

তাগাই হুকুম দিয়েছে, গর্তের মধ্যে কয়েদীদের খানাতল্লাশী করতে হবে। কিন্তু হুকুম দেওয়া কত সোজা করার চেয়ে, খাঁদা তা বুঝতে পারে হাড়ে হাড়ে।

অনেক পরে—গর্তের মধ্যে লড়াইয়ের ঝুটোপুটি একসময় থেমে যায়। আহত সঙ্গী তিনজন আর একজোড়া বাজেয়াপ্ত ছোরা নিয়ে বাসমাচিরা চলে গেছে। গরাদের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক চাঁদের আলো নীচে এসে পড়লো।

গর্তের তলায় পড়ে আছে ক্ষতবিক্ষত আধমরা কয়েদী তিনজন। অসাড় দেহ, ছিন্ন-ভিন্ন পোশাকপরিচ্ছদ রক্তমাখা। ফাঁসিতে লটকানোর জন্যে কয়েদীদের জানে মারা চলবে না, তাগাইয়ের এই হুকুমের ফলেই খাঁদার হাত থেকে ওরা প্রাণে বেঁচেছে। এক-জন বাসমাচির একটা চোখ এক পাশে আবছা আলোয় চকচক করছে ধুলোর মধ্যে।

জুরার গলা দিয়ে 'ঘড়ঘড়' শব্দ বেরোচ্ছে। সঈদ গোঙাচ্ছে। চাওয়ের কোন সাড়া নেই।

পঞ্চম পর্ব ১

দিন দশেক পরে। পাহারাওলারা সেদিন সকালবেলায় দড়ির সাহায্যে জুরা, চাও আর সঈদকে টেনে তুললো গর্ত থেকে।

ঝকঝকে রোদে কয়েদীরা ভাল করে তাকাতে পারে না, চোখ পিটপিট করে। শোচনীয় কাহিল তাদের চেহারা। স্বাস্থ্য বলতে কিছু বাকী নেই। সকালের ঠাণ্ডায় তারা কাঁপছে হি-হি করে।

সাগ্রহে জুরা চারদিকে তাকায়, টাটকা বাতাস টেনে নেয় বুক ভরে।

কুকুরদের সেই শহরের কাছে পড়ো জমিতে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে ছটা ফাঁসিকাঠ দাঁড়িয়ে আছে।

দূর থেকে ফাঁসিকাঠের ওপর নজর পড়তেই সঈদ আর্তনাদ করে উঠলো,—আাঁ, ওরা আমাদের ফাঁসিতে লটকাবে! হাঁয়রে হায়, এবার শেষ!

মাটির নীচের আর এক গর্ত থেকে আরো তিনজন কয়েদীকে তোলা হয়েছে। তারাও যাচ্ছে ওদের সঙ্গে। তারাও ফাঁসির আসামী, বুক চাপড়ে হায় হায় করে চোখের জল ফেলছে সঈদের মতোই।

চাও নীরব। তার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি ফাঁসিকাঠের ওপর আটকে গেছে যেন। আর মাথা উঁচু করে জুরা চলেছে কয়েদী-দলের আগে আগে, সোজা সামনে দূর পর্বত-চূড়োটার দিকে তার নজর। সকালের রোদে চূড়োটা যেন আলোয় আলোময়।

ফাঁসিকাঠ ঘিরে পড়ো জমিতে দর্শকদের প্রচণ্ড ভিড়। ফাঁসির আসামী আধা-উলঙ্গ কঙ্কালসার লোকগুলোকে দেখার জন্যে তাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি চেঁচামেচির অন্ত নেই।

দূর থেকে কিপচাকবে আর তাগাইয়ের ক্রুদ্ধ চিৎকার ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে হল্লা থেমে যায়। জনতা সচকিত হয়ে ওঠে।

কিপচাকবে হুকুম দিতেই আসামীদের ফাঁসিকাঠের পাশে নিয়ে যাওয়া হলো। ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হলো গলায়। তখনো জুরার দৃষ্টি নিবদ্ধ সেই আলো-ঝলমল গিরিশৃঙ্গটার দিকে। জনতা নিস্তব্ধ। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে : এইবার—এইবার! আর মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত!

হঠাৎ সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে কানে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে শব্দটা। উৎকর্ণ সবাই। একটু পরেই দেখা গেল, ঘর্মাক্ত ক্লান্ত এক ঘোড়ার পিঠে তীরবেগে ছুটে আসছে একজন পাহারাদার।

কিপচাকবের হাতে সে হাঁফাতে হাঁফাতে কয়েকটা সোনার আশরফি দিতেই তিনি চমকে উঠলেন, সবিস্ময়ে তাকালেন পাহারাদারটার দিকে।

ফিস ফিস করে পাহারাদারটি জানালে—মরা গরুগুলোকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে, সেই ঢিবিটা ঠিক আছে কিনা পরখ করার জন্যে তাকে পাঠানো হয়েছিল। গিয়ে দেখে, কুকুরের পাল ঢুকেছে ঢিবির মধ্যে। কোন্ পথে ওরা ভেতরে ঢুকলো দেখার জন্যে সে ঢিবিটা চক্কর দিতে গিয়েই দেখে, সরু একটা পথের ওপর এই আশরফিগুলো পড়ে আছে। কুকুরগুলো মাঝে মাঝে ঢিবি থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে ছুটতে ছুটতে গা ঝাড়া দিচ্ছে, আর অমনি তাদের গা থেকে ছিটকে পড়ছে এইসব সোনার আশরফি। তার

বিশ্বাস, ঢিবির তলায় কোন পুরনো ধনদৌলত লুকনো আছে। হুজুর নিজে গিয়ে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।

বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠেন কিপচাকবে। তাঁর হুকুমে কয়েদীদের গলা থেকে ফাঁসির দড়ি খুলে নেওয়া হলো। বিস্ময়াহত জনতার গুঞ্জন-ধ্বনি কানে যেতে কিপ-চাকবে বললেন,—দিন দুয়েকের জন্যে আসামীদের ফাঁসি স্থগিত রাখা হলো।

কয়েদীরাও দারুণ হতভম্ব। কিপচাকবে তাদের বললেন,—তোমাদের অনেকেরই এবার বরাত খুলে যাবে। তোমরা হবে আমাদের গুপ্তধনের সন্ধানী। নিজের কাজ যে ঠিকমতো করতে পারবে, তাকেই মুক্তি দেওয়া হবে।

ফিসফিস করে তাগাই বললে,—বলছেন কি? জুরাকে কক্ষনো ছাড়া চলে না। আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

আস্তে মোলায়েম কণ্ঠে কিপচাকবে বললেন,—আলবৎ নয়। ও মরবেই। কিন্তু আশায় আশায় থাক্, তাহলে সোনার তল্লাশ আরো ভালভাবে করবে।

আসামী ছজনাকে নিয়ে দূরের এক পাহাড়ের দিকে রওনা হয় সবাই। আশরফি পেয়েছিল যে পাহারাওলাটি, ঘোড়ার পিঠে সে যাচ্ছে সবার আগে। তার পাশে কিপচাকবে।

ওদের আসতে দেখে 'হোঁৎকাকাটালেজ' কুকুরটা ভয়ঙ্কর চিৎকার করে দলের অন্য-দের হুঁশিয়ারি জানালে ঃ সাবধান! দুশমনরা আসছে!

সঙ্গে সঙ্গে গরুদের কবরখানায় ঢোকার সুড়ঙ্গ-পথ আটকে কুকুরের পাল হিংস্র কণ্ঠে ডাকতে শুরু করে।

কয়েদীদের নিয়ে সুড়ঙ্গের কাছে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। গায়ে গা ঘেসে তারা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে গাঁইতি দেওয়া হয়েছে। বাসমাচিরা কুকুরগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সাধ্য কি! হিংস্র কুকুরের পাল—পথ আগলে গর্জাচ্ছে আর দাঁত খিঁচোচ্ছে ভয়ঙ্কর ভাবে।

কিপচাকবে বললেন,—এবার তাহলে সুড়ঙ্গ দিয়ে গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ো। মনে রেখ, বেশী ধনদৌলত যে আনতে পারবে, তাকেই ছেড়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু কে ঢুকবে কুকুরের সেই জ্যান্ত দেয়াল ভেদ করে! কয়েদীরা নড়তেও ভয় পাচ্ছে। গুলি ছুড়ে আর বন্দুকের কুঁদো চালিয়ে বাসমাচিরা সুড়ঙ্গের মুখ সাফ করে ফেললে, কিন্তু তা একান্তই সাময়িক।

শেষ পর্যন্ত কয়েদীদের একজন গুঁড়ি মেরে খোঁড়লে ঢুকলো, কিন্তু পরক্ষণে কানে এল তীক্ষ্ন এক মরণ-আর্তনাদ। পাহারাওলারা পা ধরে কয়েদীটাকে টেনে আনলে বাইরে। তার টুঁটি ছিন্নভিন্ন।

কিপচাকবে গর্জে উঠলেন,—যত সব কাপুরুষের দল! ভেতরে না ঢুকলে তোদের গরদান হবে এখুনি।

জুরা, চাও আর সঈদ পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে।

পঞ্চম পর্ব ২

ধীরে ধীরে জুরা সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে দাঁড়ালে। ভেতরে অন্ধকার পাতাল। সে চোখ ফেরায় দূরের গিরিশ্রেণী আর চোখ-ধাঁধাঁনো সূর্যের দিকে।

আবার তার দৃষ্টি ফিরে এল সুড়ঙ্গ-মুখে। জনতা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে, নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে ঃ তারা শুনেছে এই ভয়ঙ্কর লোকটার কথা, দৈত্যের মতো অমানুষিক জোর নাকি ওর গায়ে।

নিষ্পলক চোখে জুরা তাকিয়ে আছে সুড়ঙ্গের দিকে। ছাইরঙা পাহাড়টার তলায় কালো অন্ধকার শুধু। ভেতর থেকে অসংখ্য কুকুরের হিংস্র গর্জন ভেসে আসছে।

মৃত্যু! বাইরে থাকলেও মৃত্যু, ভেতরেও মৃত্যু!

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হঠাৎ সে কিপচাকবেকে বললে,—তরোয়াল চাই একখানা। কুকুরগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো একটা হাতিয়ার দরকার।

সঙ্গে সঙ্গে একখানা তরোয়াল দেওয়া হলো তাকে।

সুড়ঙ্গের দিকে জুরা পা বাড়ালে। কিন্তু কুকুরদের হিংস্র উন্মত্ত চিৎকারে বুঝি বিহ্বল হয়ে পড়ে সে ক্ষণেকের জন্য। তার পরেই উপুড় হয়ে কনুইতে ভর দিয়ে সে সামনের দিকে তরোয়ালের খোঁচা মারতে মারতে এগিয়ে গেল অজানা পাতালপুরীর অন্ধকারের দিকে। তার দেহের আড়ালে বাইরের আলো ঢাকা পড়ে গেল। চারদিকে অন্ধকার—নিশ্ছিদ্র অন্ধকার শুধু।

কুকুরদের সংখ্যা সম্পর্কে জুরা অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠে। অন্ধকারে চোখগুলো জ্বলছে ছোট ছোট আগুনের ভাঁটার মতো। জুরা তবু থামে না। কনুইয়ে ভর দিয়ে এগিয়ে যায় সুড়ঙ্গ দিয়ে।

হাতে তরোয়াল থাকলে, কুকুর তো কোন্ ছার, ড্রাগনদের সঙ্গেও সে পাঞ্জা লড়তে ভয় পায় না। আজাদির আশা তাকে সামনে অজানা অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। কয়েদখানায় আটক থেকে দেহ তার খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে সত্যি, কিন্তু এই মুহূর্তে মুক্তির আশা ও আনন্দ সে দেহে শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। সে জানে, সামনেই আসন্ন আজাদির লড়াই। তারই উত্তেজনায় তার দেহমন উন্মুখ ও রোমাঞ্চিত।

কুকুবদের জ্বলন্ত চোখগুলো ইতিমধ্যে খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। অন্ধকারে জুরা সজোরে তরোয়ালের খোঁচা মারলে সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুরের ভীষণ আর্তনাদ শোনা গেল। সম্মিলিত চিৎকার করতে করতে কুকুররা এবার পিছু হটে গেল। জুরাও ধেয়ে গেল সামনের দিকে।

কিন্তু হঠাৎ তার বাঁ কনুইয়ের নীচেকার মাটি ধসে যায়। সে টাল সামলাতে পারলে না—পড়ে গেল। আর সেই সঙ্গে তরোয়ালখানাও ছিটকে গেল হাত থেকে। সর্বনাশ! সে ঝাঁপ দিলে ওটা ধরার জন্যে। ভয়ে পিছু হটে গেল কুকুরের পাল।

কিন্তু তরোয়ালটার কোন হদিস নেই। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ জুরার হাতে ঠেকলো একটা সিঁড়ি—অন্ধকারে সেটা নীচে নেমে গেছে। তরোয়ালটা, মনে হয়, গড়িয়ে নীচে গিয়ে পড়েছে।

মৃত্যুরূপী হিংস্র কুকুর-দলের মাঝে সে একা নিরস্ত্র, এটা মনে হতেই জুরা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর এক চিৎকার। খালি হাতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে প্রস্তুত যে লোক, তেমনি মানুষের কণ্ঠ থেকেই বুঝি বেরোয় ওরকম বেপরোয়া ক্রুদ্ধ হুঙ্কার।

কুকুরদের সে ভাববার সময় না দিয়ে তাড়া করলে পেছনে। কুকুরের দলও সিঁড়ি বেয়ে দৌড়লো নীচের দিকে। আছাড়িপিছাড়ি খেয়ে গড়াতে গড়াতে তারা পালাচ্ছে হুড়মুড় করে। ভয়ে ওরা দিশেহারা—রক্ত-জল-করা ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে পেছনে ধেয়ে আসছে সাংঘাতিক একটা লোক!

জুরা মাঝে মাঝে থামছে, সিঁড়ির ধাপ হাতড়াচ্ছে। কিন্তু তরোয়ালখানার হদিস

না পেয়ে আবার ধাওয়া করছে কুকুরদের পেছনে আরো নীচের দিকে। তার চিৎকার ও গর্জনের বিরাম নেই।

সিঁড়ি বেয়ে সে নেমে এল নীচে। অন্ধকার এক গহ্বর মনে হয়। উপরে কোথা থেকে অল্প অল্প আলো আসছে। সামনেই উঁচু দেয়াল।

সামনে পাশে কুকুরের দল তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বদিকেই ভয়ঙ্কর করাল দংষ্ট্রা আর জ্বলন্ত নিষ্ঠুর চোখ—একটু একটু করে এগিয়ে আসছে।

কুঁজো হয়ে জুরা তাকালো ওদের দিকে। তীব্র নিষ্পলক সে চাউনি। কুকুরের দল পিছু হটে গেল। দুঃসাহসী বেপরোয়া মানুষের ওরকম তীব্র তীক্ষ্ম দৃষ্টি তারা বোধহয় সইতে পারে না।

হঠাৎ জুরার কেন জানি মনে হয়, পেছন থেকে গুরুতর বিপদ আসন্ন। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াতেই সে দারুণ চমকে উঠলো ঃ তার সামনেই প্রকাণ্ড এক কালো কুকুর, কপালের তার মস্ত এক সাদা টিপ, ঝাঁপ দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছে!

টীক! বিস্ময়ে আনন্দে জুরার যেন বাক্‌রোধ ঘটে। নিজের চোখকেও যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। পরক্ষণে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠলো,—টীক! টীক! আমার টীক!

একটু যেন লাফিয়ে উঠেই কুকুরটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। লাফ দেবার সে উদ্যত ভঙ্গি আর নেই। গোটা দলটাও হঠাৎ চুপ মেরে যায়।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত পার হয়। জুরা ও কুকুরটা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। জুরার কাছে মনে হয়, বুঝি যুগের পর যুগ পার হচ্ছে।

টীক এবার লেজ নাড়তে শুরু করলো। নিঃশব্দে দাঁত বের কবলো সে, যেন হাসছে। শেষে অপরাধীর মতো তাকাতে তাকাতে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল জুরার দিকে।

তারপব পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সামনের দুই থাবা জুরার দুই কাঁধে রেখে টীক হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, নিজের প্রকাণ্ড মাথাটা রাখলো জুরার বুকের ওপর। আনন্দে গবগর করছে সে। কতকাল পরে আবার সে ফিরে পেল তার প্রাণের দোস্তকে—তার মনিবকে! তাই কিভাবে মনের ভাব প্রকাশ করবে, বোধহয় ভেবে পাচ্ছে না। জুরা তার মাথাটা দু হাতে আঁকড়ে ধরে উচ্ছ্বসিত আনন্দে চেপে ধরলো নিজের গালের সঙ্গে।

কুকুরের দলে তখন দোমনা ভাব, কি করবে বুঝতে পারছে না। তবে সর্দারের সঙ্গে ঐ মানুষটির যে দোস্তি আছে, তা বুঝতে পেরেছে।

সন্ধানী চোখে জুরা এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখে, সিঁড়ির তলায় তরোয়ালখানা পড়ে আছে। ছুটে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়েই সে ধাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালে। কিন্তু না, ভয় নেই, টীক পাশে দাঁড়িয়ে অন্য সব কুকুরের হামলা থেকে মনিবকে পাহারা দিচ্ছে। কুকুরের পাল ক্রুদ্ধ চিৎকার করে চলেছে বটে, কিন্তু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। জুরা বুঝলে, টীক আগের মতোই বিশ্বস্ত আছে, আর ভয় নেই।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সে সুড়ঙ্গ-মুখের কাছাকাছি গিয়ে হাঁক ছাড়লে,—চাও, সঈদ, তাড়াতাড়ি এস।

পরক্ষণে অন্ধকার হলো সুড়ঙ্গের মুখ, সঈদ গুড়ি মেরে ভেতরে ঢুকলো। তার পেছনে চাও। জুরা হুঁশিয়ারি জানালে,—সাবধানে নাম, কয়েক ধাপ সিঁড়ি আছে এখানে। আমায় ধরে থাকো, নীচে নামতে হবে।

কুকুরগুলোর কি অবস্থা?—চাও জিজ্ঞেস করে।

—আর কোন ভয় নেই। টীক আছে এখানে। দলের সে সর্দার।

ধাপ বেয়ে তারা নীচে নামলে। কুকুর সর্বত্র। লোক তিনটিকে ঘিরে দূরে দাঁড়িয়ে

তারা বেপরোয়া চিৎকার করে চলেছে, কিন্তু আক্রমণ করছে না। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে চাও ও সঙ্গীদের। দম নিচ্ছে বারবার। সমস্ত শরীর কাঁপছে উত্তেজনায়।

জুরা বসে পড়ে আস্তে আস্তে ডাকলে,—টীক!

দাঁত বের করে, যেন হাসতে হাসতে, টীক এগিয়ে এল, সামনের দুই থাবা জুরার দুই কাঁধে রেখে সে মাথাটা রাখলে থাবার ওপর। চোখ জুরার মুখের ওপর নিবদ্ধ। গর্বে ও আনন্দে জুরা তাকে জড়িয়ে ধরলো।

চাও ও সঙ্গীদের চোখে তখন দুনিয়ার বিস্ময় ও আনন্দ। উচ্ছ্বসিত ভালবাসা ঝরে পড়ছে চাওয়ের দৃষ্টি থেকে ঃ হ্যাঁ, যেমন মনিব, তেমনি তার সহচর বটে! সাবলীল শক্তিমত্তার মূর্ত প্রতীক যেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে বললে,—চটপট করো, আর দেরি নয়। বেরোনোর পথ খুঁজতে হবে।

অন্ধকারে দু হাত বাড়িয়ে আর পা দিয়ে মেঝে ঠুকতে ঠুকতে তারা আবার চলতে শুরু করে। অজানা ভয়ঙ্কর পাতালপুরী। জুরা সামনে তরোয়ালের খোঁচা মারছে—সর্বত্র দেয়াল। এক জায়গায় এসে তরোয়ালটা ভেতরে ঢুকে গেল। ফাঁকা জায়গা। সেদিকে কিছুটা এগিয়ে যেতেই, কিসের গাদায় যেন তারা হোঁচট খায়। আঙুল দিয়ে জিনিসটা পরখ করে সঙ্গীদ বললে,—রেশম!

বহুকালের আধপচা রেশমের গাদা। অনেক কষ্টে তারা ওতে আগুন জ্বালতেই কামরাগুলো আলোকিত হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় কামরাটা ফাঁকা। তারা তৃতীয় কামরায় ঢুকলো। গবুর মড়া পচা তীব্র দুর্গন্ধ সেখানে।

হঠাৎ তারা চমকে উঠলো। এক কোণে একটা লোক মরে পড়ে আছে! তার পাশে বড় এক চামড়ার থলি। থলি থেকে এক গাদা সোনা ও রুপোর টাকা বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে।

শকুনের মতো সঙ্গীদ ছুটে গেল লাশটার দিকে। ছোঁ মেরে চামড়ার ব্যাগটা তুলে নিয়েই যেসব টাকা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে ছিল, সেগুলো সে পুরতে শুরু করলো থলির মধ্যে। তার পরেই সে ছুটে যায় কোণের দিকে। কয়েক ব্যাগ ভরতি রুপোর টাকা সেখানে। পাশে এক জায়গায় গর্ত, তার মধ্যে বহু রুপোর বাট নজরে পড়ছে। উত্তেজনায় সঙ্গীদের যেন দম আটকে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে চিৎকার করে উঠলো,—ইস্! হন্দর সাতেক তো হবেই!

লাশটার কাঁধ ধরে চিৎ করে শুইয়ে দিয়েই, সে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো,—আরে চের যে! সেই দুঙ্গান চের বেটা!

কে ও?—জুরা জিজ্ঞেস করলে।

—কেন, ভিখিরিদের সর্দারকে চেন না? বেটা খাঁটি কুত্তা, কিপচাকবের চর। কবরখানায় থাকে আর গায়ে গায়ে ভিখ মেগে বেড়ায়। ও-ই তো এবার আমায় কিপচাকবের লোকদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

বলতে বলতে সঙ্গীদ লাশটার মুখে এক লাথি মেরে থুথু দিতে দিতে বললে,—বুড়ো শয়তান, শেষ পর্যন্ত মরলি তুই!

চাও বললে,—তাহলে অন্য পথ যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। বেশীক্ষণ ও মরে নি। সম্প্রতি এখানে এসেছিল, তা-ও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আমাদের ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে ও ঢোকে নি নিশ্চয়ই। এখানকার গুপ্ত ধনদৌলতের কথা ও জানতো। পাহাড়টায় তোলপাড় শুরু হতেই, সেই ধনদৌলত সামলাতে এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুকুরের হাতেই খতম হলো।

সঈদ তখন অন্য কাজে ব্যস্ত। চাওয়ের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিতে দিতে, সোনাটা সে কোমরবন্ধে জড়িয়ে নিয়ে রুপোর ব্যাগ দুটোকে একত্রে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে কাঁধের ওপর দিয়ে।

তার অবস্থা দেখে জুরা ও চাও হেসে ফেললে। খোশমেজাজে সঈদ বললে,—হাসছো যে বড়! রুপো যে যা পার, নিয়ে নাও। আমার ব্যাগ থেকে কিছু দেব না কিন্তু। নিয়ে নাও, নিয়ে নাও। এ দিয়ে উট ও খাবার কিনতে হবে।

হঠাৎ দূরের সুড়ঙ্গ থেকে চিৎকার-আর্তনাদ ভেসে এল। কুকুরের পাল ছুটছে সেদিকে। একমাত্র লালচুলো রইল টীকের পাশে। টীক ক্ষণেকের জন্যও জুরাকে ছাড়ছে না। দোস্তের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হতে আর সে রাজী নয়।

সঈদ চেঁচায়,—চলো চলো! চটপট, চটপট!

কিন্তু কোথায় যাবে? বাকী রেশমের গাদায় তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। চারদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ লাশটা থেকে অল্প দূরে একটা ফাটল দেখা গেল।

ফাটল দিয়ে ওরা গলে বেরিয়ে এল। জুরা ও চাও একটা করে রুপোর ব্যাগ নিয়েছে। প্রত্যেকটার ওজন আধ মনের কাছাকাছি। সামনেই সরু একটা পথ—মাটি কেটে তৈরী। টীক আসছে জুরার পেছনে, আর সবার পেছনে লালমুখো।

পথ গেছে এঁকেবেঁকে—কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে। সবশেষে দেখা গেল, উঠে গেছে উপরমুখো। কিন্তু এক মাটির ধসের কাছে এসে তা-ও শেষ হয়ে গেল। আর এগোবার পথ নেই।

দারুণ রাগে ও হতাশায় সঈদ গোঁ গোঁ করে উঠলো। অন্ধকারে হাত দিয়ে সযত্নে মাটির ডেলা পরখ করতে করতে চাও বললে,—এর পরে আর রাস্তা নেই। ধসটা বহু পুরনো।

ফেরারীর দল কপাল থেকে ঘাম মোছে। সবাই নির্বাক। অন্ধকারে আবার চাওয়ের গলা শোনা যায়,—ঘাবড়ালে চলবে না, অন্য কোথাও নির্ঘাত বেরোনোর পথ আছে।

রাগে মাটিতে লাথি মারে জুরা। কিন্তু এ কী! মাটিটা যে ফাঁপা মনে হচ্ছে! জুরা আবার লাথি মারলে। হ্যাঁ, আবার সেই ফাঁপা আওয়াজ।

সবাই মিলে তারা মাটি খুঁড়তে শুরু করলে। একটু পরেই কি যেন একটা আংটার মতো জুরার হাতে ঠেকে। ওটা ধরে টান মারতেই একটা ঢাকনা উঠে এল। তার তলায় একটা কুয়ো।

ক্ষীণ একটা আলো আসছে কুয়োর তলা থেকে। কুয়োটা প্রায় মানুষসমান গভীর। দম আটকে তারা শোনার চেষ্টা করে—কোথাও কোন শব্দ আছে কিনা। কিন্তু না, নিস্তব্ধ সব।

জুরা কুয়োয় লাফিয়ে পড়লো। তলায় গিয়ে গুঁড়ি মেরে কোথায় যেন চলে গেল সে। আর জুরা চোখের আড়াল হতেই কুয়োর কিনারায় শুরু হলো টীকের ছুটো-ছুটি আর লাফালাফি।

চাও বললে,—ধরে রাখ ওকে। সরু কুয়ো। লাফ দিলে ওর ঘাড় ভাঙতে পারে।

কিন্তু টীক ততক্ষণে লাফ দিয়ে ফেলেছে। কুয়োর দেয়ালে ঘা খেয়ে সে কাত হয়ে পড়লো। তারপর লাফিয়ে উঠেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটলো জুরার খোঁজে। ওপরে লালচুলো তখন কেঁউ কেঁউ করছে। ঝাঁপ দেবে কিনা ঠিক করতে পারছে না।

কিছু পরে জুরার গলা কানে এল—ওদের সে নেমে আসতে বলছে। চাও আর সঈদ ভেতরে নেমে গেল। সরু পথে কিছুদূর এগোতেই ছোট এক চৌকো কামরায় এসে হাজির হয় তারা।

কবর একটা!—সঈদ বললে : আমরা কোন গোরস্থানে এসেছি।

একটা ফাটল দিয়ে বাইরে উঁকি মারতে মারতে জুরা বলে,—হ্যাঁ, গোরস্থানই বটে, একটা গাঁয়ের পাশে।

ধীরে ধীরে সে ফেরে চাও ও সঈদের দিকে। আনন্দে দীপ্ত তার চোখ। নিজেদের শরীরে যে হাড়-চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই, সেদিকে ওর নজর নেই। ওর চোখে পড়ে শুধু আনন্দে ঝলমল চাও ও সঈদের চোখমুখ।

দেখতে দেখতে জুরার চোখমুখের চেহারা পাল্টে যায়। গম্ভীর শ্রদ্ধানম্র কণ্ঠে শেষে ও বললে,—শোন চাও, আজ হলফ করছি, জীবনে মরণে তোমার দোস্ত থাকবো চিরকাল। হলফ করছি, আমার দানাপানির শেষটুকুও ভাগ করে খাব তোমার সংগে। আমার বাড়ি তোমারই বাড়ি হবে। আমার হাতিয়ারও হবে তোমার হাতিয়ার। আমার প্রাণের দোস্ত তুমি। আজ থেকে আমরা একই পাখির দুটো ডানা, একই ডালের দুটো কুঁড়ি যেন।

পরক্ষণে জুরা আর চাও বুক আলগা করে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলে গভীর আলিঙ্গনের মধ্যে।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে চাও বললে,—আমিও হলফ করছি জুরা, তোমার দোস্ত থাকবো চিরদিন। তোমার দুশমন আমারও দুশমন হবে। তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ। আমাদের চলার পথ এক হোক। আমাদের কাজের ফলে দুঃস্থ গরীবদের জীবন যেন সুখে সম্পদে ভরে ওঠে, নিপীড়িত মানুষদের দুঃখকান্নার যেন শেষ হয়। আমার সবচেয়ে আদরের ভাই, সবচেয়ে বড় দোস্ত তুমি।

বলতে বলতে চাও অন্য দিকে মুখ ফেরায়। আঙুল দিয়ে চোখ মুছছে সে আর বিড়বিড় করছে,—এঃ বড্ড ধুলো এখানে.... .

সঈদও নিজের বুক আলগা করে জুরা ও চাওকে পর পর আলিঙ্গন করে, দোস্তির শপথ নেয়।

হঠাৎ বাইরে থেকে লোকজনের গলা শোনা গেল। সঈদ ছুটে গেল ফাটলের কাছে, বাইরে উঁকি মেরে সঙ্গীদের সে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারা করলে,—চুপ! চুপ! আর কোন কথা নয়!

বাইরে থেকে সারাদিন ধরে লোকজনের গলা কানে আসে। দলে দলে মানুষ পাহাড়ে যাচ্ছে—সবাই উৎসুক গুপ্তধনের খবর জানতে।

রাত্রির অপেক্ষায় শ্রান্ত ক্ষুধার্ত ফেরারীর দল নীরবে বসে থাকে কবরের অন্ধ কুঠরির মধ্যে। ধরা পড়ার ভয় যে কোন সময়।

সঈদ এক সময় ফিসফিস করে বললে,—বড্ড খিদে পেয়েছে হে, কিছু খাওয়া দরকার।

রাত্রি নামে—গভীর হয় ক্রমশঃ। দেয়ালের গর্ত দিয়ে এবার বেরিয়ে এল ফেরারীর দল। নিঃশব্দে রওনা হয় তারা নদীর দিকে। সঈদ তাদের গাইড।

নদীর ধারে জংগল—ছোটবড় গাছপালা আর কাঁটা ঝোপে ভরা। কাঁটায় ওদের পা ছড়ে যায়, রক্ত ঝরে।

জংগলের মধ্যে ছোট এক ফাঁকা জায়গা। অন্যদের সেখানে অপেক্ষা করতে বলে, এক ব্যাগ রুপোর টাকা নিয়ে নদীর কূল ধরে সঈদ চলে গেল।

প্রহরের পর প্রহর পার হয়। রাত শেষ হয়ে আসছে। পুব আকাশে ভোরের ইংগিত। হিমে জমে গেছে নদীর পাড়। কিন্তু সঈদের তবু দেখা নেই।

ঘুম ভেঙে জুরাই প্রথম নীরবতা ভাঙলে,—আমাদের ফাঁকি দিয়ে সঈদ পালালো না তো?

শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে চাও। হিমে জমে ঠোঁট দুটো এমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে যে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। বললে,—না, এক ব্যাগ ভরতি রুপোর টাকা ফেলে পালানোর মতো লোক সঈদ নয়।

একটু পরেই টীক গরগর করে উঠলো। জল ভাঙার আওয়াজ আসছে। দেখতে দেখতে সঈদ এসে হাজির। একটা ঘোড়ায় সে চড়েছে, আরেকটার লাগাম ধরে আছে।

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে, কিছু জামা-কাপড় ও দুজোড়া বুট জুতো ওদের দিকে ছুড়ে দিয়ে সে বললে,—জামাকাপড় পরে নাও। সকাল হয়ে গেছে, এখন আর পালানোর উপায় নেই। রাত পর্যন্ত এই জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। ঘোড়া দুটো চরে বেড়াক। ইতিমধ্যে নিজেরাও কিছু খেয়ে নিই।

সবাই খাচ্ছে। টীক ও লালচুলোকেও খেতে দেওয়া হয়েছে। খেতে খেতে সঈদ বক-বক করে চলেছে সমানে,—তোমাদের দাড়িগোঁফ কামাতে হবে। ভারতবর্ষ থেকে আসছো বললে সবচেয়ে ভাল হয়। ওখান থেকে বহু লোক এখন এদিকে আসছে। আমার এক শিকারী দোস্ত আছে। তার কাছ থেকে ঘোড়া বদলে উট নেব। উত্তর দিকে যাব আমরা। এখনো কেউ কিছু জানে না। সব্বার ধারণা, আমরা কুকুরের পেটে গেছি। শুনলাম, দিনের বেলায় নাকি ধোঁয়া দিয়ে কুকুরগুলোকে গর্ত থেকে বের করা হবে......

উত্তরে আমি যাব না।—দৃঢ় কণ্ঠে জুরা বললে।

আরে ঘাবড়াও মাৎ!—সঈদ বললে : জয়নাব পালিয়েছে। তার পালানোর কথা ছাড়া শহরে এখন আর কোন আলোচনাই নেই। ঘোড়ায় চড়ে সে পালিয়েছে পুব দিকে। এক দোস্তের বাড়িতে আমার এক খুড়ীর সঙ্গে দেখা হলো। তার কাছেই সব শুনলাম। খুড়ীর নাম সমরু, তাগাইয়ের বৌদের ফাইফরমাশ খাটে, খিদমত করে। আমাকে সে সাহায্য করতে পারতো। কিন্তু আমি যে কয়েদ আছি, তা সে জানতো না। আর আমিও জানতাম না যে, তাগাই তার বিবিদের এখন এখানে রেখেছে। খুড়ী গাইড হিসেবে আমার খুড়তুতো ভাইকে দিয়েছে জয়নাবের সঙ্গে।

তাগাইয়ের কবল থেকে জয়নাব পালিয়েছে শুনে জুরা আনন্দে কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারে না, শেষে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে,—আমরাও তাহলে পুব দিকে যাব।

সঈদ বাধা দেয়,—তোমার কি মাথা খারাপ! তাগাইয়ের দলবল জয়নাবের জন্যে ছোট বড় সমস্ত পথের ওপর নজর রাখছে। তাদের চোখ এড়িয়ে আমাদের পুব দিকে সটকানো অসম্ভব। তা নয়, আমরা আগে যাব উত্তরে, তারপর পুবে।

চাও সমর্থন জানায়,—হ্যাঁ, সঈদ ঠিক কথাই বলছে।

একখণ্ড ঠাণ্ডা মাংস আর রুটি মুখে পুরে জুরা বললে,—বেশ, তাই হোক।

পঞ্চম পর্ব ৩

তাকলামাকান মরুভূমির ভেতর দিয়ে উটের পিঠে পালাচ্ছে ফেরারীর দল—জুরা, চাও ও সঈদ। পালাচ্ছে তারা উত্তর দিকে। আর তাদের খোঁজে তখন পুব সীমান্ত চষে ফেলছে তাগাইয়ের লোকজন।

তিন দিন হলো ভয়ঙ্কর এই নিষ্প্রাণ মরুভূমির ভেতরে তারা ঢুকেছে। রোদহীন ছায়াহীন বিজন মরুপ্রান্তর। মাথার ওপর আধা-স্বচ্ছ পুরু ধুলোর পরদা। আকাশ নজরে পড়ে না।

উষর মরু। পাথরের মতো শক্ত দিগন্তহীন নোনা বিলের বুক। ফুটিফাটা চৌচির। সর্বত্র শুধু ফাটল আর ফাটল—অন্তহীন অগণন। নোনা বিলের এই সব খাদ ও অবতলে জন্মায় না কোন কিছু, বাঁচেও না কোন কিছু। আদ্যিকালের শুকিয়ে-যাওয়া সমুদ্র-খাতের ভয়ঙ্কর স্মৃতিই শুধু মনে করিয়ে দেয়।

মরুর মৃত্যুনিথর স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা যেন মুসাফিরদের বুকের ওপর চেপে বসেছে। তারা চলেছে নীরবে, কদাচিৎ কথা বলছে দু-একটা। তা-ও ফিসফিস করে।

তিনটে উটের কাফেলা। সঈদ সামনে, সে-ই পথ-প্রদর্শক। তার পেছনে জুরা। দূরে একভাবে তাকিয়ে আছে সে। শরীর আরো শুকিয়ে গেছে। কালো হয়ে গেছে গায়ের রঙ। চোয়ালের হাড় যেন ঠেলে উঠেছে ওপর দিকে। তার পিঠে একটা ম্যাচলক বন্দুক। শিকারীরা ওটা সঈদকে উপহার দিয়েছিল।

জুরার পেছনের উটে চাও। দিগন্তহীন নির্মম ভয়াল মরুভূমি তাকে বিষণ্ণ ভীত করে তুলেছে।

কাফেলার পেছনে আসছে রোগা বিপর্যস্ত টীক। সফরের কঠোরতা লালচুলো সহ্য করতে পারে নি, পথেই মারা পড়েছে।

পিপাসা—নিদারুণ পিপাসা! মশকে এক ফোঁটা জল নেই। ওষ্ঠ নীল। চাওয়ের মনে হয়, চোখ বুজলে শুকিয়ে-যাওয়া চোখের সঙ্গে ঘষা লেগে চোখের পাতা যেন কড়কড় আওয়াজ করছে। জিভ সাদা, ফুলে উঠেছে। এক-একটা করে ঘণ্টা পার হচ্ছে, আর তাদের শরীরও শুকিয়ে আসছে সেই সঙ্গে।

সন্ধ্যা নাগাদ উটগুলো শুয়ে পড়লো। তারা উঠতে চায় না। অনেক কষ্টে যখন তোলা হলো, তারা নড়তে নারাজ। মুসাফিররা পিঠে চাপতেই তারা পড়ে গেল। বিরাট হাঁ করে চিৎকার ছাড়লে হিংস্র পাগলের মতো। সওয়ার তিনজন ত্রস্ত-বিহ্বল।

শেষ পর্যন্ত একটা উটই শুধু রওনা হলো আবার। বুনো জোয়ান সে—কালো দো-কুঁজো। অন্য দুটো সেখানে পড়ে রইল মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

হঠাৎ—ও কী! দূরে একটা হ্রদ দেখা যাচ্ছে না! নীল জল চিকচিক করছে। আনন্দে আত্মহারা মুসাফির তিনজন : যাক্ জান তাহলে বাঁচলো!

তারা জোরে পা চালিয়ে দেয়। কিন্তু ক্লান্তি ও অবসাদে হঠাৎ একবার তারা পড়ে গেল মাটিতে। একটু পরে যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন অবাক : কোথায় কি! কোথায় হ্রদ আর কোথায়ই বা জল! তারা বুঝতে পারে, ওসব কিছুই বাস্তব নয়—মরীচিকা, মরু-ভূমির মায়া মরীচিকার হাতছানি শুধু।

টলতে টলতে তারা চলেছে—পড়ছে, উঠছে, হাঁটছে, আবার পড়ছে। মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির অশক্ত-বিকল মানুষগুলির পেছনে আসছে টীক—টলতে টলতে। নিদারুণ অব-সাদে তারও চলার শক্তি যেন ফুরিয়ে আসছে।

এর পরেও জুরা ম্যাচলকটা হাতছাড়া করতে নারাজ। সঈদও তেমনি রুপো ছাড়তে রাজী নয়।

ভোর নাগাদ তারা অসীম ক্লান্তি ও অবসাদে ভেঙে পড়লো।

বালিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে তারা পড়ে থাকে। মাথার ওপর সূর্য যেন আগুনের গোলা। তাদের নড়াচড়া নেই—বিকারগ্রস্ত অবস্থা।

রাতে মরু ঠাণ্ডা হয়। আবার তারা হাঁটতে শুরু করে। পথে একটা মরা উট পড়লো। করুণ বিষণ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে চাও কি যেন বলে বিড়বিড় করে।

ক্ষীণকণ্ঠে সঈদ জিজ্ঞেস করে,—কি বলছো?

—বলছি, আমাদের পথ ভুল হয়নি তো? তাহলে ঐ উটটার মতোই চিরকালের জন্যে এই ভয়ঙ্কর মরুর বুকে আমাদের থেকে যেতে হবে!

সঈদ চারদিকে তাকায়। চোখে ভীতত্রস্ত চাউনি।

সঈদ ক্রমেই পেছিয়ে পড়েছে। রুপোর বোঝা সে আর বইতে পারছে না। তার দুই চোখ ফুলে গেছে। শেষ পর্যন্ত টাকার ব্যাগটা সে কোনরকমে বালির ওপর দিয়ে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চললো। পথে টাকা ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যাগটা এক সময় খালি হয়ে গেল।

এমনি করে সে রাত কাটলো। পরের দিনটা কাটলো তাদের গর্তের মধ্যে—অর্ধমৃত অবস্থায়।

রাতে আবার তারা রওনা হয়। প্রতি পাঁচ পা অন্তর টীক শুয়ে পড়ছে দম নেবার জন্যে।

হঠাৎ ও কী! গাছপালা দেখা যাচ্ছে না! কিন্তু আবার সেই মরীচিকা নয় তো! তারা হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। হাঁটার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে।

গাছপালার জঙ্গলের ধারে এসে তারা পেঁাছলো একসময়। না, মরীচিকা নয়! কিন্তু জল—কোথায় জল?

পিপাসায়, অবসাদে আর হতাশায় তারা এলিয়ে পড়লো গাছপালার নীচে। দেহ অসাড়। বিকারে প্রলাপ বকছে। টীক কিন্তু তখন ওখানে নেই।

জুরার এক সময় জ্ঞান ফিরে এল। রাত কত, কে জানে! টীক তার হাত চাটছে। হাত দিয়ে সে টীককে ঠেলা মারে সরিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু এ কী—টীকের গায়ের লোম যে ভিজে!

জল!—জুরা চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না। হামাগুড়ি দিয়ে সে চললো টীকের পেছনে। অনেকক্ষণ পরে নল-খাগড়ার এক ঝোপঝাড়ের ধারে এসে সে পেঁাছলো। সামনের নল-ঝোপটা সরাতেই—অ্যাঁ, জল!

আঃ! জুরা সোজা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো......

এর পর চাও আর সঈদও সুস্থ হলো জল পেয়ে।

নল-খাগড়ার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে তারা রওনা হয় আবার। ভোর হয়ে আসছে। কিন্তু বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ কেন? তারা সচকিত হয়ে উঠলো।

সন্তর্পণে কিছুটা এগোতেই তারা দেখে, বিরাট এক উটের কাফেলা তাঁবু গেড়েছে। তারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। বন্দুকটা এক ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে তারা গিয়ে দেখা করলো কাফেলা-মালিকের সঙ্গে। সামান্য তাদের প্রার্থনা—উট-তদারকির চাকরি। বিনিময়ে শুধু খেতে পেলেই চলবে। মালিক সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলো।

চাকরিতে বহাল হবার পর দশ দিন কেটে গেছে। বিরলবসতি এক দেশের ভেতর দিয়ে তারা চলেছে। শীত শেষ হবার মুখে। কিন্তু আবহাওয়া তবু ঠাণ্ডা; বরফ পড়ছে মাঝে মাঝে। এগার দিনের দিন তারা এক বাজারে এসে পেঁাছলো। তখন তুমুল হিম-ঝঞ্ঝা চলেছে আর চলেছে সুচের মতো ধারালো তুষারপাত।

বাজারে ঢুকেই টীক কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অদূরে তার সামনে একপাল কুকুর। বাতাসে টীক যেন কিসের গন্ধ পেয়েছে, বাতাস শুঁকছে বারবার।

একটু পরেই সে ধেয়ে গেল কুকুরগুলোর দিকে। তাদের সামনে মাদুর আর কম্বলের

এক গাদা। তার ভেতরে ঢোকার সরু পথটা আগলে এক ছাইরঙা কুকুর বসে আছে। সে-ই দলপতি।

কম্বলের গাদার খোঁড়লের ভেতর থেকে বিকারগ্রস্ত এক মানুষের অস্ফুট কাতরানি ভেসে আসছে।

টীক ছাইরঙা কুকুরটাকে ছিটকে দূরে ফেলে গুঁড়ি মেরে ঢুকে গেল গর্তের মধ্যে। ভেতরে মৃত্যুপথযাত্রী এক বুড়ো ভিখিরি। উষ্ণ জিভ দিয়ে বুড়ো লোকটার মুখ চাটে টীক, আর কেঁউ কেঁউ করতে থাকে। অবোলা জীব, কথা বলতে পারে না—মুখ চেটে আর কেঁউ কেঁউ করে ভালবাসা ও সমবেদনা জানায়।

একটু পরেই সে লাফিয়ে বাইরে এল, ছুটে গেল জুরার কাছে। সে কেঁউ কেঁউ করে আর জুরাকে টানতে থাকে কোটের কিনারা কামড়ে ধরে।

কি ব্যাপার রে, টীক?—জুরা জিজ্ঞেস করে।

টীকের কিন্তু তর সইছে না। কোট কামড়ে ধরে জুরাকে সে টেনে নিয়ে গেল কম্বলের গাদার ধারে।

চাও ও সঈদের সাহায্যে কম্বলগুলোকে পাশে সরিয়ে জুরা ঝুঁকে পড়লো বুড়ো লোকটার ওপর। বললে,—এক বুড়ো দেখছি। শীতে জমে আসছে।

টীকের কিন্তু ছুটোছুটির বিরাম নেই। সে চিৎকার করছে, এক-একবার গিয়ে কামড় বসাচ্ছে কুকুরগুলোকে আর ছুটে গিয়ে মুখ চাটছে বুড়ো লোকটার।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বুড়ো হঠাৎ চোখ মেললে, ক্ষীণ অস্ফুট কণ্ঠে বিড়বিড় করে উঠলো,—জুরা! জুরা!

জুরা চমকে চেঁচিয়ে উঠলো,—অ্যাঁ, কুচাক! এ যে কুচাক দেখছি!

জুরার গলা কানে যেতেই কুচাকের জ্ঞান ফিরে এল। হঠাৎ জুরাকে দেখে ভুকরে কেঁদে উঠলো সে।

মৃত্যুর হিমশীতল অসীম অন্ধকারের দরিয়ায় কুচাক তলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। জুরাকে দেখেই সে ডুবতে ডুবতে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো, তার দু হাত জড়িয়ে ধরে চেপে ধরলো নিজের মুখের ওপর।

চাও চোখের জল রোধ করতে পারে না। অন্য দিকে মুখ ফেরায়। কুচাকের কথা সে বহুবার শুনেছে জুরার কাছে। এখন সে দেখছে সেই কুচাককে—কী করুণ অসহায় অবস্থা! আর কী পরম নির্ভরতায় সে জড়িয়ে ধরেছে জুরাকে!

হিমঝঞ্ঝায় তুষারকণা বাইরে ঘুরপাক খাচ্ছে, লোকজনের মুখের ওপর পড়ে গলে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। মনে হচ্ছে, মানুষজন বুঝি কাঁদছে। ঝোড়ো হাওয়ায় বিষাদের সুর—কাঁদছে বুঝি প্রকৃতিও।

হঠাৎ করুণ কণ্ঠে ডুকরে উঠলো টীক।

•

কাফেলাটা থেমেছে গ্রামের বাইরে—কয়েক দিন বিশ্রামের জন্যে। তাঁবুর ভেতরে উষ্ণ আগুনের পাশে বসে আছে কুচাক। অনেক চেষ্টার পর মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে সে। তার হাসি ও কান্না চলেছে পালা করে। বলছে সে নিজের অতীত জীবনের কান্নায় ভেজা বেঁচে থাকার লড়াইয়ের কাহিনী।

কারো চোখ শুকনো নেই। জুরা নত চোখে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ ডলতে ডলতে চাও বললে,—ইস্ বড্ড ধোঁয়া দেখছি!

সঈদ কামিয়ে দিয়েছে কুচাককে। তার ফলে কুচাকের বয়স যেন কমে গেছে অনেকখানি। বেশ স্বাস্থ্যবান চকচকে দেখাচ্ছে তাকে।

শেষে কুচাক জিজ্ঞেস করলে,—তুমি কেমন ছিলে, জুরা?

জুরা বললে,—টীক না থাকলে আমি বাঁচতাম না, আমাদের কেউই বাঁচতো না। তুমিও বাঁচতে না। দুনিয়ায় টীকের মতো দোস্ত আর হয় না, বুঝলে?

আগুনের পাশে মাদুরের ওপর শুয়ে আছে কালো বিশালকায় টীক। নিজের নাম কানে যেতেই সাগ্রহে জুরার দিকে তাকিয়ে সে লেজ নাড়তে শুরু করে।

জুরা, কুচাক, চাও আর সঈদ সস্নেহে তাকায় তার দিকে।

নরম গলায় জুরা ডাকলে,—টীক!

গম্ভীর চালে টীক উঠে দাঁড়ায়, সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে হেলেদুলে এগিয়ে যায় মনিবের কাছে। তারপর সামনের দু পা দিয়ে প্রিয়তম দোস্তের গলা জড়িয়ে ধরে তার চোখে চোখ রেখে দাঁড়ালো সে। জুরা তাকে বুকে চেপে ধরলো।

বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত অন্য মানুষ তিনটি মুগ্ধ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে সেই অপরূপ দৃশ্যের দিকে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পর্ব ১

কাশগড়িয়া আর সোভিয়েত কিরঘিজিয়ার মাঝখানে সীমান্ত বরাবর চলে গেছে গিরিশ্রেণী।

রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করে সোভিয়েত কিরঘিজিয়ার সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে চারজন লোক—জুরা, কুচাক, চাও ও সঈদ। কাফেলা মালিককে না বলে তাঁবু থেকে পালিয়েছে তারা। হাঁটছে দ্রুত পায়ে। সীমান্ত পেরিয়ে সোভিয়েত এলাকায় ঢোকাই তাদের উদ্দেশ্য। সঈদ পথপ্রদর্শক।

সীমান্ত বরাবর লালফৌজের টহলদার ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সতর্ক প্রহরা। রক্ষী-দের সঙ্গে দেখা করে সীমান্ত পার হবার প্রস্তাব দিয়েছিল চাও। আর তা শুনে সঈদ তো রেগেই অস্থির। এই সব রক্ষীদের সঙ্গে মোলাকাতের অনেক দুঃখকষ্টের অভিজ্ঞতা তার আছে। তাই দেখা করার প্রশ্নই ওঠে না। 'বিশেষ একটা জায়গা' তার জানা আছে, যেখান দিয়ে ভেতরে ঢোকা খুব একটা কঠিন হবে না।

ঘন কাঁটাঝোপের জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ পথ। সেটা পেরোনোর পর এক গিরিসংকটে এসে তারা হাজির হয়। কঠিন চড়াই বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। শেষে তাদের সামনে পড়লো দুরারোহ এক খাড়া পর্বত। হিমেল ঠান্ডা বাতাস আসছে তার ওপরের এক হিমবাহ থেকে। পর্বতের ডান দিকের গা বেয়ে তারা ওপরে উঠতে শুরু করলো। কঠিন বিপদসংকুল পথ।

ঘণ্টা তিনেক ওঠার পর একটা বনভূমি পার হতেই দেখা গেল এক পার্বত্য তৃণভূমি। কিন্তু মুসাফিরদের তখনো বিশ্রাম নেই।

সামনেই আর এক পর্বত। তার তুলনায় যে পর্বতটা তারা পার হয়ে এল, তাকে পাহাড় মনে হয়। চারদিকে তুষার-মৌলী পামীর-শিখরমালা উদীয়মান সূর্যকিরণে ঝল-মল করছে। দুপুর নাগাদ তারা দৈত্যাকার পর্বতটার ঢালুতে এসে পেঁছিলো। তুষার গলেছে। বেশ রোদের তাপ। ছোট ছোট অসংখ্য ঠান্ডা হিমেল জলধারা মিষ্টি কুলুকুলু রবে পর্বত বেয়ে নীচে নামছে। প্রান্তরে হলদে, লাল, নীল, বেগুনী প্রভৃতি কত রঙের অসংখ্য ফুলের সমুদ্র যেন। বাহারে রঙের এত উজ্জ্বল সমরোহ যে, নীচেকার সবুজ ঘাস চোখে পড়ে না।

দূরে ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে তিনটে ভেড়ী চরছে। অল্প দূরে ছোট এক ঝরনার ধারে তাদের পাহারায় নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে আছে বড় একটা ভেড়া। ভেড়ীদের কাছেই ঘুরছে হলদে-ছাইয়ে রঙের বড় বড় কয়েকটা পাখি—উলার। হঠাৎ উলারগুলো মাথা তুললো।-সন্দেহজনক শব্দ তাদের কানে এসেছে। একটা উলার উড়ে গিয়ে উঁচু

এক টিলার ওপর বসেই ডেকে উঠলো। তীক্ষ্ন শিসের মতো আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে সচকিত ভেড়ার পাল উধাও।

লুব্ধ চোখে জুরা তাকিয়ে আছে স্বদেশের পামীরশ্রেণীর দিকে। দেখে দেখে যেন আশ মেটে না। নিশ্বাস নেওয়া এখানে কত সহজ। গিরিরাজ্যের ঠাণ্ডা টাটকা মিষ্টি বাতাস সে টেনে নেয় ফুসফুস ভরে।

খাড়াই বেয়ে তারা এগোচ্ছে অতি কষ্টে। কিন্তু একসময় তা-ও বন্ধ হয়ে গেল। সামনে পর্বতটা সোজা খাড়া উঠে গেছে। পর্বতের গা বেয়ে বা আরো স্পষ্ট করে বললে, সেই দুর্লঙ্ঘ্য খাড়াইয়ের কিনারা ঘেঁষে খুব অস্পষ্ট এক ছাগল-চলা পথের রেখা সোজা ওপর দিকে গেছে দেখা যায়। কিছুদূর গিয়ে পথটা এত সরু হয়ে গেছে যে, একটা পা কোনরকমে বাখা চলে। তারপর তা-ও আর নজরে পড়ে না। বহু—বহু নীচে এক খর-স্রোতা পার্বত্য নদী সাদা এক সরু ফিতের মতো এলিয়ে আছে যেন।

জুতো খুলে তারা পেছনে কোমরবন্ধে ঝুলিয়ে নিলে। টীককে জুরা ফিতে দিয়ে বেঁধে নিলে কাঁধের সঙ্গে। তারপর পর্বতের গায়ে বুক ঠেকিয়ে, গর্তে আঙুল আটকে আর এবড়োখেবড়ো পাথর আঁকড়ে ধরে প্রায় দম আটকে তারা ওপরে উঠতে শুরু করলো।

অবিশ্বাস্য ভয়ংকর এই ঊর্ধ্বারোহণ। লহমার অসতর্কতায় ভবলীলা সাঙ্গ হওয়ার বিপদ পদে পদে—হাত-পা হড়কে কোথায় কোন্ অতলে গিয়ে পড়বে, কেউ জানে না......

শেষ পর্যন্ত তারা উঠে এল প্রশস্ত সমতল এক পাথরের ওপর।

রোদের তাপে পাথর গরম। টীককে কাঁধ থেকে না খুলেই জুরা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। টীক হলো তার মাথার বালিশ। আর তাদের ভয় নেই। তারা এখন সোভিয়েত এলাকার মধ্যে।

একটু পরেই টীক কিন্তু গোঁ গোঁ করতে শুরু করে। ছটফট করছে সে ছাড়া পাবার জন্যে।

হঠাৎ এক কণ্ঠস্বর ভেসে এল—সেলাম আলায়কুম!

প্রায় গজ কুড়িক দূরে এক পাথর-ঢিবির পেছন থেকে এক বৃদ্ধ সোজা চেয়ে আছে তাদেব দিকে। তার পাশে পাথরের ওপর একটা ম্যাচলক বন্দুকের নল ওদের দিকে তাক করা।

সর্বনাশ! অসহায় ত্রস্ত চোখে সঈদ, চাও ও কুচাক এদিক-ওদিক তাকায়। কিন্তু পালানোর পথ নেই।

আলায়কুম সালাম।—জুরা প্রত্যভিবাদন জানায়। আগন্তুকের ওপর তার স্থির দৃষ্টি।

বৃদ্ধ আগন্তুকের হাবভাব অবিচলিত স্থিরপ্রতিজ্ঞ। কপাল প্রশস্ত। চোয়ালের হাড় আর ঝুলে-পড়া ঘন গোঁফ জোড়া সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবচেয়ে নজরে পড়ে তার লম্বা সাদা দাড়ি, কিরঘিজদের মধ্যে যা খুব কমই দেখা যায়। নিজের সে পরিচয় দেয় শিকারী হিসেবে।

ওরা অত্যন্ত অবাক হয়, যখন দেখে যে বুড়ো জুরাকে চেনে খুব ভালভাবেই। জানে জুরার শপথের কথা, এমন কি খাঁদার গুলিতে জখম হওয়ার পর আল্লাকে সে যে শাপ-শাপান্ত করেছিল, তাও তার অজানা নেই।

তাজ্জব কাণ্ড!—ফ্যাল ফ্যাল করে জুরা চেয়ে থাকে বুড়োর দিকে : লোকটা অনেক কিছুই জানে দেখছি!

বৃদ্ধ আগন্তুকও কম বিস্মিত হলো না, যখন শুনলো, রাত্রিবেলায় গোপনে ওরা সীমান্ত পার হয়েছে।

সঈদ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সে একটা কৈফিয়ত খাড়া করার চেষ্টা করতেই আগন্তুক বললে,—তোমার নাম সঈদ না? চোরাচালানদারিতে ওস্তাদ টেরাচোখো সঈদ, তাই না?

সঈদ আরো ঘাবড়ে যায়। ত্রস্ত কণ্ঠে বলে,—কিন্তু তুমি কে? তোমায় তো চিনতে পারছি নে।

ইদ্রিস বলে ডেকো।—বলতে বলতে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় ঠোঁটে ঠোঁট চেপে শিকারী ফিরলো চাওয়ের দিকে। চাওয়ের পরিচয় পেয়ে বললে,—তোমার কথা আমি শুনেছি।

এমনি করে বেশ কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর বুড়ো যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। সে বেরিয়ে এল পাথরের পেছন থেকে। লোকটা, দেখা যায়, খোঁড়া। বললে,—খোঁড়া আমি, তাই ছেলেকে নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিলাম। গতকাল হঠাৎ আর এক শিকারীর কাছে শুনলাম, লুঠেরা বাসমাচিদের দল রাতে সীমান্ত ডিঙিয়ে এদিকে আসছে। এখন কি করা যায়, বল তো?

সঈদ ও কুচাকের মত হলো, এ ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই।

কিন্তু চাও মাথা নাড়ে,—না, আমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করা উচিত।

আর জুরা! স্থির চোখে শিকারীর দিকে তাকিয়ে চিন্তিত কণ্ঠে বললে,—একটা বন্দুকও যদি পেতাম!

সে কথার জবাব না দিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বুড়ো শিকারী বললে,—ছেলেকে আমি পার্টিজান ফৌজের কাছে পাঠিয়েছি সীমান্ত রক্ষীদের হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যে। কিন্তু তোমরা যদি গলে আসতে পার তো, বাসমাচিরা পারবে নির্ঘাত। এখানে অসংখ্য যেমন পর্বতশ্রেণী, তেমনি বহু গিরিদ্বারও। তাছাড়া আমার ছেলে যখন পথে, তারই মধ্যে ওরা সীমান্ত পেরিয়ে আলাই উপত্যকার পাহাড়ে-পর্বতে গা ঢাকা দেবে আর সেখান থেকে হানা দেবে গাঁয়ের পর গাঁয়ে, লুঠতরাজ আর খুন করবে চাষীদের। কি করা যায় এখন?

কি করবো বলো?—জুরা ভ্রূ কোঁচকায়: একটা রাইফেল যদি পেতাম, ওদের একটাকেও পার হতে দিতাম না। তাছাড়া—

একটু থেমে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে আবার সে বললে,—তোমায় চিনি নে। এ ব্যাপারে কি করে তোমায় বিশ্বাস করি?

তা, কথাটা মন্দ বলোনি, শিকারী মৃদু হাসলো: কিন্তু জুরা, তোমাকে আমি চিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে।

তারপর সে জুরার জীবনের বিভিন্ন ঘটনার লম্বা এক ফিরিস্তি দিয়ে গেল একের পর এক। সবশেষে বললে জয়নাবের কথা, জানালো—তাগাইয়ের কবল থেকে পালিয়ে জয়নাব মিন-আরখার গাঁয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু তাগাইয়ের আবার সেখানে যাওয়া অসম্ভব নয়। যদি যায়?

ওঃ!—হঠাৎ যেন চাবুক খেয়ে জুরা সোজা হয়ে বসলো, বললে: তুমি কে?

—যেই হই না কেন, শুধু শুনে রাখ, বাসমাচিরা তোমার মতো আমারও সবচেয়ে বড় দুশমন। কিন্তু—কিন্তু জুরা, তুমি এখন কোন্ পক্ষে?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল,—সোভিয়েত শক্তির আমি বিশ্বস্ত বন্ধু। তাগাই, খাঁদা, কজিৎজুকি ও অন্য বাসমাচিদের শেষ না করা পর্যন্ত আমার বিশ্রাম নেই। এ কাজে আমরা সবাই তোমায় সাহায্য করবো।

বলতে বলতে জুরা উঠে দাঁড়ালো। শিকারী ইদ্রিস ভারী খুশী। কুচাককে দেখিয়ে সে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে, জুরা পরিচয় দিলে।

কাঁধ থেকে টীকের বাঁধন জুরা ততক্ষণে খুলে দিয়েছে। ইদ্রিসকে লক্ষ্য করে টীক গরগর করে উঠতেই শিকারী ডাকলে,—টীক, টীক!

অমনি এক তাজ্জব ব্যাপার! টীক হঠাৎ কান খাড়া করলে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে শিকারীকে কয়েকবার শুঁকে খুশিতে দাঁত বের করে মুখ বেঁকালে। হাসলো মনে হয়।

শিকারীর কণ্ঠস্বরে আর টীকের নাম সে জানে দেখে জুরা আরো অবাক হয়। শিকারী যে স্বরে টীককে ডাকলো, ঠিক সেই স্বরে তাদের সঙ্গে কথা বলে নি। আর সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার, এ স্বর যেন জুরার খুবই পরিচিত—বহুবার শোনা। অথচ সে ধরতে পারছে না।

সঈদ এদিকে জুরাকে চোখ টিপছে, ইশারায় বলছে, শিকারীকে এই সুযোগে নিরস্ত্র করে নীচে গিরিখাতে ফেলে দেওয়া যাক।

সে ইশারা বুড়োর নজর এড়ায় না। সে বললে,—আমায় মেরে তোমার কি ফয়দা হবে, টেরাচোখো?

সঈদ থতমত খেয়ে যায়,—বটেই তো, বটেই তো! মিছিমিছি মস্করা করছিলাম। অবশ্যি এ ধরনের মস্করা যে ঠিক নয়, তা বুঝতে পারছি।

শিকারীর তীক্ষ্ন দৃষ্টি ও বুদ্ধি দেখে সে মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তাকে দেখিয়ে ইদ্রিস জুরাকে জিজ্ঞেস করলে,—আমাদের যে উদ্দেশ্য, তার মধ্যে ওকে কি আনা চলে? আস্থা করার মতো লোক?

নিশ্চয়ই।—দৃঢ় কণ্ঠে জুরা জবাব দিলে ঃ ও আমার দোস্ত। গর্তে কয়েদ থেকে একসঙ্গে তকলিফ ভোগ করেছি। আমার দোস্তি পেতে চাও তো সঈদকেও তোমার বিশ্বাস করতে হবে।

বেশ, তাই হবে।—অনিচ্ছার সঙ্গে ইদ্রিস বলে।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে চাও।

সঈদ ইতিমধ্যে হম্বিতম্বি জুড়ে দিয়েছে,—জুরাকে কি জিজ্ঞেস করছো? জিজ্ঞেস করতে হয় তো আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি চাই কিনা তোমার দোস্ত হতে!

বুড়ো শিকারীর চোখে ভ্রূকুটি। সে ধমকে উঠলো,—হেই টেরাচোখো, তোমার তড়পানি থামাবে কিনা!

সঙ্গে সঙ্গে সঈদ ঠাণ্ডা।

সবাই নীরব। শেষে শিকারী বললে,—বাসমাচিরা দশ, কুড়ি বা তিরিশ জনে ভাগ ভাগ হয়ে বিভিন্ন পথ ধরে যাবে। তাগাই কোন্ পথে যাবে, নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়। আমরাও এবার ভাগ হবো। ঐ যে পর্বতটা দেখা যাচ্ছে, টেরাচোখো আর কুচাক যাবে ওখানে। ওখান থেকে উপত্যকাটা ভাল দেখা যায়। বাসমাচিরা উপত্যকা দিয়ে গেলে, ওরা পর্বতে আগুন জেবলে আমাদের সংকেত জানাবে। পুব থেকে ঐ যে তিন নম্বর শৈলশিরাটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে উত্তরের ঢালুতে বড় এক জুনিপার গাছের কাছে শিকারীদের জমা-করা বহুৎ শুকনো কাঠ আছে। কাঠগুলো ভিজিয়ে নিও, তাহলে যথেষ্ট ধোঁয়া হবে। ডাকাতরা আগুন দেখে সন্দেহজনক কোন কিছু আঁচ করতে পারবে না, মনে করবে রাখালেরা বুঝি জেবলেছে।

সঈদ কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বুড়ো শিকারী আবার বললে,—আর

আমি, জুরা ও চাও যাব ঐ পর্বতটায়, ওই যে ঐ তুষার-চূড়োয়। ওখানে গোপন পথে এমন একটা জায়গা আছে, যেখানে মাত্তর দু-একজনই গা ঢাকা দিয়ে দুশমনদের দলকে দল শুধু আটকানো নয়, একেবারে সাবাড় করে দিতে পারে।

বলতে বলতে সে জুরার দিকে ম্যাচলকটা এগিয়ে দিয়ে ব্যাগ থেকে বের করলে রুটি আর ঠাণ্ডা সেদ্ধ মাংস।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে কুচাক ও সঙ্গীদ রওনা হয়ে গেল। ইদ্রিস, জুরা আর চাও-ও বেরিয়ে পড়লো।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তারা শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইদ্রিস ও চাও ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু জুরার চোখে ঘুম নেই। আগাইয়ের সঙ্গে শেষ মোকাবিলা করার জন্য তার দেহ-মন আজ উন্মুখ।

গভীর চিন্তায় সে মগ্ন ঃ আচ্ছা, দেওদের কাছে কোরবানি দিলে কেমন হয়? তারা তাহলে সাহায্য করবে, সে জিতবে পরক্ষণে তার চমক ভাঙে। কি সব আজেবাজে কথা ভাবছে! জাদুর কথা কি সে ভুলে গেল, মরীচিকা ছাড়া যা কিছু নয়! কি রকম বুনো সে ছিল! তাই তো খাঁদা তাকে গুলি করতে পেরেছিল। পার্টিজান বাহিনীতে থেকে অনেক কিছু সে শিখেছে, অনেক মোহও টুটেছে

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জুরা। ভোর হচ্ছে। মুহূর্তে মুহূর্তে পাণ্ডুর আকাশের পটভূমিকায় স্পষ্টতর হয়ে উঠছে শিখরমালা। দূর থেকে নেকড়ের ডাক কানে আসে। পূব দিগন্তে ধূসর মেঘমালার ওপর অংশে ফ্যাকাসে পাতলা লালের ছোপ। আকাশ ক্রমেই জ্যোতির্ময় রূপ নিচ্ছে। রক্তবরণ গিরিশিখর—তাদের ওপর কে যেন রক্ত ঢেলে দিয়েছে।

জুরা উঠে দাঁড়ায় ম্যাচলকটা নিয়ে। ঢালু বেয়ে এগিয়ে যায় নিঃশব্দে। টীক আগে আগে ছুটছে।

একের পর এক জলধারা জুরা সহজেই লাফিয়ে পার হয়ে যায়। আর আপনমনে ভাবে—এই যে সব স্রোতধারা, এদেরই মতো আমার জীবন। অন্যান্য স্রোতধারার সঙ্গে মিশলে আমি হবো শক্তিশালী বেগবান, পর্বতও সরাতে পারবো। কিন্তু একলা এক-খানা পাথরও টলাতে পারবো না।

প্রথম পর্ব ২

কাশগড়িয়ার সারিকল জেলায় ইমাম বলরককে সবাই সাধুসন্ত পীর হিসেবে বিশেষ-ভাবে মানে গোনে।

খুব বেশী হলে বছর পাঁচেক এ এলাকায় তিনি এসেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে বয়স্ক মোল্লারাও তাঁর কথায় ওঠে বসে। ভিখিরিদলের মাতব্বররা তাঁর হয়ে কাজ করে, তার বদলে পায় মোহর। তাঁর বাড়ির দরজায় দরবেশদের নিয়মিত ভিড়।

ইমামকে সর্বত্র দেখা যায়—কখনও ফেরগানায়, কখনও কাশগড়িয়ায়, কখনও বা লেখ-এ। সময় সময় অনেক দিন তাঁর পাত্তা মেলে না। ফিরে এসে তিনি প্রচার করেন, হজ্ করতে মক্কায় গিয়েছিলেন।

কেউ যদি বলে, বিশেষ এক রাষ্ট্রের গুপ্তচর-তালিকায় ইমাম বলবকের নাম রয়েছে, তাহলে কে বিশ্বাস করবে সে কথা? কে বিশ্বাস করবে যে, সে তালিকায় বলবকের নাম রয়েছে ১২৩ এন. বি. নম্বর গুপ্তচর হিসেবে? খবরটা এতই গোপনীয় আর চমকপ্রদ এবং ইমাম বলবক এমনই সম্মানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত যে, কেউ বিশ্বাস তো করবেই না, বরং এ কথা প্রকাশ্যে প্রচার করার হিম্মৎ যদি কারো হয় তো, দেখা যাবে এ দুনিয়া থেকে হঠাৎ একদিন সে নিঃশব্দে উধাও হয়ে গেছে।

ইমামের অনুপস্থিতি কালে অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করে তাঁর অন্যতম একজন সেক্রেটারী। দীর্ঘকায় লোকটির অনেকগুলি ভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলার ক্ষমতা অসাধারণ। কিন্তু একটা ব্যাপার দীনদারদের কাছে খুবই খারাপ লাগে। সেটা হলো, সেক্রেটারীর মাথার চুল কালো হলেও চোখ দুটো শ্বেতাঙ্গদের মতো নীল। কিন্তু লোকটা বহু হাদিস জানে, দীনদাররা তাই তার অমুসলমানী বিশ্রী নীল চোখ দুটো মেনে নিয়েছে।

ইমামের আরেকজন সেক্রেটারীও আছে—রোগা চেহারা, ময়লা গায়ের রঙ, মাথার চুল কালো। লোকটা সাপের মতোই পিচ্ছিল ও গতিশীল। কিরঘিজ, তারাঙ, উজবেক ও চীনাদের মধ্যেই শুধু নয়, তিব্বতের তুরগুতদের মধ্যেও তার চর আছে। তার ওপর যে কোন জায়গার মানচিত্র আঁকার ক্ষমতাও তার অদ্ভুত। বিশেষ বিশেষ লম্বা জরুরী সফরের সময় ইমাম একে সঙ্গে নেন।

ইমাম বলবকের বিশেষ দর্শনপ্রার্থীদের বেশির ভাগই রাত্রে এসে দেখা করতে।

ইদ্রিসের সঙ্গে জুরার দেখা হওয়ার কিছুকাল আগের ঘটনা। রাতটা বেশ গরম। ইমামের বাড়ি ও উঠোন ঘিরে উঁচু পুরু কাদার পাঁচিল। তার সামনে এসে তিনজন ঘোড়সওয়ার থামলো।

দরজার পাশে মানুষ-সমান উঁচুতে গোপন জায়গায় লুকনো একটা ছোট্ট বোতাম। ঘোড়সওয়ারদের একজন গিয়ে বোতামটা টিপলে।

ভেতরে দরজার পেছন থেকে প্রশ্ন এল,—কে?

আগন্তুক জবাব দিলে,—সত্যসন্ধানী।

—সত্যসন্ধানীদের মঙ্গল হোক। কিভাবে এলেন?

—কালো, ধূসর আর সাদায় চড়ে। কে, মাহ্‌মুদ?

—হ্যাঁ, আসুন। ইমাম অপেক্ষা করছেন।

দরজা খুলে গেল। ঘোড়াগুলোর দায়িত্ব নিলে ইমামের নির্বাক বান্দার দল, আর মাহ্‌মুদ আগন্তুকদের নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে।

ঘরে গোল উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। এক কোণে গালিচার ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে ইমাম কোরান পাঠে রত—অন্ততঃ তাই মনে হয়।

গাট্টাগোট্টা চেহারার মানুষ ইমাম! মুখে পাতলা লালচে দাড়ি, কিন্তু গোঁফ পরিষ্কার কামানো। মনোযোগের সঙ্গে তিনি আগন্তুকদের লক্ষ্য করেন। একটু নজর করলেই দেখা যাবে, তাঁর ডান চোখটা সম্পূর্ণ অনড় স্থির, কিন্তু বাঁ চোখটা আগন্তুকদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছুটোছুটি করছে।

মুসাপা বা পারস্পরিক অভিবাদন শেষ হলে আগন্তুকরা ইমামের সামনে গোল হয়ে বসলো। পরক্ষণে মেহমানদের খানা দেবার জন্য ঘরে ঢোকে মাহ্‌মুদ। সুতরাং কুশলপ্রশ্নাদি ছাড়া এ সময় আর কোন কথা হয় না। সে চলে যেতেই, পেটমোটা এক ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলো ইমামের নীলচোখো সেক্রেটারী। দরজাটা সে পেছনে ভাল করে বন্ধ করে দিলে।

এবার ইমাম কথা বললেন আগন্তুকদের লক্ষ্য করে,—ইমানদার তাগাই সাহেব ও কজিৎজ্‌কি সাহেব, এবার বলুন ইতিমধ্যে কি কি করেছেন আপনারা। খবরটা আমাদের দোস্তের কাছে পেঁছে দিতে হবে। শরফ সাহেব কেল্লায় গিয়েছিলেন। তাঁর খবরও শুনবো।

তাগাই শুরু করলো,—মহামান্য ইমাম সাহেব, আপনি জানেন, দক্ষিণ থেকে যেসব হাতিয়ারপত্র আসার কথা ছিল, শীতকালেই তা এসে গেছে। সবসুদ্ধ আমরা পেয়েছি তিনশো সাতাশিটা রাইফেল, পাঁচ শো গ্রেনেড, পনেরোটি হাল্‌কা মেশিনগান, পঞ্চাশ হাজার রাউন্ড গোলাবারুদ আর দু হাজার রিভলবার। যোদ্ধাদের আমরা শিখিয়েছি গ্রেনেড ছুড়তে, রাইফেলে তাক ঠিক করতে। শিখিয়েছি, কিভাবে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে তার মধ্যে থাকতে হয় আর আক্রমণই বা করতে হয় কিভাবে। আপনার পাঠানো অফিসাররা আর কজিৎজ্‌কি সাহেব বাসমাচিদের তালিম দিয়েছেন, আপনার নির্দেশ মতো কুচ-কাওয়াজ করিয়েছেন—

ইমাম বাধা দিলেন,—না, আমি কোন নির্দেশ বা হুকুম পাঠাই নে। যিনি টাকা ও হাতিয়ারপত্র দিয়ে আমাদের সাহায্য করছেন, আমাদের সেই দোস্ত যা নির্দেশ দেন, সেইটেই শুধু আমি আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিই। তাঁর যে শেষ চিঠিগুলো পাঠিয়ে-ছিলাম সেগুলো এবার ফিরিয়ে আনার কথা।

হ্যাঁ, এই নিন।—কামিজের বোতাম খুলতে খুলতে কজিৎজ্‌কি বললে। ছোট একটা ব্যাগ সে বের করলে ভেতর থেকে। সরু শেকল দিয়ে সেটা গলার সঙ্গে ঝোলানো। ব্যাগ থেকে চিঠিগুলো বের করে সে ইমামের হাতে দিলে।

চিঠিগুলো উলটেপালটে দেখে নিয়ে ইমাম সেগুলো সেক্রেটারীর হাতে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন,—তালিকাটা এনেছেন?

হ্যাঁ, এই নিন।—তাগাই তাঁর দিকে একখানা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললে : সব-চেয়ে সেরা তেষট্টি জন বাসমাচির নাম এতে আছে। তারা প্রত্যেকে একশো সিপাইয়ের পরিচালনার ভার নেবার হিম্মৎ রাখে। কাজী কিপচাকবের সইও এতে আছে।

তালিকাটা পড়তে পড়তে মাথা নাড়েন ইমাম। শেষে বললেন,—আমাদের দোস্তের চিঠিখানা এবার আপনাদের পড়ে শোনাবো। অত্যন্ত জরুরী চিঠি বলে ওটা আমি হাতছাড়া করিনি। দোস্তের কাছে চিঠিতে আমি লিখেছিলাম, বলশেভিকদের অত্যা-চারে জর্জরিত অভিজাত দীনদাররা আজাদির জন্যে ছটফট করছে, সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে তারা একজোট হয়ে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত। আমাদের এইসব আর্জি ও অনু-রোধে দোস্ত কান দিয়েছেন এবং একটা পরিকল্পনা পাঠিয়েছেন। আজো আমরা পামীর ও মধ্য এশিয়ায় দখল কায়েম করতে পারি নি। তাই দোস্ত লিখেছেন, এবার আমাদের এই আক্রমণ শুধু হানাদারি নয় বা শুধু রাস্তাঘাট নষ্ট করা, পুল উড়িয়ে দেওয়া বা সোভিয়েত খেতখামার পুড়িয়ে দেওয়াও নয়, তার চেয়ে অনেক বড় ও গুরুতর ব্যাপার। অন্যান্য এলাকায় বলশেভিক-বিরোধী যে লড়াই চলছে তার সঙ্গে আমাদের কাজকর্মের ধারা যোগ করে দিয়ে তিনি এই পরিকল্পনা পাঠিয়েছেন। এবার শুনুন মন দিয়ে।

সেক্রেটারী পড়তে শুরু করে পরিকল্পনাটা,—বড় বড় সৈন্যদলকে বিরাট খেসারত না দিয়ে সীমান্ত পার করা অসম্ভব, সময় সময় একেবারে নির্মূল হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে। সেজন্য আগেকার কায়দা পাল্‌টাতে হবে। সবচেয়ে সেরা বাসমাচিদের বাছাই করতে হবে, যারা একশো লোকের এক-একটা দল চালনা করতে সক্ষম। ছোট ছোট দলে তাদের সীমান্ত পার হওয়ার জন্যে পাঠাতে হবে।

সেরা বাসমাচিদের তালিকাটা ইমাম বকবক দোলাতে থাকেন। সেক্রেটারী পড়ে

চলে,—এবারকার শীতে তুষারপাত অস্বাভাবিক কম। তাই সেইসব গিরিবর্ত্ম দিয়ে সীমান্ত পার হতে হবে, যেগুলিকে একদম অনতিক্রম্য মনে করা হয়। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য পাঁচটি ছোট ছোট দল সীমান্তের অন্যত্র হানা দেবে। পরিকল্পনা দেওয়া হলো। ইতিমধ্যে কজিৎজ্যকির নেতৃত্বে প্রথম দল 'বায়ু' হিমবাহের মাথার দিক দিয়ে সীমান্ত পার হবে। দলে থাকবে তিরিশজন। সামনাসামনি লড়াই এড়াতে হবে। সীমান্ত-রক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে সীমান্ত পার হবার পর কজিৎজ্যকি ঘোষণা করবেন, তিনি কেল্লায় যাচ্ছেন আত্মসমর্পণের জন্যে। এজন্যে পার্টিজানদের তিনি একটা খানাপিনা বা ভোজের বন্দোবস্ত করতে বলবেন। এই ভোজের সুযোগ নিতে হবে পুরোপুরি, যাতে পার্টিজানদের খুন করে কৌশলে কেল্লার দখল নেওয়া যায়। সোভিয়েত এলাকায় আমাদের শক্তির ওপর চাষীদের আস্থা খুবই কম। এই কারণেই কেল্লাটা দখল করা জরুরী, তারা যাতে আমাদের সঙ্গে জোট বাঁধার ভরসা পায়। কেল্লা দখলের পর ইমাম জেহাদ ঘোষণা করবেন এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে পয়গম্বরের ঝাণ্ডার নীচে তামাম দুনিয়ার দীনদারদের জমায়েত হতে আহ্বান জানাবেন। পরিকল্পনা জুড়ে দেওয়া হলো।

দম নেবার জন্যে ক্ষণকাল থামে সেক্রেটারী। খোশমেজাজে ইমাম দাড়িতে হাত বোলাচ্ছেন আর মাথা নাড়ছেন।

সেক্রেটারী আবার শুরু করে,—চল্লিশকুজউটপর্বত জেলায় যে হিমবাহটা আছে, সেখান দিয়ে তাগাইয়ের নেতৃত্বে দশজনের একটা দল সীমান্ত পার হবে।

তাকিয়ার তলা থেকে ইমাম একখানা ম্যাপ বের করে, তাতে লাল ক্রশ-চিহ্ন-দেওয়া একটা জায়গা দেখিয়ে দেন।

তাগাই ও কজিৎজ্যকি উবু হয়ে পড়ে ম্যাপের ওপর।

সেক্রেটারী পড়ে চলে,—গ্রীষ্মকালের দুই সপ্তাহ ছাড়া অন্য সময় এ পর্বতকে অলঙ্ঘ্য মনে করা হয়। এবার শীতে তুষারপাত কম হওয়ায় তাগাইয়ের দল সীমান্ত-রক্ষীদের সঙ্গে হাঙ্গামা এড়িয়ে এই পথ ধরে যাবে। তাগাইয়ের পথ হবে পর্বতশ্রেণীর ভেতর দিয়ে। আলাই উপত্যকা পার হয়ে তিনি যাবেন কারাতেগিনের দিকে। সেখানে দমব্রাচিতে মোল্লা সাতোইয়ের সঙ্গে দেখা হবে। সাতোই তাঁকে নিয়ে যাবেন বেল-এ। সেখানে তিনি আফগানিস্তান থেকে আগত ইস্কান্দার-বের বাসমাচি-দলের সঙ্গে মিলিত হবেন। তারপর ফেরগানা উপত্যকায় গিয়ে তিনি নতুন নতুন বাসমাচি-দল সংগঠিত করবেন। বাকী সব খবরাখবর ও পরামর্শ তিনি পাবেন ইস্কান্দার-বে মারফত।

সেক্রেটারী একটু থামতেই তাগাই কি বলতে যায়, কিন্তু ভ্রূকুটি করে ইমাম তাকে থামিয়ে দিয়ে সেক্রেটারীকে ইশারা করেন পড়ে যেতে।

সেক্রেটারী আবার শুরু করে,—শরফের নেতৃত্বে পাঁচজনের তৃতীয় দলটি একশো মাইল উত্তরে সীমান্ত পার হবে। শরফকে বলশয় গ্রাম দখল করতে হবে, যাতে পামীর যাবার পথের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা বন্ধ করে দেওয়া যায়। বলশয় গ্রামে সোভিয়েত আঞ্চলিক বাহিনীর একজন মাত্র সৈন্য আর দশ-বারো জন বলশেভিক কর্মী আছে। শিকারের বিন্দুক তাদের সম্বল। ওখানে বাসমাচিদের কথা কেউই ভাবছে না। তাই আক্রমণ হবে আকস্মিক। গ্রাম থেকে দশ মাইল দূরে কুম পর্বতের পাশে যে হ্রদটা আছে, তার ডান তীরে আকবে সর্দারের স্থানীয় বাসমাচি-দল বসন্তকালে শরফের জন্য অপেক্ষা করবে। সংকেত-বাক্য হবে ঃ প্রশ্ন—'কে যায়?' জবাব—'সত্যসন্ধানী।' প্রশ্ন—'সত্যসন্ধানীদের মঙ্গল হোক। কিভাবে এলেন?' জবাব—'কালো ধূসর আর সাদায় চড়ে।'

সেক্রেটারী এই যে পড়ে চলেছে, এ সময়ে ইমামের বাঁ চোখটা কিন্তু স্থির নেই কোন সময়, অবিরাম ঘুরছে তাগাই, কজিৎজ্‌কি আর শরফের মুখের ওপর দিয়ে।

সেক্রেটারী তখন পড়ছে,—কিন্তু পরিকল্পনা যদি একান্তই ব্যর্থ হয়, তাহলে তাগাই, কজিৎজ্‌কি ও শরফ প্রত্যেকেই চটপট সারেজ হ্রদের দিকে রওনা হবেন। সেখানে আফগানিস্তান থেকে আগত আবদুল্লার লোকদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হবে। ডিনামাইটের বড় বড় পাটা নিয়ে আসবে ওরা। পরিকল্পনা ভণ্ডুল হলে, হ্রদের কাছে লুকিয়ে থেকে, যে বাঁধ হ্রদের জল আটকে রেখেছে, সেখানে মাইন পাততে হবে। তারপর চিঠি পাঠাতে হবে বলশেভিকদের কাছে, জানিয়ে দিতে হবে, তারা পামীর ছেড়ে না গেলে আর কয়েদীদের মুক্তি না দিলে বাঁধ উড়িয়ে দেওয়া হবে, আর তার ফলে বিশাল হ্রদের জল প্রচণ্ড তোড়ে দুরন্ত বন্যার আকারে নেমে আসবে পামীর থেকে, মধ্য এশিয়ার মাঠঘাট গ্রাম-শহর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যাবে সব। ভয়ঙ্কর এ শাসানি। বলশেভিকরা ভয় পাবেই।

পড়া শেষ হয়। ইমাম এবার তাকালেন শরফের দিকে,—এবার আপনার খবর বলুন, শরফ সাহেব।

মুচকি হেসে শরফ বলে,—ল্যিনেজার সঙ্গে দেখা করেছি। কেল্লায় কজুবের জায়গায় তিনি এখন পার্টিজানদের নেতা। তিনি বললেন, কাজটা জলদি করা দরকার, কারণ ওরা তাঁকে বিশ্বাস করে না, শীগগীরই সরিয়ে দেবার সম্ভাবনা। কেল্লার জন্যে ন হাজার আর প্রত্যেক পার্টিজানের জন্যে একশো করে সোনার রুবল চান তিনি। আমি বলেছি, তা-ই দেওয়া হবে। কেল্লার মেশিনগান দুটো অকেজো করে দেওয়া হবে বলে তিনি কথা দিয়েছেন। পার্টিজানদের তিনি আগে থেকেই বলতে শুরু করছেন যে, বাসমাচিরা আত্মসমর্পণ করতে আসছে আর সেজন্য বড় একটা খানাপিনার বন্দোবস্ত করা দরকার। কিন্তু তাঁর ভয় বয়স্ক পুরনো পার্টিজানদের নিয়ে। তারা হয়তো হৈচৈ শুরু করবে। তাই তিনি সময় এলে তাদের অন্যত্র টহলে পাঠাবেন।

ইমাম জিজ্ঞেস করলেন,—পাশের গাঁয়ের সর্দারের সঙ্গে আপনি দেখা করেছিলেন? তাঁকে, যে কোন ভাবে হোক, আমাদের দলে আনা দরকার। তাঁর সাহায্য ছাড়া কেল্লা দখল করা মুশকিল। কি বলেছেন তিনি?

—'না' জবাব দিয়েছেন, মহামান্য ইমাম সাহেব। বলেছেন, বলশেভিকরা তাঁর লোকদের কোন ক্ষতি করে না, বরঞ্চ সাহায্যই করে। তাদের সঙ্গে অনর্থক তিনি ঝগড়া বাধাতে রাজী নন।

হুঁ, এটা আমি আগেই বুঝেছিলাম,—ভ্রূ কুঁচকে ইমাম বললেন : এবং এরকম জবাব পেলে তাঁকে আমার দ্বিতীয় চিঠিখানা দিতে বলে দিয়েছিলাম। সোজা পথে কাজ হবে না, বুঝতে পারছি।

—হ্যাঁ, চিঠিখানা তিনি নিয়েছেন।

এর পর খানাপিনা শেষ হয়। বিদায়ের আগে কজিৎজ্‌কি বাদে আর সবাইকে ইমাম বলবক কোরান ছুঁয়ে হলফ করালেন : সারেজ হ্রদের ব্যাপারটা সমেত পরিকল্পনার কোন গোপন তথ্যই তারা জান থাকতে কখনও ফাঁস করবে না কারো কাছে।

পরবর্তী কালে তাগাই, কজিৎজ্‌কি ও শরফ তাজ্জব বনে গেল, যখন তারা নির্দিষ্ট সময়ের দু সপ্তাহ আগেই কাজ শুরু করার নির্দেশ পেল ইমামের কাছে থেকে। কেউ যাতে গণ্ডগোল বাধাতে বা বেইমানি করতে না পারে, তার জন্যেই ধূর্ত ইমাম বলবকের এটা হলো আর এক কারসাজি।

প্রথম পর্ব ৩

সকাল হলো। সতেজ আনন্দোজ্জ্বল বসন্ত প্রভাত। নদীর কূল বরাবর পার্বত্য তৃণভূমিতে পাহাড়ী বুনো ছাগল-ভেড়ার পাল চরছে। হঠাৎ উলাররা শিস দিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ছাগল-ভেড়ার দল পালাতে শুরু করে। উলাররাও উড়ে পালায়।

জুরা বুঝলো, ওদের পেছনে কোথাও মানুষ আছে। হামাগুড়ি দিয়ে সে ফিরে এল সঙ্গীদের কাছে।

একটু পরেই দেখা গেল বাসমাচিদের। আচিক-সু নদীর ওপরে সংকীর্ণ শৈলশিরা বেয়ে লম্বা লাইন বেধে তারা চলেছে। গিরিসংকটের পর গিরিসংকট পার হয়ে এগোচ্ছে তারা। মাথার ওপরে ঝুলন্ত তুষারের স্তূপ, যে কোন মুহূর্তে নীচে ধসে পড়তে পারে ভয়ঙ্কর হিমানী-সম্প্রপাতের আকারে। দম আটকে গুড়ি মেরে তারা পার হচ্ছে সেসব।

বাসমাচিদের নেতৃত্ব করছে তাগাই। সবার পেছনে খাঁদা—এক মেশিনগান বয়ে নিয়ে চলেছে। সব রকমের গুণ্ডা-বদমাশরা রয়েছে দলের মধ্যে। প্রত্যেকের কাছে আন-কোরা নতুন আধুনিক রাইফেল। কাঁধ থেকে বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে কার্তুজের বেল্ট ঝুলছে আর কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে খাপে ভরা রিভলবার, দুটো গ্রেনেড আর একখানা করে ছুরি।

অদূরে সামনে এক শৈলশিরা—বরফ ও তুষার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সেদিকে তাকিয়ে বাসমাচিদের বুকে বল ফিরে আসে, মুখে হাসি দেখা দেয়। আর একটু এগোলেই ভয়ঙ্কর কঠিন পথটা শেষ হয়ে যাবে। নিজেদের অজ্ঞাতেই তাদের চলার গতি বেশ কিছুটা বেড়ে যায়।

সহসা, ভয়ঙ্কর পথটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে শৈলশিরার পেছন থেকে আচমকা উঠে দাঁড়ালো জুরা। তার পাশের এক টিলায় লাফিয়ে উঠে ক্রুদ্ধ চিৎকার শুরু করে টীক।

থাম্!—জুরা গর্জে ওঠে ঃ এক পা এগোবি না!

বাসমাচিদের রাইফেলের বুক-কাঁপানো খটখট আওয়াজ কানে এল।

একটিবার গুলি ছুড়ে দ্যাখ্,—জুরা আবার হুঙ্কার ছাড়লে ঃ তুষার-ধস তোদের গুঁড়িয়ে দেবে।

হিমানী-সম্প্রপাত থেকে জুরার ভয় নেই, বিপদ-সীমার বাইরে সে দাঁড়িয়ে আছে। পাষাণের মতো নিথর দাঁড়িয়ে গেল বাসমাচিরা। তাদের পাশে ভয়ঙ্কর খাড়াই, বহু নীচে নদী, মাথার ওপরে ঝুলন্ত মৃত্যুরূপী বিশাল তুষারের স্তূপ আর সামনে জুরা।

পিছু হটো!—টান মেরে রিভলবার বের করে পিছু হটতে হটতে তাগাই চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো।

পেছন দিকে ছোটে বাসমাচিরা। নীচে অতলস্পর্শী খাদে পড়ার বিপদের দিকেও তাদের নজর নেই। জুরা গুলি ছুড়লো। তাগাইয়ের আগে আগে ছুটছিল একজন বাসমাচি, টলতে টলতে পড়ে গেল।

শুয়ে পড়ো! শুয়ে পড়ো! হিমানী-সম্প্রপাত আমাদের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাবে! —তাগাই আবার চেঁচিয়ে উঠলো!

পর্বতের গা ঘেঁষে পাথরের তাকের ওপর শুয়ে পড়ে ডাকাতরা।

আকাশ-ছোঁয়া পর্বতরাজ্যের তরঙ্গক্ষুব্ধ নিশ্চল মহাসমুদ্র যেন আর্তনাদ শুরু করেছে। বাতাসে বিষম গুড়গুড় আওয়াজ। পরক্ষণে তুষারের পর তুষারের ধস নেমে এল ওপর থেকে। তুষারগুঁড়োর সাদা মেঘে সব কিছু অদৃশ্য। তারপর এক সময় সাদা পরদা সরতেই জুরা দেখে, ধসে-পড়া তুষারের স্তূপ সব নড়ছে। একের পর এক বেরিয়ে আসছে ডাকাতরা।

সঙ্গে সঙ্গে চাও উঠে দাঁড়ালো এক ঢিবির পেছন থেকে। দূরে কতকগুলো বড় বড় পাথরের চাংড়া আর ঢিবি। আতঙ্কিত বাসমাচিরা ছুটছে সেদিকে। হঠাৎ এবার এক ঢিবির আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করলো বুড়ো শিকারী ইদ্রিস। তার হাতে রিভলবার। সে হাঁক ছাড়ে,—হেই তাগাই, আত্মসমর্পণ করো। তোমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে।

বেশ, করছি।—জবাব আসে তাগাইয়ের কাছ থেকে।

বাসমাচিরা রাইফেল ফেলে দিয়ে মাথার ওপর হাত তুলে এগিয়ে আসতে থাকে একের পর এক। সব শেষে আসে খাঁদা, মেশিনগানটাকে সে অকেজো করে দিয়েছে।

শিকারী হকচকিয়ে যায়। বাসমাচিদের স্বভাবের সঙ্গে তার পরিচয় নতুন নয়, কমও নয়। দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকতে তারা লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু আজ হঠাৎ এভাবে ওরা আত্মসমর্পণ করছে কেন? এটা কি কোন কারসাজি? ওরা এগিয়ে আসছে দেখে, অল্প দূরত্ব থাকতে শিকারী তাদের হুকুম করল থামতে।

শুকনো গলায় তাগাই বলে,—আমরা আত্মসমর্পণ করছি। আমরা কেল্লায়ও যাচ্ছিলাম এইজন্যে। নয়তো এইসব ঢিবি-টিলার আড়াল থেকে বহুক্ষণ যুঝতে পারতাম। আমাদের একজনকে তোমরা খামখা খুন করলে। এর ফলে পার্টিজান ফৌজের কাজে শুধু ব্যাঘাতই সৃষ্টি হবে। অন্যেরা ঘাবড়ে গিয়ে পরিকল্পনামতো আর আত্মসমর্পণ করতে এগোবে না।

জুরা এতক্ষণ বাসমাচিদের ফেলে-দেওয়া অস্ত্রশস্ত্রগুলো পরখ করছিল, এবার সে তুষার-ধসের পেছনে থেকে বেরিয়ে এল। তার হাতে একটা রাইফেল। কার্তুজের বহু বেল্ট বুকের ওপর। কোমরবন্ধে একটা রিভলবার আর গোটা পাঁচেক গ্রেনেড। গলা থেকে চামড়ার ফিতেয় ঝোলানো একজোড়া দূরবীন।

দাঁতে দাঁত চেপে রাইফেল তুলে সে এগিয়ে গেল তাগাইয়ের দিকে। আতঙ্কে তাগাইয়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর এক লাফে গিয়ে লুকোলো অন্য ডাকাতদের পেছনে।

তাগাইয়ের কথা শুনে শিকারী অত্যন্ত অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু সে ভাব গোপন করে মিষ্টি গলায় সে জিজ্ঞেস করলে,—তাগাই, তুমি তাহলে বলছো. তোমরা কেল্লায় যাচ্ছ আত্মসমর্পণ করতে? আর ওরা যে খানাপিনার বন্দোবস্ত করেছে, তা তোমাদেরই জন্যে?

বাসমাচিরা সবাই আত্মসমর্পণ করছে। ঐ জন্যে আমিও যাচ্ছিলাম। কজিৎজকিও তাই।—বলতে বলতে তাগাই হঠাৎ থেমে গেল. সচকিত কণ্ঠে বললে: কিন্তু তুমি কে? খানাপিনার কথাই বা জানলে কি করে? না, না, আমি কিচ্ছু জানি নে। আত্মসমর্পণের জন্যেই আমরা যাচ্ছিলাম। ওসব কি খানাপিনার কথা বলছো? কজিৎজকি সম্বন্ধে যা বলেছি. তাও ঝুট বাত।

হুঁ, তা বটে! এই, হাত তোল!—তাগাই সন্তর্পণে কোমরবন্ধের পেছনে হাত নেবার ফিকির করছে দেখে গর্জে উঠলো শিকারী।

অনিচ্ছার সঙ্গে আবার হাত তোলে তাগাই। শিকারীর নির্দেশে বাসমাচিদের দেহে

খানাতল্লাশি চালিয়ে তাগাই ও খাঁদার কাছ থেকে জুরা বের করলো রিভলবার আর অন্যদের কাছ থেকে ছোরা।

চাও-ও জুরার মতো নিজেকে সশস্ত্র করেছে। বাসমাচিদের ওপর তারও কড়া নজর। শিকারীর নির্দেশে কয়েদীরা এবার পশ্চিমমুখো রওনা হলো।

সবাই নামছে নীচের দিকে। হঠাৎ দেখা যায়, নীচে গিরিসংকট দিয়ে একদল ঘোড়-সওয়ার জোর কদমে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। শিকারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। চাওকে পাঠায় বাকী অস্ত্রশস্ত্রগুলো কুড়িয়ে আনার জন্যে।

চাও চলে যেতেই জুরা এগিয়ে এল শিকারীর কাছে। তার প্রস্তাব, তাগাই ও খাঁদাকে তার হাতে দেওয়া হোক, সে ওদের গুলি করে মারবে। শিকারী সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলে সে প্রস্তাব। ভীষণ তর্কাতর্কি শুরু হলো দুজনার মধ্যে। বাসমাচি-দের বিচার করা হবে শুনে জুরা তো রেগে আগুন। ও সব বিচার-ফিচারের সে তোয়াক্কা করে না, শয়তানদের বিচার সে করবে রাইফেলের মুখে, বলতে বলতে সে বাসমাচিদের দিকে ফিরতেই প্রচণ্ড ধমক খেল শিকারীর কাছ থেকে।

তীব্র কণ্ঠে শিকারী বললে,—শোন গোঁয়ার হাঁদারাম, নিরেট গাধার মতো ব্যবহার করো না। আগেও অনেক ভুল করেছ তুমি, আবারও সেই ভুল করছো। তাগাই ও খাঁদাকে গুলি করে মারা হবে ঠিকই, এবং তা তুমিই মারবে। কিন্তু তার আগে সমস্ত খবর বের করতে হবে তাগাইয়ের কাছে থেকে। অনেক কিছুই সে জানে। কজিৎজ্‌কি সম্বন্ধে সে কি বলছিল শুনেছিলে? কজিৎজ্‌কিকে আমি চিনি, আত্মসমর্পণ করবার লোক সে নয়। কেল্লায় নির্ঘাত কোন গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। সাংঘাতিক কোন বেই-মানি ও চক্রান্ত আছে এই সব আত্মসমর্পণ ও মেজমানীর মধ্যে।

জুরার রাগ ততক্ষণে অনেকটা পড়ে এসেছে। শিকারীর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির প্রভাবে সে ধীরে ধীরে শান্ত হয়।

শিকারী বলে চলে,—কজিৎজ্‌কির আগে গিয়ে আমাদের পেঁছিতে হবে। গুলি করে ওদের আমরা মারবোই। কিন্তু তার আগে আমাদের জানতে হবে ওদের সব মতলব। কেল্লার বর্তমান ফৌজদারের চেয়ে তোমায় আমি অনেক বেশী বিশ্বাস করি, জুরা। আমার কথামতো তোমাকে চলতে হবে। কেমন, চলবে তো?

বিস্মিত জুরা মাথা নেড়ে সায় দিতে দিতে বলে,—কিন্তু তুমি কে, বলো তো?

—পরে সবই জানতে পারবে।

নীচে পার্টিজান ও বাসমাচি কয়েদীরা ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে। জুরাকে উৎরাই বেয়ে নেমে আসতে দেখে নিদারুণ বিস্ময়ে আনন্দে গোরা চেঁচিয়ে উঠলো,—আরে, আরে, কে? কে? জুরা! অ্যাঁ তুমি?

তার পরেই সে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গিয়ে জাপটে ধরলো জুরাকে,—আঃ দোস্ত! কেমন আছ তুমি? ওঃ বেঁচে আছ! লোকে বলতো, তুমি বেঁচে নেই। কী যে কষ্ট পেয়েছি তোমার কথা ভেবে! আঃ!

জুরাও কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। গোরাকে জাপটে ধরে তার পিঠে হাত বুলোয় শুধু।

মুসা এসেছে পার্টিজানবাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে। প্রথমে সে হকচকিয়ে গেছলো, পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠলো,—আরে আরে, জুরা যে! অ্যাঁ, সত্যিই তুমি?

অন্য পার্টিজানদের মধ্যেও তুমুল সোল্লাস কলরোল। আর উচ্ছ্বসিত ভালবাসার এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখে জুরা অভিভূত।

বাসমাচিদের নিয়ে ও তাদের হাতিয়ারপত্র ঘোড়ায় চাপিয়ে এবার সবাই রওনা হবে। যেতে হবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। দলে ছজন পার্টিজান, আর শিকারী, জুরা ও চাও।

মুসা জুরাকে বললে,—অনেক বড় বড় খবর আছে, বুঝলে? আমাদের পুরনো কত্তা কজুবে এখন আর কেল্লায় নেই। বর্তমানে তিনি বড় একজন কমিউনিস্ট নেতা, শহরে থাকেন। তবে প্রায়ই নাকি এই পর্বত-মুল্লুকে টহল দিতে আসেন শোনা যায়। সাময়িকভাবে আমাদের একজন নতুন সেনাপতি এসেছেন, নাম লিনেজা। তিনিও কিরঘিজ। সামরিক স্কুলে শিক্ষা পেয়েছেন, বড় জমিদারের ছেলে। বড্ড দাম্ভিক। শুধুই হম্বি-তম্বি করেন আর বলেন, 'হেই, এটা সোভিয়েত শাসন! আমিই সোভিয়েত সরকার!' খামখা শাপ-শাপান্ত আর গালিগালাজ করেন। পার্টিজানরা অপমান বোধ করে। পুরনো পার্টিজানদের মধ্যে আর চারজন মাত্র অবশিষ্ট আছে। অন্যেরা সবাই নতুন।

শিকারী ইদ্রিস দাঁড়িয়ে আছে কিছুদূরে, মুসা নীচু গলায় জুরার সঙ্গে কথা বললেও, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সব। মুসা বলছে,—বাসমাচিদের একটা দল কেল্লায় আসছে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। কজিংজ কি তাদের নিয়ে আসছে। লিনেজা আমায় এদিকে পাঠিয়েছেন হয়তো আরো কিছু বাসমাচির দেখা মিলতে পারে এই আশায়।

হঠাৎ ইদ্রিস ডাক ছাড়ে,—ওহে জুরা, তোমার দোস্তদের কথা কি ভুলে গেলে, টেরাচোখো আর কুচাকের কথা?

জুরা চমকে ওঠে। তাই তো! তাই তো! ইস্, বড্ড ভুল হয়ে গেছে! নিজের ওপরই রাগ হয় তার।

মুসা সব শুনে বললে,—বেশ, দুটো ঘোড়া নিয়ে তুমি আর চাও যাও। দোস্ত দুজনের জন্যে অস্ত্রশস্ত্রও কিছু নিয়ে যাও সঙ্গে।

জুরা ইতিমধ্যে ওদের সঙ্গে চাও ও ইদ্রিসের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। চাওকে নিয়ে সে তখুনি রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত. ফুর্তিতে ছুটোছুটি ও লাফালাফি করছে ঠিক, মুসা বললে,—একটু সবুর করো।

তারপর নিজের নোটবই থেকে খান দুই কাগজ বের করে জুরার হাতে দিয়ে সে বললে,—এটা সাবধানে রেখ। ভারী কঠিন সময় চলেছে। আমাদের সীমান্ত-রক্ষীদের সামনে পড়লে এটা তাদের দেখিও।

জুরা ও চাও চলে গেল। ইদ্রিস এদিকে রওনা হবার জন্যে ছটফট করছে। চটপট করতে বলছে সবাইকে। তার এই ব্যস্ততা দেখে মুসা বিরক্ত হয়। শেষে বললে,—আপনার এত তাড়া কেন, বলুন তো? আমাদের কাজ তো শেষ। ঘোড়াগুলোও ক্লান্ত।

তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে।—একটু ভেবে গম্ভীর কণ্ঠে শিকারী বললে : এদিকে একটু আসবে মেহেরবানি করে?

কি সম্বন্ধে. দাঠাকুর?—শিকারীর পেছু পেছু এক উঁচু টিলার আড়ালে যেতে যেতে মুসা মস্করা করে বললে। কিন্তু মিনিটখানেক পরেই তার চোখমুখ থেকে কোথায় উবে গেল সেই মস্করা-হাসিঠাট্টার ভাব! বুড়ো শিকারীর দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে সশ্রদ্ধ অভিভূত কণ্ঠে সে বললে,—কমরেড কজুবে!

কজুবে বললেন,—যত শীগগীর পারা যায়, কেল্লায় আমাদের ফেরা দরকার। কিছু একটা বেইমানী ফাঁদ সেখানে পাতা হয়েছে, বুঝতে পারছি। লিনেজা সম্বন্ধে যা জান, চটপট বলো। পুরনো পার্টিজানদের তাড়িয়ে নতুন রংরুট কেন সে নিচ্ছে? ডাকাত বাসমাচিদের সঙ্গে খানাপিনার যে বন্দোবস্ত হচ্ছে, সে ব্যাপারটাই বা কি? আচ্ছা, কেল্লার পাশের গাঁয়ের সর্দারের খবর জান কিছু? তিনি এখন কোথায়?

—উত্তরে দূরে তাল্‌দিকের চারণভূমিতে তিনি গেছলেন। কিন্তু এখন শুনছি, তিনি অসুখে পড়েছেন, দশ দিন যাবৎ তাঁবুর বাইরে আসছেন না।

না, তাল্‌দিকে তিনি যান নি।—কজুবে বললেন : হালে কি তুমি তাঁকে দেখেছ?

না।—মুসা জবাব দেয়। তারপর লিনেজা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যা জানে সব খুলে বলে কজুবেকে।

প্রথম পর্ব ৪

সঙ্গীদ ও কুচাক ইতিমধ্যে সাংঘাতিক এক কাণ্ড করে বসেছে। সঙ্গীদই অবশ্য ঘটিয়েছে কাণ্ডটা।

সুউচ্চ পর্বতের ওপর থেকে নীচে উপত্যকায় নজর রাখছে সে ও কুচাক। হঠাৎ একসময় ঘোড়া ও উটের এক কাফেলা তাদের নজরে পড়লো। সঙ্গীদ বুঝতে পারে, তারা বাসমাচি নয়, ব্যবসায়ী সওদাগর। সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত লোভ তাকে পেয়ে বসলো। সে ঠিক করে, আজই রাতের অন্ধকারে এই কাফেলা তারা লুঠ করবে, ওদের যা কিছু আছে সব কেড়ে নেবে।

জুরার ভয়ে কুচাক প্রথমে রাজী হয় না। ফলে প্রচণ্ড রাগে সঙ্গীদের টেরা চোখ আরো টেরা হয়ে যায়। তার পরেই দাঁতের ফাঁক দিয়ে বাতাস টেনে নিয়ে সে হিসহিস করে উঠলো। জুরা সম্পর্কে নানা কটূক্তি ও অশ্রাব্য গালমন্দ করতে করতে কুচাককে সে প্রথমে সোনাদানার লোভ দেখালে, শেষে শাসিয়ে উঠলো ভয়ঙ্কর কণ্ঠে,—শোন, আমার মতলবে কোন নড়চড় হবে না। এ কাজে যদি আমায় সাহায্য না করো, তাহলে তোমায় খুন করতেও পেছপা হবো না।

কতকটা ভয়ে আর কতকটা লোভে পড়ে কুচাক রাজী হয় শেষ পর্যন্ত।

গভীর রাত্রি। কাফেলার সবাই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সেই সময় অন্ধকারে কাফেলার ওপর হামলা শুরু করলো সঙ্গীদ ও কুচাক। সঙ্গীদ প্রথমে কাফেলার দুটো ঘোড়া চুরি করে আনলে। তারপর শুরু হলো তার ধড়িবাজি ও কারসাজি।

এসব কাজে সে ওস্তাদ ও অভিজ্ঞ। পাথরের টুকরোয় থলি ভরে ঘোড়ার পিঠে সে আর কুচাক ছুটতে শুরু করে তাঁবুগুলো বেড় দিয়ে আর পাথর ছুড়তে থাকে সমানে। আর সেই সঙ্গে নানা কণ্ঠ নকল করে চেঁচাতে থাকে সঙ্গীদ।

কাফেলার লোকেরা নিদারুণ ঘাবড়ে যায়। তারা ধরে নেয় বিরাট ডাকাতের দল তাদের আক্রমণ করেছে। তারা আত্মসমর্পণ করলো। সঙ্গীদের হাতে তুলে দিলে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র—একটা রাইফেল ও কয়েকটা ছোরা।

লুঠতরাজ চালাতে চালাতে সুন্দর একটা রেশমী আংরাখা নজরে পড়ে সঙ্গীদের। ওটা সে তক্ষুণি দান করলে কুচাককে। কুচাক তো আত্মহারা আংরাখাটা সে পরে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে।

বড় বড় চামড়ার পেটি ফেড়ে ওদিককার লুঠতরাজ শেষ করে সঙ্গীদ এবার পড়লো কাফেলার চালকদের নিয়ে। আর সেখানেই বাধলো ফ্যাসাদ। তাদের কাছে টাকাপয়সা যা কিছু আছে সমস্তই দাবি করে বসলো।

হতভম্ব চালকেরা গোঙিয়ে উঠলো,—এ কেমন কথা! আমরা গরীব মানুষ, আমাদের রোজগারের সম্বলটুকুও দিয়ে দিতে হবে?

বলতে বলতে তারা অন্ধকারে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

সঈদের মেজাজ খিঁচড়ে যায়। সর্বনাশ, ওরা যদি সীমান্ত-রক্ষীদের গিয়ে জানায়!' কুচাককে সে তক্ষুণি হুকুম করলে ওদের পাকড়াও করে আনতে। কিন্তু জুরা আর সীমান্ত-রক্ষীদের ভয়ে কুচাক ইতস্ততঃ করছে দেখে সঈদের আর সহ্য হয় না। সে মেরে বসলো কুচাককে। নিরুপায় কুচাক—রওনা হলো ঘোড়ার পিঠে।

ক্ষুধার্ত কুচাক, দু রাত ঘুমোতে পারেনি, তার ওপর সঈদও কিনা তাকে মারে! নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে সে চলেছে, এমন সময় পথেই তার দেখা হলো জুরা ও চাওয়ের সঙ্গে। কাফেলার লোক পাঁচজনও রয়েছে তাদের সঙ্গে।

সে মুখ খোলার আগেই জুরার চাবুক আর সেই সঙ্গে হুঙ্কার এসে পড়লো তার ওপর,—কোটটা ওদের খুলে দাও!

ভয়ে ও ব্যথায় ককিয়ে উঠলো কুচাক। নিঃশব্দে কোটটা সে খুলে দেয় কাফেলার লোকদের হাতে।

আগুনের পাশে সঈদ রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার পিঠে জুরাকে দেখে সে যেন একটু স্বস্তি বোধ করে। জুরা কিন্তু সোজা এগিয়ে গেল তার দিকে, নীরস ঠাণ্ডা গলায় বললে,—তোমার আসল পরিচয়টা আজ আমায় বলতে হবে। বাসমাচি, বাটপাড়, খুনে—কে তুমি? কাফেলা লুঠ করেছ কেন?

জুরার অগ্নিমূর্তি দেখে সঈদ একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুহূর্তে তা সামলে নিয়ে হিংস্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো,—থাম্, ক্ষুদে গেঁয়ো বেয়াদপ! আমাকে শেখাতে চাস—তুই? আমি জানি, আমি কি করছি!

মুহূর্তে জুরার চোখমুখের চেহারা যা দাঁড়ায় তা কল্পনা করাও কঠিন। ভয়ঙ্কর চাপা কণ্ঠে সে হুঙ্কার ছাড়লে,—ওদের বন্দুক ফেরত দাও!

তীক্ষ্ন তিক্ত কণ্ঠে সঈদ হেসে ওঠে। হিংস্র শব্দ করে জোরে সে বাগিয়ে ধরলো রাইফেলটা।

পরক্ষণে হিসহিস শব্দ ওঠে বাতাসে। চোখের পলকে জুরার চাবুক গিয়ে জড়িয়ে ধরলো রাইফেলটা। চাবুকে জুরা হেঁচকা টান দিতেই রাইফেলটা ছিটকে বেরিয়ে এল সঈদের হাত থেকে।

আর দেখা গেল, সঈদের গালে কালশিরা পড়ে গেছে। চাবুকের লিকলিকে আগায় জোরালো ঘা লেগেছে সেখানে। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। সঈদ বেসামাল হতভম্ব।

জুরা বললে,—আমরা বাসমাচিদের মারি, তাদের হাতিয়ারপত্র দখল করি। কিন্তু তুমি! তুমি বাটপাড়ি করছো কাদের ওপর? কি করা উচিত তোমার সম্পর্কে?

দারুণ রাগে ও যন্ত্রণায় সঈদ আরো ট্যারা হয়ে গেছে। মুখ ভেংচে সে হিসহিস করে উঠলো,—তোরই বা কি মতলব? তোর দলে যখন ভিড়ি, তখন ধারণা ছিল, মানুষের মতো বাঁচবো। কিন্তু কাটাচ্ছি কুত্তার জীবন। গরিব মানুষ আমি, একেবারেই ভিখিরি। যে তাগাইকে তুই খুন করতে চাস, সে তার দলের প্রত্যেককে কত করে দেয় জানিস? ফি মাসে সোনার কুড়ি রুবল করে, লুটপাটও করতে দেয় সেই সঙ্গে।

জুরা নির্বাক। আবার সেই সোনা! সেই এক কথা : সোনা! সোনা! বাসমাচিরা টকটকে লাল লোহা দিয়ে যখন তাকে সেঁকা দিয়েছিল, তখনো তাদের মুখে ছিল ঐ এক চিৎকার : সোনা! সোনা!

আগুন-ঝরা চোখে জুরা তাকায় সঈদের দিকে।

চাও এতক্ষণ চুপচাপ ঘোড়ার পিঠে বসে সঈদের প্রতিটি কথা ও হাবভাব তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছিল, এবার শান্ত কণ্ঠে বললে,—না সঈদ, নিজেকে তুমি গরিব বোলো না। তোমার যে সোনাদানা আছে, তা দিয়ে ইচ্ছে করলে তুমি জামাকাপড় কিনতে পার, খুব ভালভাবেই থাকতে পার। মরুভূমিতে তুমি রুপোগুলো ফেলে দিয়েছিলে, কিন্তু মোহরগুলো ফেলনি।

কি! আমার কাছে মোহর আছে?—তীরবেগে সঈদ ঘুরে দাঁড়ালো চাওয়ের দিকে। বিজাতীয় ঘৃণায় ও বিদ্বেষে তার চোখের দৃষ্টি লকলক করছে।

অ্যাঁ! মোহর আছে ওর কাছে?– বিস্মিত জুরা গর্জে ওঠে: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো! আমার মনেই ছিল না। শোন সঈদ, এই গরিবদের ওপর অকারণে তুমি যে হামলা-জুলুম করেছ, ওদের পেটি ও গাঁইটগুলো ফেঁড়ে ফেলেছ, তার খেসারত হিসেবে ওদের প্রত্যেককে একটা করে মোহর তোমায় দিতে হবে এবং তা এক্ষুণি।

দুঃসহ হিংস্র রাগে সঈদ কথা বলতে পারে না।

সঈদের বিষাক্ত কুটিল দৃষ্টি চাওয়ের নজর এড়ায় নি। তবু সে শান্ত কণ্ঠে আবার বললে,—সঈদ, ভুল করো না। জনসাধারণ ও চাষীদের সঙ্গে কেন তুমি আমাদের অকারণ হাঙ্গামায় জড়িয়ে ফেলছো?

দারুণ রাগে সঈদ যেন ফেটে পড়ে। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে সে বললে,—রাখ ওসব আবোলতাবোল বুকনি! আর সবার মতো জুরা আগে ছিল স্বাভাবিক মানুষ। কিন্তু এখন? তোমার পাল্লায় পড়ে এখন তার মুখে শুধু 'চাষীসমাজ" 'জনগণ', এই সব কথা। কি ফয়দা ওসবে? ওতে আমার অন্ততঃ রুচি নেই। সুখী শুধু ধনীরাই, বুঝলে?

সঈদ, আমাদের দেরি করার সময় নেই। শেষবারের মতো আবার বলছি, ওদের প্রত্যেককে একটা করে মোহর দিয়ে দাও।—জুরার গলা যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি ভয়ঙ্কর। কুচাক ভয়ে কেঁপে ওঠে।

সঈদ নিরুত্তর। আগুনের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। হঠাৎ জুরার ডাগর কালো চোখের দিকে নজর পড়তেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কোমরবন্ধ খুলে জুরার নির্দেশ সে পালন করলো অক্ষরে অক্ষরে। মনের দুঃখ, বিদ্বেষ ও তিক্ততা তার মনেই থেকে যায়।

সঙ্গীদের নিয়ে জুরা এখুনি আবার রওনা হতে চায়। কিন্তু কাফেলার মালিক ও চালকেরা তাদের ছেড়ে দিতে চায় না। বারবার তারা অনুরোধ করে তাদের সঙ্গে খানাপিনা করে রাতটা ওখানে কাটিতে যেতে। কিন্তু জুরার বিষম তাড়া। ইতি-মধ্যে কাফেলার চালকেরা গোপনে তাকে ও চাওকে এমনই একটা গুরুতর খবর দিয়েছে যে, আর এক মুহূর্তও দেরি করা চলে না। ধন্যবাদের সঙ্গে তাদের অনুরোধ এড়িয়ে সঙ্গীদের নিয়ে জুরা রওনা হলো।

জুরার পেছনে ঘোড়ার পিঠে বসেছে সঈদ আর চাওয়ের পেছনে কুচাক।

সঈদ ভাবছে সমস্ত ঘটনাটা। রাগে ও অপমানে মন তার বিষিয়ে গেছে। জুরা ও চাওয়ের ওপর বিদ্বেষ ও আক্রোশের অন্ত নেই। সে যদি সঈদ হয়, এর বদলা তাহলে সে নেবে কড়ায় গণ্ডায়। তাগাই আর কিপচাকদের সঙ্গে তার শত্রুতা আছে বটে, কিন্তু কাজ দেখিয়ে ও ভেট দিয়ে নিজের আনুগত্য সে যদি প্রমাণ করতে পারে, তাহলে তারা ওকে মাফ করবেই, বিশেষ করে বিরোধ যেখানে মৌলিক নয়, কোন নীতি নিয়েও নয়। গতকালের যে দুশমন আজ সে দোস্ত—এই তো চলে আসছে চিরকাল।

নীরবে চলেছে সে ও জুরা। জুরা ভাবছে, কতক্ষণে কেল্লায় পৌঁছবে। আর সঈদ

ভাবছে—এখন কোন কথা নয়, সময় ও সুযোগ আসবেই, তখন ব্যবস্থা নিতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়।

হঠাৎ মোলায়েম কণ্ঠে একসময় সে বললে,—ভাই জুরা, দোস্ত! সত্যি আমি বড় অন্যায় করে ফেলেছি। নিজের অপরাধের গুরুত্বটা এখন টের পাচ্ছি পুরোপুরি। চির-কাল একভাবে জীবন কাটিয়েছি, আজ নতুন জীবনে এসে তাই ভুল করছি পদে পদে। এটা যতই ভাবছি, ততই অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি। তুমি আমায় মেরেছ বলে এখন আর আমার মনে কোন আপসোস নেই।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে জুরার বুক থেকে যেন বিষম ভারী একটা পাথর নেমে গেল। দোস্ত সঙ্গীদের সঙ্গে তাকে যে ব্যবহার করতে হয়েছে, সেজন্যে তার মনস্তাপের সীমা ছিল না। সঙ্গীদের কথা শুনে খুশিতে তার হৃদয়ের উদার আকাশ আবার ঝলমল করে উঠলো। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে,—ভাই সঙ্গীদ, প্রাণের দোস্ত আমার! তোমায় ঐ চোট দিতে আমি কখনই চাইনি, হঠাৎ ঘটে গেল। এটা তুমি রাখ।

বলে কাঁধ থেকে দ্বিতীয় রাইফেলটা নিয়ে সঙ্গীদের হাতে দিতে দিতে সে আবার বললে,—ভাই, রাগ করো না আমার ওপর, আমায় মাফ করো। হঠাৎ আমার মেজাজ গরম হয়ে গেছলো।

গভীর আবেগে জুরাকে আঁকড়ে ধরে সঙ্গীদ বললে,—যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু রাতে কোথায় থাকবো আমরা? বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

রাতে জিরানো হবে না,—জুরা জবাব দেয়: সময় নেই। জলদি কেল্লায় ফেরা দরকার। বিরাট সব ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। কাফেলার লোকেরাও কয়েকটা ভারী জবর খবর দিয়েছে। কুচাককে বলশয় গ্রামে পাঠাতে হবে।

চাওয়ের পেছনে ঘোড়ার পিঠে কুচাক বসে আছে। চাও তাকে দ্বিতীয় রাইফেলটা আর বেশ কিছু কার্তুজ দিয়েছে। কুচাকের ডান হাতে রাইফেল, বাঁ হাতে ভেড়ার রান্না-করা বড় একটা ঠ্যাং। কাফেলার লোকেরা ওটা তাকে দিয়েছিল।

মোলায়েম কণ্ঠে চাও বলে চলেছে—বলশয় গ্রামে পৌঁছে কি তাকে করতে হবে আর আসন্ন বিপদের হুঁশিয়ারিই বা সে বাসিন্দাদের জানাবে কি ভাবে।

প্রত্যেকটি কথায় কুচাক 'হাঁ-হুঁ' করে মাথা নেড়ে চলেছে। দুনিয়ার বিস্ময় তার চোখে। আর সেই সঙ্গে কি এক বিশ্বাসের অনুভূতি যেন উঁকিঝুঁকি মারছে তার মনের মধ্যে। এ বিশ্বাস বা আস্থা বুঝি তার নিজের ক্ষমতার ওপর। হাতে-ধরা মাংসের কথাটাও তার মনে নেই। এর আগে চাও তাকে ধীরে ধীরে ধৈর্য ধরে বুঝিয়েছে, সঙ্গীদের সঙ্গে মিলে কাফেলার ওপর হামলা করা তার কত বড় অন্যায় হয়েছে। কুচাক বুঝেছে শেষ পর্যন্ত। আর সেজন্য সে যেমন লজ্জিত হয়েছে, অনুতপ্তও হয়েছে তেমনি।

সেই রাতেই সে রওনা হয়ে গেল উত্তরে বলশয় গ্রামের উদ্দেশ্যে।

পর দিন সকালে জুরা, চাও আর সঙ্গীদ কিজিল-আর্টের পাশের গিরিসংকটে কেবল নেমেছে, হঠাৎ একটা লাশের গন্ধে টীক চঞ্চল হয়ে উঠলো। লাশটার ওপর শকুনের ঝাঁক বেড় দিয়ে উড়ছে। গিরিসংকটের তলার পর্বতের গায়ে মোটামুটি বড় এক ফাটলের মধ্যে রয়েছে লাশটা।

জুরা উঁকি মেরে দেখে, লোকটার পরনে শুধুই অন্তর্বাস, আর কোন পোশাক নেই। ঘাড়ের কাছে পাকা চুলগুলো খাড়া হয়ে আছে। হাত দুটো পেটের নীচে, দুই পা গোটানো।

রাইফেলটাকে পর্বতের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে জুরা ফাটল থেকে লাশটাকে টেনে বের করে চিৎ করে শুইয়ে দিতেই দারুণ চমকে উঠলো। মৃতদেহের ঠোঁট দুটো

পচে গেছে, মুখটাও বিকৃত। কিন্তু যত বিকৃতই হোক, জুরা সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারে তার পুরনো দোস্তকে—কেল্লার পাশের গাঁয়ের সেই বুড়ো সর্দারকে যে তাকে একটা রাইফেল দিয়েছিল আর দিয়েছিল আজিমের দলের গতিবিধির খবর। সেই সর্দার এখন তার সামনে শুয়ে আছে—নিষ্প্রাণ হিমশীতল।

সর্দার সংক্রামক ব্যাধিতে মরে নি। তাহলে তার জামাকাপড় কেউ স্পর্শ করতো না। তাকে বিষ খাইয়ে জামাকাপড় সব কিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

জুরা উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকায়। তার মাথায় ঘুরছে বাসমাচিদের কথা। এটা নির্ঘাত তাদের কাজ।

বড় বড় পাথরের চাংড়ার মাঝে বালির ওপর একাধিক মানুষের পায়ের ছাপ—সর্দারের পায়ের দাগ ছাড়াও। দাগগুলো চলে গেছে একবার পুবে আর একবার দক্ষিণে। পুবে ও দক্ষিণে কিছুদূর গিয়ে দুটো ঘোড়ার খুরের দাগও জুরার নজরে পড়ে।

সব দাগ পরীক্ষা করে জুরার ধারণা হয়, সর্দার কারো সঙ্গে দেখা করতে নিজের ঘোড়ায় চেপে এই এলাকায় এসেছিল। যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সে লোকও এসেছিল ঘোড়ায় চেপে। তার সঙ্গে এসেছিল আব একজন লোক। সর্দারের সঙ্গে দেখা হবার পর এই দ্বিতীয় লোকটি প্রথম জনের ঘোড়ায় চেপে চলে যায়। তারপর প্রথম লোকটি সর্দারকে খুন করে তার জামাকাপড় জিনিসপত্র নিয়ে তারই ঘোড়ায় চেপে সরে পড়ে। কিন্তু সর্দারের ঘোড়াটা অত্যন্ত তেজী এবং বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাই সে যে নবাগত আগন্তুককে নিজের পিঠে চাপতে দিতে চায়নি, ধস্তাধস্তি করেছে, তার স্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। কিন্তু ঘোড়াটাকে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হয়েছিল।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জুরা গিরিসংকটে ফিরে আসে। সর্দারের জন্যে মন তার ব্যথাতুর। লাশটা ফাটলের মধ্যে রেখে সে পাথর আর নুড়ি দিয়ে সেটা ঢেকে দিলে সযত্নে। তারপর টীককে নিয়ে রওনা হলো চাও ও সঙ্গীদের নাগাল পাবার জন্যে।

কুচাকের জন্যে আবার নতুন করে তার মনে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। যে কঠিন সময় পড়েছে, তাতে পথে কত রকমের বিপদআপদই না ওৎ পেতে আছে! নিরাপদে সেসব এড়িয়ে সে যেতে পারবে তো? দুর্দান্ত নদীটাই বা পার হবে কি করে? আর পার হলেও বলশয় গাঁয়ে সময়মতো পৌঁছুতে পারবে তো?

এইসব ভাবতে ভাবতে এক মালভূমির ওপর উঠতেই ভাঙা একটা চাবুক জুরার নজরে পড়লো। হাতলটা সাদা হাড়ের তৈরী, চমৎকার খোদাই করা। মাথার দিকে যেখানে চামড়া বাঁধা থাকে, সেখানেই ওটা ভেঙে গেছে। চাবুকের মালিক, মনে হয়, সর্দারের ঘোড়াটাকে বশে আনার জন্যে ওটা দিয়ে তার মাথায় মেরেছিল, আর তার ফলে ওটা ভেঙে গেছে।

চাও আর সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা হতে সবিস্তারে বললে জুরা ঘটনাটা। চাবুকটা নিয়ে পরীক্ষা করতে কবতে চিন্তিত কণ্ঠে চাও বললে,—খুব দামী চাবুক এটা, ভারতীয় হাতির দাঁতের তৈরী। সাংঘাতিক না চটলে এমন দামী জিনিস কেউ নষ্ট করে না বা ফেলেও দেয় না। তার মানে, বিপজ্জনক কোন গুরুতর গুপ্ত তথ্য তোমার হাতে এসেছে, জুরা। হয় চাবুকটা ফেলে দাও, নয় লুকিয়ে রাখ, সর্দারের খুনী যাতে দেখতে না পায়। চাবুকটা হাতে থাকলে খুনীর নজর পড়বে তোমার ওপর, কিন্তু তুমি খুনীকে চিনতে পারবে না। আমাদের তাই সতর্ক হওয়া দরকার।

জুরা বললে,—ফেলে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কুচাক যেমন ফাঁদ পেতে ছাগল ধরতো, আমিও তেমনি এটা দিয়ে এর মালিককে ধরবো।

শিকারীদের পায়ে-চলা পথ ধরে গিরিশ্রেণীর পর গিরিশ্রেণী আর গিরিখাদের পর গিরিখাদ পার হয়ে জুরো, চাও আর সঈদ সোজা চলেছে কেল্লার দিকে। জুরো যাচ্ছে আগে আগে। দ্বিতীয় ঘোড়াটায় চাও আর সঈদ।

পথ শেষ হলো এক সময়। দূরে উপত্যকায় দেখা যাচ্ছে কেল্লাটা। পর্বতের ঢাল বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ একসময় থমকে দাঁড়ালো তারা। পর্বতের গায়ে এক উঁচু টিলা, তার পেছনে বড় এক গুহার মধ্যে একটা তাঁবু দেখা যাচ্ছে। জায়গাটা ভারী নিরিবিলি। তাঁবু থেকে কটা রঙের এক তেজী ঘোড়ায় চেপে তাদের দিকে আসছে ও কে? এ কী দেখছে জুরো! লোকটার পেছনে একটা কালো ঘোড়ার পিঠে দ্বিতীয় আর একজন সওয়ার।

জুরো যেন বজ্রাহত। তার সামনে আসছে সর্দার—নিজেরই কটা রঙের ঘোড়াটায় চেপে! সর্দারের লাশটা আগে না দেখলে জুরো ভাবতেই পারতো না যে, ঐ লোকটা সর্দার ছাড়া আর কেউ। সেই সাজপোশাক, সেই জুতো, সেই টুপি ও পাগড়ি। তফাৎ শুধু, একফালি কাপড় দিয়ে এই বুড়ো লোকটার এক চোখ ঢেকে মুখটা বাঁধা। কাপড়ের ভেতর থেকে লালচে রঙের কাঁচা-পাকা পাতলা দাড়ি বেরিয়ে এসেছে।

এদিকে চাও কিন্তু আগেই লোক দুটোকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জুরোর হাত থেকে চাবুকটা ছিনিয়ে নিয়ে জুরোর কোটের নীচে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ফিসফিস করে সে বলে,—সব সময় হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

জুরো ততক্ষণে মন স্থির করে ফেলেছে। এই লোকটাই তাহলে সর্দারকে খুন করেছে! সে হঠাৎ কলবর করে উঠলো,—আরে কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ! সর্দার যে! কি খবর আপনার? দোস্তকে চিনতে পারছেন? মনে আছে সেই হলফের কথা?

লোকটার হাতে চাবুক নেই। অথচ জুরো চিৎকার করতেই ঘোড়াটার গতি বেড়ে গেল। জুরো দেখলে, সওয়ার গোড়ালি দিয়ে তার পেটের দুপাশে চাপ দিচ্ছে। জুরো লাগাম চেপে ধরলো। বললে,—এ কী তাজ্জব ব্যাপার দেখছি, সর্দার! পুরনো দোস্তকে চিনতে পারছেন না কবে থেকে? তাহলে কি আদপেই আপনি আমার সেই দোস্ত সর্দার নন?

বুড়ো ঘোড়সওয়ারের মুখে ক্ষণিক বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। কিন্তু পরক্ষণে মুখে হাসি টেনে এনে অন্তরঙ্গ কণ্ঠে সে বিড়বিড় করে উঠলো,—ওহো, তুমি! তুমিই তাহলে? আমার শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না। গলা একেবারে বসে গেছে। চোখে কম দেখছি। দাঁতেও দরদ। দাওয়াইয়ের জন্যে তাই ওঝার কাছে যাচ্ছি। সেখান থেকে ফিরে আসি, আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার মেহমান।

বলতে বলতে লোকটা জোরে লাগামে ঝাঁকুনি মারে। জুরো যেন অবাক হয়ে গেছে, এমনিভাবে লাগামটা চেপে ধরে বললে,—কিন্তু এ তো কথা ছিল না, সর্দার! আপনি যা যা বলেছিলেন, সবই আমি করেছি—গুলি করে মেরেছি আজিমকেও। তখন আপনি কি হলফ করেছিলেন, নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে! বলেছিলেন, কাজটা হাসিল করতে পারলে যেখানে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে, এমন কি রাস্তায় হলেও, ঘোড়াটা তক্ষুণি আমায় দিয়ে দেবেন।

—বেশ, ঠিক আছে। ওঝার কাছ থেকে ফিরে আসি। সন্ধ্যার সময় তুমি এস, ঘোড়াটা তোমায় আলবৎ দিয়ে দেব। এখন বড় তাড়া আছে।

কিন্তু জুরো নাছোড়বান্দা। আরো জোরে লাগাম চেপে ধরে বললে,—কিন্তু তা হয় কি করে, সর্দার? হলফ করে আপনি তা খেলাপ করতে চান? নিজের কানকেই যে বিশ্বাস করতে পারছি নে। না কি আদপেই আপনি সর্দার নন?

সঈদ এদিকে বুড়োর সঙ্গীটাকে নিয়ে পড়েছে। রোগা চেহারা লোকটার, গায়ের রঙ ময়লা, মাথার চুল কালো। বুড়োর সঙ্গে জুরার ব্যবহার দেখে সাপের মতোই সে যেন কিলবিল করছে অস্থিরভাবে।

সঈদ তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেখে লোকটা অসোয়াস্তি বোধ করছিল। শেষে ভদ্রতার খাতিরে একটু হাসার ভঙ্গি করতেই, তার প্রকাণ্ড দুই ধারালো দাঁতের পাটি ঝকঝক করে উঠলো। আর বিস্ময়ে ফেটে পড়লো সঈদ,—আরে আরে, পণ্ডিত না? নির্ঘাত পণ্ডিত! আমি হলফ করে বলতে পারি, তুমি পণ্ডিত।

লোকটা জোরে মাথা নেড়ে অস্বীকার করে সচকিত চোখে তাকালো সঙ্গী বুড়ো লোকটার দিকে।

বুড়ো তখন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বিড়বিড় করে জুরাকে উদ্দেশ করে বলছে,—তোমার বেয়াদপি দেখছি বড়দেরও রেয়াৎ করে না! লাগাম ছেড়ে দাও।

বলতে বলতে সে সবার অলক্ষ্যে ঘোড়াটাকে গোড়ালির ঘা মারলে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা এক পাশে হটে গিয়ে ছুট দিলে সামনের দিকে।

জুরা লাগাম ধরে ঝুলে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের কোটটা আলগা হয়ে গেল, আর ভেতরের পকেট থেকে বেরিয়ে পড়লো হাতির দাঁতের সেই চাবুকের বাঁটটা। সেদিক নজর পড়তেই বুড়ো চমকে উঠে চকিতে তাকালো জুরার দিকে। চোখে তার হিংস্র দৃষ্টি, জুরার নজর এড়ায় না।

ক্ষণেকের জন্যে বুড়ো বুঝি বেসামাল হয়ে পড়ে। তার মুখের ওপর থেকে হঠাৎ কাপড়ের ফালিটা সরে গেল। জুরা দেখে, কাচের মতো অনড় নিশ্চল তার ডান চোখের চাউনি।

সঈদ এদিকে চিৎকার করছে,—আলবৎ, আলবৎ তুমি পণ্ডিত! এ দেশের লোক তুমি নও, ভারতবর্ষে তোমার বাড়ি। পীত নদীর উৎস-মুখে নক্ষত্রখচিত প্রান্তরে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সেখানে তুমি যন্ত্রপাতি নিয়ে কি সব করছিলে আর জায়গাটার নকশা আঁকছিলে। কি, মনে পড়ছে না?

লোকটা তখন বিষম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। দুর্বোধ্য ভাষায় বুড়ো ঘোড়সওয়ারকে ঝটিতি কি সব বলতেই, অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বুড়ো মাটিতে লাফিয়ে পড়েই চোখের পলকে লাফিয়ে উঠলো সঙ্গীর ঘোড়ার পেছনে। তীরবেগে ঘোড়াটা ছুটলো উত্তরমুখো। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল যেন বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো।

জুরা গর্জে উঠলো,—খবরদার, থাম, থাম! নয়তে গুলি কববো!

বলতে বলতে সে শূন্যে ফাঁকা আওয়াজ করে আবার হুংকার ছাড়লে,—টীক, ধর্, ধর্ ওকে!

টীক তীরেব মতো ছুটলো ঘোড়সওয়ারের পেছনে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ওরা দেখলে, কেল্লার পাশের গাঁ থেকে তিনজন ঘোড়সওয়ার জোর কদমে ছুটে আসছে তাদের দিকে। গাঁয়ে বেশ ভিড় জমেছে। তিনজনের মধ্যে যে মাতব্বর, শক্তসমর্থ চেহারা তার, দাড়িগোঁফ পরিষ্কার কামানো। উঠে আসতে আসতে সে জিজ্ঞেস করলে,—তোমরা কি বাসমাচি?

না, পার্টিজান।—জুরা বললে। তারপর সে এ পর্যন্ত যা ঘটেছে, সর্দারের লাশ পাওয়া থেকে ছদ্মবেশী খুনে লোকটার পালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত, সমস্ত ঘটনাটা বলে গেল সংক্ষেপে।

কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার! ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে কোন পরিবর্তন বা চাঞ্চল্য দেখা গেল না। জুরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে,—কিন্তু আপনারা কে?

রুষ্ট কণ্ঠে মাতব্বর লোকটা বললে,—সে কৈফিয়ৎ তোমায় দেব না। তবু শুনে রাখ, আমার নাম লিনেজা, এখানকার পার্টিজান বাহিনীর কর্তা।

পরক্ষণে, লিনেজা হুকুম দিতেই, জুরা, চাও ও সঙ্গীদকে নিরস্ত্র করা হলো, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হলো তাদের কাছ থেকে। বিস্মিত অপমানিত জুরা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে,—ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি নে। খুনী আর তার সাকরেদ ঐ পালিয়ে যাচ্ছে। ওদের পাকড়াও করে আপনার হাতে দিতে চেয়েছিলাম। আইন নিজের হাতে নিতে চাইনি। নইলে শূন্যে ফাঁকা আওয়াজ করতাম না। শুধু তাই নয়—তাগাই ও তার দলবলকেও আমরা পাকড়াও করেছি, নিরস্ত্র করেছি। মুসা নিয়ে আসছে তাদের। তবু কেন আমাদের সঙ্গে এই ব্যবহার?

অ্যাঁ!—লিনেজা যেন ক্ষেপে উঠলো: কি করেছিস, নিরেট গাধা-শুয়োরের দল? মারের চোটে তোদের মগজ উড়িয়ে দেওয়া উচিত। বাসমাচিরা আসছে আত্মসমর্পণ করতে, ইতিমধ্যেই একত্রিশজন আত্মসমর্পণ করেছে, আর তোরা কিনা এই করলি?

জুরা স্তব্ধ। অনেক কষ্টে অপমানটা তাকে হজম করতে হয়। শেষে একসময় সংযত কণ্ঠে আবার সে বললে,—সোভিয়েত শক্তির আমরা দোস্ত, আর আপনি কিনা এইভাবে আমাদের বেইজ্জত করছেন! সর্দারের খুনীকেই তো আপনার গুলি করা উচিত ছিল। সে যাক। একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তাগাই আর খাঁদাকে কেল্লায় আনা হলে তাদের কি গুলি করা হবে?

লিনেজা গর্জে উঠলো,—চোপ্ রও, কুত্তার বাচ্চা! আমাকে উচিত-অনুচিত শেখাতে এসেছিস?

দুর্জয় রাগে জুরা যেন পাথর বনে যায়। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। কিছু দিন আগেও এ অপমানের হাজার ভাগের একভাগ সহ্য করাও তার পক্ষে কল্পনাতীত ছিল! কিন্তু—কিন্তু আজ সে পার্টিজান, সোভিয়েত শক্তির দোস্ত। হঠাৎ চাওয়ের সঙ্গে তার চোখাচোখি হলো। চাওয়ের চোখে মিনতি, তাকে ইশারা করছে, ধৈর্য যেন না হারায়।

কিছুক্ষণ পরে আত্মসংবরণ করে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে জুরা আবার বললে,—শুনুন লিনেজা, এই চূড়ান্ত অপমানের পর আমার চুপ করে চলে যাওয়াই উচিত ছিল। তবু বলতে হচ্ছে, তাগাই ও খাঁদাকে আমিই পাকড়াও করেছি। শিকারী ইদ্রিস কবুল করেছিল, বিচারের পর ওদের গুলি করা হবে। তাই—

অসহিষ্ণু কণ্ঠে লিনেজা বাধা দিলে,—কে তোর ইদ্রিস, আমি চিনি নে। তাগাইকে আমরা বন্দী হিসেবে বিনিময় করবো, গুলি করার কথাই ওঠে না। কিন্তু এসবে তোর এত মাথাব্যথা কেন? কোথাকার তালেবর তুই?

এই সময় একজন পার্টিজান এগিয়ে এসে লিনেজার কানে কানে কি বলে শেষে জুরার পরিচয় দিয়ে বললে, এই সেই লোক যে আজিমের দলকে ঘায়েল করেছিল।

ভ্রূ কুঁচকে দাঁতে দাঁত চেপে লিনেজা তাকালো জুরার দিকে, তারপর কতকটা মোলায়েম কণ্ঠে বললে,—ওঃ তাই বলো! তুমিই জুরা? বেশ, বেশ। শোন, একত্রিশজন বাসমাচি নিয়ে কজিঙ্কজ্কি এসেছেন আত্মসমর্পণ করতে। সেইজন্যেই আমরা এক খানাপিনার বন্দোবস্ত করেছি। খানাপিনার সময় কারো কাছে কোন হাতিয়ারপত্তর থাকবে না। বাসমাচিরা তাদের হাতিয়ারপত্তর আগেই আমাদের কাছে জমা দিয়েছে। আমারও বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে সঙ্গে কিছু রাখছি না। আমার পাহারাদারদের কাছেই শুধু রাইফেল থাকছে। মেজমানী হচ্ছে গাঁয়ের বাইরের পতিত জমিটায়। তোমরাও সেখানে এস, কেমন!

জুরা বললে,—তা না হয় হলো, কিন্তু মেজমানীতে কি আমরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংস খাব নাকি? ছোরা কখানা অন্ততঃ ফেরত পেলে ভাল হয়।

ছোরা তিনখানা ওদের ফেরত দেওয়া হলো।

মেজমানীতে ওদের অবিলম্বে যোগ দিতে বলে, লিনেজা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল কেল্লার দিকে।

প্রথম পর্ব ৫

জুরা, চাও ও সঈদ কেল্লায় কেবল পেঁৗচেছে, এমন সময় ঘোড়সওয়ার দলটি নিয়ে মুসাও বেরিয়ে এল উত্তরের গিরিদ্বার থেকে।

কেল্লার ফটকে জুরা ইদ্রিসের পথ আটকায়। বলে,—তুমি না হলফ করেছিলে তাগাইয়ের বিচার হবে; কিন্তু লিনেজা বলছেন, তার সংগে বন্দী বিনিময় করবেন। তাগাইযের সংগে বন্দী-বিনিময় চলে কি করে? তার মানে, সে আবার খালাস পাবে।

নীরস কণ্ঠে ইদ্রিস বললেন,—সব কিছুই আইন-মাফিক চলবে। আইন ভাঙার এখ-তিয়ার কারো নেই, তোমারও না।

বটে! রুষ্ট চোখে জুরা তাকালে ইদ্রিসের দিকে। মুসার দিকে ফিরে বৃদ্ধ শিকারী বললেন,—তাগাই আর খাঁদাকে হাজতে বন্ধ করো, একজন সেপাই মোতায়েন রাখ সেখানে। লিনেজাকে খবর দাও এখানে আসার জন্যে।

বলতে বলতে তিনি ঢুকলেন সর্দারের কুঠিতে। ছাদের ওপরকার পাহারাদার বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুসা হাত নেড়ে ইশারা করতেই সে থতমত খেয়ে গেল।

জুরা, চাও আর সঈদকে মুসা নির্দেশ দিলে ডাক্তারের কুঠিতে গিয়ে বিশ্রাম করতে। সে কুঠি এখন ফাঁকা।

চাও আব সঈদকে সেখানে রেখে জুরা উঠোনে বেরিয়ে এল। সব কিছুই তার পরি-চিত। সে গোরার খোঁজ করে। কেল্লায় কজুবে নেই, আছে শুধু গোরা—তার প্রিয়তম দোস্তদের একজন। তাগাই সম্পর্কে নিজের কর্মপন্থা স্থির করার জন্যে গোরার সংগে সে একটু পরামর্শ করতে চায়।

কিন্তু গোরার পাত্তা মেলে না কোথাও।

জুরা এদিকওদিক ঘুরছে আর ভাবছে। এমনি কবে ঘুরতে ঘুরতে শেষে উদ্দেশ্য-হীনেব মতোই একসময় সে ধীরেসুস্থে এগিয়ে চললো হাজতের দিকে।

সমস্ত ব্যাপারটা সে ভেবেছে নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতো এবং শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তেও এসেছে। তাগাই ও খাঁদাকে খালাস দিতে ওরা সবাই—লিনেজা তো বটেই, মায় ইদ্রিস পর্যন্ত—যেন কোমর বেঁধে লেগেছে। কিন্তু তাগাই ও খাঁদা বেঁচে থাকলে চাষীদেব রক্তের দরিয়া নামবে পর্বত-মুল্লুক থেকে। হাজতের দিকে যেতে যেতে জুরা আপন মনে বলে,—না, কিছুতেই তা ঘটতে দেব না!

নিঃশব্দে সে ফাটকের দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালে। ফাটক আর আস্তাবলের মাঝ-খানের কোণে যেসব বাসমাচিদের এনে জড়ো করা হয়েছে, সেখানে তুমুল হৈচৈ। ফাটকের দিকে কারো নজর নেই।

এমনি সুযোগই জুরা খুঁজছে। চোখের পলকে দরজা খুলে সে ফাটকের ভেতর ঢুকে গেল।

তাগাই ও খাঁদা একটা মাদুরের ওপর বসে আছে। জুরাকে দেখেই তারা লাফিয়ে উঠলো। আতঙ্কে দুই চোখ বিস্ফারিত—তারা পিছু হটতে থাকে।

পরক্ষণে কানে এল এক তীব্র তীক্ষ্ন আর্তনাদ—মরণ-আতঙ্কে দিশেহারা জানোয়ারের আর্তনাদ যেন। উঠোনের লোকজন চমকে উঠে তাকালো হাজতের দিকে।

লিনেজা তখন সবেমাত্র কেল্লায় ফিরে ঘোড়া থেকে নামছে, নিশ্চল দাঁড়িয়ে গেল সে। তার বাঁ পা তখনো রেকাবের ওপর।

আবার আর্তনাদ এল ঃ বাঁচাও! বাঁচাও!

সবাই ছুটলো হাজতের দিকে।

জুরা! জুরা!—বুকফাটা আর্ত চিৎকার ছেড়ে তাগাই লাফিয়ে পড়লো হাজত থেকে। তাকে তখন চেনাই দায়। কে বলবে—এই সেই তাগাই, বেপরোয়া তেজী বাসমাচি-সর্দার তাগাই! বিস্ফারিত দুই চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, প্রকাণ্ড হাঁ করে তারস্বরে চিৎকার ছেড়ে ছুটছে ফাটকের দিকে।

পার্টিজানরা ছুটে গেল তার দিকে। পেছনে ছুটে আসছে জুরা। হাতে রক্তমাখা ছোরা। তার দিকে একবার নজর পড়তেই আলুথালু তাগাই ছুটলো আরো জোরে—তীরবেগে।

ততক্ষণে সর্দারের কুঠির দরজা খুলে শিকারী বেরিয়ে এসেছেন। তাগাইয়ের পথ আগলে দাঁড়ালেন তিনি।

গুলি করো না!—চিৎকার করে পার্টিজানদের তিনি হুঁশিয়ারি জানালেন।

আতঙ্কে তাগাই তখন পাগলের মতো, বৃদ্ধ শিকারীকে আমলই দিল না। চোখের পলকে শিকারী একটা পা বাড়িয়ে দিতেই, তাগাই হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জুরা এসে বাজপাখির মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

রেহাই নেই তোর!—তাগাইয়ের চুলের মুঠি ধরার চেষ্টা করতে করতে জুরা গর্জে উঠলো ঃ পুরনো দেনাপাওনা আজ সব চুকিয়ে ফেলবো।

বুড়ো শিকারী ততক্ষণে ছোরাসমেত জুরার হাত চেপে ধরেছেন এবং তার নাকটা আঙুলের মধ্যে চেপে ধরে মোচড় দিতে দিতে তার মাথায় সজোরে ধাক্কা মারছেন ওপর দিকে। পার্টিজানরাও ছুটে এসেছে। অনেক কষ্টে জুরাকে তারা টেনে নিলে তাগাইয়ের কাছ থেকে। তার ছোরাটাও ছিনিয়ে নেওয়া হলো।

দুর্দান্ত রাগে লিনেজা চিৎকার করছে। খাপ থেকে সে রিভলবার বের করার চেষ্টা করছে, কিন্তু হাত কাঁপছে দারুণ উত্তেজনায়। সে চিৎকার ছাড়লে,—পাজী বেআদপ বদমাশটাকে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে দাও। এখুনি ওকে আমি গুলি করে মারবো।

বুড়ো শিকারী রাগে ফেটে পড়লেন,—জুরা, আবারও তুমি কারও পরোয়া না করে নিজের মর্জিমাফিক কাজ করলে! কতবার না তোমায় হুঁশিয়ার করে দিয়েছি!

তিক্ত কঠিন চাপা গলায় জুরা বললে,—ইদ্রিস, তোমার জন্যে আবারও সব কিছু ভেস্তে গেল। আকাশের তারাদের নামে হলফ করছি—

চোপ রও! থাম!—তেড়ে উঠলেন শিকারী ঃ লজ্জা করছে না, আবার কসম খাচ্ছ দীনদারদের মতো! মারকান-সুর কাছে খাঁদার বুলেট বুকে নিয়ে যখন পড়ে ছিলে, তখন আল্লার নিকুচি করেছিলে মনে নেই? নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার!

সেপাইরা ধস্তাধস্তি করতে করতে জুরাকে নিয়ে দ্বিতীয় ফাটকে আটকালে।

তাগাই তখনো মাটিতে পড়ে আছে। বুটের আগা দিয়ে তাকে ঠেলা মেরে ইদ্রিস বললেন,—এই, ওঠ!

রাগে ফুসছিল লিনেজা, খেঁকিয়ে উঠলো,—কে হে তুমি বুড়ো, ফৌজের কাজে নাক গলাচ্ছ? এ এখতিয়ার তুমি কোথায় পেলে?

শিকারী নকল দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেললেন।

কজুবে!—বিস্ময়ে ফেটে পড়ে লিনেজা। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার হতাশ বিহ্বল কণ্ঠ থেকে আবার বেরিয়ে এল,—কজুবে!!

খবরটা ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো। কেল্লার সর্বত্র আওয়াজ ওঠে,—কজুবে! কজুবে এসেছেন!

ঘৃণ্য পরিচিত নামটা কানে যেতেই তাগাই এক লাফে উঠে দাঁড়ালে। তার দম যেন আটকে আসছে। না ভেবেচিন্তেই সে হাউমাউ করে উঠলো,—তুমি? তুমি কি করে এখানে এলে? তুমি তো শহরে ছিলে! পামীরে তোমার তো কোন কাজ নেই!

ওর অবস্থা দেখে কজুবে হেসে ফেললেন, বললেন,—তোমাদের গোয়েন্দা-ব্যবস্থা খারাপ নয়, স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে আমরা ঘুমিয়ে থাকবো, এমন কোন কথা আছে? বুঝতেই পারছো, আমি শহরেও থাকি, আবার এখানেও থাকি।

বলতে বলতে তিনি তাগাইকে হাজতে আটকাতে হুকুম দিলেন।

গোরা এইমাত্র কেল্লায় ফিরেছে। মুসা ও ইদ্রিসের সঙ্গে ফেরে নি। মুসার সঙ্গে পরামর্শ করে চারপাশের এলাকাটা আবারো একবার ভাল করে টহল দেবার জন্যে সে বেরিয়ে পড়েছিল। ফিরে এসে দেখে এই কাণ্ড—কেল্লায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই জুরা আবার এক জবর ঝামেলা বাধিয়ে বসেছে।

গোরাকে দেখে চাও অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করে। বাসমাচিদের হাতে আটক থাকা কালে এবং গোরার সঙ্গে এবার দেখা হবার পরেও জুরার কাছে সে বহুবার শুনেছে গোরার কথা।

তাদের দুজনার মধ্যে কিছুক্ষণ কি যেন পরামর্শ হয়। তারপর গোরা এগিয়ে গেল কজুবের দিকে আর চাও লিনেজার দিকে। তাদের সম্মিলিত আবেদন হলো ঃ জুবাকে মাফ করুন এবারের মতো। ছেড়ে দিন তাকে। আবারও সে ভুল করেছে। কিন্তু শতগুণে সে তা পুষিয়ে দেবে। সে একটা গোপন খবর জানে। খুবই জরুরী খবর।

চাওয়ের দিকে ফিরে লিনেজা গর্জে উঠলো,—কে হে তুমি? কোথা থেকে আসছো?

পরক্ষণে একজন পার্টিজানের দিকে ফিরে সে হুকুম করলে,—জুরার সঙ্গে একেও ফাটকে আটকাও।

না।—কজুবে বাধা দিলেন।

আকস্মিক বিস্ময়ের ধাক্কা লিনেজা ততক্ষণে কাটিয়ে উঠেছে। তার হাবভাবে আগেকার সেই বিহ্বলতা আর নেই। সে জিদ ধরে,—কিন্তু আমি বলছি, আটকাও ওকে। পাজীটাকে আমার বিশ্বাস নেই।

এমন সময় মুসা এসে হাজির হলো। প্রথমে লিনেজার দিকে, তারপর কজুবের দিকে ফিরে সে বললে,—প্রথম হাজতে তাগাইকে আর দ্বিতীয়টায় জুরাকে আটকানো হয়েছে। জুরা চেঁচামেচি করছে খালাস পাবার জন্যে। খাঁদার লাশটার কি করা হবে? কবর দেওয়া দরকার।

লিনেজাকে উদ্দেশ করে রাগত গলায় কজুবে বললেন,—চাওয়ের ব্যাপারটা আমার

ওপর ছেড়ে দাও। বাকী পার্টিজানদের কেল্লায় এনে জমায়েত করো। এক জোড়া মেশিনগান নিয়ে ঘেরাও করো বাসমাচিদের। তারা এখন খানাপিনায় মত্ত।

ঘোড়ায় উঠতে উঠতে লিনেজা উদ্ধত কণ্ঠে জবাব দিলে,—উঁহু, সে আর হচ্ছে না। আমিই এখানকার ফৌজদার। সেপাইরা সব নতুন। তোমাকে তারা চেনে না। নিজের মর্জিমাফিক আমি কাজ করবো।

বলতে বলতে সে হুকুম করলে,—পাহারা তুলে নাও!

বাসমাচিদের পাহারায় যারা ছিল, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

জোর গলায় মুসা হাঁক ছাড়লে,—যে যার জায়গায় ফিরে যাও!

গাঁয়ের দিক থেকে তখন মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ আসছে, হল্লা উঠছে।

কজুবের হুকুম শোনা গেল,—বাসমাচিদের এখানে নিয়ে এস।

বৃথা চেষ্টা! ও হুকুম চলবে না।—লিনেজা চিৎকার ছাড়লে। পরক্ষণে ঘোড়ায় চাবুক কষে সে ছুটলো ফাটকের দিকে।

ফেরো! ফেরো!—কজুবে গুলি ছুড়লেন লিনেজাকে তাক করে।

ডাকাতদলের ভয়ংকর রণধ্বনি কানে এল,—চার-ঈয়ার! চার-ঈয়ার!......

তারা কেল্লা চড়াও করেছে।

আবার শোনা যায় কজুবের হুকুম,—এক্ষুণি দেয়ালের ফুটোর মুখে যাও!

—চার-ঈয়ার! চার-ঈয়ার!......

ফুটোর ভেতর দিয়ে গাঁ অবধি গোটা ময়দানটা দেখা যায়। গাঁয়ের কাছে খানাপিনার বন্দোবস্ত হয়েছে। নিরস্ত্র পার্টিজানরা ছুটে আসছে সেদিক থেকে। আর তাদের পেছনে হল্লা করতে করতে বিজয়োল্লাসে ছুটে আসছে বাসমাচি-ঘোড়সওয়াররা। তাদের ফুর্তি আরো এই জন্য যে, তারা বুঝেছে, কেল্লার পার্টিজানরা নিজেদের লোকদের ওপর কখনই গুলি চালাবে না, আর ওরাও তাই সহজে কেল্লায় ঢুকতে পারবে।

কিন্তু ছুটতে ছুটতে নিরস্ত্র পার্টিজানরা হঠাৎ কার হুকুমে যেন শুয়ে পড়লো মাটির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কেল্লা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ শুরু হলো ডাকাতদের ওপর। কয়েকজন ঘায়েল হতেই হামলাকারীরা পিছু হটে গেল।

মুসা মেশিনগান আনতে ছুটেছিল, ফিরে এল খালি হাতে। বললে,—কমরেড সর্দার, মেশিনগানগুলো থেকে গুলি ছোড়ার পিন সব খুলে নেওয়া হয়েছে। পুরো বেইমানি!

ডাকাতদের কাছ থেকে যেসব হাতিয়ারপত্তর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার থেকে একটা রাইফেল তুলে নিয়ে কজুবের পাশের ফুটোয় গিয়ে দাঁড়ালো চাও।

পরক্ষণে হাঁফাতে হাঁফাতে ঘাম মুছতে মুছতে গোরা ছুটে এল,—কমরেড সর্দার, গ্রেনেডগুলো থেকে সমস্ত বিস্ফোরক ডিটোনেটার বের করে নেওয়া হয়েছে। বেইমানি, চূড়ান্ত বেইমানি!

মুসা বললে,—বিষম ভাবনার কথা।

কুছ পরোয়া নেই!—কজুবে বললেন ঃ ঘাবড়াও মাৎ!

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসছে। সুবিন্যস্ত ব্যূহের আকারে বাসমাচিরা আবার আক্রমণ করলো।

অন্যদের দিকে মাথা নেড়ে কজুবে বললেন,—দেখছো? বাসমাচিদের এরকম কায়দা-কানুন মেনে চলতে দেখেছ কখনো? তার মানে, ওরা লড়াইয়ের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা রপ্ত করেছে।

হ্যাঁ, তাই তো!—পার্টিজানরা বিস্মিত হয়। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বৃষ্টি শুরু করে তারা।

বেশ কিছু বাসমাচি ঘায়েল হতেই বাকী সবাই শুয়ে পড়লো সুশৃংখলভাবে।

লড়াইয়ের ডামাডোল যখন চলেছে, সবার অলক্ষ্যে সঈদ তখন বেরিয়ে এল ডাক্তারের কুঠি থেকে। গোধূলির ঘনায়মান অন্ধকারে, তাগাই যে ফাটকে আটক রয়েছে, এগিয়ে গেল সেদিকে।

চারদিকে সে দেখে নিলে ভাল করে। না, কেউ কোথাও নেই। এক ঝটকায় সে ফাটকের হুড়কো টেনে নিয়ে দরজা খুলে ফেললে। ভেতরে অন্ধকার। তাগাইকে দেখা যাচ্ছে না।

চাপা গলায় সঈদ ডাকলে,—তাগাই, আমি সঈদ, তোমায় সাহায্য করতে এসেছি।

দরজার পেছন থেকে তাগাই বেরিয়ে এল। হাতে বড় এক লোহার ডেলা।

তোমার জোর বরাত যে কথা বলেছ, নয়তো এই লোহার ডেলাটা মাথায় পড়তো। তারপর? কি খবর?—তাগাই বললে। সঈদ যে নিরস্ত্র, তাগাইয়ের তা নজর এড়ায়নি। তাই সংগে সংগে তার স্বাভাবিক উদ্ধতভাব ফিরে এসেছে।

সঈদ বললে,—মনে রেখ তাগাই, আমি তোমার জান বাঁচিয়ে দিলাম। ভবিষ্যতে এটা কিন্তু ভুলে যেও না।

ভ্রূ কুঁচকে তাগাই ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকে সঈদের দিকে। শেষে নীরস কণ্ঠে বললে,—তার মানে অতীতের দুষ্কর্মের জন্যে মাফ চাইছ? বেশ, তাই হোক। বেঁচে গেলে তুমি!

হাজত থেকে তারা বেরিয়ে আসতেই সঈদ দরজায় আবার খিল এঁটে দিলে।

তাগাই শুনেছে, আস্তাবলের ভেতর দিয়ে কেল্লা থেকে বেরোনোর আর একটা পথ আছে। সঈদকে নিয়ে সে দেয়াল ঘেঁষে গুড়ি মেরে এগোতে এগোতে একসময় ধাঁ করে আস্তাবলে ঢুকে পড়লো। তারপর ঘোড়ার গায়ে হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকারে পথ হাতড়ে এসে পড়লো সেই দরজার কাছে।

সঈদ বললে,—আমিও যাব তোমার সংগে। এই জঘন্য কুত্তার জীবন আমি আর সইতে পারছি নে।

দরজা থেকে সন্তর্পণে হুড়কো খুলতে খুলতে তাগাই বললে,—না, তুমি থাকবে এখানে। জুরার মাথা আমার চাই। তোমায় তা এনে দিতে হবে। তার জন্যে দশ হাজার সোনার মোহর তুমি পাবে আর পাবে সারিকলে বাড়ি একটা।

বলতে বলতে তাগাই দরজা খুলে সঈদকে টেনে নিয়ে বাইরে এল। কেল্লার এ দিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। যে দিকটা গাঁয়ের দিকে, লড়াই চলছে সেখানে।

তাগাই বললে,—শোন, কেল্লায় থাকবে তুমি। এসব দরজা যাতে বন্ধ না হয়, সেদিকে নজর রাখবে। জুরার মাথা এনে দেবার কথা কখনই ভুলবে না। ওটা করতে পারলে দশ হাজার মোহর আর একটা বাড়ি—বুঝলে? এবার যাও, একটা ঘোড়া নিয়ে এস আমার জন্যে।

ঠিক আছে, তাই হবে।—বলতে বলতে সঈদ আবার আস্তাবলে ঢোকে। কয়েক মিনিট পরেই জিন ও লাগাম পরিয়ে একটা ঘোড়া নিয়ে ফিরে এল সে।

তার হাতে একটা বোতল এগিয়ে দিয়ে তাগাই বললে,—এটা রাখ, এতে বিষ আছে। সবুজ ঝান্ডা নেড়ে তিনবার তোমায় আমি সঙ্কেত করবো, তুমি তখন কেল্লার ঢাকা

রিজারভার বা মূল চৌবাচ্চাটার জলে এই বিষ মিশিয়ে দেবে। সকালে এই সংকেতের জন্যে গাঁয়ের দিকে নজর রেখ। এটা না করলে কজুবেকে কিন্তু আমি চিঠি লিখে জানিয়ে দেব যে, তুমিই আমায় খালাস করে দিয়েছ।

সঙ্গীদের টেরা চোখ মুহূর্তের জন্যে রাগে আরো টেরা হয়ে যায়। তবু রাগ দমন করে যথাসাধ্য সংযত কণ্ঠে সে বললে,—এ শাসানির কোন দরকার ছিল না, তাগাই। যা করেছি, তোমার হুকুমের তোয়াক্কা না রেখেই নিজের তাগিদে করেছি। বাকিটাও করবো। দোস্ত আর দুশমনের মধ্যে তফাৎ বোঝা দরকার।

বোতলটা ছাড়াও লোহার ডেলাটা সে তাগাইয়ের হাত থেকে নিয়ে নিলে।

বাসমাচিরা পেছু হটছে। বহু লোক যুদ্ধে খতম হওয়ায় শেষ পর্যন্ত গোলাগুলি বন্ধ করে তারা গাঁয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু খানাপিনা থেকে যে সব পার্টিজান পালাতে পেরেছিল, তাদের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

কজুবের পাশের দু ফুটোয় গোরা আর চাও। তাদের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে কজুবে বললেন,—আরে, জুরার কথা যে আমরা একদম ভুলে গেছি! একজন গিয়ে তাকে খালাস করে নিয়ে এস।

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ঝড়ের বেগে চাও বেরিয়ে গেল। গোরাও ছুটতে যাচ্ছিল, মুচকি হেসে কজুবে বললেন,—এঃ! জোয়ান ছোকরা হয়ে বুড়ো চাওয়ের সঙ্গে পারলে না! আর ছুটে কি করবে?

মৃদু হেসে গোরা আবার রাইফেল তুলে নিলে।

একটু পরেই জুরা এসে দাঁড়ালো কজুবের সামনে। দুরন্ত রাগে সে ফুঁসছে। কিন্তু কজুবেকে দেখেই মুহূর্তে রাগ তার জল। হতবাক সে। পরক্ষণে প্রচণ্ড খুশির ঝাপটায় সে জাপটে ধরলো কজুবেকে। আনন্দে সে যেন দিশেহারা। বেশ কিছুক্ষণ পরে তার মুখে কথা ফুটলো,—আপনি এখানে! কখন এলেন? তোফা, তোফা! আর ভাবনা নেই। এখানে কি চলছে জানেন? অনেক কথা আপনাকে বলার আছে।

পরে। ওসব পরে হবে।—কজুবে বললেন ঃ এখন যাও তো, তাগাইকে নিয়ে এস এখানে। আমরাই ওর বিচার করবো। প্রাণদণ্ডই ওর একমাত্র শাস্তি। তুমিই গুলি করবে।

অস্ত্রশস্ত্রের গাদা থেকে জুরা একটা রাইফেল, কার্তুজের বেল্ট আর রিভলবার বেছে নিয়ে ছুটলো হাজতের দিকে।

হুড়কো টেনে নিয়ে লাথি মেরে সে দরজা খুলে ফেললে। কিন্তু কি ব্যাপার! ঘরে তো কেউ নেই! কোথায় গেল তাগাই?

পালিয়েছে!—কথাটা মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে যেতেই এক লাফে জুরা বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

কোন্ দিকে যেতে পারে বদমাশটা? বাঁ দিকে সর্দারের কুঠির দেয়াল, ডাইনে আস্তাবল। জুরা ঢুকলো আস্তাবলে। ঘোড়াগুলো ডাকছে, তাদের লাগামের শব্দ হচ্ছে। জুরা চমকে উঠলো ঃ ওপাশের বাইরে বেরোবার দরজাটা খোলা! খোলা দরজা দিয়ে যে আলো আসছে, তাতে কি যেন নড়ছে সেখানে দেখা যায়!

বেরিয়ে এস!—জুরা গর্জে উঠলো ঃ বেরিয়ে এস, নইলে গুলি করবো!

বলতে বলতে সে কোণের দিকে ছুটে গেল। সেখানে বিচালির গাদার মধ্যে কে যেন নড়াচড়া করছে।

আমি! আমি, জুরা!—ত্রস্ত ব্যাকুল কণ্ঠে সঈদ আর্তনাদ করে উঠলো। জুরার ভয়ংকর শাসানিতে ভীত-বিহ্বল সঈদ বাঁচার আর কোন পথ নেই দেখে লোহার ডেলাটা দিয়ে নিজের কপালেই জোরে আঘাত করে বসলো। কপাল কেটে উষ্ণ চটচটে রক্তের ধারা নামলো চোখ বেয়ে।

অন্ধকার থেকে জুরার কাছে এগিয়ে এসে কম্পিত গলায় সে গড়গড় করে বলে গেল, কিভাবে সে তাগাইকে পালাতে দেখে তার পিছু ছুটেছিল, তাগাই কেমন করে ঘোড়ায় চেপে পালিয়ে গেল, কিন্তু যাবার আগে লোহার এক ডেলা দিয়ে কিভাবে তাকে আঘাত করেছিল, যার ফলে সে সংবিৎ হারিয়ে ফেলে।

আবেগের সংগে জুরা বললে,—শাবাশ ভাই, শাবাশ! খাঁটি দোস্তের মতো কাজই তুমি করেছ।

গাঁ থেকে অবিরাম মেশিনগান ছোড়ার আওয়াজ আসছে। ধুপধাপ শব্দে দেওয়ালে এসে বুলেট লাগছে, উঠোন পেরিয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ন শব্দ করে। জুরা আস্তাবল থেকে বেরোবার দরজাটায় আবার হুড়কো লাগিয়ে একটি কড়িকাঠ এঁটে দিলে। তারপর বাইরে এসে সঈদের কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে বললে,—যাও, ডাক্তারের কুঠিতে গিয়ে বিশ্রাম করো গে।

আবার সে ফিরে এল আস্তাবলে। তন্নতন্ন করে তল্লাশ চালায় সর্বত্র। না, কেউ কোথাও নেই।

দেওয়ালের এক ফুটোর ভেতর দিয়ে হঠাৎ সে বাইরে তাকাতেই চমকে উঠলো। দেখে, গুড়ি মেরে বাসমাচিরা এগিয়ে আসছে কেল্লার দিকে। আস্তাবলের খোলা দরজা-টাই তাদের লক্ষ্য, স্পষ্ট বোঝা যায়।

এত অন্ধকার যে, ঠিকমতো রাইফেল তাক করা কঠিন। জুরা তবু সবচেয়ে কাছের অস্পষ্ট মূর্তিটাকে তাক করে গুলি ছুড়লো। সংগে সংগে শোনা গেল এক আর্ত চিৎকার,—ওঃ-হো-হো, গেছি, গেছি!...আঃ, মারা গেলাম...মারা গেলাম...

রুশভাষায় কে যেন বুকফাটা আর্তনাদ করছে। কিছুক্ষণের জন্যে গোলাগুলি থেমে যায়। এই ফাঁকে কজুবে জুরাকে খুঁজতে খুঁজতে এলেন আস্তাবলে। জুরা তাঁকে তাগাইয়ের পালিয়ে যাওয়া আর দরজা খোলা থাকার খবরটা দিয়ে বললে যে, তার ধারণা, কজিৎজ্‌কিই মরেছে তার গুলিতে।

না।—কজুবে বললেন ঃ পোল কজিৎজ্‌কি ও নয়। সব সময় সে থাকে দলবলের পেছনে। বাসমাচিদের মধ্যে সব জাতের গুঁছা বদমাইশ আছে—রুশ, কিরঘিজ, দুংঘান, তুর্কোমেন ইত্যাদি। কিন্তু একটা লোক আছে তাদের মধ্যে, যে সাংঘাতিক বিপজ্জনক। এমন কোন লোকের দেখা যদি কখনো পাও জুরা, যার ডান চোখের কোটরে কাচ বসানো, তাহলে তক্ষুণি তাকে পাকড়াও করবে।

—লোকটা কি মাঝারি লম্বা? বাঁ চোখটা বড় ও বাদামী রঙের আর সব সময় ঘোরে?

কজুবে অবাক ঃ কি করে জানলে তুমি?

জুরা তাঁকে জানালে পাশের গাঁয়ের বুড়ো সর্দারের খুন হওয়া এবং খুনীর সংগে তার দেখা হওয়ার ঘটনাটা।

কজুবে বললেন,—হ্যাঁ, নির্ঘাত এই সেই লোক।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আবার বললেন তিনি,—লোকটা হচ্ছে ইমাম বলবক।

সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে সে-ই উস্কোচ্ছে জমিদারদের। সে-ই পরিচালনা করছে বাসমাচিদের। ইমাম ছাড়াও সে আরো কিছু......

বলতে বলতে কজুবে হঠাৎ থেমে যান, তারপর বলেন,—যাই হোক, ওসবে তোমার দরকার নেই। শুধু মনে রেখ, লোকটা আমাদের ভয়ংকর দুশমন—সবচেয়ে ভয়ংকর দুশমন। সর্দারের ভেক ধরে সে কেল্লায় আসছিল। তার গোটা পরিকল্পনাটা কিভাবে কার্যকর করা হচ্ছে, তাই তদারক করাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু তুমি হঠাৎ তা বানচাল করে দিলে। বলবকের একখানা চিঠি আমরা পথের মাঝে আটক করেছি। তা থেকে বোঝা যায়, সে-ই সর্দারকে বিষ খাইয়ে মেরেছে।

হঠাৎ জুরা জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা, শিকারী ইদ্রিস কোথায়? বুড়োটার সবকিছুই সন্দেহজনক!

মুচকি হেসে কজুবে বললেন,—আমিই ইদ্রিস। খুবই চেনা-জানা বলে ছদ্মবেশ না নিয়ে উপায় ছিল না। লিনেজার কাছেই আসছিলাম, কিন্তু দেরি হয়ে গেল।

আপনি!—জুরা থ। পরক্ষণে সে হেসে ফেললে ঃ হুঁ, আলবৎ আপনি! এবার বুঝতে পারছি টীকের তখনকার হাবভাবের কারণ। আপনার গলার স্বর ও চাউনি আমার চেনা লাগছিল, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারিনি। আপনি খোঁড়াচ্ছিলেন। শাবাশ টীক! বলবকের পেছনে ওকে পাঠিযেছি। ভয় হচ্ছে, সে হারিয়ে না যায়।

নিশ্চিন্ত কণ্ঠে কজুবে বললেন,—না, টীক সে জাতের কুকুর নয়।

কিছুক্ষণের জন্যে দুজনেই নীরব। শেষে কজুবে বললেন,—ব্যাপারটা মোটেই ভাল ঠেকছে না। আমরা মাত্র দশ জন, আর ওরা এখুনি শ খানেক, আগামী কাল হয়তো চারশোয় দাঁড়াবে। খুবই কঠিন অবস্থা।

জুরা একটা কোণের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে,—সাদা ফুটকি-দেওয়া কটা রঙের ঘোড়াটাকে বিচালি দেবার ব্যবস্থা করে আসছি। বলবকের কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিয়েছি। এখন ও আমার।

ক্ষণপরেই তার খিস্তিখেউড় কানে এল। কজুবে জিজ্ঞেস করেন,—কি হলো?

ইস্!—জুরার জবাব এল ঃ বিচালি খুঁজছিলাম, হঠাৎ কি একটা লোহার জিনিসের সঙ্গে পায়ে ধাক্কা লাগলো। উঃ, নখটা খতম হবার যোগাড়!

দেখি, নিয়ে এস তো ওটা।—কজুবে বললেন।

জুরাকে নিয়ে তিনি আস্তাবলের বাইরে আলোয় এলেন। জুরার হাতে একটা নয়, দুটো লোহার জিনিস। কজুবের চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। জিনিস দুটো পরখ করতে করতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বললেন,—না, কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নি। তোফা, তোফা! মেশিনগান দুটোর গুলি ছোঁড়ার পিনের অংশ এ দুটো। তোফা, এই-বার বাছাধনরা মজা টের পাবে। এটা লিনেজারই কাজ। সহজেই কাম ফতে হবে, বেইমানরা আশা করেছিল। তাই কাছেই এগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু দুঃখ হলো, আমি ছাড়া মেশিনগান চালাবার দ্বিতীয় লোক নেই। দোসরা মেশিনগানটা তাই অকেজোই থাকবে। যারা মেশিনগান চালাতে জানতো, তারা ঐ খানাপিনায় মারা পড়েছে।

—চাওকে নিন। তার কাছে শুনেছি, সে মেশিনগান চালাতে জানে।

তাই নাকি?—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কজুবে বললেন ঃ যাক! তাহলে আর কথা নেই!

হঠাৎ আস্তাবলের দেওয়ালের বাইরে থেকে একটা গোঙানি ভেসে এল। সন্তর্পণে কজুবে এগিয়ে গেলেন ফুটোটার কাছে। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন,—কে?

—আমি ওসমান......পার্টিজান......ভেতরে নিন আমায়.....

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে যখন বোঝা গেল, অতর্কিত আক্রমণের জন্যে কেউ কোথাও ওত পেতে নেই, তখন কজুবে দরজা খুলে জুরার সাহায্যে আহত লোকটাকে চটপট আস্তাবলে ঢুকিয়ে নিলেন।

প্রথম পর্ব ৬

ডাক্তারের কামরায় আহত ওসমানের পাশে পার্টিজানরা জড়ো হয়েছে। তার বিছানার মাথার দিকে পা গুটিয়ে জুরা বসে আছে। তার পাশে চাও। কয়েক হাত দূরে গোরা দাঁড়িয়ে আছে—স্তব্ধ নির্বাক। দৃষ্টি তার ওসমানের মুখের ওপর নিবদ্ধ। মুসা মাথা এক দিকে কাত করে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। আধ-বোজা চোখে সঈদ দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেষে।

কজুবে বলছেন,—কিভাবে বেইমানির জাল পাতা হয়েছিল, সেটা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা দরকার। আমাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কে বেঁচে থাকবে, কেউ বলতে পারে না। যে বাঁচবে, সে-ই লালফৌজের কর্তাদের গিয়ে জানাবে সব ব্যাপারটা। ওসমান, এবার বলো তোমার অভিজ্ঞতা।

ওসমান শুরু করে,—লিনেজাই যে সবচেয়ে বড় বেইমান, এটা আমরা এখন বুঝতে পারছি। সে ছিল দাঁড়কাকের মতো ধূর্ত। তেমনি আবার রগচটা ও বদরাগী। কথায় কথায় ক্ষেপে গিয়ে যা নয় তাই বলতো। সময় সময় আমরা এর প্রতিবাদ করতাম। আর তার ফলে আমাদের অর্থাৎ পুরনো পার্টিজানদের সঙ্গে তার খিটিমিটি ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়। এমনি করে পুরনো লোকজন সব একে একে চলে গেল। আজ বুঝছি, এটাই লিনেজা চেয়েছিল। সে নতুন লোক রিক্রুট করলো। কিছুকাল থেকেই সে বলতে শুরু করেছিল যে, বাসমাচি-নেতারা দলবল অস্ত্রশস্ত্র সমেত তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আসছে। আমরা পুরনো পার্টিজানরা এটা পছন্দ করতাম না। বললাম, বাসমাচিরা হলো নেকড়ে, তাদের যে বিশ্বাস করে তারই জান যায়। কিন্তু কে শোনে কার কথা! লিনেজা রেগে আগুন।

একটু থেমে ওসমান আবার বলতে থাকে,—দিন দশেক আগে লিনেজা সবাইকে জানালে, কজিৎজ্‌কির নেতৃত্বে গোটা একদল বাসমাচি সীমান্তের ওপার থেকে আত্মসমর্পণ করতে আসছে। কত রকমের কত অস্ত্রশস্ত্র তারা জমা দেবে, তারও হিসাব দিল সে। তারপর বললো, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার করতে হবে দোস্ত হিসেবে, দুশমন হিসেবে নয়। তারা এখন অনুতপ্ত। তাদের জন্যে আমরা একটা মেজমানীর বন্দোবস্ত করবো। তাদের সঙ্গে খানাপিনা করবো।

আবার থামে ওসমান। একটু জিরিয়ে নিয়ে শুরু করে,—তারপর বাসমাচিরা গাঁয়ে এল। তাদের হাতিয়ারপত্র ত্যাগ করলো। লিনেজা নিজে তাদের তল্লাশি করে বললে,—আর কিছু নেই, সবই ওরা দিয়ে দিয়েছে। এর আগেই লিনেজা মুসা ও গোরাকে টহল দেবার অছিলায় দূর পর্বত-এলাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। তা ছাড়া আরো যারা তাকে সবচেয়ে বাধা দিত বা দিতে পারতো, তাদেরও সে পাঠিয়েছিল মুসা ও গোরার সঙ্গে। এ নিয়ে গোরার সঙ্গে তখন লিনেজার কিছু কথা কাটাকাটিও হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। আর তার ফলে লিনেজার তখনকার চেহারা হয়েছিল ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো। যাই হোক,

তারপর বাসমাচিদের প্রস্তাব মতো তাদের সঙ্গে আমাদের কিছুসময় খেলাধুলো হয়। শেষে শুরু হয় খানাপিনা। এই সময় হঠাৎ পর্বতের দিক থেকে গুলির আওয়াজ এল। লিনেজা আঁতকে উঠে ছুটলো ঘোড়ায় চেপে। কিন্তু ভোজ চলতে থাকে। আর নানা রকম খবর আসতে থাকে কেল্লা থেকে। শোনা গেল, মুসা এসে পৌঁছেচে, সঙ্গে পাকড়াও করে এনেছে তাগাই, খাঁদা ইত্যাদিকে। তার পরেই জবর খবর এল, জুরা খাঁদাকে খুন করেছে আর কজুবে নিজে কেল্লায় হাজির......

নিস্তব্ধ ঘর। মানুষগুলো যেন পাথর বনে গেছে। একমাত্র সঙ্গীদের চোখের দৃষ্টিই শুধু কিছুটা তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছে। ওসমান বলছে,—এইবার শুরু হলো আসল ব্যাপার। আমরা ও ডাকাতরা সামনাসামনি বসেছিলাম—মুখোমুখি। ওপাশে ওরা, এপাশে আমরা। হঠাৎ কজিংজুকি চিৎকার ছাড়লে, চার-ঈয়ার! সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতরাও 'চার-ঈয়ার' হাঁক ছেড়ে বুকের কাছে কোটের তলা থেকে টেনে বের করলো রিভলবার, সোজাসুজি গুলি ছুড়লো আমাদের দিকে। আমাদের অনেকে উঠে দাঁড়ানোরও সময় পেলে না। আমি লুকিয়ে পড়লাম। এমন সময় কেল্লা থেকে ঘোড়ায় চেপে ছুটে এল লিনেজা। সে জখম হয়েছিল। কজিংজুকির বুকে এসে সে পড়লো। কজিং-জুকি তার ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করে দিল্লে। এর পরেই দেখা গেল, বাসমাচি কয়েদীরা ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে গাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে। আমি ধাওয়া করলাম তাদের দিকে। আমাদের মধ্যে বাকী আর যে পাঁচজন বেঁচে ছিল, তারাও আমার পথ ধবলে। বাসমাচিরা নিজে-দের লোককে গুলি করবে না, বুঝেছিলাম। তাই ঐ ঝুঁকি নিয়েছিলাম।

ওসমান জল চাইলে। ঢকঢক করে খানিক জল খেয়ে আবার সে শুরু করে,—বাস-মাচিরা ছুটে আসছে কেল্লা থেকে, আমরা ছুটছি তাদের দিকে, আর আমাদের পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আরও বাসমাচি। হঠাৎ দেখলাম, কেল্লার লোকেরা আমাদের জন্যে বাসমাচিদের গুলি করতে পারছে না। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, শুয়ে পড়ো! অন্য পাঁচজন শুয়ে পড়লো। বাসমাচিরা পাশ দিয়ে যাবার সময় আমরা এদিক-ওদিক গড়া-গড়ি দিতে লাগলাম। কিন্তু আমিই একমাত্র কেল্লায় পেঁছতে পেরেছি।...জখম আমার সামান্যই। বাহুতে গুলি লেগেছে।...এর পর বাসমাচিরা আবার আওয়াজ তুললো, চার-ঈয়ার! শাবাশ তাগাই! চার-ইয়ার!...কি ব্যাপার? তাগাই কি পালিয়েছে?

কজুবে মাথা নাড়েন। ওসমান বলে,—বাসমাচিদের আমি আরও বলতে শুনেছি, এবার জয় আমাদের। বলশয় গ্রাম আমাদের, কেল্লাও আমাদের। গোটা পামীরও শীগ্-গীর আমাদের হবে।

কজুবে বললেন,—তা বটে, কেল্লা যেমন ওদের হয়েছে, বলশয়ও যদি তেমনি হয়ে থাকে, তাহলে ওদের অবস্থা খুব আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে না। ওরা এখনো টের পায় নি যে, আমরা মেশিনগান পেয়েছি।

তাছাড়া বলশয় গ্রামে আমি......—জুরা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কজুবে তাকে থামিয়ে দিলেন।

এরপর আর বিশেষ কথা হলো না। নিজের কামরায় ফিরে কজুবে ডেকে পাঠালেন জুরাকে, সে এলে বললেন,—শোন, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে কথা বলবে। কেল্লায় এত বড় বেইমানি ঘটেছে, আজ তাই খুব সাবধানে কথা বলা দরকার বুঝলে! কে ভাবতে পেরেছিল যে, লিনেজা বেইমান? নতুন পার্টিজানরা কে কি, আমরা জানি নে। আচ্ছা, টেরাচোখো কি জানে বলশয়ে লোক পাঠিয়েছ?

জুরা মাথা নাড়ে,—হ্যাঁ জানে।

খারাপ খবর।—কজুবে বলেন : ওকে আমি বিশ্বাস করি নে।

জুরার অহংকারে ঘা লাগে। কজুবের কথার অর্থ, জুরা লোক চেনে না। অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বললে,—সঈদ আমার দোস্ত। আগে সে হয়তো চোরাচালানদার ছিল, কিন্তু এখন বদলে গেছে। আমার সংগে এবং আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শের সংগে আজ আর সে বেইমানি করতে পারে না। এক সংগে আমরা কয়েদখানায় ছিলাম। তাকে আমি খুব ভাল করেই চিনি।

স্থির দৃষ্টিতে কজুবে তাকিয়ে আছেন জুরার দিকে। বললেন,—দেখ, এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। ব্যাপক মনুষ্য-চরিত্র সম্পর্কে তোমার অভিজ্ঞতা কতটুকু বলো তো? দুনিয়াটাকে নিজের মতো ভেব না, তাহলে কিন্তু বারে বারে ঠকতে হবে। কয়েদখানায় আটক থাকলেই সবাই বদলে যায় না বা দোস্ত হয় না, বুঝলে! যাই হোক, এসব ব্যাপারে তোমার কোন কিছু মনে করা নিরর্থক। যা বললাম জুরা, সেই কথা কয়টি আবার একটু ভেবে দেখো। বলশয় গ্রামে তুমি কাকে পাঠিয়েছ? কি নির্দেশ দিয়েছ তাকে?

কাফেলার লোকদের সেই খবর থেকে শুরু করে কুচাককে পাঠানো পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা জুরা বলে গেল। বললে কুচাককে চাওয়ের তালিম দেবার কথা।

বাঃ বেশ!—কজুবে বললেনঃ এবার তোমাকে যা বলছি, তা খুবই দায়িত্বপূর্ণ। এখুনি তৈরী হয়ে নাও। একটা রাইফেল, একটা রিভলবার আর কার্তুজ যা পার সংগে নাও। তোমায় কুরঘান যেতে হবে। চেকিস্ট কুজমিনের সংগে দেখা করে এই চিঠিখানা তাঁর হাতে দেবে। বাসমাচিদের হাতে ধরা পড়ো তো, চিঠিটা গিলে ফেলো। কুজমিনকে মুখে বলবে, ইমাম বলবক পামীরে উপস্থিত। জমিদারদের সে উত্তেজিত করছে। কজিৎজ‌্কি ও তাগাইয়ের আত্মসমর্পণের ব্যাপারটাও বলবে। লিনেজার বেইমানির কথাও জানাবে।

বলতে বলতে কজুবে থেমে যান। কয়েক মুহূর্ত কি চিন্তা করে আবার বললেন, —কুজমিনকে বলবে, বেশ কিছুকাল হয়তো আমরা রুখতে পারবো। রসদ ও হাতিয়ার-পত্র যথেষ্ট আছে। কিছুদিনের মতো পর্যাপ্ত জলও আছে। কেল্লার কোণা দিয়ে জলের পাইপটা ভেতরে এসেছে এবং চৌবাচ্চা ভর্তি করার হুকুম দিয়েছি। মনে রেখ, বাধ্য না হলে কোন লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়বে না। যে কোন ভাবে হোক, কেল্লা আমাদের হাতে রাখতেই হবে। জমিদার ও মোল্লারা অনেক লোক পাঠাবে। সংখ্যার জোরেই তারা আমাদের ভাঙবার চেষ্টা করবে।......কে ওখানে? কি ব্যাপার?

চাও ঘরে ঢুকলো। বললে,—কমরেড মীরসিপাহ্‌শালার, পাইপের জল বিষাক্ত করা হয়েছে। ঘোড়াদের জল খাওয়াতে নিয়ে গেছলাম। কিন্তু তারা জল খেলে না। সংগে সংগে আমি পাইপ কেটে দিয়েছি। জল এখন কেল্লার বাইরে গিয়ে পড়বে।

কয়েক মুহূর্ত সবাই নীরব। শেষে ধীরে ধীরে কজুবে বললেন,—খুবই কঠিন অবস্থা। ডাকাতরা নদীর ওপর দিককার জল বিষাক্ত করে দিয়েছে। রিজারভারে কি পরিমাণ জল আছে?

বালতি পঞ্চাশেক হবে,—চাও জবাব দেয়ঃ কিন্তু ঘোড়াগুলোকে এখনো জল দেওয়া হয় নি। সংখ্যায় ওরা তিরিশটে।

—রিজারভারের জল বিষাক্ত হয় নি তো?

—না। আমি খেয়ে দেখেছি।

কড়া নজর রাখ ওটার ওপর।—কজুবে বললেন।

ঐ দিন গভীর রাত্রে টহল দিতে বেরোচ্ছে বলে জুরা বিদায় নিলে বন্ধুদের কাছ থেকে। সঈদ তো প্রথমে অবাক। তারপর অতি-অন্তরঙ্গের মতো বললো,—কোথায় যাচ্ছ তুমি? একা কখনি যেতে পারবে না। পথে কত বিপদ-আপদ! আমি যাব সঙ্গে।

জুরার কোন কথাই সে শুনতে নারাজ—নাছোড়বান্দা, যাবেই। শেষে কজুবের কড়া ধমক খেয়ে সে ঠাণ্ডা হলো। রওনা হবার সময় জুরা কজুবেকে বললে, টীক ফিরে এলে তার দিকে যেন বিশেষ নজর রাখা হয়।

অন্ধকার রাত্রি। তারায় ভরা আকাশ। বাসমাচিরা গাঁয়ে তাঁবু গেড়েছে। আগুন জ্বলছে বড় বড় তাঁবুর পাশে। কানে আসছে মানুষজন ও ঘোড়ার হৈ-হল্লা-চিৎকার।

পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে উত্তরের গিরিপথের দিকে জুরা ছুটে চলেছে। সামনেই বড় একটা পর্বত। তার কাছাকাছি আসতেই, হঠাৎ ঘোড়াটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে। আর একটু হলে, জিন থেকে জুরা ছিটকে পড়েছিল আর কি! পরক্ষণে কালো একটা ছায়া ছুটে এল তার দিকে। জুরা সোল্লাসে চিৎকার করতে গিয়েই সামলে নিলে। দোস্তকে ঘিরে টীক তখন নিঃশব্দে নাচানাচি শুরু করেছে।

দ্বিতীয় পর্ব ১

আলাই গিরিশ্রেণীর শাখা-প্রশাখা দূরে বহুদূরে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে পড়েছে। গিরিসংকটগুলি বেয়ে যত নীচে নামা যায়, ততই গাছপালার সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাড়ে ঘন সবুজের সমারোহ। পপলার বৃক্ষশ্রেণী ততই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, বার্চজাতীয় হেজল্ ও এপ্রিকট গাছের ঘন পত্রকুঞ্জে ঢাকা পড়ে গেছে মানুষের বসতবাটি, বাগান, সবকিছু। ফেরগানা উপত্যকায় ঢোকার মুখে এমনি এক সবুজ গিরিসংকটের মাঝে ঘন পত্রকুঞ্জের আড়ালে ঠিকমতো সারিবন্ধভাবে সাজানো রয়েছে বহু সাদা তাঁবু। সবচেয়ে বড়গুলির মাথায় ছোট ছোট লালঝাণ্ডা যেন সোল্লাসে বাতাসে উড়ছে। সাদা তাঁবুগুলির অদূরে আরো কতকগুলো সবুজ তাঁবু দেখা যায়।

এই তাঁবুর একটিতে সামরিক বাহিনীর ব্যবহারোপযোগী এক হাল্কা টেবিলের সামনে ভাঁজ-করা জাতের এক চেয়ারে বসে আছেন লালফৌজের এক সেনাপতি। বাস-মাচিদের সংগে মোকাবিলা করার জন্যে গঠিত এক বিশেষ বাহিনীর তিনি অধিনায়ক।

কিন্তু কে এই অধিনায়ক? একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, লোকটা আর কেউ নয় —ইভাস্কো। গত কয়েক বছরে ইভাস্কোর পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। আজ তাকে দেখে কে চিনবে সেই তরুণ খনিমজুর ও লাল পার্টিজানকে, যে দুরন্ত শীতকালে দুঃসহ ঠাণ্ডায় তখনকার স্বল্প-পরিচিত দুর্লঙ্ঘ্য পামীরের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত তাগাইকে ধাওয়া করেছিল?

তার বাইরের চেহারাতে কম পরিবর্তন ঘটে নি। আগে সে ছিল কতকটা গেঁয়ো জবুথবু, চালচলনে এলোমেলো। এখন তার বদলে এসেছে ছন্দ ও সৌষ্ঠব। তার চালচলন এখন অনেক বেশী নিখুঁত, লঘু ও সতর্ক। দৃঢ়তাব্যঞ্জক চিবুক আজ আরও স্পষ্ট।

তার আগেকার সব অভ্যাস-দোষ, যা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার একটা এখনো টিকে আছে। এখনো কপাল কুঁচকে সে ভ্রূ থেকে চিবুক পর্যন্ত হাত বুলিয়ে বলে,—একশো শয়তানকেও পরোয়া করি নে!

এ অভ্যাস আর যাবার নয়।

চিরকালই সে নির্ভীক, সাহসী। কিন্তু আগেকার বেপরোয়া সাহসের সংগে আজ যুক্ত হয়েছে অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা আর সুচিন্তিত দৃঢ় সংকল্প। আজো সে ঝুঁকি নেয় নির্ভয়ে—কিন্তু নেয় বিচক্ষণতার সংগে, অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে।

মাঝে মাঝে সে বিভিন্ন জাতের কাফেলার লোকদের সংগে তাঁবুর আগুনের পাশে বসে নানা আলোচনায় সারা রাত কাটিয়ে দেয়। তাদের গল্পগুজব ও অভিজ্ঞতার কথা শোনে, কিন্তু নিজে কথা বলে খুবই কম। পরদিন শোনা যায়, 'শয়তান' কিরকম কার-সাজি করে একটা বাসমাচি দলকে ঘিরে ফেলে একেবারে সাবাড় করে দিয়েছে। হ্যাঁ, বাসমাচিরাই 'শয়তান' আখ্যা দিয়েছে ইভাস্কোকে। ও যে সাক্ষাৎ শয়তান, বাসমাচিদের তাতে কিছুমাত্র সংশয় নেই।

তার ভয়ে কাঁপে ফেরাগানা, আন্দিজান, জালালাবাদ ও কারাতেগিনের ডাকাতের দলগুলো। তাদের সব রকম ধরনধারণ সে জেনেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কোরান ও স্থানীয় বাসিন্দাদের আদবকায়দা রপ্ত করেছে নিখুঁতভাবে। আর যখন কিরঘিজ ও উজবেক ভাষায় কথা বলে, তখন কে বলবে সে অন্যভাষী!

সেদিন সে বহুকাল পেছনে ফেলে এসেছে, যখন পর্বতকে তার মনে হতো ভয়াল স্তব্ধকুটিল। আজ সে বুঝেছে, প্রতিটি পর্বত ও টিলা-পাথরের পেছনে লুকিয়ে আছে স্থানীয় বাসিন্দাদের নানা কুসংস্কার, কিছু-না-কিছু গোপন ইতিহাস। সে সব জানতে হয়েছে তাকে। আর তার ফলে পাহাড়-পর্বতও তাকে যেন এই নির্মম রক্তক্ষয়ী কঠোর যুদ্ধে সাহায্য করে বলে মনে হয়।

হাসিখুশী ফুর্তিবাজ মজলিসী রসিক লোক ইভাস্কো। কোন কোন সন্ধ্যায় সুযোগ পেলেই সে ইউক্রেনের গান ধরে। ফৌজের অন্য লোকেরাও ছোটবড় নির্বিশেষে সোল্লাসে যোগ দেয়, গলা মেলায় তার সংগে।

ইভাস্কোর বাহিনীতে মোট তিরিশজন লোক। বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক ও ঘোড়াকে সে তালিম দিয়েছে নিজের হাতে। তাই কাজ তার নিখুঁত চট্‌পটে।

ফৌজের লোকদের সংগে আলোচনার জন্যে সেদিন সে কাগজে নোট নিচ্ছে। সামনে এক কাপ সবুজ চা। টেবিলে বই আর পাণ্ডুলিপির গাদা। মাঝে মাঝে কোন বই বা পাণ্ডুলিপি দেখার জন্য বা চায়ে চুমুক দেবার জন্যে সে কলম রাখছে।

উপত্যকায় গুমোট গরম। মাথার ওপর মিহি ধুলোর পরদা ঝুলছে যেন। অগুন্তি মাছির ঝাঁক চকচকে কালো বিন্দুর মতো বাতাসে সেঁটে আছে মনে হয়। কালি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাচ্ছে। সবুজ চায়ে আর এক চুমুক দিয়ে বাকিটা ইভাস্কো দোয়াতে ঢেলে দিলে।

হঠাৎ আর্দালির গলা শোনা গেল। বললে,—বড় সাহেব আপনার কাছে একজন যোদ্ধাকে পাঠিয়েছেন। সে আপনাকে চাইছে, বলছে জরুরী খবর আছে।

বলো, আমি এখুনি আসছি।—ইভাস্কো বললে।

দ্বিতীয় পর্ব ২

বেঁটেখাটো, লোমশ এক কিরঘিজ তাঁবুতে বসে আছে। হাত দুটো শরীরের তুলনায় লম্বা। একটা ঠ্যাং ভাঁজ ক'রে তার ওপর চেপে সে বসে আছে চেয়ারে। ধুলিধুসর কোট, ছেঁড়া জুতো আর শীর্ণ শুকনো মুখে নিদারুণ ক্লান্তির ছাপ। দেখলেই বোঝা যায়, বহু দূর দুর্গম পথ ভেঙে সে এসেছে।

টেবিলের ওপাশে লোকটার মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে ইভাস্কো। টেবিলের ওপর একটা চাবুক। সেটা দেখিয়ে সহকারী অধিনায়ক বললে,—বলশয় গাঁ দখল হয়েছে এইটার জোরে।

ইভাস্কো চাবুকটা তুলে নেয়। সাধারণ চাবুকের সংগে এর তফাৎ হলো, এটার আগায় চামড়ায় মোড়া বড় এক খণ্ড সীসে বাঁধা। চাপ-বাঁধা শুকনো রক্তে সেটা কালো হয়ে গেছে, কয়েকটা চুলের গোছা তখনো আটকে আছে সেখানে।

ইভাস্কো আগন্তুক কিরঘিজের জন্যে চা ও খানার নির্দেশ দিতেই আর্দালি বললে,—আমি ইতিমধ্যে বলে দিয়েছি। এখুনি ব্যবস্থা হবে। উনি এইমাত্র এলেন।

মাথা নেড়ে ইভাস্কো আগন্তুককে কিরঘিজ ভাষায় জিজ্ঞেস করলে,—কি নাম তোমার? কোথা থেকে আসছো? কে তোমাদের সর্দার?

কিরঘিজটি বললে,—আমার নাম কুচাক। সৌকসাই নদীর কাছে পার্বত্য গ্রাম মিন-আরখারের বাসিন্দা। বহু কাল গাঁ ছেড়েছি, তাই বলতে পারবো না, বুড়ো সর্দার ইস্কান্দার আজো বেঁচে আছে কিনা। শুনতে চান তো, গত কয়েক বছর কোথায় কোথায় ঘুরেছি বলতে পারি। কিন্তু এখন বড় ক্লান্ত। গত তিন দিন শুধুই হেঁটেছি। সামান্যই খাওয়া জুটেছে, ঘুমিয়েছিও যৎসামান্য। বাসমাচিদের সম্বন্ধে শেষ খবরটাই বরং আগে আপনাকে বলি, তারপর নিজের কথা বলবো।

আগন্তুকের পরিচয় পেয়ে ইভাস্কো কিন্তু চমকে গেছে। স্মৃতির সমুদ্র তোলপাড় করে দূর-বিস্মৃত অতীত জেগে উঠেছে তার মনে। পামীরের সেই দুর্দান্ত শীত, তুষার ও বরফে ঢাকা সেই ভয়ংকর পর্বতমালা আর সেই সুউচ্চ পর্বত-রাজ্যের বিরলীকৃত অতি-হালকা বাতাসে তাগাইকে অনুসরণ—একে একে সবই মনে পড়ছে তার। স্মৃতির অতলে হারিয়ে-যাওয়া হাজার হাজার চেহারার ভেতর থেকে তার মানস-পটে ভেসে ওঠে পার্বত্য গ্রাম মিন-আরখারের হাত-লম্বা কুচাকের ছবি। আর মনে পড়ে সেই দুঃসাহসী তরুণ শিকারীকে, আর একটু হলেই যে ওদের পাঠিয়ে দিত পূর্বপুরুষদের কাছে। তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে সর্দার ইস্কান্দারের চেহারা।

আমায় চিনতে পার?—ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে।

কুচাকের দুই চোখ অনিদ্রায় লাল—নিষ্প্রভ। জোলোজোলো চোখে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ইভাস্কোর দিকে। শেষে মাথা নাড়লে।

—মনে করার চেষ্টা করো। মুসাকে নিয়ে এক শীতকালে তোমাদের মিন-আরখার গাঁয়ে গেছলাম। আচ্ছা, ছোকরা শিকারীটি কোথায়?

কুচাক বললে,—জুরাই তো আমায় বলশয় গ্রামে পাঠিয়েছিল। চাও বলে দিয়েছিল, কি কি করতে হবে। ব্যাপারটা একটু বলি। বুড়ো শিকারী ইদ্রিস জুরাকে জানায় যে, তাগাই তার দলবল নিয়ে সীমান্ত পার হতে যাচ্ছে। জুরা আমাকে আর সঙ্গীদকে অন্য দিককার এক গিরিপথের ওপর নজর রাখবার জন্যে পাঠিয়ে দিলে। তারপর রাত হলে সে এসে জানালে, তাকে আমরা পাকড়াও করেছি।

—কাকে?

—তাগাইকে।

তাগাইকে? ভুল করছো না তো, কুচাক?—ইভাস্কো নড়ে চড়ে বসলে: তুমি কি ঠিক জান, যাকে পাকড়াও করা হয়েছে, সে-ই সর্দার শো ওরফে তাগাই?

—কুচাক যখন বলে হ্যাঁ, তার মানে সে তা জানে।

দিনের বেলায় প্যাঁচার যে রকম অবস্থা হয়, তেমনি ঘুমে-ঢুলঢুলু অবস্থা কুচাকের। চেয়ারে বসে বসে ঢুলছে। চোখ বোজা, কথা বলছে নীচু গলায়। মনে হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে সে ঘুমিয়ে পড়বে আর পড়ে যাবে চেয়ার থেকে।

কি এক পানীয় ভর্তি একটা কাপ কুচাকের হাতে দিয়ে আর্দালি বললে,—এটা খেয়ে নাও।

কুচাক খেয়ে ফেলে জিনিসটা। তারপর কপাল কুঁচকে থুতু ফেলে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নেয়।

ইভাস্কো বললে,—এবার কুচাক, একটু বুঝে শুনে কথা বলো। জুরা তোমায় বলশয়ে কেন পাঠিয়েছিল?

কাফেলার লোকেরা তাকে বলেছিল...—বলতে গিয়েই রেশমী কোটের ঘটনাটা কুচাকের মনে পড়ে যায়, থতমত খেয়ে সে বললেঃ হ্যাঁ—যা বলছিলাম—সেই যে কাফেলাটা—হ্যাঁ, সেই কাফেলার লোকেরাই জুরাকে বলেছিল, তারা খবর পেয়েছে, বাসমাচিরা বলশয় গ্রাম দখল করতে যাবে, তাদের সঙ্গে থাকবে শরফ অর্থাৎ বোইলাজোচ্‌কা-বোই। তাই জুরা আমায় বললে, তুমি যাও, ওদের গিয়ে হুঁশিয়ার করে দাও। আমি রওনা হলাম। সারা রাত ছুটলাম ঘোড়ার পিঠে, সারা সকাল ছুটলাম ঘোড়ার পিঠে, সারা দুপুর ছুটলাম ঘোড়ার পিঠে, সারা দিন ছুটলাম ঘোড়ার পিঠে, সারা রাত ছুটলাম ঘোড়ার পিঠে, আবার সারা সকাল ছুটলাম ঘোড়ার পিঠে.....

তার এই ক্লান্তিকর ঘোড়ার পিঠে ছোটায় সহকারী বাধা দিতে যাচ্ছিল, ইভাস্কো তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে,—বলে যাও কুচাক, যা যা ঘটেছিল পর পর বলে যাও।

কুচাক বললে,—ঘোড়াটা শেষতক মরে পড়ে গেল। তখন পায়ে হেঁটে ছুটলাম। জবর ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে, তবুও চললাম। শেষে গিয়ে পেঁছলাম। বললাম, বাসমাচিরা আসছে। তারা জিজ্ঞেস করলে, কে বলেছে? আমি বললাম, জুরা বলেছে, এটা গোপন খবর। গ্রাম-সোভিয়েতের সভাপতি শুনে হাসলো।

কুচাক থুতু ফেলে। কেশে গলাটা আবার সাফ করে নিয়ে শুরু করে,—পর দিন ছিল বড় হাট। সকালে সবাইকে বলতে শোনা গেল, সীমান্তে লড়াই হয়েছে, তিনজন বাসমাচি খতম হয়েছে। গাঁয়ের লোকেরা বেশ খুশী ও নিশ্চিন্ত। তারপর ডাকাতরা এল, যারা মরে নি তারাই এল। দারুণ ধড়িবাজ তারা। পরনে চাষীর পোশাক। কেউ তাদের চিনলো না। তারা ঘোরাঘুরি করলো, সব কিছু দেখলো শুনলো।

টেবিলের ওপর রাখা চাবুকটা দেখিয়ে কুচাক বললে,—সীসের ডেলা-বাঁধা ঐটার মতো একটা করে চাবুক তাদের হাতে। তাদের কাছে আর কোন অস্ত্রশস্ত্র আছে বলে তখন মনে হয়নি। সন্ধ্যা হলো। সভাপতি ও স্থানীয় প্রতিরক্ষা ফৌজের লোকেরা আমায় ঠাট্টা করে বললে, কই হে তোমার বাসমাচি কোথায়? যত্তো সব গাঁজাখুরি গাল-গপ্প! সন্ধ্যার সময় বাসমাচিরা গ্রাম-সোভিয়েতের সভাপতির কাছে এল, তাঁকে একখণ্ড কাগজ দিয়ে বললে, দয়া করে এটা পড়ুন। তিনি ওটা টেবিলের ওপর পেতে কেবল পড়তে শুরু করেছেন, অমনি বাসমাচিরা তার মাথায় ঐ চাবুকের ঘা মারলে। সীসের ডেলা খেয়ে সভাপতি কাত হতেই তারা ওকে খুন করলো। অন্য বাসমাচিরা তখন প্রতিরক্ষা ফৌজের চৌকিতে গেছে। সেখানে উপস্থিত ছিল একজন মাত্র ফৌজী লোক। তাকে ওরা বললে, আমাদের একটা সার্টিফিকেট দিন। লোকটা কেবল সার্টিফিকেটটা লিখতে বসেছে, অমনি ব্যাং! ব্যাং! সমানে সীসের ডেলা পড়তে লাগলো তার মাথায়...

হাত-পা নেড়ে কুচাক দেখিয়ে দেয়, বাসমাচিরা কিভাবে মেরেছিল লোকটাকে।

সে বলে চলে,—তারপর তারা ফৌজী লোকটার রিভলবার, রাইফেল ও তরোয়াল নিলে, তার মাথা কেটে এক খুঁটির আগায় বাঁধলে, খুঁটিটা বাঁধলে ছাদের ওপর। তারা এবার লোকজন খুন করতে শুরু করলে। পনের জন লোক খতম হলো। ইতিমধ্যে কোটের নীচে থেকে রিভলবার বের করে তারা গুলি ছুড়তে লেগেছে। সংখ্যায় তারা ন'জন। তাদের দু'জন এসেছিল কাশগড়িয়া থেকে। সংখ্যায় তারা নাকি আরো অনেক ছিল। কিন্তু দু'জন বাদে বাদবাকী সবাই সাবাড় হয়ে গেছে সীমান্তরক্ষীদের হাতে। দলের বাকী সবাই স্থানীয় বাসিন্দা। এই স্থানীয় ডাকাতরা পর্বত-এলাকা থেকে নেমে

এসেছিল। এর পর জমিদাররাও এল। হুকুম হলো, বলশয় গ্রামের বাইরে কেউ যেতে পারবে না।

কুচাক চুপ করে। নিস্তব্ধ তাঁবু। ইভাস্কো, তার সহকারী এবং আর্দালি উদ্‌গ্রীব চোখে তাকিয়ে আছে। শেষে ইভাস্কো বললে,—তারপর?

কি যেন ভাবছিল কুচাক। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে,—তারপর...এমনি করে বলশয় গাঁ দখল হলো, মরলো অনেকে...আমার হুঁশিয়ারি কেউ গ্রাহ্য করলো না। চাও বলে দিয়েছিল, যদি দেখ কিছুতেই কিছু হলো না, তাহলে তুমি বাসমাচিদের দলে ভিড়ে যেও। কিন্তু চোখ খোলা রেখ। বাসমাচিরা সংখ্যায় কত জন, কি কি হাতিয়ারপত্র তাদের আছে, সব শুনবে। তারপর যত তাড়াতাড়ি পার রুশ সেনাপতির কাছে যাবে, তাঁকে বলবে সব কিছু। শুনে সেনাপতি বলবেন, ধন্যবাদ। তিনি তোমার ভাল খানাপিনার ব্যবস্থা করবেন আর দেবেন একটা করে নতুন কোট, ঘোড়া আর রাইফেল।

শেষের টুকু কুচাকের নিজের যোগ করা। একটু ভেবে চিন্তেই সে যোগ করেছে ওটুকু। বড় একজন সেনাপতি তার কথা শুনেছেন, এটা তার কাছে এক মস্ত ঘটনা। ইভাস্কোকে চিনতে না পারার দরুন মনে মনে সে এতক্ষণ বেশ অস্বোয়াস্তি বোধ করছিল। ভুলটা শুধরে নেবার আশায় একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে সে বললে,—তখন সংগে সংগেই আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু সে সময় তা ফাঁস করতে চাইনি।

মাথা নেড়ে ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে,—কিন্তু তুমি কি করে জানলে, আমরা কোথায় আছি?

ওঃ! এই কথা!—চেয়ারে দুলতে দুলতে কুচাক বললে : চাও বলে দিয়েছিল, যে কোন গরিব লোককে জিজ্ঞেস কোর কোথায় যেতে হবে, সে ঠিক বলে দেবে। কয়েকজন গরিব চাষী মিলে আমায় একটা ঘোড়া দিয়েছিল। শিকারীরা পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। আসতে আসতে ঘোড়াটা বিষম ক্লান্ত হয়ে পড়লো, আর এগোতে চায় না। তাই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম, সে বাড়ি ফিরে গেল।

মুচকি হেসে ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে,—কতজন বাসমাচি আছে সেখানে?

—হুঁ-হুঁ! সব কটাকে আমি গুনেছি। আমি হয়েছিলাম ভবঘুরে গায়ক, মহাবীর মানাসের গান গাইতাম। এখানে যেতাম, ওখানে যেতাম আর দেখতাম সব কিছু। বাসমাচিরা শেষ পর্যন্ত সংখ্যায় মোট দাঁড়িয়েছিল তেষট্টিজন। তিরিশজনের ঘোড়া নেই। ছাব্বিশজনের রাইফেল আছে, বাদবাকী সবার ম্যাচলক গাদা বন্দুক। ওরা আমায় একটা বন্দুক দিয়ে পথে পাহারা দেবার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। ওটা লুকিয়ে রেখে আমি পালিয়ে এসেছি। ওরা ভাববে, শিকারীরা আমায় মেরে ফেলেছে।

দুই প্লেট ভর্তি মাংস আর পরিজ এল কুচাকের জন্য। খেতে খেতে সে বলে চলে,—সর্দার শরফকে চিৎকার করে বলতে শুনেছি, পামীরের কেল্লা তারা দখল করেছে, লিনেজা তার দোস্ত, কারাতেগিন বিদ্রোহ করেছে, শুধু উপত্যকাগুলোতেই সোভিয়েত-শাহী যা কিছু এখনো টিকে আছে, তা-ও শীগ্‌গীরই খতম হয়ে যাবে। জমিদাররা শুনেই চিৎকার ছাড়লে চার-ঈয়ার! বললে, চলো আর দেরি নয়, লড়াই ফতে করে দি।

কুচাকের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছলো। কয়েক খণ্ড মাংস মুখে পুরে আবার সে শুরু করলে,—কিন্তু বাসমাচিরা নিজেরাই ভীতু। লড়াই জিতবে, এ বিশ্বাস ওদের নেই। তাই শরফ বললে, আগে হাজার খানেক লোক যোগাড় করা যাক, তারপর যাওয়া যাবে। অবশ্যি প্রত্যেককে দেবার মতো হাতিয়ারপত্র আমার আছে, পর্বতে লুকিয়ে রেখে এসেছি। তাকে আরও বলতে শুনেছি, শীগ্‌গীরই সাহেব অফিসাররা এসে বাসমাচিদের লেফট-রাইট শেখাবে, আর তার ফলে কিজিলওয়ালাদের চেয়ে আমাদের জোর বেড়ে

ম্বাবে অনেক বেশী। সে আরও বলতো, খুব বড় একটা শক্তিমান দেশ নাকি বাসমাচিদের টাকাপয়সা রসদপত্র দিয়ে মদত করছে। এই দেখুন।

বলতে বলতে কুচাক তার কোমরবন্ধের তলায় লুকোনো একটা মসার পিস্তল টেনে বের করে। পিস্তলটার গায়ে গত বছরের ছাপ মারা।

ইভাস্কো ও তার সহকারীর মধ্যে চোখাচোখি হয়।

ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে,—শরফ কে? এই কি সেই শরফ যে আগে পার্টিজান ছিল, কেল্লায় থাকতো?

—তা জানি নে। তবে শুনেছি, শরফ নাকি আগে পার্টিজানদের সঙ্গে ছিল।

ইভাস্কো বললে,—শোন কুচাক, তোমায় একজোড়া সিল্কের কোট দেব, ঘোড়া দেব, রাইফেলও দেব। কিন্তু আমি যা বলবো, তোমায় তাই করতে হবে। আবার তোমাকে বাসমাচিদের কাছে যেতে হবে।

আবার?—কুচাক গোঁঙিয়ে উঠলো।

হ্যাঁ, আবার।—ইভাস্কো জোর দিয়ে বললে ঃ তোমার মতো নির্ভীক সাহসী মরদ সচরাচর চোখে পড়ে না। তার ওপর তুমি অত্যন্ত চতুরও বটে। যে কাজ তুমি করতে যাচ্ছ, বাসমাচিদের হারাতে তা অনেকখানি সাহায্য করবে। এস আমার সঙ্গে। কি করতে হবে ও বলতে হবে, তোমায় শিখিয়ে দেব।

গর্বে ও আনন্দে কুচাকের প্রাণ তখন হাবুডুবু খাচ্ছে। সে সাহসী! সে নির্ভীক! সে চতুর! জীবনে এই প্রথম সে নিজের সম্বন্ধে এই বিশেষণগুলো শুনলো, আর তা কিনা খুব উঁচুদরের একজন সেনাপতির কাছ থেকে! আত্মপ্রসাদ শুধু নয়, আত্মবিশ্বাসে তার বুক ভরে ওঠে।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে সে বললে,—আলবৎ আমি যাব। আপনি ঠিকই বলেছেন, সাহসী নির্ভীক ও চালাক না হলে এ কাজ করা মুশকিল। হক কথা বলেছেন আপনি। বটেই তো! চলুন, যাওয়া যাক।

রোসো একটু। ওখানে কে কে তোমার মুখ দেখেছিল?—ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে।

কেউ না।—দৃঢ় কণ্ঠে কুচাকের ঃ মুখে আমি তখন কাপড়ের ব্যান্ডেজ বেঁধেছিলাম, বলতাম দাঁতে ব্যথা হয়েছে। এটা আমি একটা লোককে করতে দেখেছিলাম। সে শরফের কাছে এসেছিল। শরফ প্রথমে তাকে চিনতে পারে নি, চর বলে সন্দেহ করেছিল। ফলে, লোকটা তার মুখে-জড়ানো সাদা পাগড়িটা খুলে ফেললে, ডান চোখের কোটর থেকে একটা নকল চোখ খুলে নিলে, তারপর সেটা জলে ধুয়ে আবার ঠিক জায়গায় পরলে। সঙ্গে সঙ্গে শরফ কুঁজো হয়ে তাকে আদাব করে বললে, হুকুম করুন, জনাব। পরদার ও পাশ থেকে ফুটো দিয়ে ব্যাপারটা আমি আগাগোড়া লক্ষ্য করেছিলাম।

ইভাস্কো আর তার সহকারীর মধ্যে আবার চোখোচোখি হয়। কুচাক তখন মাথায় পাগড়ি জড়াচ্ছে। রুশ ভাষায় ইভাস্কো সহকারীকে বললে,—লোকটা বলবক নিজে। তাকে পাকড়াও করতেই হবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের সীমান্ত-রক্ষীদের নজর অন্যত্র সরিয়ে নেবার জন্যে মূল বাসমাচি-ফৌজ সব পেছনে সীমান্তে থেকে গেছে। কেবল বাসমাচি সংগঠক ও রক্ষীরাই এসেছে এখানে।

সাদরে কুচাকের পিঠে চাপড় মেরে সে বললে,—সত্যি কুচাক, তোমার মতো একজন লোককে পেয়ে আমি খুব খুশী। মরদের মতো মরদ তুমি।

এমন সময় এক বেতার-বার্তা নিয়ে ঘরে ঢুকলো বেতার-অপারেটার। ইভাস্কো সেটা পড়ে সহকারীর হাতে দিতে দিতে বললে,—খবরটা আমরা আগেই পেয়ে গেছি। ঘটনার স্রোত খুব দ্রুত জমাট বাঁধছে। আফগানিস্তান থেকে ওরা এসেছে ছোট ছোট

দলে ভাগ হয়ে, তার মানে এখানে আবার ওরা মিলিত হতে যাচ্ছে। কাজ করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু বিরাট পরিমাণ ডিনামাইটের এত সব চাংড়া ওরা এনেছে কেন, বুঝতে পারছি নে। ব্যাপার দেখে মনে হয়, খুব বড় ধরনের নাশকতামূলক কোন কাজের চক্রান্ত আঁটা হয়েছে।

গভীর চিন্তায় ডুবে যায় ইভান্কো। শেষে বললে,—আজই আমি নিজে যাব বলশয় গ্রামে। অন্য পথে নয়, যাব আলাই গিরিশ্রেণীর দুর্গম শাখাগুলো পার হয়ে। সোজা গিয়ে হাজির হবো বলশয় গ্রামের কাছে। সেখানকার কাজ শেষ করে আলাই পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে দক্ষিণে যাব কেল্লা পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পর্ব ৩

বলশয় গ্রামে যাবার নানা পথ—দক্ষিণে পামীর থেকে, পূবে সীমান্ত থেকে, তেমনি উত্তর দিক থেকেও। এমন কি পশ্চিম থেকেও যাওয়া যায়।

বাসমাচিরা শত্রুর হামলা সবচেয়ে আশংকা করে উত্তর থেকে। পশ্চিম থেকে করে খুবই কম। কারণ খুব কম লোকই সে পার্বত্য পথের খবর জানে। তাছাড়া উন্মত্ত ফেনিল নদীর ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে সে পথ—অত্যন্ত দুর্গম ভয়ংকর। নদীর দুর্দান্ত স্রোতে বড় বড় ভারী পাথরের চাঁই খাত দিয়ে গড়িয়ে চলে। তার গর্জনে দিগ্-দিগন্ত অবিরাম প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তাতে ডুবে যায় ঘোড়ার খুরের শব্দ।

সে পথ এত সরু যে, দুজন লোক পাশাপাশি চলতে পারে না। ঘোড়ার সম্পূর্ণ পাক ঘোরারও জায়গা নেই। কোন ভীরু কাপুরুষ কখনও ঐ পথে যাবে না। এ পথে ফেরার উপায় নেই, শুধু এগিয়েই যেতে হবে।

বলশয় গ্রাম থেকে পশ্চিমে দশ মাইল দূরে গোপন এক বাসমাচি-ঘাঁটি। উঁচু দুর্গম পর্বতের ওপর ছজন বাসমাচি লুকিয়ে আছে। পাঁচজন জুয়া খেলছে, বাকী জন নজর রাখছে সামনের দিকে।

পেছনে বলশয় গ্রামের দিক থেকে হঠাৎ গুলির আওয়াজ এল। সংগে সংগে, যে লোকটা পাহারায় ছিল, সে পড়ে গেল চিৎ হয়ে। পেছন থেকে বাসমাচিরা হামলার আশংকা করে নি। তাই ঘুঁটি-ফুটি ফেলে তারা ভয়ে লাফিয়ে উঠলো। তারপর এক পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে, পশ্চিমের পথের দিকে পেছন ফিরে তারা এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করলো—আকস্মিক অজানা সেই শত্রুর দিকে মুখ করে। শত্রু কিন্তু তাদের ভাববার বা সামলে ওঠার ফুরসৎ দিলে না। গুলি আসছে পুরোদমে। পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে বুলেট ঠিকরে পড়ছে সাঁ সাঁ শব্দে। পেছনটা যে অরক্ষিত, সেদিকে খেয়াল করারও তখন ফুরসৎ নেই বাসমাচিদের।

একটু পরেই পথের বাঁক ঘুরতে দেখা গেল ইভান্কোর বাহিনীকে। একটু একটু করে তারা এগিয়ে আসছে। বাসমাচিদের কিন্তু সেদিকে লক্ষ্যই নেই। উল্টো দিকে সামনের অদৃশ্য শত্রুকে নিয়েই তারা ব্যতিব্যস্ত।

ইভান্কো রিভলবার আন্দোলিত করতেই তার ঘোড়সওয়ার বাহিনী ছুটতে ছুটতে গুলি চালাতে শুরু করলো। বাসমাচিরা হকচকিয়ে যায়—তারা আন্দাজই করতে পারে না, কোথা থেকে বুলেট আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা সব কটা খতম হয়ে গেল।

তোফা! সাফ কাজ!—ঘোড়া থেকে নামতে নামতে ইভাস্কো বললে। পথ সেখানে নেমে গেছে নদীর দিকে, চাওড়া হতে হতে শেষে মিলিয়ে গেছে পাড়ের গালপালা ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে।

সামনের দিকে নজর পড়তেই ইভাস্কো মুচকি হাসলো। বলশয় গাঁয়ের দিকের এক পর্বত থেকে একটা লোক হিঁচড়ে নেমে আসছে তাদের দিকে। পার্টিজানরা তাকে দেখিয়ে দেয়। ইভাস্কো বললে,—ও আমাদের লোক। ও-ই তো সেই কুচাক!

বেশ কিছু আমি ঘায়েল করেছি! এই দেখুন!—হাঁক ছাড়তে ছাড়তে কুচাক এগিয়ে এল। এক জোড়া কেড়ে-নেওয়া রাইফেল সে মাথার ওপর তুলে ধরেছে।

—তোফা, কুচাক! সত্যিকার সাহসী মরদ তুমি! কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় বলশয় গাঁর দিক থেকে তুমি গুলি চালাতে শুরু করেছিলে। এটাই আমি আশা করেছিলাম তোমার কাছ থেকে। এবার ঘোড়া নিয়ে চটপট চলে যাও বাসমাচিদের ওখানে। লাল-ফৌজের লোক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, জোর গলায় এটার প্রচার চালিয়ে যাবে। তাছাড়া আর যা যা করতে বলেছি, তাও করবে ঠিকমতো। তোমার পথপ্রদর্শকরা কোথায়?

কুচাক হাঁক ছাড়তেই ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে এক বুড়ো আর একটা ছেলে বেরিয়ে এল। ইভাস্কোর সঙ্গে তাদের সে পরিচয় করিয়ে দিলে। তারপর ঘোড়ার পিঠে রওনা হয়ে গেল বলশয় গাঁয়ের দিকে। যাবার আগে সন্দেহ এড়ানোর জন্যে রাইফেল রেখে সে সঙ্গে নিলে একটা ম্যাচলক গাদা বন্দুক।

এবার নিজের বাহিনীকে এক জায়গায় জড়ো করে ইভাস্কো বললে,—বলশয় গাঁয়ে এখন নতুন-দীক্ষা-পাওয়া সব বাসমাচি এসে জমায়েত হয়েছে। পাহাড়-পর্বতের পেছন থেকে তাদের এক এক করে টেনে বের করার দরকার হবে না। অসতর্ক অবস্থায় তাদের ওপর পড়তে হবে, তাদের ঘিরে ফেলতে হবে। ফিওডোর, তুমি পনেরজন লোক নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উত্তর-পূব ঘুরে পূব দিকের পর্বতের ঐ ঢালুতে যাও, ঐ যে ঐ ওখানে। দেখতে পাচ্ছ?

বলতে বলতে জুনিপার জঙ্গলে ঢাকা পর্বতটা সে দেখিয়ে দেয়,—এই বুড়ো তোমায় ওখানে নিয়ে যাবে। ঐ যে প্রকাণ্ড ফাটলটা দেখছো, মেশিনগান নিয়ে ওখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। আর নাগানচিক, দশজন লোক নিয়ে ঘোড়ায় চেপে দক্ষিণ-পশ্চিম ঘুরে তুমি যাও ঐ ওখানে—ঐ পর্বতে। ছেলেটি তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। পর্বতটার পাশ থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর সামনের দিকে বেরিয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ—ঐটাই। ওখানে তুমি গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। এবার শোন, কি করতে হবে। ফিওডোর, তুমি পর-পর দুবার গুলির শব্দ শুনলেই গাঁয়ের ওপর মেশিনগান থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুড়বে। আর নাগানচিক, তুমি মেশিনগান চালাবে উপর্যুপরি তিনবার গুলির আওয়াজ পেলে।

একটু থামে ইভাস্কো, তারপর আবার শুরু করে,—ঘোড়ায় চেপে আমি নিজে যাচ্ছি বলশয় গ্রামে, সোজা শরফের কাছে। বাসমাচি শরফ এককালে পার্টিজান ছিল। আমা-দের সে ভয় করে। আফগানিস্তান থেকে তার সাহায্যের জন্যে যে দলটাকে পাঠানো হয়েছিল, কারাতেগিনে তারা ধরা পড়েছে। শরফকে আমি জ্যান্ত কয়েদ করবো। বাস-মাচিদের মধ্যে আমার পৌঁছনোর আধ ঘণ্টার মধ্যেও যদি গুলির আওয়াজ না পাও, তাহলে ওদের আক্রমণ করবে। অবশ্যি ওখানে কি ঘটছে, তার কিছুটা আভাস তোমরা পাবে দূরবীনের সাহায্যে। যেসব বাসমাচি হাতিয়ারপত্র সমেত পর্বতে পালানোর চেষ্টা করবে, তাদের পাকড়াও করবে।

ক্ষণেকের জন্য থেমে ইভাস্কো শেষে বললে,—ফিওডোর, তোমাকে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যাচ্ছি।

ইভাস্কোর নির্দেশ মত দল দুইভাগে ভাগ হয়ে রওনা হয়ে গেল। তাদের ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছনোর জন্যে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে ইভাস্কো রওনা হলো।

পথ সোজা সামনের দিকে চলে গেছে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে। মর্মর-ধ্বনি উঠছে ঝোপঝাড় থেকে। আড় চোখে সেদিকে তাকাতে তাকাতে ধূসর রঙের তেজী ঘোড়াটা এগিয়ে চলেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। যত এগোয় ইভাস্কো গিরিসঙ্কট ততই চওড়া হয়। শেষ পর্যন্ত এক উপত্যকায় এসে তা শেষ হলো। নদীর তীর বরাবর প্রসারিত উইলো-বীথি। সেদিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ইভাস্কোর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে,—আঃ কী সুন্দর!

বাল্যের স্মৃতি জেগে ওঠে তার মনে। একটু পরেই সে হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে। তার পরেই ঘোড়ার পিঠে আবার সে সোজা হয়ে বসলো কষে-বাঁধা স্প্রিংয়ের মতো। চোখে তীক্ষ্ন সজাগ দৃষ্টি।

হঠাৎ উঁচু পাহাড়টার তলা থেকে একজন বাসমাচি সান্ত্রী রাইফেল হাতে লাফিয়ে পড়লো অদূরে পথের ওপর। ইভাস্কো কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ইতস্ততঃ করে না। ঘোড়ায় চাবুক কষে জোর কদমে সোজা এগিয়ে গেল তার দিকে। যেতে যেতে সে হাঁক ছাড়লে,—এই মাথামোটা গাধা, তোদের কর্তার কাছে আমায় নিয়ে চল্।

বাসমাচি ভাবনায় পড়ে,—লোকটা দেখছি পুরোপুরি সশস্ত্র, তার ওপর গোড়া থেকেই গালিগালাজ শুরু করেছে। সুতরাং জিজ্ঞাসাবাদ চলবে না। কিন্তু লোকটা কে? এল কোত্থেকে?

হঠাৎ বাসমাচির চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। ইভাস্কোর চাবুকের এক ঘা এসে পড়েছে তার ওপর। লাফিয়ে উঠলো সে। বুঝলো, ইনি জরুর কোন খানদানী মাতব্বর ব্যক্তি। অতএব—অতএব—

আঘাতটা এত আকস্মিক ও যন্ত্রণাদায়ক আর তার ফলে বাসমাচির মনে তা এমনই দাগ কেটে বসলো যে, মাথায় বুলেট খাওয়ার ভয়ে সে নুয়ে পড়লো। কিন্তু বুলেট এল না, তার বদলে আবার এল চাবুক এবং তা আরো জোরে। চাবুক কষে ইভাস্কো হুকুম করলে,—এই বেআদব, কানে ঢুকছে না কথা? তোদের কর্তার কাছে আমায় নিয়ে চল্। জরুরী আলোচনা আছে।

চাবুকের ঘায়ে বাসমাচি ককিয়ে উঠেছিল। পেটের ওপর সসম্মানে দু হাত জোড় করে সে কেঁউ কেঁউ করে উঠলো,—জী হুজুর, আলবৎ! জরুর!

ছোট্, ছোট্!—ইভাস্কো হুকুম করতেই পথ দেখিয়ে প্রাণপণে বাসমাচি দৌড়লো আগে আগে।

আরে, আরে, এই বেয়াকুফ্! রাইফেল তুলে নে! রাইফেল ফেলে দিয়েছিস কোন্ আক্কেলে?—বলতে বলতে ইভাস্কো আবার চাবুক কষলো তার পিঠে।

জোরে ছুটছিল বাসমাচি, চাবুক খেয়ে আরো ঘাবড়ে গেল। পেছনে ছুটে গিয়ে রাইফেলটা তুলে নিয়েই আবার দৌড়লো।

পেছনে ঘোড়ার পিঠে ইভাস্কো। সমানে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে বাসমাচিটাকে। বার বার সে হাঁকছে,—ছোট্! আরো জোরে ছোট্! আরো জোরে!

তাড়া মারতে মারতে আবার সে চাবুক কষলো। লোকটাকে মুহূর্তের জন্যও সে ভাববার সময় দিচ্ছে না। তার হাতে সিসেয় মোড়া ভারী এক চাবুক। খাপের রিভলবার খাপেই থেকে যায়।

এমনিভাবে, হুঁশিয়ারি না দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছাড়াই একলা শয়তানই কেবল যেতে পারে দুশমনদের গুহায়।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে বাসমাচি। পথের এক মোড় ঘুরতেই বলশয় গাঁয়ের ঘরবাড়ি দেখা গেল। পশুচারণ-মাঠটা পার হয়ে বড় একটা তাঁবুর দিকে ছুটছে বাসমাচি। তাঁবুটা পশমের—তার গায়ে নানারকম নকশার কাজ।

তাঁবুটা ঘিরে সশস্ত্র একদল বাসমাচি দাঁড়িয়ে আছে। ইভাস্কোকে দেখেই তারা বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাদের ধারণা, সান্ত্রীই পাকড়াও করেছে ইভাস্কোকে। সমস্বরে গর্জে উঠলো তারা,—ওকে আমাদের কাছে নিয়ে এস! নিয়ে এস এখানে!

ধীরে সুস্থে বড় বাদামের আঁঠি ভাঙতে ভাঙতে আর তার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ইভাস্কো আসছে। দেখে মনে হয়, যেন নিজের গাঁয়ে নিজের লোকজনদের মধ্যেই এসেছে সে। বাসমাচিদের ভেতর দিয়ে সোজা সে গিয়ে হাজির হলো সর্দারের অর্থাৎ শরফের তাঁবুর সামনে।

ঘোড়ার লাগাম কষতে কষতে লঘুতরল কণ্ঠে সে হাঁক পাড়লে,—কত্তা! ও কত্তা! আরে, কি জাতের ওঁছা কত্তা রে বাবা, সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে দেখা করেন না? বলি ও কত্তা!

শরফ ছুটে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। সে এত হকচকিয়ে গেছে যে, খেয়ে হাত ধুতেও ভুলে গেছে। হ্যাঁ, ওরা ঠিকই বলেছে, শয়তান সশরীরে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে! সে যখন পার্টিজান ছিল, শয়তানকে তখন সে বেশ কয়েকবার দেখেছে। তাঁবুর বাইরে সেই শয়তান ইভাস্কা নিজে দাঁড়িয়ে আছে—নির্ভীক, মুখে মৃদু হাসি। দেখে মনে হচ্ছে, এখুনি সে বুঝি পার্টিজানদের কুচকাওয়াজ করাতে শুরু করবে।

বেঁটেখাটো বলিষ্ঠ গড়ন শরফের, কালো চোখে তীক্ষ্ন চঞ্চল দৃষ্টি। সে হতভম্ব হয়ে গেছে। সাক্ষাৎকারী অন্য কেউ হলে, এতক্ষণে মাথায় বুলেট খেয়ে ঘোড়া থেকে উল্টে পড়তো। কিন্তু এ যে ইভাস্কো! শরফ নিদারুণ ঘাবড়ে যায়। ইভাস্কোর কাজে এ পর্যন্ত একটা ব্যর্থতারও নজির নেই। শয়তান যখন নিজে এখানে এসেছে, তখন বুঝতে হবে, শরফের অবস্থা খুবই কাহিল। আফগানিস্তান থেকে যে বাসমাচি-দল আসছিল, এই মাত্র তাদের পরাজয়ের খবর সে পেল। এ অবস্থায় শয়তান কি জন্যে এসেছে এখানে?

জনতা দম বন্ধ করে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে—কি ঘটে দেখার প্রতীক্ষায়। তাদের অধিকাংশই শয়তানকে এই প্রথম দেখছে। তাদের ওপর ওর প্রভাব পড়েছে গভীরভাবে। লোকে যে তার কথা বলে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তার জিনে রুপোর কাজ করা, জিনের কাপড় লাল মখমলের, তাতে সোনার পাঁচ-কোণা এক তারা জ্বলজ্বল করছে। তার লাগাম, তার সাজপোশাক, তার অস্ত্রশস্ত্র, সবই তাদের সর্দারের চেয়ে দামী ও উঁচুদরের।

সহজ সরল কণ্ঠে শয়তান বললে,—তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, শরফ। প্রক্তন একজন পার্টিজানের কাছে পার্টিজান হিসেবে এসেছি। যদিও আমরা তোমাদের ঘিরে ফেলেছি, তবু মনে একটা প্রশ্ন উঠলো, অকারণে মানুষ খুন করা কেন? শরফও তো একজন পুরনো পার্টিজান, বেফয়দা সে কখনই জীবন দেবে না—তার ও তার দলবলের নিরাপত্তার কথা......

শরফের ক্ষুদে চোখ দুটো বনবন করে ঘুরছে। চিন্তার স্রোত চলেছে মাথার মধ্যে,—শয়তান সাচ্চা বাত বলছে, না ঝুট বলছে? হতে পারে, সবটাই চালাকি! ও একা, আমরা অনেক......

সে দ্রুত কোমর থেকে রিভলবারের খাপ খুলতে থাকে। বাসমাচিরা ভাবলে,—শাবাশ! সর্দার এবার শয়তানকে গুলি করবে!

শরফের হাতের দিকে চাবুক উঁচিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে ইভাস্কো জিজ্ঞেস করে,—কি হাতড়াচ্ছ?

ব্রাউনিং!—বিষাক্ত কণ্ঠ শরফের।

কিন্তু আমার আছে মসার পিস্তল,—কাঠের খাপের ওপর সাদরে চাপড় মারতে মারতে ইভাস্কো বললে ঃ মসারের বিরুদ্ধে ব্রাউনিং কি করবে? তোমার আছে আটটা বুলেট, আমার পঁচিশটে। তোমার আছে তেষট্টিজন হচপচ, আমার আছে দুশো জন সুশিক্ষিত যোদ্ধা। তোমার অন্দেক লোকেরই ঘোড়া নেই, কিন্তু আমার সব লোকেরই ভাল ঘোড়া আছে। তোমার আছে মাত্র ছাব্বিশটে রাইফেল, আর আমার আছে দুশো রাই-ফেল আর মেশিনগান আর যথেচ্ছ গোলাবারুদ। সব দিক থেকে তোমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। তবু নিরর্থক মানুষ মারতে চাই নে। যারা হাতিয়ার ত্যাগ করবে, তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

শরফ বিহ্বল অবস্থা দ্রুত কাটিয়ে উঠছে, তৈরী হচ্ছে আঘাত হানার জন্যে—এটা ইভাস্কোর নজর এড়ায় নি। চোখের পলকে সে শরফের মুখের ওপর লাগাম জোড়া ছুড়ে দিলে, হুকুমের সুরে বললে,—লাগাম ধরো!

যন্ত্রের মতোই শরফ দু হাত দিয়ে লাগাম ধরে ফেললে। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়তে পড়তে ইভাস্কো বললে,—সাক্ষাৎকারীকে ঠিকমতো খাতির-আপ্যায়ন করা উচিত ছিল তোমার। ছ্যাঁ!

বলতে বলতে সে পেছনে একবারও না তাকিয়ে ঢুকে গেল তাঁবুর মধ্যে। এ সময় যদি সে একবারও পেছনে ফিরতো, কণামাত্রও যদি ইতস্ততঃ করতো, তাহলেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়তো তার ওপর। কিন্তু ওদের সে কোন কিছু ভাববারই অবসর দিলে না।

তাঁবুতে ঢোকার মুখে কার্পেট ঝুলছে। বাসমাচিরা ধাক্কাধাক্কি করতে করতে আগে আগে ছুটে গেল কার্পেটটা সরিয়ে দিতে। তাদের ধারণা, সর্দার সায়েব যা করেছেন, তার ওপর এটুকু বাড়তি সম্মান দেখানোয় এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তাঁবুতে ঢোকার মুখে ইভাস্কো থমকে দাঁড়ালে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতেই উদ্বেলিত জনতা পেছু হটে গেল। দৃঢ় কণ্ঠে ইভাস্কো বললে,—আবার বলছি, বাঁচতে চাও তো আত্ম-সমর্পণ করো!

পরক্ষণে সে ভেতরে ঢুকে গেল। যেখানে গিয়ে বসলো, সেটা মানী ব্যক্তির আসন।

বাইরে জনতার মধ্যে তখন তুমুল গুঞ্জন-ধ্বনি। ভীরুর মতো কাজ করে সর্দার শরফ ইতিমধ্যেই ইজ্জৎ খুইয়ে বসেছে। কুচাক প্রতিটি লোকের কাছে যাচ্ছে আর ফিস-ফিস করছে,—বিখ্যাত ব্যক্তি ইনি......বুলেট ওঁর কিছুই করতে পারে না......বাঁচার একমাত্র পথ হলো আত্মসমর্পণ করা......

তাঁবুর ভেতরে ইভাস্কো। আর বাইরে কুচাক ততক্ষণে কাম প্রায় ফতে করে এনেছে —শরফ সম্পর্কে অবিশ্বাসের বীজ ঢুকিয়েছে সকলের মনে। তার ওপর শয়তানের বড় বড় অভিযানের কয়েকটা কাহিনী শুনিয়ে ঘটনার মোড় সে ঘুরিয়ে ফেলেছে অনেকখানি। বাস্তবে অবশ্য সেসব অভিযানের কোন অস্তিত্বই নেই। বাসমাচিদের মধ্যে তখন চূড়ান্ত বিভ্রান্তি। এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে সব ঘটনা ঘটে গেল যে, তার ধাক্কা সাম-লানো তাদের পক্ষে কঠিন।

ইতিমধ্যে হাত ধোয়ার জন্যে ইভাস্কো মোলায়েম কণ্ঠে ডাকছে শরফকে—তার হাতে জল ঢেলে দিতে হবে। তারপর হাত বাড়িয়ে সে নীরবে অপেক্ষা করে, শরফ কখন

তোয়ালে এগিয়ে দেবে। কাণ্ডকারখানা দেখে জনতার চোখ ছানাবড়া। তাদের মধ্যে বিষম উত্তেজনা : দেখছো ব্যাপার, শয়তানের ভয়ে সর্দার শরফ কি রকম কুঁকড়ে গেছে!

ভেতরে মুখোমুখি বসে ইভাস্কো ও শরফ। কৌমিশ পান করলে তারা নীরবে। চা দেওয়া হলো। ইভাস্কো এবার জিজ্ঞেস করে,—তাহলে আমাদের মধ্যে কি যুদ্ধ চলবে, না শান্তি স্থাপিত হবে?

তারপরেই সে যোগ করে : অবশ্যি মনে রেখ, আমার ফৌজ বলশয় গ্রাম ঘিরে ফেলেছে। দরকার পড়লে, তোমাদের সব কটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেব।

শুনুন সেনাপতি সাহেব,—ধূর্তকণ্ঠে শরফ বললে রুশ ভাষায় : এখানে রুশ ভাষা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। কি করে আমি বুঝবো যে, বলশয় গ্রাম আপনারা ঘিরে ফেলেছেন? এটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। যদি দেখি, কোন উপায় নেই, তাহলেই আত্মসমর্পণ করবো। নয়তো মনে রাখবেন, আপনি একা আর আমরা তিন শো জন—সবাই সশস্ত্র।

ঝুটমুট বলো না!—ইভাস্কো বললে : তোমরা মাত্র তেষট্টিজন। আগে আরো কিছু বেশী ছিল। কিন্তু আজ আমি আসার পথে কয়েকটা কমে গেছে। আচ্ছা, ডাকাতদের মধ্যে এসে শয়তান তাদের খপ্পরে পড়েছে, এটা কাউকে বলতেও শুনেছ কখনো? দেখ তো মনে করে!

অনেকক্ষণ ধরে শরফ মনে করার চেষ্টা করে। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে,—না।

তবে!—ইভাস্কো এবার কিরঘিজ ভাষায় বললে বেশ চিৎকার করে, যাতে অন্য সবাইও শুনতে পায় : তোমাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে কিনা তার প্রমাণ চাইছ? বেশ, এক্ষুণি দেব সে প্রমাণ।

বলতে বলতে সে তাঁবুর বাইরে এসে মসার থেকে পর পর দুবার ফাঁকা আওয়াজ করলে। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগান ছোড়ার খটখট আওয়াজ এল বাঁ দিক থেকে। শাঁ শাঁ শব্দে বুলেট ছুটলো বাসমাচিদের মাথার ওপর দিয়ে। তাদের কেউ কেউ কুঁজো হয়ে পড়লো, আর যারা বেশী 'সাহসী', তারা সটান ভূমিশয্যা গ্রহণ করলো।

আবার ইভাস্কো ফাঁকা আওয়াজ করলো, এবার তিনবার। পরক্ষণে ডাইনে থেকে এল মেশিনগানের শব্দ।

এবার তোষামোদী হাসি দেখা দিলে শরফের মুখে, বললে,—এতক্ষণ তামাশা করছিলাম। আত্মসমর্পণ করার মতলবেই তো বাসমাচিদের এখানে নিয়ে এসেছি। আমি তো সোভিয়েতেরই লোক!

ইভাস্কোর ইচ্ছে হয় বলে, চোপ্ রও মিথ্যেবাদী! কিন্তু সামলে নেয়।

সবাই দম বন্ধ করে আছে। কারো মুখে রা নেই।

নিস্তব্ধতা এত গভীর যে, জনতার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে। সহসা ইভাস্কো কয়েক পা এগিয়ে এল, তারপর শরফের পিঠে আস্তে এক চাপড় মেরে বললে, —শাবাশ শরফ! বাহাদুর বুদ্ধি বটে তোমার! এবার তোমার লোকদের হুকুম দাও এক্ষুণি হাতিয়ার ত্যাগ করতে।

ইভাস্কোর কথা শেষ হতেই, সবার আগে এগিয়ে এল কুচাক, সবাইকে দেখিয়ে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই গাদা বন্দুকটা সে নামিয়ে রাখলে তার পায়ের কাছে।

সেদিকে দেখিয়ে ইভাস্কো বললে,—তোমাদের রক্তপাত ঘটাতে চাই নে। সবাই যে যার হাতিয়ার সব ফেলে দাও ওখানে।

এবার শরফ শুরু করে,—দোস্ত সব, শোন! আল্লা যা নসীবে লিখেছেন, তা পাল্টা-

নোর হিম্মৎ কারো নেই। লালফৌজের বুলেট আর তরোয়ালের ঘায়ে তোমরা খতম হয়ে যাবে, এটা আমি চাইনে। তাই বলছি, এস হাতিয়ার সব ফেলে দি। সেনাপতি সাহেবও হলফ করে বলুন, এটা করলে যার যেখানে ইচ্ছে সে খুশিমতো চলে যেতে পারবে, বাধা দেওয়া হবে না।

হক কথা বলেছেন!—কুচাক হাঁক ছাড়লে।

ঠিক ঠিক!—অন্যেরাও যোগ দিলে ঐ সঙ্গে। অল্প কয়েকজন অবশ্য প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলো, কিন্তু আর সবাই থামিয়ে দিলে তাদের।

ইভাস্কোর ব্যস্ততা নেই। ধীরে সুস্থে সে বললে,—হাতিয়ার ত্যাগ করে তোমরা যার যেখানে খুশি চলে যাও, কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু যারা হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে যাবে, তাদের বেলায় কোন কথা দিতে পারবো না।

এক বুড়ো চেঁচিয়ে উঠলো,—কোরানের নামে হলফ করুন! কোরানের নামে!

মুচকি হাসলো ইভাস্কো, তারপর কোরানের বায়ান্ন নম্বর অধ্যায় থেকে হলফ পড়ে চললো ধীরে ধীরে, কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে। সবটাই সে বলে গেল স্মৃতি থেকে।

বুড়োর বিস্মিত কণ্ঠ থেকে যেন আর্তনাদ বেরিয়ে এল,—বিলকুল! বিলকুল ঠিক বলে গেছে সবটা!

শয়তান! সত্যিই ও শয়তান!—ত্রস্ত কণ্ঠেব গুঞ্জন ওঠে জনতার মধ্যে : নয়তো রুশ হয়ে ও কি করে এভাবে কোরান জানলে?

তরোয়াল ও পিস্তল শরফ মাটিতে ফেলে দিলে। তার পিঠে আবার মৃদু চাপড় মেরে ইভাস্কো তরোয়াল ও পিস্তলটা ওকে ফেরত দিতে দিতে বললে,—স্বাগত জানাচ্ছি তোমায়, শরফ! নিজেই তো তুমি বলেছ, তুমি সোভিয়েতের লোক, ডাকাতদের এখানে এনেছ আত্মসমর্পণ করাতে। তাই হাতিয়ারগুলো ঠিকমতো আবার পরে নাও। সোভি-য়েতের লোক যখন তুমি, আশা করি আমার ফৌজে যোগ দেবে!

জনতার মধ্যে সোরগোল উঠলো,—বেইমানি! বেইমানি! পালাও!....

বলতে বলতে কিছু বাসমাচি দৌড়লো পর্বত-এলাকার দিকে।

ইভাস্কো ভান করে, যেন ডাকাতদের এই পালানোটা সে টেরই পায়নি। বাসমাচি-দের ক্রুদ্ধ চাউনির সঙ্গে শরফের চোখাচোখি হয়। সে বেশ বুঝতে পারে, ইভাস্কোর কবল থেকে কোন রকমে জ্যান্ত রেহাই পেলেও বাসমাচিরা তাকে রেহাই দেবে না। তাই বাঁচার এখন একমাত্র পথ সাময়িকভাবে শয়তানের আশ্রয়ে থাকা, তারপর অবস্থা বুঝে সটকানো। সে বললে,—আপনাকে আমি আলবৎ সাহায্য কববো। খোদা হাফেজ! আল্লা আমাদের সহায়!

অস্ত্রশস্ত্রের গাদা জমেছে। বাসমাচিদের মধ্যে যারা হাতিয়ার ত্যাগ করেছে, তাদের উদ্দেশ করে ইভাস্কো বললে,—তোমাদের আমি বিশ্বাস করি এবং তার প্রমাণও দেব। তোমাদের ফৌজে না নেওয়া পর্যন্ত তোমাদের হাতিয়ার তোমরাই পাহারা দেবে।

হতভম্ব জনতা বিস্ময়ে ফেটে পড়ে। তাদের সবার সামনে কুচাক। তাকে উদ্দেশ করে ইভাস্কো আবার বললে,—এই তুমি! তুমিও তো বাসমাচিদের একজন! কিন্তু সবার আগে তুমিই নিজেব বন্দুকটা ফেলে দিয়েছিলে। তাই এই সব হাতিয়ার পাহারা দেবার ভার তোমায় দিচ্ছি। একটা রাইফেল তুলে নাও। যে অবাধ্য হবে বা এইসব অস্ত্রশস্ত্রে হাত দেবে, বুলেট মেরে তাকে শুইয়ে দেবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, তাঁবুর সামনে অস্ত্রশস্ত্রের গাদার পাশে কুচাক রাই-ফেল হাতে একাই দাঁড়িয়ে আছে। বাসমাচিদের কয়েকজনমাত্র হাতিয়ার নিয়ে পর্বতের দিকে পালিয়েছে, বাকী সবাই বাড়ি ফিরে গেছে।

ইভাস্কো খুশী। বলশয় গ্রাম দখল হয়েছে, বাসমাচি-দল ছত্রভঙ্গ এবং তার বড় অংশটাই এখন নিরস্ত্র। পর্বতাঞ্চল থেকে গুলির শব্দ আসছে। ইভাস্কো বুঝতে পারে, তার লোকেরা সশস্ত্র বাসমাচিদের পাকড়াও করছে। সে আরও খুশী এইজন্যে যে, কজিৎজ্কির ডান হাত সর্দার শরফ তার মুঠোর মধ্যে। অনেক কিছুই সে জানে।

সন্ধ্যা নাগাদ ইভাস্কোর গোটা বাহিনী গাঁয়ে এসে জড়ো হলো। তাঁবুর মধ্যে শরফ বসে আছে, মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। ঘুরে ফিরে একটা কথাই বার বার তার মনে আসছে—শয়তান না হয়ে আর কেউ হলে ঘটনাস্রোত অন্য খাতে বইত।

ইভাস্কো তাঁবুতে ঢুকলো। আলো জ্বালতে বলে আগুনের পাশে গিয়ে বসলো। শরফ ছাড়া আর সবাইকে সে বের করে দিলে তাঁবু থেকে।

সবুজ চা এল। চা খেতে খেতে নানা আলোচনা চলে দুজনের মধ্যে। আলোচনার ধরন দেখে শরফের মেজাজ খিঁচড়ে যায়। না পালিয়ে কত বড় ভুল সে করেছে, তা বুঝতে বাকি থাকে না। শয়তান জানে অনেক কিছুই। তার চার পুরুষের বংশ-পরিচয় বলে দিয়েছে—তার প্রপিতামহ থেকে বাবা পর্যন্ত। সে জানে, তার প্রপিতামহ ছিলেন মৌলবী আর বাবা ছিলেন মোল্লা।

তা ছাড়া কজিৎজ্কির শাগরেদ হিসাবে এ পর্যন্ত যেসব কাণ্ডকারখানা সে করেছে, তারও একটা পুরো ফিরিস্তি শয়তান তাকে শুনিয়ে দিয়েছে। শুধুই কি তাই! এমন কতকগুলো গোপন ঘটনা সে বলেছে, যা কেউ জানতে পারে বিশেষ করে কোন লাল-ফৌজদার, তা স্বপ্নেরও অতীত।

ফলে সমস্ত ব্যাপারটা হালকা রঙে রাঙিয়ে নিজেকে সোভিয়েতের লোক বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা শরফের আর নেই। কিছুক্ষণ গুম মেরে থেকে এক সময় সে বললে,—আপনি কথা দিয়েছিলেন, যেখানে খুশি আমাদের চলে যাবার আজাদি দেবেন। কথাটা কি ফিরিয়ে নিয়েছেন?

না।—ইভাস্কো বলে ঃ জবান দিয়েছিলাম, জবান রেখেওছি।

পোই, লাস্তোচ্কা, পোই...—রুশ ভাষায় শরফ হঠাৎ গেয়ে উঠলো।

কি বললে?—ইভাস্কো চমকে উঠলো ঃ পোই, লাস্তোচ্কা, পোই অর্থাৎ গাও, সোয়ালো, গাও! সর্দার শরফের নাম যখন বলা হয়েছিল বোই-লাজ্দোচ্কা-বোই, তখন বুঝতে পারিনি। এখন বুঝছি। গানটা কজিৎজ্কির মুখে প্রায়ই শোনা যায়, তাই না?

আবার দুজনে খানিকক্ষণ চুপচাপ। শেষে ইভাস্কো বললে,—একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি শরফ, তুমি কি বাঁচতে চাও?

—চাই, আলবৎ চাই!

—তাহলে বলো, ইমাম বলবক তোমায় কি নির্দেশ দিয়েছে। আমি জানি, অকারণে তুমি এভাবে আত্মসমর্পণ করো নি, জরুরী কোন একটা ব্যাপারের জন্যে সরে পড়ার মতলবে আছ।

অসহায়ভাবে শরফ কুশন-চেয়ারে এলিয়ে পড়ে। তারপর মাথা হেঁট করে ধীরে ধীরে বললে,—আপনি তো জানেন, আমার বাবা হলেন মোল্লা। বলতে গেলে আমি নিজেও মোল্লা—খাঁটি মুসলমান দীনদার। পবিত্র কোরান ছুঁয়ে হলফ করে তা আমি ভাঙতে পারি নে। সুতরাং আপনি আমায় গুলি করতে পারেন।

—কিন্তু কসম থেকে যদি খালাস পাও, তাহলে বলবে?

—জান বাঁচানোর জন্যে নিশ্চয়ই বলবো। কিন্তু আমি হলফ করেছিলাম ইমাম বলবকের কাছে, তিনিই কেবল পারেন সে হলফ থেকে আমায় খালাস দিতে।

ইভাস্কোর মুখে মৃদু হাসি দেখা দেয়। ধীরে ধীরে সে বললে,—শরীয়ত তো তুমি ভালভাবেই রপ্ত করেছ। কোরানের টীকা হাদিস পড়েছ?

পড়েছি। মাদ্রাসায়!—সগর্বে জবাব দেয় শরফ।

—হলফ সম্পর্কে হাদিসের নির্দেশ তাহলে তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি।

সন্দিগ্ধ চোখে শরফ তাকালো ইভাস্কোর দিকে। মুখে তার বিকৃত তাচ্ছিল্যের হাসি।

ইভাস্কো বললে,—একখানা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও, সেখানে নিজের চেহারাই তুমি শুধু দেখতে পাবে। তার মানে, তুমি সম্পূর্ণ একা—এটা হাদিসেরই কথা। একলা তুমিই শুধু রয়েছ, এটা তিরিশবার বলো। তাহলে আয়নার ভেতরকার তোমার ছায়াও সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবে। হলফ করার ফলে যা ব্যক্ত করা হারাম, তা শুধু তুমি নিজের কাছেই ব্যক্ত করতে পার। এক্ষেত্রেও তাই—তোমার কথা আর কেউ শুনতে পাচ্ছে না, কারণ নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই তুমি দেখছো না!

শরফ হতভম্ব। চোখেমুখে তার শ্রদ্ধা ও আতঙ্কের স্পষ্ট ছাপ। বিস্ময়ে ফেটে পড়ে সে,—কী তাজ্জব! কী তাজ্জব! খুব পণ্ডিত আপনি, সবই আপনার জানা দেখছি। পণ্ডিত আমিও জানিও সব, কিন্তু......

বলতে বলতে শরফ গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। দুই হাঁটুর ওপর হাত রেখে বসে থাকে বহুক্ষণ। শেষে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—বেশ, তাই হোক। আপনার জবানের ওপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করছি।

তরপর থলি থেকে সে রুপোর ফ্রেমে আঁটা গোলাকার একখানা আয়না বের করে নিজের সামনে ধরলে। এবার শুরু হয় তাব কসরৎ ঃ তাঁবুর মধ্যে সে ছাড়া আর কেউ নেই এবং সে যা এখন ব্যক্ত করবে, তা জানার বা শোনারও কেউ নেই, এটা সে বোঝাতে শুরু করে নিজেকে।

ব্যাপারটা যে আগাগোড়া ভণ্ডামি ও ভাঁড়ামির প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়, এটা ইভাস্কো ভাল করেই জানে। হাদিসের প্রতি আনুগত্যের প্রশ্ন এটা নয়, প্রশ্নটা মৃত্যু ভয়ের, যার তাড়নায় শরফ সব কিছু ফাঁস করতে বাধ্য।

আয়নায় নিজের ছায়াকে উদ্দেশ করে শরফ এবার বলতে শুরু করে,—শোন শরফ, গুরুতর একটা গোপন খবর তোমায় বলছি। তোমার ওপর গোপন কাজের যে ভার রয়েছে, সেটা ঝালানোর জন্যেই বলছি এটা। বহু নদ-নদী-পর্বত ডিঙিয়ে বাসমাচিরা দলে দলে পামীরে গিয়ে হাজির হবে। আসবে দীনদার, জমিদার ও মোল্লার দল। গর্দান উড়ে যাবে বলশেভিকদের। কিন্তু এমন যদি ঘটে যে, আল্লা গোসা করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং ঘটনার স্রোত উলটো দিকে মোড় ঘুরলো, তাহলে তারা যাবে বার্তাং নদীর ধারে। ইমাম বলবক বলে দিয়েছেন, কজিৎজকি, তাগাই আর তুমি শরফ, তোমরা তিনজনে যাবে সেখানে। যে বেঁচে থাকবে এবং পৌঁছতে পারবে সেখানে, সে-ই করবে কাজটা। এবার শোন, ইমাম বলবক আরো কি বলেছেন ঃ বহু—বহু বছর আগে পামীরের পর্বতমুল্লুক একবার কেঁপে উঠেছিল। সেই ধাক্কায় মস্ত এক পর্বত ভেঙে পড়ে। আর তার ফলে সারেজ, উসয় ও পার্শ্ববর্তী আরো চারটে গ্রাম যেমন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, তেমনি পর্বতের বাঁধ পড়ে বার্তাং নদীও পুরোপুরি আটকা পড়ে যায়, এবং নদীর স্রোত বন্ধ হওয়ায় তৈরী হয় প্রকাণ্ড এক হ্রদ। তোমাদের এই বাঁধে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন ইমাম বলবক। বাঁধটা তিন-চার মাইল লম্বা আর চওড়া আঠাশ শো ফুট—পাহাড়ের মতো বিরাট বিরাট পাথর দিয়ে তৈরী। কিন্তু একটা জায়গা আছে, যেখানে ডিনামাইটের বড় বড় চাঁই বসিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালে বাঁধ উড়ে যাবে। আর তার

ফলে হ্রদের সমস্ত জল দুরন্ত বেগে ধাওয়া করবে নীচের দিকে। তার তোড়ে সেতু ফসল মানুষ গ্রাম জনপদ, সব কিছু ভেসে যাবে আমু দরিয়া পর্যন্ত। ইমাম বলবক বলেছেন, নির্দিষ্ট জায়গায় তোমাদের ডিনামাইট সরবরাহ করা হবে। সেখান থেকে ইমাম বলবক সোভিয়েত সরকারের কাছে চিঠি পাঠাবেন। সোভিয়েত সরকার যদি অগুনতি মানুষের ধনপ্রাণ বানে ধ্বংস করতে না চায়, তাহলে তাদের পামীর ছেড়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে যেসব বাসমাচিকে তারা কয়েদ রেখেছে, তাদেরও ছেড়ে দিতে হবে......

হাসতে হাসতে ইভাস্কো বললে,—তাহলে বলবকের সাধ দেখা যাচ্ছে খোদা হওয়া আর মধ্য এশিয়া বানে ডুবিয়ে দেওয়া। একমাত্র যা অসুবিধে, তা হলো হ্রদে অত জল নেই। যাই হোক, পরিকল্পনাটা খুবই জবর।...তাহলে তোমার মতলব ছিল বার্তাং নদীর ধারে পালিয়ে যাওয়া আর অপেক্ষা করা—

—সঙ্কেতের জন্যে। এটাই ইমাম বলবকের নির্দেশ।

—সীমান্ত-রক্ষীরা ডিনামাইট সমেত তোমাদের কাফেলা আটক করেছে শুনেছ?

—শুনেছি। ডিনামাইট নিয়ে তিনটে কাফেলার আসার কথা। একটা যদি ধরা পড়ে থাকে তো আর দুটো পার হয়ে গেছে।

—তুমি ছাড়া আর কে কে এটা জানে?

—তাগাই ও কজিৎজ্‌কি। আর ইমাম বলবক নিজে তো বটেই। যাক, সবই তো আপনাকে বললাম। আমায় জান ও আজাদি দেবার কড়ার করেছিলেন।

কিন্তু সঙ্কেতটা কি?—ইভাস্কো আচমকা জিজ্ঞেস করে : কি সঙ্কেত তোমাদের দেবার কথা ইমামের?

ভোরের তির্যক সূর্য-রশ্মি উঁকি মারছে তাঁবুর মধ্যে। শরফ নির্বাক। ক্লান্তি ও হতাশায় মাথা নুয়ে পড়েছে।

হঠাৎ তাঁবুর পর্দা সরে গেল। ভেতরে মাথা বাড়িয়ে আর্দালি বললে,—কমরেড সেনাপতি, একটা বুড়ো লোক অনেকক্ষণ এখানে এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বড্ড পেড়াপীড়ি করছে।

ইভাস্কো বাইরে এল। সামনে দাঁড়িয়ে এক বুড়ো, হেঁট হয়ে তাকে কুর্নিশ করছে। কুর্নিশ করতে করতে সে যা বললে, তার মোদ্দা কথা হলো : গ্রাম-সোভিয়েতের অফিসে সক্রিয় পার্টি-সভ্যরা ছাড়াও আরো অনেকে ইভাস্কোর জন্যে অপেক্ষা করছে। বিশেষ এক জরুরী খবর নিয়ে সীমান্ত থেকে এক আহত চাষী এসেছে। তাই এখুনি তার একবার যাওয়া দরকার। তাছাড়া মাতব্বরেরা এক ভিস্তি কৌমিশও পাঠিয়েছে তার জন্যে। বলতে বলতে সে ভিস্তিটা এগিয়ে ধরে ইভাস্কোর দিকে।

ব্যাপারটা জানার জন্যে ইভাস্কো প্রথমে আর্দালিকে পাঠাবে স্থির করে, কিন্তু বুড়োর পেড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তাকে মত পালটাতে হয়। কৌমিশের ভিস্তিটা আর্দালিকে ভেতরে নিয়ে রাখতে বলে সে একলাফে ঘোড়ায় উঠে বুড়োকে বললে,—চলো, যাওয়া যাক। আমার সময় খুব কম।

কুর্নিশ করতে করতে বুড়ো বললে,—আপনি এগোন, আমি আপনার পেছনেই আসছি।

পরক্ষণে, ইভাস্কো চলে যেতেই, সে তাঁবুর দিকে যেতে যেতে রুশ ভাষায় আর্দালিকে বললে,—ভিস্তিটা আমি নিজে নিয়ে যাব তাঁবুর মধ্যে।

আর্দালি রাজী হয় না। পথ আটকে দাঁড়ায়।

হঠাৎ কাছের এক ঝোপ থেকে চিৎকার উঠলো,—আল্লা! আল্লা!

চোখের নিমেষে ছোরা হাতে এক দরবেশ সেখান থেকে ধেয়ে এল আর্দালির দিকে। আর্দালি রাইফেলে বাগিয়ে ধরলে।

ইতিমধ্যে বুড়ো ছুটে গেছে তাঁবুর মধ্যে। আর দরবেশ তর্জন গর্জন করতে করতে পাগলের মতো ধেই ধেই করে নাচছে ও পাক খাচ্ছে আর্দালিকে ঘিরে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বুড়ো লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে এবং একটা চাবুক হাতে ধেয়ে গেল দরবেশের দিকে। চাবুক দেখেই তীক্ষ্ণ চিৎকার করে দরবেশ দে ছুট—ছুটে পালালো ঝোপের মধ্যে। আর হম্বিতম্বি করতে করতে বুড়ো ধেয়ে গেল তার পেছনে। দেখতে দেখতে দুজনেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে।

অত ভোরেও গ্রাম-সোভিয়েতে বহু লোক জমায়েত হয়েছে। হালের ঘটনাবলী নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা চলছে চাষীদের মধ্যে। সবারই মুখে ইভাস্কোর নাম। এমন সময় ইভাস্কো গিয়ে হাজির। ওকে দেখে সবাই হকচকিয়ে যায়। পরক্ষণে তারা সমস্বরে অভ্যর্থনা জানালে,—আসুন, আসুন কমরেড বীরজোয়ান! আসুন, সেলাম-আলায়কুম!

প্রত্যেকেই চায় ইভাস্কোর আরও কাছে যেতে, তার সঙ্গে কথা বলতে। আবেগের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে প্রত্যেকেই তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। তাদের চোখে মৌন শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা বাঙময় হয়ে ওঠে।

বসুন, আপনারা সব বসুন।—ইভাস্কো বললে ঃ আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। আহত লোকটা কোথায়? একটু তাড়াতাড়ি করুন!

আহত লোক! সবাই অবাক। এমন সময় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো আর্দালি। ইভাস্কোর কাছে ছুটে গিয়ে তার কানে কানে সে রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করে বলে গেল,—আপনি চলে যেতেই সেই বুড়ো লোকটা এসে আমায় বললে, ভিস্তিটা আমিই তাঁবুর ভেতর নিয়ে যাব। আমি বাধা দিলাম। হঠাৎ কোথা থেকে এক পাগলা দরবেশ ধেয়ে এসে আমায় আক্রমণ করলে। আমি তাকে ঠেকাচ্ছি, এমন সময় বুড়োটা এসে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। তারা চলে যেতেই, তাঁবুর ভেতর থেকে আমার কানে এল একটা ঘড়ঘড় শব্দ। ভেতরে ঢুকে দেখি, শরফ মেজেয় পড়ে আছে, মর-মর অবস্থা। তার বুকে একখানা ছোরা বিঁধে আছে. সে বিড়বিড় করছে, বলবক, বলবক......

বলবক?—ইভাস্কো লাফিয়ে উঠলো।

হ্যাঁ, বলবক!—বিস্মিত আর্দালি সায় দেয়।

ইভাস্কো জানলার কাছে ছুটে গিয়ে দুবার ফাঁকা আওয়াজ করলে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। সমস্তটাই সাজানো ঃ উপস্থিত সবাই জানালে, তাকে গ্রাম-সোভিয়েতে ডেকে তারা তার কাজের ক্ষতি করতে চায় নি, নিজেরাই তার কাছে যাবে ঠিক করেছিল।

ইভাস্কোর লোকেরা বুড়োর খোঁজে ঘোড়া নিয়ে তক্ষুণি নানা দিকে ছুটলো। কিন্তু কোথায় বুড়ো! সে তখন ঝোপের মধ্যে ভোল পাল্টে এক বুড়ির বেশ পরে নিয়েছে—বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢাকা। কুঁজো বুড়ির ছদ্মবেশে সে আবার গাঁয়ে ঢুকে ঝুড়ি নিয়ে ঘুটে কুড়তে শুরু করে।

দীর্ঘ পরিশ্রমের পর খুব ভাল ঘুম হওয়ায় কুচাকের মেজাজ শরীফ। হঠাৎ বুড়ির ওপর নজর পড়তেই তার দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠলো। ওটা আবার কোথাকার বুড়ি! কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে!

বুড়ি তখন একবার এদিক যাচ্ছে, আর একবার ওদিক যাচ্ছে। এমনি করতে

করতে, পর্বতের ঢালুতে যে ঘন ঝোপ, চোখের পলকে তার মধ্যে সে ঢুকে গেল। তার পেছু পেছু গিয়ে কুচাক দেখে, [illegible] বারখা পড়ে আছে। সেটা নিয়ে সে গেল ইভাস্কোর কাছে, বললে,—আমার দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, ও বুড়ি নয়, খেড়ে মন্দা।

জবর এই ধাপ্পায় পড়ে ইভাস্কোর মন-মেজাজ বিগড়ে যায়। কৌমিশটা সে ফেলে দিতে বললে এবং বাইরে কিছু খেতে বা পান করতেও বারণ করে দিলে নিজের লোক-জনদের।

দস্যুদের বর্বরতার বলি যারা হয়েছিল, গুরুগম্ভীর পরিবেশে তাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া শেষ হলে, পামীর-অভিযানে রওনা হবার তোড়জোড় শুরু হলো ইভাস্কোর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে।

ইভাস্কো কুচাককে জিজ্ঞেস করলে,—কি হে, জুরাকে উদ্ধার করতে যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে?

আলবৎ!—কুচাক জবাব দেয়ঃ আমি সঙ্গে না থাকলে সব দিক আপনি সামলাবেন কি করে?

একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে ধীর কণ্ঠে ইভাস্কো বললে,—কথাটা ঠিকই বলেছ বোধহয়। তুমি উপস্থিত থাকলে শরফ হয়তো এভাবে খুন হতো না আর বলবকও পালাতে পারতো না।

দিন শেষ হয়ে রাত্রি নামে। সেই রাতেই রওনা হলো সৈন্যবাহিনী। দীর্ঘ ও কঠিন সফর শুরু হয় তাদের। দুর্গম বিপজ্জনক পথ। অসংখ্য গিরিশ্রেণী, গিরিসংকট, হিমবাহ আর দুর্দান্ত নদ-নদীর ওপর দিয়ে গেছে সে পথ।

তৃতীয় পর্ব ১

ছোট্ট গ্রাম মিন-আরখারকে ঘিরে আগের মতো আজও হিংস্র ভয়াল পর্বতশ্রেণী আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গিরিসঙ্কটের কিনারায় নগণ্য কুঠুরীগুলো আজো জড়াজড়ি করে আছে আগের মতোই। কয়েক বছর আগে যেমন ঘটেছিল, আজো তেমনি কুকুরগুলোর হিংস্র চিৎকারে গাঁয়ের বাসিন্দারা সচকিত হয়ে উঠলো। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে উৎফুল্ল কণ্ঠের অনুরণন কানে এল,—ওরা আসছে!

—যাক, শেষ পর্যন্ত আটাময়দা কাপড়চোপড় চিনি, সব নিয়ে ওরা এল তাহলে!

এক-চোখোর নেতৃত্বে এক পাল প্রকাণ্ড কালো কুকুর ধেয়ে গেল উত্তরমুখো। একটু পরেই শোনা যায় তাদেব বন্য হিংস্র চিৎকার। সোল্লাসে হৈ-চৈ করতে করতে বাসিন্দারাও ছুটলো সামনের দিকে। এমন সময় হঠাৎ গুলির শব্দ। পরক্ষণে কানে এল একটা কুকুরের করুণ আর্তনাদ।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে এক বুড়ি বললে,—এরা তারা নয়, অন্য কেউ হবে।

অন্ধকারের দিকে উদ্দেশ করে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে এক যুবতী হাঁক ছাড়লে,—হেই, তোমরা অন্ধ নাকি! শিকারী কুকুরদের কেন গুলি করছো?

একটু পরেই ঘোড়সওয়াররা ওপরে উঠে এল। সংখ্যায় তারা পাঁচজন, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। সবার আগে লালদাড়িওলা এক মরদ। সে তাজ্জব বনে গেছে। সঙ্গীদের সে বললে,—আরে দেখ দেখ, শুধুই জেনানা, সব কটাই মুরগী! হেই, তোমাদের মরদরা কোথায়?

জবাব দিলে সেই বুড়ি, আয়েশা,—আমরা নিজেরাই কাজকম্ম চালাই। মরদ নেই এখানে।

বস্তাবোঝাই তিনটে ঘোড়া দেখিয়ে মেয়েদের একজন ফিসফিস করে বললে,—নতুন কিপারেটিফ এসেছে, বুঝলে?

ওহে লালদেড়ে, তোমরা কি কুরঘান থেকে আসছো?—সেই যুবতী জিজ্ঞেস করে।

তোমার তা জেনে দরকার?—রূঢ় কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করে ঘোড়সওয়ারদের একজন।

যুবতী আবার জিজ্ঞেস করলে,—মালপত্তর কিছু এনেছ?

হাঁ হাঁ, এনেছি!—জবাব দিলে লালদেড়ে।

তারা কুঠুরীতে পৌঁছলো। ঘোড়াগুলোকে দেয়ালের গোঁজের সঙ্গে বেঁধে আগন্তুকরা কামরায় ঢুকে আগুনের পাশে গিয়ে বসলো। তাদের চা দেওয়া হলো।

ইতিমধ্যে এক গাদা মারমটের চামড়া নিয়ে এসেছে মেয়েরা। আগন্তুকদের সামনে তারা সেগুলো বিছিয়ে দিলে। আগন্তুকরা তো অবাক, এ ওর দিকে তাকায়। কিন্তু চুপ করে থাকে—কি ঘটে দেখার জন্যে।

এর পর মেয়েরা নিয়ে এল কুড়িটে শেয়ালের, সাতটা নেকড়ের আর তিনটে তুষার-চিতার চামড়া। কিন্তু আগন্তুকরা তবু আগের মতোই নীরব।

এমন খাসা চামড়া, অথচ লোকগুলো কিনা কথা বলছে না! আয়েশা বুড়ি রাগে

গজগজ করে উঠলো। অল্প আলোয় চামড়াগুলো হয়তো ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না, তাই কিছু কাঠ সে ফেলে দেয় চুল্লীতে।

দেয়ালে আলো পড়তেই লালদাড়িওলা সেই তাগড়াই জোয়ান চমকে লাফিয়ে উঠলো, সগর্জনে বললে,—অ্যাঁ, দেয়ালে রাইফেল ঝুলছে!

যুবতীটির দিকে ফিরে সে আবার গর্জে উঠলো,—তোমরা মিথ্যে কথা বলেছ আমাদের কাছে! তোমাদের মরদরা সব কোথায়? হেই, সব জায়গা তল্লাশ করো।

আগন্তুকদের চারজন রাইফেল নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

যুবতীটি বললে,—আমাদের গাঁয়ে কোন মরদ নেই।

—এসব হাতিয়ার তাহলে কাদের?

কেন আমাদের!—বিস্মিত গলায় মেয়েটি বললে : বুনো পাহাড়ী ছাগল ভেড়া মারতে ওগুলো আমাদের দরকার হয়। ফাঁদ পেতে আমরা মারমট, শেয়াল আর নেকড়ে ধরি। কুরঘান কো-অপারেটিভ চামড়ার বদলে এই চারটে শিকারের বন্দুক. কার্তুজ, গোলাবারুদ আমাদের দিয়ে গেছে। তোমাদের তো এসব জানার কথা।

—ঝুট বাত বলছো না তো? কি নাম তোমার?

—জয়নাব। এই বুড়ির নাম আয়েশা, আর এই হলো বিবি, আমার প্রধান সহকারী। আর ওরা হলো আমাদের দুজন মরদের বিধবা, দুরন্ত সোকসাই নদীতে মরদ দুজন ডুবে মারা গেছে। কিন্তু তোমরা কারা? কুরঘান কো-অপারেটিভের লোক নও?

কুরঘান কো-অপারেটিভের লোক! আমি!—লালদেড়ে বিস্ময়ে ফেটে পড়লো : হায় হায়, সুন্দরী! কোথায় গেল তোমার চোখ? এ জাতীয় বুট কখনো লালব্যাটাদের পরতে দেখেছ?—বলেই সে উঁচু-হীলের নতুন কীড-বুটজোড়ায় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ করলে।

—কিন্তু ওসব মালপত্তর তাহলে কিসের? ঘোড়া তিনটের পিঠে যে মাল বোঝাই রয়েছে, ওসব কি জন্যে? চামড়ার সঙ্গে বিনিময় করার জন্যে নয়?

—ওহো! এতক্ষণে বুঝতে পারছি, চামড়াগুলো কেন তোমরা আমাদের সামনে বিছিয়ে দিয়েছ। না, আমরা বেনিয়া নই। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। আমরা বাসমাচি।

তাগাইয়ের লোক?—সচকিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে জয়নাব। তার চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছে।

লালদেড়ে ক্ষণেক চুপ করে থেকে বললে,—হ্যাঁ, আমরা তাগাইয়ের কাছে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি জানলে কি করে? ইমাম বলবকের দূত কি আগেই তোমাদের গাঁয়ে এসে গেছে?

তল্লাশ সেরে অন্য বাসমাচি চারজন ফিরে এসে জানালে, কামরাগুলো সব ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই।

সঙ্গে সঙ্গে ফুর্তিতে ডগমগ করে উঠলো লালদেড়ে। জয়নাবকে আঙুলের এক ঠেলা মেরে মস্করা করে বললে,—আমরা চামড়া চাইনে, বুঝলে? কিন্তু আমাদের মালপত্তর আছে প্রচুর। আসবার পথে দুটো মোটা ভেড়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করলাম, ঘোড়ার পিঠে যাচ্ছ কোথায়? ওরা বললে, মিন-আরখার গাঁয়ে। শিকারীদের কো-অপারেটিভের জন্যে মাল নিয়ে যাচ্ছি। বুঝতেই পারছো, হোঁৎকা ভেড়া দুটোর কি দশা হলো! ওরা অবশ্য হাউমাউ করেছিল, বলেছিল, গরিব চাষীদের আমরা সাহায্য করতে যাচ্ছি, আমাদের মের না, আমাদের কাছে কোন হাতিয়ার নেই। হুঁ, ওসবে ভুলবার পাত্তর আমি নই। ওদের আমি চিনি। আজ ওরা কো-অপারেটিভ, কাল হবে লাল

পার্টিজান আর আমাদের খুন করবে। জাহান্নামে যাক ওরা! সেখানেই ওদের পাঠিয়ে দিয়েছি। সে যাক, শোন চামড়া আমরা কিনি না কিন্তু মালপত্তর আছে অঢেল। সে সবই হবে তোমাদের, তার বদলে তোমাদের কাছ থেকে চাই অঢেল খাতির-যত্ন, বুঝলে? আমাদের মালপত্তর আর তোমাদের আদর-আপ্যায়ন, কি বলো?

বলতে বলতে লালদেড়ে চোখ টেপে। বুটজোড়া আবার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে উঠলো। আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো দস্যুরা।

বিবি আর আয়েশা ছুটলো দরজার দিকে, তাদের পেছনে বিধবা দুজন। কিন্তু দস্যুদের একজন চোখের পলকে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজায় খিল এঁটে দিলে।

বিবির চোখ জ্বলে ওঠে। কোমরবন্ধে হাত রাখলে সে। ছোরার বাঁটটা সেখানে বেরিয়ে আছে। মেয়েদের সবার দৃষ্টি জয়নাবের ওপর—হুকুমের অপেক্ষা শুধু।

জয়নাব কিন্তু নির্বাক, একটু নড়ছে না পর্যন্ত। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো এক ঝিলিক মুচকি হাসি খেলে যায় তার মুখে। কর্মপন্থা তার ঠিক হয়ে গেছে। তাগাইয়ের খপ্পরে পড়ে যে অভিজ্ঞতা সে লাভ করেছে, তার পরে এই-সব ওঁছা শয়তানদের সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

মেয়েদের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে সে বললে,—আরে এত বোকা কেন তোমরা? এই মরদরা আমাদের কাছ থেকে একটু যত্ন-আত্তির জন্যে আরজি পেশ করছে। এতে পালানোর কি আছে? যাক্ গে—শুনুন জনাব, আপনাদের কৌমিশ দিচ্ছি, খেয়ে নিন। তারপর সবাই মিলে আনন্দ-ফুর্তি করা যাবে, কি বলেন?

তোফা! তোফা!—উল্লাসে ফেটে পড়ে লালদেড়ে ঃ ঠিক বলেছ, একেবারে আমার মনের কথাটা বলেছ। হ্যাঁ, আগে কৌমিশ, তারপর ফুর্তি। নিয়ে এস, নিয়ে এস!

জয়নাব উঠে গিয়ে ঘরের এক অন্ধকার কোণ থেকে কৌমিশের ভিস্তিটা তুলে নিলে, তারপর সবার অগোচরে কোমরবন্ধ থেকে ছোট একটা থলি বের করে উপুড় করে ঢেলে দিলে কৌমিশের মধ্যে। থলি ভরতি ছিল ঘুমের গুঁড়ো। তাগাইয়ের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে দরকার হতে পারে ভেবে সমবু ওটা তাকে দিয়েছিল।

বড় একটা কাঠের পাত্র কৌমিশে ভরতি করে লালদেড়ের হাতে দিতে দিতে সে বললে,—খেয়ে ফেলুন, মেজাজ শরীফ হবে।

খেতে খেতে লালদেড়ে বললে,—কৌমিশটা কিন্তু টাটকা নয়, কেমন যেন কটু ঝাঁঝ লাগছে।

ও কিছু নয়, ও রকম মনে হয় এখানে এই দুরন্ত ঠান্ডার দেশে।—আর একজন দস্যুর হাতে কাপভরতি কৌমিশ দিতে দিতে জয়নাব জবাব দিলে। পরক্ষণে মেয়েদের দিকে চোখ টিপে সে বললে ঃ এই বিবি দাঁড়িয়ে আছিস কেন? নাচ শুরু কর্। নাচ্, নাচ্। তাম্বুরোটা নিয়ে এস বুড়িমা, বাজাও।

ষোড়শী বিবির নাচ শুরু হয়। হাড্ডিসার আঙুলে আয়েশা বুড়ি তাম্বুরায় ঝঙ্কার তুলছে। আগুনের এক ধারে বিধবারা বসে আছে আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে।

তোফা, তোফা! কিন্তু বড্ড ক্লান্তি লাগছে যে। ঘুম পাচ্ছে।—বলতে বলতে থলিটার ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে সশব্দে হাই তোলে লালদেড়ে। কুকুরের মতো তার দাঁতে দাঁত লেগে খট্‌খট্ আওয়াজ ওঠে।

মোলায়েম সুরে তাম্বুরা বেজে চলেছে। ধীরে ধীরে আগুন নিভে এল। আর ক্ষণ পরে অন্ধকারে জেগে উঠলো দস্যুদের নাকের ঐকতান-গর্জন।

বিধবা দুজন উঠে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত লোকগুলোকে ডিঙিয়ে ত্রস্তপদে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই, জোরে ফিসফিস করে জয়নাব ডাকলে,—এই যাচ্ছ কোথায়? ফেরো!

ওদের পাউডার খাইয়েছি। এখন ওরা মারমটের মতো ঘুমে বেহুঁশ, জাগবে বহু পরে। রাইফেল ব্যাগ সব ছিনিয়ে নাও। ঘোড়াগুলোও আমরা সঙ্গে নেব।

ছোরা বের করতে করতে বিবি বললে,—খুনও করবো ওদের, তাই না?

—না। ওভাবে হাত নোংরা করার দরকার নেই। ভাল করে বেঁধে গাঁয়ের পাশে গিরিসঙ্কটের কিনারায় ওদের টেনে নিয়ে যাব। সেখানে অতল খাড়াইয়ের ধারে ফেলে রেখে যাব ঐ অবস্থায়। কো-অপারেটিভের লোকদের খুন করার মজা টের পাবে নোংরা বদমাশ ডাকাতের দল।

জয়নাবের নির্দেশ মতোই কাজ হয়।

পরদিন বিকেল নাগাদ ঘুম ভাঙলো দস্যুদের। ব্যাপারটা যে কি, কি যে ঘটেছে, বহুক্ষণ সেটা আদের মাথায়ই ঢোকে না। রোদের তাপে সব যেন ঝলসে যাচ্ছে। মাথা কন্‌কন্‌ করছে, শরীরেও দারুণ অসোয়াস্তি, তার ওপর তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

হাত-পা বাঁধা, গভীর খাদের একেবারে কিনারায় তারা পড়ে আছে। এতটুকু নড়া-চড়া করেছ কি, বহু নীচে তীক্ষ্ন কঠিন পাথরের ওপর গিয়ে পড়তে হবে। অস্ত্রশস্ত্র ঘোড়া মালপত্র—সব লোপাট। গায়ের কোটগুলো পর্যন্ত খুলে নেওয়া হয়েছে।

এক পাথরের চাঁইযের সঙ্গে লালদেড়েকে বেঁধে রাখা হয়েছে। পায়ে বুটজোড়াও নেই। সে গোঁ গোঁ করে উঠলো,—সব কটাই ওরা লাল শয়তানী! দেখা মাত্রই খুন করা উচিত ছিল।

পরীরা যে আমাদের জানে মারে নি, সেটাও কম কথা নয়!—দলের একজন, কারাতে-গিনের সে বাসিন্দা, শান্ত গলায় বললে: যাই হোক, কিন্তু এখন কি করা।

লালদেড়ে আবার গরগর করে উঠলো,—করবে আবার কি, এইভাবে পড়ে থাকা ছাড়া? জানে যখন বেঁচে গেছি, তখন আর মরবো না। এখন না হোক রাতে, রাতে না হোক কাল, কাল না হোক পরশু কারো না কারো নজরে পড়বোই, ছাড়াও পাব। এইসব নির্জন পর্বতশ্রেণী এখন মানুষে গিজগিজ করছে। ইমাম হুকুম না করলে আমরাই কি ছাই মরতে আসতাম এখানে! কারাতেগিনে তো তোফা লুঠপাট চালাচ্ছিলাম। মরুক গে সে সব! লাল মেয়ে-শয়তানগুলোকে আমি খুঁজে বের করবোই, তারপর দাদ যা তুলবো—হুঁ, ধারণাও করতে পারবে না!..ইস্‌, একটু জল পেলে হতো, তেষ্টাতেই মারা যাব দেখছি!

লালদেড়ে রোদে-পোড়া শুকনো ঠোঁট চাটে....

এর পর একে একে দু দিন কেটে যায়। তৃতীয় দিনে ঐ পথেই যাচ্ছিল দুজন জমিদার। তাগাইয়ের কাছে তারা চলেছে। লোক কটাকে দেখে তারা অবাক। মর-মর বেহুঁশ অবস্থা। ওদের তারা খালাস করলে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা লালদেড়ের। হম্বিতম্বি কোথায় উবে গেছে! পরীদের ভয়ে সবাই তটস্থ, পালাতে ব্যস্ত—বিশেষ করে জমিদার দুজন। ওদের ধারণা, মেয়েগুলো মানুষ নয়—পরী!

সৌকসাই নদীর অদূরে গ্রীষ্মকালীন পশুচারণ-ভূমির দিকে মিন-আরখার গাঁয়ের মেয়েরা এগিয়ে চলেছে। ছিনিয়ে-নেওয়া ঘোড়ার পিঠে তারা যাচ্ছে। মাল-বওয়া ঘোড়া দুটো সমেত নিজেদের চারটে ঘোড়াও নিয়ে চলেছে লাগাম ধরে। মেয়েদের প্রত্যেকের পিঠে একটা করে শিকারের বন্দুক, হাতে একটা রাইফেল।

বিবি সারাক্ষণ বকবক করে চলেছে। মুহূর্তের জন্যেও তার চুপ করে থাকার

উপায় নেই। নানা ভঙ্গিতে দস্যুদের কথাবার্তা হাবভাব নকল করছে সে। সবাই হাসছে। লালদেড়ের বুটজোড়া পরেছে আয়েশা বুড়ি। প্রফুল্ল কণ্ঠে সে বললে,—বন্দুক ঘোড়া মালপত্তর, সবই আমরা মুফতে পেয়ে গেলাম। এবার চামড়াগুলো বেচে আরো কিছু রোজগার হবে।

না।—জয়নাব বাধা দেয়ঃ সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নয়। দস্যুদের ওরা যখন খতম করে আনবে, তখন আমি নিজে যাব দারাউত-কুরঘানে। যেসব মালপত্তর আমরা নিয়েছি, চামড়া দিয়ে তার দাম চুকিয়ে আসবো।

তুমি যা ভাল বোঝ, করো। আমাদের মধ্যে তুমিই শুধু পার্টিজান।—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে আয়েশা। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আবার সে যোগ করেঃ এটা অবিশ্যি মানতেই হবে জয়নাব, আমাদের চেয়ে তোমার কাণ্ডজ্ঞান অনেক বেশী। তবু এটাও কবুল না করে পারছি নে যে, আমি হলে চামড়াগুলো বেচে দিতাম।

তৃতীয় পর্ব ২

যে দিকে তাকানো যায়, নজরে পড়ে শুধু হিংস্র ভয়াল নেড়া পর্বতশ্রেণী। গাছ-পালাহীন ভয়ঙ্কর সেসব গিরিতরঙ্গের ঢালে সর্বত্র শুধু ছাতাশেওলায় ঢাকা ছোট-বড় পাথরের চাংড়া, ঢিবি আর টিলা। শৈলশিরার ওপরেই শুধু এখানে ওখানে যা একটু ছিটেফোঁটা পার্বত্য ঘাসজমি দেখা যায়।

কেউ ধারণাও করতে পারবে না যে, এই রকম নিরানন্দ করাল গিরিশ্রেণীর পেছনে ফুলে ফলে ভরা জাঁকালো এক সবুজ বনভূমি থাকতে পারে, আর সেখানে গ্রীষ্মকালীন পশুচারণভূমিতে এক উষ্ণ প্রস্রবণের পাশে নতুন করে ঘাঁটি গাড়তে পারে পার্বত্য গ্রাম মিন-আরখার।

পর্বতশ্রেণীর ভেতর দিয়ে নিঃসঙ্গ এক মুসাফির চলেছে। না, চলেছে বললে ভুল হবে, চলার চেষ্টা করছে। নিঃশব্দে ককাতে ককাতে একসময় সে পর্বতের মাথায় উঠে গেল। সে-ও এটা ধারণা করতে পারে নি। নীচের দিকে তাকাতেই তাই আঁৎকে উঠলোঃ কী এ! নীচে এক উপত্যকা, আর সেখানে লোকজন, তাঁবু ও গৃহপালিত জন্তুজানোয়ার! এ যে স্বপ্নেরও অগোচর! ভয়ে বিস্ময়ে সে কাঠ হয়ে গেল।

লোকটা কিরঘিজ—মাঝারি লম্বা, যৌবন পেরিয়ে গেছে। পোশাক-পরিচ্ছদ শত-ছিন্ন, দু পায়ে ছেঁড়া পটি জড়ানো। কোটরগত চোখ আর চোপসানো গাল দেখলেই তার ক্লান্তি ও অবসাদের পরিমাণ কিছুটা আঁচ করা যায়। পথশ্রমে তার হাঁটু কাঁপছে। সে ফিরে তাকালো। পেছনে-ফেলে-আসা ফেরার পথটা বুঝি সে একবার আন্দাজ করার চেষ্টা করে। পরক্ষণে গভীর অবসাদ ও হতাশায় লুটিয়ে পড়লো এক পাথরের ওপর।

প্রকাণ্ড এক এক-চোখো কুকুর তাকে আক্রমণ না করলে, কতক্ষণ যে সে ঐভাবে আধা-বেহুশ অবস্থায় পড়ে থাকতো, বলা যায় না। কুকুরের চিৎকার বা গজরানি তার কানে ঢোকে নি। কুকুরটা হঠাৎ পায়ে কামড় বসাতেই সে তীক্ষ্ন চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো।

গিরিসঙ্কট বেয়ে সে চিৎকার ছড়িয়ে পড়ে বহু দূরে। নীচে লোকজন, কুকুরের পাল

সচকিত হয়ে ওঠে। চিৎকারের ফলে নিজের গতিবিধি ফাঁস হয়ে গেছে, মুসাফির এটা ঠিক মতো বুঝবার আগেই একপাল প্রকাণ্ড কালো কুকুর তাকে ঘিরে ফেললে—তার ফেরার পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

লোকটা সেখানে দাঁড়িয়েই কুকুরের হামলা ঠেকানোর চেষ্টা করে। তার হাতে একখণ্ড পাথর। পাথরটা সে ছুড়তে যাবে, হঠাৎ এক গম্ভীর কণ্ঠের হুকুম এল,—বসে পড়ো!

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বসে পড়লো। হুকুম শুনে কুকুরগুলোও পেছু হটে গেল—অবশ্য অনিচ্ছাসত্ত্বে। পাথর-ঢিবির পেছন থেকে আবার হুকুম এল,—হাতিয়ার সব নামিয়ে রাখ!

লোকটা তাড়াতাড়ি খাপ থেকে এক ছোরা বের করে পাথরের ওপর রাখলে। কোমর-বন্ধের লম্বা কাপড়টা সে খুলে ফেলে। সেখান থেকে ন্যাকড়ায় জড়ানো এক রিভলবার বের করে সে রাখলে ছোরাটার পাশে।

অদৃশ্য ব্যক্তিটি এক পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে। আবার তার হুকুম এল,—নীচে যাও! পালানোর চেষ্টা করেছ কি, বুলেটে পিঠ ফুটো হয়ে যাবে!

যাচ্ছি, যাচ্ছি।—বলে গোঙিয়ে উঠে লোকটা উদ্বেগে হাঁকপাঁক করতে করতে ছুটলো নীচে তাঁবুগুলোর দিকে। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ সে একবার হোঁচট খায়। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফেরাতেই থ হয়ে গেল। তার পেছনে আসছে কিনা বন্দুক হাতে এক জেনানা! গলার স্বর শুনে তাকে একজন তরুণ বলেই ওর ধারণা হয়েছিল। থতমত খেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। পরক্ষণে তীক্ষ্ন কণ্ঠের আদেশ আর রাইফেলের বুক-কাঁপানো ক্লিক-ক্লিক শব্দ কানে যেতেই সে আবার হুড়মুড় করে দৌড়লো নীচের দিকে।

সেখানে সশস্ত্র মেয়ের দল তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

এক যুবতী এগিয়ে এল। তার পিঠে রাইফেল, কোমরে রিভলবার আর হাতে চাবুক।

জেনানার এ কী সাজ রে বাবা!—লোকটার চোখে দুনিয়ার বিস্ময়। তাকে যে কয়েদ করা হয়েছে, তা সে ভুলে যায়। মুচকি হেসে মাথা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে গিয়ে সে মেয়েটার পিঠে হাত রাখলে। সঙ্গে সঙ্গে আচমকা তার মাথায় পড়লো এক চাবুকের ঘা। থরথর করে কেঁপে উঠলো সে, চোখে নামলো অন্ধকার।

তুমি কি বাসমাচি?—রূঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে মেয়েটি।

হাঁ!—মাথা নেড়ে সায় দেবার চেষ্টা করে লোকটা। হঠাৎ তার শরীরের মধ্যে কেমন করে উঠলো। পথের কষ্ট ও অবসাদ, উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা আর সবশেষে চাবুকের ঘা—এ সব কিছুর প্রতিক্রিয়া হঠাৎ তাকে যেন বেহুঁশ করে ফেললে। টলতে টলতে পড়ে গেল সে।

ঘণ্টা কয়েক পরে আবার তাকে এনে দাঁড় করানো হলো জয়নাবের সামনে। ঠাট্টা-মস্করার জায়গা যে এ নয়, তা সে ততক্ষণে হাড়ে হাড়ে বুঝে ফেলেছে।

দৃঢ়কণ্ঠে জয়নাব বললে,—বাসমাচিদের তুমি গুপ্তচর। কে কি জন্যে তোমায় পাঠিয়েছে, সব খুলে বলো। নয়তো বুঝতেই পারছো...সব সত্যি বলবে।

জয়নাবের কণ্ঠস্বরে যে এতটুকু বাগাড়ম্বর নেই, লোকটার তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাড়াতাড়ি সে জবাব দেয়,—না না, আমি গুপ্তচর নই। ডাকাতও নই।

ওসব তাহলে কি?—পাশে-রাখা রিভলবার ও ছোরাটার দিকে মাথা হেলিয়ে জয়নাব জিজ্ঞেস করে।

—হাঁ, আমি বাসমাচি ছিলাম, কিন্তু এখন আর নেই। তাগাইয়ের দল থেকে পালিয়ে

এসেছি। কি কুক্ষণেই যে মনিবকে কথা দিয়েছিলাম, এখন সে সময়টাকে আমি অভিশাপ দেই।'

—সব কিছু খুলে বলো।

আমার নাম মামাই,—লোকটা শুরু করলো : দুরুমবের ছেলে, কিপচাক গোষ্ঠীর লোক। আমি গরিব লোক, যাকে বলে সাঁচি, তাই। মনিব দৌলতবের দয়ায় সুখেই ছিলাম। তাঁর দেড় শো ভেড়ার দেখাশোনা করার, পাহারা দেবার, দানাপানি খাওয়ানোর, লোম ছাঁটার, এক কথায় সব রকম তদ্বির-তদারক করার ভার ছিল আমার ওপর। আর সে জন্যে তাদের আদ্দেক দুধ আমি পেতাম।

আর তার ফলে তুমি বেশ বড়লোক হয়ে পড়লে, তাই না?—জয়নাব বললে।

না না, শুনুন তারপর।—লোকটা বাধা দেয় : গত বছরটা ছিল দুর্বছর। দশটা ভেড়া মরে গেল, বারোটা নেকড়েয় খেলে আর তিনটে গেল হারিয়ে। তারপর বসন্ত কালে হঠাৎ এমন তুষারপাত আর ঠাণ্ডা শুরু হলো যে, বহু বাচ্চা গেল মরে। নিঃসন্তান রুগ্ন বৌকে নিয়ে আমি তাঁবুতে থাকতাম। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচানোর জন্যে বাচ্চাগুলোকে তাঁবুতে নিয়ে এলাম। কিন্তু তারা বাঁচলো না। ধাড়ী বা বাচ্চা, যে ভেড়াই মরুক, সবই আমাকে জ্যান্ত ফেরত দিতে হবে। তাঁবুতে আরো ভেড়ার থাকার জায়গা করার জন্যে নিজের বিমার বৌকেও তাঁবুর বাইরে আনতে হলো। আমাদের থাকা-খাওয়া-শোওয়া সব খোলা আকাশের নীচে। রোগা ভেড়াগুলোর গায়ে পশমের কম্বল চাপা দিলাম। রাতের পর রাত শরীর গরম রাখার জন্যে তাঁবুর আগুনের পাশে বসে আমাদের দুজনের সারা রাত কাটতো। তুষারপাত যেমন সাংঘাতিক, ঠাণ্ডাও তেমনি। আমরা ঘুমোতে পারতাম না। আর তার ফলে বৌয়ের অসুখ আরো বেড়ে গেল—

বলতে বলতে লোকটা চুপ করে যায়। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে। করুণ চোখে সে তাকিয়ে আছে পর্বতের দিকে।

শেষে জয়নাব বললে,—তারপর?

লোকটা যেন সজাগ হয়ে উঠলো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—একদিন তুষার-ঝড় উঠলো। ভেড়াগুলো সব নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাদের খুঁজে পেতে আনার জন্যে আমি বেরিয়ে পড়লাম। তিন দিন কাটলো বাইরে। যখন ফিরে এলাম, দেখি বিবি আমায় চিরকালের মতো রেহাই দিয়ে পরপারে রওনা হয়ে গেছে। হেমন্তে মনিব দৌলতবে এলেন। সব ভেড়া বার বার গুনলেন তিনি। শেষে বললেন, তেতাল্লিশটে ভেড়া পাওনা তোমার কাছে। হয় কাজ করে দেনা শোধ করো, নয়তো নগদ টাকায় দাম চুকিয়ে দাও। কিন্তু অত টাকা আমি কোত্থেকে পাব? জমিদার-মহাজনদের কাছে গেলাম। তারা বললে, হাওলাত দিতে পারি, কিন্তু যে টাকা দেব, এক বছরে তার দ্বিগুণ ফেরত দিতে হবে। কিন্তু গরিব সাঁচি আমি—কি করে অত টাকা শোধ করবো?

আর তার পরেই ডাকাতের দলে ভিড়ে লুঠপাটে মন দিলে কেমন?—জয়নাব মন্তব্য করে।

তার কথা লোকটার কানে ঢুকেছে কিনা বোঝা গেল না। সে বলে চলে,—মনিবের কাছেই তখন আমি কাজ করে চলেছি। মনিব একদিন বললেন, শোন মামাই, তোমার যাতে বরাত ফেরে, তা আমি ভেবেছি। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে দীনদাররা সব আজ রুখে দাঁড়াচ্ছে। তুমিও মহম্মদের ফৌজে ভিড়ে পড়ো, ইসলামের জন্যে লড়াই করো। লড়াইতে লুঠের মাল জুটবে প্রচুর তার থেকে আমার দেনা শোধ কোর। শুনে আমি গেলাম দোস্তদের কাছে। লড়াইয়ের খবর কেউ কিছু বলতে পারে না। শেষে একজন বললে, হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু ও লড়াইয়ে আমাদের কি ফয়দা হবে? ওতো জমিদার-

বড়লোকদের লড়াই। তারাই যুদ্ধ করছে। তারা যদি জেতে, আমাদের বরাতে দারুণ তকলিফ আছে। আর বিপক্ষেরা জিতলে আমাদের বরাত ফিরে যাবে। আমরা সাঁচি—সোভিয়েতের দিকেই তো আমাদের যাওয়া উচিত। তাই বলছি, তুমি আর দেরি না করে লাল পার্টিজানদের দলে গিয়ে যোগ দাও।

মেয়ের দল নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে লোকটাকে ঘিরে। কারো মুখে কথা নেই। লোকটা বলছে,—এই সময় একজন লোক এসে বললে, যে যেখানে আছ, ঘোড়া নিয়ে চটপট কেল্লায় চলে যাও। তাগাইয়ের বাসমাচি-দল কেল্লা দখল করেছে। তারা লুঠের মাল বখরা করে নিচ্ছে। বলশয় গ্রামও তারা দখল করেছে। গোটা পামীরই তারা শীগ্‌গীর দখল করবে। দেরিতে যে যাবে, তার বরাতে দুঃখ আছে।

আর তাই তুমিও ছুটলে, কেমন?—বিবি ফোড়ন কাটলে।

তার কথার জবাব না দিয়ে লোকটা বলতে থাকে,—সেই রাত্রেই দৌলতবে আমাকে তাগাইয়ের কাছে পাঠালে। আমায় দিলে একটা ঘোড়া আর একটা ম্যাচলক গাদা বন্দুক। আমি গেলাম। বহুৎ লোক জমায়েত হয়েছে। পার্টিজানরা কেল্লার ভেতর থেকে গুলি ছুড়ছে। নিজের গাঁয়ের কাউকে দেখতে পেলাম না। এর পর কজিৎজাকি বাসমাচিদের বিভিন্ন কোম্পানিতে ভাগ করলে, ফি কোম্পানিতে কুড়ি থেকে পঁচিশজন লোক। তখন দেখলাম, আমাদের গাঁ থেকে এসেছে মাত্তর পাঁচজন—দৌলতবের দুই ছেলে, তাদের এক দোস্ত, একজন মোল্লা আর আমি নিজে। ওদের কোম্পানিতে তারা আমায় নিলে না। আমাদের যাবার আগেও বাসমাচিরা কেল্লা দখলের চেষ্টা করেছিল। আগে লিনেজা ছিলেন কেল্লার ফৌজদার। তাগাইকে তিনি কেল্লাটা বিক্রি করে দেন। দাম ধরা হয়েছিল দশ হাজার সোনার রুবল। পার্টিজানদেরও তিনি বিলকুল বেচে দিয়েছিলেন, মাথা পিছু একশো সোনার রুবল।

বেচে দিয়েছিলেন!—জয়নাবের কণ্ঠে বিস্ময়।

—হ্যাঁ। কিন্তু তার হিসেবে একটু গরমিল হয়েছিল। হঠাৎ কজুবে এসে সব ভেস্তে দিলেন। ওঃ, কী ধূর্তই না এই কজুবে! বুড়ো শিকারীর ছদ্মবেশে তিনি নাকি এসেছিলেন। তাই লিনেজা গোড়ায় তাঁকে চিনতে পারেন নি। তার পরেই দুজন দোস্তকে নিয়ে শিকারী জুরা এসে পেঁছিলো।

কে? কি বলছো? জুরা!—তীক্ষ্ন চিৎকার বেরিয়ে এল জয়নাবের কণ্ঠ থেকে। পরক্ষণে সে সামলে নেয় নিজেকে। নিজের এই বেসামাল অবস্থার জন্যে নিজের উপরই রাগ হয় তার। সারা মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

লোকটার কিন্তু ওসব দিকে নজর নেই। সে বললে,—হ্যাঁ, জুরা। কেন, জুরার কথা শোনেন নি আপনারা? বাসমাচিরা তো তার ভয়ে থরহরি কাঁপে। সেই যে যুবা শিকারী, সেনাপতি আজিম আর তার দলের আদ্দেক লোককেই যে একা গুলি করে সাবাড় করে দিয়েছিল।

জয়নাবের অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল। শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে দ্রুত তালে। তীব্র আনন্দ-উত্তেজনার আবেগে সে আর সামলাতে পারে না। লাজ-লজ্জার বালাই কোথায় উবে যায়! দুই হাত আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর চেপে ধরে আচ্ছন্নের মতো সে বললে, —আঃ! কী শান্তি জুরা বেঁচে আছে। আঃ! বলে যাও! বলে যাও! থেম না! কিছু বাদ দিও না!

—হ্যাঁ, শুনুন চুপ করে। জুরা এসেই প্রথমে খাঁদাকে খুন করে। তাগাইকেও খুন করতে—

—অ্যাঁ, বলো কি? খাঁদা খতম হয়েছে জুরার হাতে। তারপর, তারপর? তাগাইয়ের কি হলো?

—তাগাই পালিয়ে যায়। তার এক দোস্ত কেল্লা থেকে তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাগাই এসে যোগ দেয় কজিৎজ্‌কির সঙ্গে।

—তাগাইয়ের সে দোস্তের নাম কি?

—তা জানি নে। তার নাম ওরা ফাঁস করে নি। যাই হোক, সেই রাত্রেই ভোর হবার ঠিক আগে বাসমাচিরা কেল্লা দখলের জন্যে আক্রমণ শুরু করলে। আর অমনি, বলা নেই কওয়া নেই, কেল্লা থেকে হঠাৎ একটা মেশিনগানের গুলি-বৃষ্টি শুরু হলো—ট্রা-টা-টা......তার পরেই আর একটা—ট্রা-টা-টা......তারপর বোমার পর বোমা—বুম্‌ বুম্‌......

শাবাশ, শাবাশ! তারপর?—বিবি লাফিয়ে উঠলো।

লিনেজা বলেছিল,—লোকটা বলে চলে ঃ মেশিনগানগুলো সব বিকল করে দেওয়া হয়েছে, বোমাগুলোয় বারুদ নেই। কিন্তু সব বাজে। বহু বাসমাচি মারা পড়লো। বাকিরা নিদারুণ ভয়ে পেছন ফিরে মারলে দৌড়। আর ঝগড়া শুরু হলো মাতব্বরদের মধ্যে। কেল্লায় লোক ছিল মাত্র কয়েকজন, তবু বাসমাচিরা তা দখল করতে পারলে না। তাগাই কেল্লার পাইপের জল বিষাক্ত করে দিলে। কিন্তু পার্টিজানরা তা ধরে ফেললে। কেল্লায় বিষম ধূর্ত এক চীনা আছে। তাগাই বললে, জলের অভাবে এবার ওরা নির্ঘাত মরবে।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত থামে দম নেবার জন্যে।

কিন্তু জয়নাবের বুঝি তর সইছে না। সে তাড়া দিলে,—তারপর?

লোকটি আবার শুরু করে,—আমরা তিন দিন অপেক্ষা করলাম। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার! ওরা বেঁচে রইল। অবশ্য বাতাস বইলে আমরা মড়ার গন্ধ পেতাম। তার মানে, কেল্লার ঘোড়াগুলো জল না পেয়ে মরতে শুরু করেছে। বাসমাচি-মাতব্বররা ঠিক করলো, সমস্ত ঘোড়া ও পার্টিজানরা না মরা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে। কজিৎজ্‌কি আমাদের যুদ্ধের কায়দাকানুন ও কুচকাওয়াজ শেখাতে লাগলো। এমনি করে এক দিন গেল, দু দিন গেল, তিন দিনও গেল, কিন্তু কেল্লার ওরা বেঁচে রইল। পাঁচ দিনও গেল। কিন্তু একই অবস্থা। কি ব্যাপার, কিছুই আমাদের মাথায় ঢোকে না।

কিন্তু জুরার খবর কি?—মৃদু কণ্ঠে জয়নাব জিজ্ঞেস করে।

—অ্যাঁ, জুরা? তাগাইকে তার সেই দোস্ত কেল্লা থেকে খবর পাঠিয়েছিল যে, জুরা সাহায্য আনার জন্যে বাইরে গেছে। শুনে সবার মনে ভয় ঢুকলো, কিজিলওয়ালারা এসে না পড়ে। তাহলেই দফা রফা! তার ওপর কেল্লাও দখল হলো না। এমন সময় একদিন বাসমাচিদের মধ্যে এক কিরঘিজ এসে হাজির। লোকটা বেঁটেখাটো, লোমশ। হাত দুটো খুব লম্বা। ভারী ফুর্তিবাজ সে, আর মানাসের ভক্ত। মানাসকে নিয়েই ছিল তার গান। সে ছিল গণৎকার। সব রকমের ভবিষ্যদ্বাণী করতো, লক্ষণ দেখে ভবিষ্যৎ বলতো। লক্ষণগুলো ছিল আমাদের পক্ষে খুব খারাপ, অমঙ্গলের। গরিবদের সে খুঁজে খুঁজে বের করতো, তাদের সঙ্গে কথা বলতো। দিন ভোর সে বাসমাচি-ছাউনির মধ্যে ঘুর-ঘুর করতো, ফিসফিস করতো নতুন রংরুটদের সঙ্গে, আর কত রকমের ভবিষ্যৎ-বাণীই না করতো! সবাই ওকে সমীহ করতে শুরু করলো। আমি সাঁচি, সে টের পেল। আমার সব পরিচয় আর যা যা ঘটেছে নসীবে, সব শুনলো সে। শেষে বললে, আরো যে সব সাঁচি আছে তাদের সবাইকে ডেকে এক জায়গায় জড়ো করো। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা দরকার।

দম নেবার জন্যেই আবার বোধহয় থামে লোকটা। সবাই নিশ্চুপ, নিষ্পলক চোখে

তাকিয়ে আছে ওর দিকে। দূরে থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে পাখির কাকলি, ঘোড়ার ডাক আর কুকুরের চিৎকার।

লোকটা শুরু করলে,—সেদিন সন্ধ্যাতেই আমরা বেশ কয়েকজন এক গুহায় গিয়ে জড়ো হলাম। এবার লম্বা-হেতো বললে, দোস্ত সব, চারদিকে বড্ড খারাপ সব লক্ষণ দেখছি। বহুৎ তারা খসছে আসমান থেকে। অনেক লোক মরবে। নিজেদের জান আমাদের নিজেদেরই বাঁচাতে হবে, তাই এখুনি আমাদের সরে পড়া দরকার। ফিরে গিয়ে আমরা জমিদারদের ছাগল-ভেড়া-গরুবাছুর সব নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেব। দুনিয়ায় একজন হবে আমির, আর বেশির ভাগ হবে ফকির, এটা চলতে পারে না। আমি বিশেষভাবে খবর পেয়েছি যে, বিরাট এক লালফৌজ এদিকে আসছে। সে ফৌজের সেনাপতি আর কেউ নয়, শয়তান ইভাস্কো নিজে। তারা এলেই আমরা খতম! লম্বা-হেতোর কথা শুনে অনেকেই ঘাবড়ে গেল। সেদিন প্রথম সন্ধ্যায় এসেছিল এগার জন, কিন্তু দ্বিতীয় সন্ধ্যায় এল চল্লিশ জন, তৃতীয় দিনের বৈঠকে এল চুরাশি জন আর চতুর্থ বৈঠকে এল দেড়শো জন।

কিন্তু কেল্লার পার্টিজানদের কি হলো?—মেয়েদের একজন জিজ্ঞেস করলে।

লোকটি বললে,—সবই বলছি, শুনুন তারপর। লম্বা-হেতো বলতো, আমরা গরিব, সোজা সরল মানুষ। আমাদের ঠকানো মোটেই কঠিন নয়। চালু আইন আমাদের বিরুদ্ধে। আমরা কিভাবে চলবো বা বাঁচবো, তার ভার আমাদেরই নিজেদের হাতে নিতে হবে। আমাদের আইনকানুন আমরাই তৈরি করবো, ধনদৌলতও সব আমরাই নেব। আমরাই তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওসব তৈরি করি। আমরা সব কি—বোবা জানোয়ার, না কেনা গোলাম? আমরাও বড় হতে চাই মানুষের মতো বাঁচতে চাই, দুনিয়ার সুখশান্তি ও খাতির-আদরও পেতে চাই।

ধীর কণ্ঠে জয়নাব বললে,—তোমাদের দোস্তটি কিন্তু খাঁটি কথাই বলতো।

লোকটি মাথা নাড়তে নাড়তে বলে চলে,—হ্যাঁ। এই রকম যখন চলছে, তখন হঠাৎ এক দিন সবুজপাগড়িমাথায় এক মোল্লা বৈঠকে এসে হাজির। একখণ্ড কাপড় দিয়ে তাঁর মুখ বাঁধা। তাঁর দাঁতে নাকি ব্যথা। পরে, বুঝলাম, আমরা যে গোপনে বৈঠক করছি, এটা কেউ মাতব্বরদের কাছে ফাঁস করে দিয়েছে। মোল্লাটি খুব বিদ্বান। কোরান থেকে তিনি লম্বা-হেতোর কথার জবাব দিলেন। বললেন, দেশের ভবিষ্যৎ শাসন-কাঠামো নিয়ে সলাপরামর্শ করা কাণ্ডজ্ঞানহীনের নিরর্থক ক্ষ্যাপামি ছাড়া আর কিছু নয়। এ সম্পর্কে পয়গম্বর বলেছেন, শয়তানদের মুখ থেকেই শুধু এসব ক্ষ্যাপামি বেরোয়। এই ক্ষ্যাপামির খপ্পর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আল্লার শরণ নিতে হবে। তিনি আরও বললেন, গোলামির দুঃখকষ্টের জন্যে তোমরা নালিশ জানাচ্ছ? কিন্তু পয়গম্বর নিজেই বলেছেন, যা করার জন্যে যার সৃষ্টি হয়েছে, সে তা-ই করবে। মান-মর্যাদায় পয়গম্বররা পর্যন্ত আল্লার চোখে সমান নন। আর তোমরা কিনা সব মানুষকে সমান করতে চাইছ!

মেয়েদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। অসহিষ্ণু কণ্ঠে একজন বললে,—এসব কচ্‌কচি একটু সংক্ষেপ করলে হয় না?

না।—জয়নাব বাধা দেয়ঃ যা যা ঘটেছে, পরপর তুমি ঠিকমতো বলে যাও।

ঠিক বলেছেন,—কৃতজ্ঞ কণ্ঠে লোকটি বললেঃ নয়তো সব গুলিয়ে ফেলবো। অবশ্যি মোল্লার সব কথা যে আমার মনে আছে, তাও নয়। তিনি বললেন, যারা দীনদার আর যারা যুদ্ধে মরবে, তারা বেহেশ্‌তে যাবে, বেহেশ্‌তের অপার্থিব আনন্দ-সুখ তাদের জন্যে বরাদ্দ রয়েছে। আর যারা পাপী, আল্লাকে ভুলে গেছে, তারা গিয়ে পড়বে দোজ-

খের অতল খাদে ফুটন্ত জলের মধ্যে। তাদের সে দুঃখ-যন্ত্রণা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। পয়গম্বরের ঝাণ্ডার নীচে যারা জমায়েত হবে, অসীম করুণাময় আল্লার নামে যারা দীনের শরণ নেবে, তাদেরই ভাগ্যে জুটবে বেহেশ্‌তের সেই অফুরন্ত সুখ-শান্তি। এ সবই কোরানে লেখা আছে। দলের কয়েকজন অমনি চেঁচিয়ে উঠলো, হক কথা! সাচ্চা বাত!

জয়নাব বললে,—সব বাজে কথা।

কিন্তু ব্যাপারটা কি বুঝলেন?—লোকটা একটু থেমে বলতে থাকে ঃ লম্বা-হেতো ছিল খুব সাহসী মরদ। মোল্লার কথা শুনে সে তখন রাগে টগবগ করে ফুটছে। লাফিয়ে উঠে সে বললে, এ দুনিয়ায় আমরা জিন্দিগি ভোর যে অশেষ দুঃখ, কষ্ট আর যন্ত্রণা ভোগ করছি, সে সম্বন্ধে কোন কথা নেই, শুধুই বেহেশ্‌তের কথা! মরার পর বেহেশ্‌তে গিয়ে আমরা কি আরাম-সুখ পেলাম না পেলাম, তা শুনে কি লাভ? এই দুনিয়াতেই আমরা আনন্দ-শান্তি পেতে চাই, তারই ব্যবস্থা করতে হবে। অফুরন্ত কৌমিশ খেয়ে খেয়ে আর শুয়ে শুয়ে ভেড়া হজম করে জমিদারবা মোটা হয়েছে। বাড়িতে বসে তারা বেহেশ্‌তের আরাম-বিলাসে দিন কাটায় আর আমাদের মতো গরিবদের পাঠায় লড়াইতে মরতে, অথচ এ লড়াই কিন্তু ওরা ঐ জমিদার-বড়লোকরাই সৃষ্টি করেছে। আমরা যখন কেল্লা আক্রমণ করতে ছুটি, তখন মাতব্বররা কেন সবার পেছনে থাকে, বলতে পার? জবাব দাও!

একটানা এতখানি বলে লোকটা বোধহয় হাঁপিয়ে গেছলো। সন্ধ্যার ম্লান ছায়া নামছে উপত্যকার বুকে। অস্তাচলে ফিকে আবীরের রং আরো ফিকে হয়ে আসছে।

বিষণ্ণ চোখে লোকটা তাকিয়ে থাকে সেদিকে। তারপর ধীরে ধীরে আবার শুরু করে একসময়—লম্বা-হেতোর কথা শুনে মোল্লা তো ক্ষেপে আগুন! রিভলবার বের করে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ধরো, ধরো, ও বলশেভিক! ওকে আমি চিনতে পেরেছি। বলশয় গ্রামে শবফের ফৌজ খতম হয়েছিল ওরই কারসাজিতে। ধরো ওকে! পাঁচজন লোক ছুটলো ওকে ধরার জন্যে। কিন্তু অন্যেরা নড়লো না। ভিড়ের মধ্যে লোক পাঁচটা নানাভাবে বাধা পেতে লাগলো। লম্বা-হেতো আমার পেছনে লুকিয়েছিল। সেখান থেকে সে চেঁচিয়ে উঠলো, লালফৌজ বলশয় গ্রাম দখল করেছে। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে শয়তান ইভাস্কো আসছে আমাদের ঘিরে ফেলতে। দু-চার দিনেব মধ্যে সবাই খতম হবে তার হাতে। ব্যাপারটা ঘোরালো দেখে মোল্লা ছুটলেন সেনাপতিদের কাছে। ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘোড়সওয়ার দলবল নিয়ে তাগাই ছুটে এল। কিন্তু লম্বা-হেতো ততক্ষণে বেপাত্তা। তার পর থেকে এক আজব কাণ্ড শুরু হলো—এমন দিন যায় না, যেদিন দলের রংরুটরা দু-চার ডজন করে না পালায়। কর্জিংজ্‌কি হুকুম দিলে, রাতে কেউ ছাউনির বাইরে যেতে পারবে না। কড়া পাহারা বসলো। আশপাশের চাষীরা ইতিমধ্যে বহুদূর পর্বত-মুল্লুকে সরে পড়েছে! তাই খাবারদাবারও ক্রমে খারাপ হতে লাগলো।

এই পর্যন্ত বলে লোকটা জয়নাবের দিকে ফিরে বললে,—আজ কি এই পর্যন্ত থাকবে? এখনো অনেক কথা আছে। কাল শুনবেন?

না, না, তুমি বলে যাও। থেম না।—জয়নাব বললে।

বেশ।—লোকটা বললে ঃ তাগাই এবার আমায় ডেকে পাঠালে বললে, আমি জানি তুমি লম্বা-হেতোর দোস্ত, রাতে তার সংগে দেখা করো। আমি বিলকুল সব অস্বীকার করলাম, বললাম, দেখা হলেই লম্বা-হেতোকে আমি পাকড়াও করবো। কিন্তু মনে মনে তখন ঠিক করেছি, এবার সটকাবো। লম্বা-হেতো কিন্তু আদপেই পালায় নি। দিনের বেলায় সে

লুকিয়ে থাকতো আর রাতে বাসমাচিদের মধ্যে ঘুরঘুর করতো। শেষে একদিন সে আমায় বললে, ওঃ! লড়াইয়ের সাধ আমার মিটে গেছে! বাসমাচি-খতমের পর আবার আমি ফিরে যাব নিজের গাঁয়ে মিন-আরখারে। কিন্তু দোস্ত, তুমি আর দেরি কোর না, এবার কেটে পড়ো।

মেয়েরা ইতিমধ্যে চমকে গেছে। সচকিত কণ্ঠে জয়নাব জিজ্ঞেস করলে,—কি বললে? মিন-আরখার?

—হ্যাঁ, মিন-আরখার। কেন?

তাহলে লম্বা-হেতোর বাড়ি মিন-আরখার গাঁয়ে!—জয়নাব বললে ঃ চেহারার যে বর্ণনা শুনলাম, তাতে ও কুচাক না হয়ে যায় না। আঃ, কুচাকও তাহলে বেঁচে আছে!

জয়নাব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলে,—কিন্তু জুরার তারপর কি হলো?

—তার আর কোন খবর আমি জানি নে। এর পর বাসমাচিরা দুবার কেল্লা আক্রমণ করেছিল। দুবারই পার্টিজানরা তাদের হটিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বার হামলা করতে যাবার আগে আমাদের সবাইকে জড়ো করে তাগাই বললে, আর ভাবনা নেই। এবার আমরা বিনা লড়াইয়ে কেল্লা ফতে করবো। কেল্লায় আমাদের যে দোস্ত আছে, সে ওখানকার জলের ট্যাঙ্কেও বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। সুতরাং শীতে যেমন মাছি মরে, ওরাও তেমনি এবার জলের অভাবে মারা পড়বে। কিন্তু এর পরও পার্টিজানরা আবার আমাদের মেরে খেদিয়ে দিলে। আমরা তো পালিয়ে বাঁচি। মাতব্বরদের মধ্যে তখন আবার শুরু হলো ঝগড়া।

জানেন,—লোকটা জয়নাবকে উদ্দেশ করে শান্তকণ্ঠে বললে ঃ এইসব বাসমাচি-সর্দাররা হলো সব ভীরু, মিথ্যেবাদী, লম্বা-চওড়া কথাই শুধু ওরা বলতে পারে। পর দিন সকালে তাগাই আমাদের সবাইকে ডেকে বললে, ব্যাপারটা আমরা জানতে পেরেছি। জল যে বিষাক্ত হয়েছে, পার্টিজানরা এটা ধরে ফেলেছে। ও জল তারা খায় নি। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তা না হয় হলো, কিন্তু জল না খেয়ে পার্টিজানরা বাঁচছে কি করে? তাগাই বললে, হেঃ হেঃ তাও জেনেছি। ওদের মধ্যে একজন চীনা আছে, পাথর থেকে সে জল বের করছে। কিন্তু তা এত অল্প যে, পার্টিজানরা মরবেই। ঐ চীনাটাকে যে খুন করতে পারবে, তাকে একশো সোনার রুবল দেওয়া হবে। ব্যাপারটা শুনে বহু লোক ঘাবড়ে গেল, বললে, সেরেছে! চীনাটা নিশ্চিত খুব বড় জাদুকর। ডাইনী মায়ায় সে আমাদেরও তুক করতে পারে। পাথর থেকে জল তৈরি করা, এ বাবা ছেলেখেলা ঠাট্টা-মস্করা নয়!

আগুনের কুণ্ড ঘিরে মেয়েরা কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরও চোখেমুখে বিস্ময়। আগুনের আভায় তাদের হাতের রাইফেলগুলো ঝকমক করছে।

আগুনের কুণ্ডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লোকটা বললে,—সত্যি কথা বলতে কি, আজো ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। সে যাই হোক, এবার কজিৎজ্কি এগিয়ে এল। সে বললে, পাথর থেকে জল পাওয়া খুবই সোজা। পুরনো আমলে কাশ-গড়িয়ার লোকেরা এইভাবে জল জোগাড় করতো। রাত্রিবেলায় পাথর ঘামে, সেই জল চুইয়ে নীচে পড়ে। ব্যাপারটা আমি হাতেকলমে দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপর তার হুকুমে এক গর্ত খুঁড়ে কাদা দিয়ে তা লেপে দেওয়া হলো। একখানা পাথর রাখা হলো গর্তের ওপর, আর তার ওপর একটা ছাউনি দেওয়া হলো। উদ্বেগে সারা রাত অনেকেই ঘুমোতে পারে নি। সকাল হতেই সবাই গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম পাথরটার ওপর। কিন্তু কোথায় জল! পাথর শুকনো খটখট করছে। বাসমাচিদের মধ্যে এবার নিদারুণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। বহু লোক পালিয়ে গেল। ইস্, সেই মোল্লাটা কি ক্ষ্যাপাই

না ক্ষেপেছিলেন কজিৎজ্কির ওপর! আমিও তখন পালানোর জন্যে আইঢাই করছি। কিন্তু ফাঁক আর পাই নে। আমার ওপর ওরা কড়া নজর রেখেছে।

লোকটা থেমে জয়নাবকে বললে,—একটু জল দিতে পারেন? গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মাথাটাও ঘুরছে।

আলবৎ!—জয়নাব বললে।

ঢকঢক করে বড় একপাত্র জল খেয়ে লোকটা যেন কতকটা সুস্থ হয়, তারপর আবার শুরু করে,—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, পালানোর ফাঁক আর পাই নে। তারপর সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে বাসমাচিদের সঙ্গে আমিও চললাম আবার কেল্লা চড়াও করতে। মতলব ঠিক ছিল। হঠাৎ মরার ভান করে মাটিতে পড়ে গেলাম। বেশ অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত ঐভাবে পড়ে রইলাম সেখানে, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি সরে পড়লাম পর্বত-এলাকায়। জমিদারদের সামনে পড়ার ভয় ছিল সবসময়। তাই রাইফেল ফেলে দিলাম, রিভলবারটা লুকিয়ে ফেললাম অবশ্যি কজিৎজ্কি আমাদের গোলাগুলি ছুড়তে শিখিয়েছিল। ওটা আমি ভালই জানি। কিন্তু বড় কোন দলের সামনে পড়লে একা কি করবো? তাই ওটা করেছিলাম। দিনের পর দিন নির্জন ভয়ংকর এই পর্বতশ্রেণীর গোলকধাঁধার মধ্যে আমি ঢুকে গেছি। কত দিন যে হেঁটেছি, বলতে পারবো না। তারপর হঠাৎ এই তাঁবুগুলো নজরে পড়লো। উঃ, কী ভয়ই না পেয়েছিলাম! মনে হয়েছিল, এবার গেছি, আর রেহাই নেই!...এই হলো সব ঘটনা। আপনাদের সবই খুলে বললাম।

লোকটা চুপ করলে।

নিস্তব্ধ তাঁবু। বাইরে কালো অন্ধকার। শেষে একসময় গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়নাব বললে মেয়েদের,—সবই তো তোমরা শুনলে! এখন কি করা?

জুরার মা আয়েশা বুড়ি রাইফেলে ভর দিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে। এতকাল পরে হঠাৎ একমাত্র সন্তান তার বেঁচে আছে, খবর পেয়ে মাতৃহৃদয় আকুল হয়ে মাথা কুটছে আল্লার দরবারে। দুই গন্ড বেয়ে নামছে বাঁধভাঙা অবিরল অশ্রুধারা। মাঝে মাঝে আঙুলের ডগা দিয়ে নীরবে সে মুছে ফেলছে চোখের জল।

লোকটা মিথ্যে বলছে কিনা যাচাই করার জন্যে জয়নাব হঠাৎ দুম্ করে জিজ্ঞেস করলে,—কি নাম তোমার?

—মামাই। দুরুমবের ছেলে। কিপচাক গোষ্ঠীর লোক।

বেশ।—জয়নাব বললে ঃ আমাদের কাছে তুমি খোশখবর নিয়ে এসেছ, মামাই। বলো, কি চাও।

মামাই কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলে, তারপব মিনতিভরা বিষণ্ণ করুণ কণ্ঠে বললে,—ছোট্ট একটা আরজি পেশ করছি আপনাদের কাছে, জানি নে মঞ্জুর হবে কিনা। আমার ঘব-বাড়ি নেই, পরিবারও নেই। মনিবের কাছেও ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তাহলে সে আমায় খুন করবে। এখন কোথায় যাব? তাই আমায় যদি আপনারা এখানে একটু ঠাঁই দিতেন তো বেঁচে যেতাম। হলফ করছি, জান দিয়ে আপনাদের সেবা করবো, সমস্ত ফাইফরমাশ খাটবো।

মেয়েদের দিকে ফিরে জয়নাব জিজ্ঞেস করে,—এ সম্বন্ধে তোমাদের কি মত?

ও থাকুক।—অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আয়েশা বললে।

বেশ, তাই হোক। আমার মা যখন বলছে, থাক তুমি।—বলতে বলতে জয়নাব রাইফেলটা মামাইয়ের দিকে এগিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলে ঃ আচ্ছা মামাই, তুমি তো

বললে, গোলাগুলি ছুড়তে শিখেছ। বলতে পারো, রাইফেলে এই ঢিপিটা কি জন্যে?

এইটে?—অবাক হয়ে মামাই বললে : কেন, এখান দিয়েই তো কার্তুজ ভেতরে যায়!

তোফা! ঠিক বলেছ!—খুশিতে উচ্ছল জয়নাব : শিকারের বন্দুকের মতো রাইফেলেও এত দিন আমরা ফি বার একটা করে কার্তুজ ভরেছি। আচ্ছা, এইটা—নলের ওপর ছোট এই উঁচু জায়গাটা কি জন্যে?

—কেন, দুশো গজ দূরে যখন গুলি ছুড়বেন, তখন এটাকে এইভাবে রাখবেন! কিন্তু পাল্লা ছশো গজ করতে হলে রাখতে হবে এই ভাবে আর নশো গজের বেলায় এই রকম।

ওহো, তুমি দেখছি সবই জানো! এবার রিভলবার কি করে ছুড়তে হয় আমাদের শিখিয়ে দেবে। তুমি ট্রেনিং দেবে আমাদের।—খুশিভরা কণ্ঠে জয়নাব বললে। কিন্তু পরক্ষণে তার কণ্ঠ কঠোর হযে উঠলো : তবে একটা কথা মনে রেখ, মামাই। এক চোখ আমাদের দিকে, আব এক চোখ যদি পর্বতের দিকে রাখ আর পালানোর ফন্দি আঁটো, তাহলে আমাদের কুকুর কিন্তু তোমায় টেনে বের করবে। দয়ামায়ার কোন বালাই তখন আর থাকবে না।

মাথা নাড়তে নাড়তে মামাই বললে,—ব্যাপারটা ভুল করছেন। নিরাশ্রয় একটা লোক, নিজের জানটুকু ছাড়া যে সব হারিয়েছে, সে আজ আপনাদের কাছে এই আশ্রয় পেয়ে তো বেঁচে গেল। এ ডেরা ছেড়ে সে কোথায় যাবে? কেনই বা যাবে?

তৃতীয় পর্ব ৩

দিনরাত মেয়েরা গাঁ পাহারা দিচ্ছে। সেদিন তাদের হাতে একজন দস্যু ধরা পড়লো। রাত্রিবেলায় ধরা পড়লো আরো দুজন।

আয়েশার সংগে জয়নাব পরামর্শে বসে। আলোচ্য বিষয় হলো—এখন কি করণীয়? জয়নাব তাকে খাতির করে বলে আয়েশা খুব খুশী। আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো, মামাইকে পুরোপুরি দলে নিতে হবে।

কিন্তু,—জয়নাব জিজ্ঞেস করে : ডাকাতদের আনাগোনা যেভাবে বাড়ছে, তাতে পুরুষের সংখ্যা বেশী দাঁড়ালে কি করবো?

অবিচল কণ্ঠে আয়েশা বললে,—তোমায় যাতে তারা ভয় করে চলে, তেমনিভাবে কড়া শাসনে রাখবে। তোমার উপর ভয় বা সমীহ না থাকলে, তারা যা খুশি করবে।

সকাল বেলায় জয়নাব মামাইকে তাঁবুতে ডেকে পাঠায়। সন্ধ্যা নাগাদ দেখা গেল, তারা উৎসব করছে—মামাইয়ের সংগে দলের অল্পবয়সী এক বিধবার বিয়ের উৎসব।

দুদিন পরের কথা। গিরিখাতের পাশের পর্বতের মাথায় পাথর-ঢিবির পেছনে লুকিয়ে থেকে বিবি সব দিকে নজর রাখছে। হঠাৎ সে দেখলে, সোকসাই থেকে উত্তর দিকে যে পথ গেছে, সেই পথ ধরে চলেছে এগারজন বাসমাচি। সবার কাছে রাইফেল, প্রত্যেকের মাথায় ফারের টুপি। এক দিন পরে আবার সে তাদের দেখতে পেল। তারা দ্রুত ফিরে চলেছে, কিন্তু দলে এবার মাত্র পাঁচজন।

খবরটা শুনে মামাই বললে,—এরা সব তাগাইয়ের বাসমাচি-দলের লোক। দলের সঙ্গে সীমান্তের ওপার থেকে এসেছে। আমাদের দিক থেকে বিন্দুমাত্র সাড়া দেওয়া ঠিক হবে না। একটাও যদি কোন রকমে সরে পড়ার সুযোগ পায়, তাহলে আমাদের আর বাঁচতে হবে না।

কিন্তু ডাকাতদের আনাগোনার বিরাম নেই। আই একেবারে চুপচাপ লুকিয়ে থাকাও যায় না। নানা দিকের পর্বত ধরে রোজই তাদের যাতায়াত চলে। হঠাৎ যারা পশুচারণ-ভূমিতে এসে পড়ে, মামাই ও মেয়েরা তাদের পাকড়াও করে হাজির করে জয়নাবের কাছে।

সব রকমের লোকই দেখা যায় কয়েদীদের মধ্যে। তবে লুটপাট-ডাকাতিতে সবাই প্রায় নতুন। তারা আগে কেউ ছিল সাঁচি, কেউ কারবারী, কেউ বা শিকারী, কেউ কেউ আবার সাধারণ দুর্বৃত্ত।

মেয়েদের মধ্যে বিশেষ করে আয়েশা বুড়ি তাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয় জেরা করে। তারা কারা, কোথা থেকে আসছে, কেনই বা এখন পালিয়ে যাচ্ছে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে সে। গোপন কথা টেনে বের করার কাজে আয়েশার বুদ্ধি খোলে যেন সব-চেয়ে বেশী।

কয়েদীদের মধ্যে যাদের দলে নেওয়া যায় না, আবার ছেড়ে দেওয়াও ঠিক নয়, তাদের বড় একটা পাথরের কুঠুরীতে আটকে রাখা হয় দাগী আসামীর মতো। ওদের দিয়েই কুঠুরীটা তৈরি করা হয়েছে। যাদের বিশ্বাস করা যায়, মামাই ও একজন মেয়ের সঙ্গে তাদের রাইফেল দিয়ে পাঠানো হয় ডাকাত পাকড়াও করতে। যারা অন্ততঃ দুজন ডাকাত পাকড়াও করে, তাদের আস্থাভাজন বলে ধরা হয়।

মামাই ছাড়াও দলে এখন এগারজন পুরুষ। তাদের মধ্যে চারজন সবসময় রাইফেল রাখার অধিকার পেয়েছে। অন্যদেব রাইফেল দেওয়া হয় কেবল পাহারা দেওয়া বা ডাকাত ধরার সময়। এদের মধ্যে চারজন অবশ্য সবসময় ছোরা রাখতে পারে।

পর্বত-এলাকায় দিন দিন লোক-চলাচল বাড়ছে। পর্বত পেরিয়ে পশুচারণ-ভূমিতে যারা ঢুকছে, তাদের সংখ্যাও বাড়ছে দিনের পর দিন। অনেকে ধরা পড়ছে, অনেকে পালিয়েও যাচ্ছে। আর তাব ফলে অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তা বাড়ছে গাঁয়ের বাসিন্দাদের মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত জয়নাব পরামর্শ করতে বসলো আয়েশা ও মামাইয়ের সঙ্গে।

মামাই বললে,—সব জাতের লোকই এ পথ দিয়ে যাবে দলে দলে। সাঁচি ও অন্যান্য গরিবেরা পালাবে তাগাইয়ের খপ্পর থেকে, মোল্লা ও জমিদাররা তাদের বেশী দিন ধোঁকা দিয়ে আটকে রাখতে পারবে না। এদের বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু খাঁটি বাস-মাচিরাও এ পথে আসবে। জনাকুড়ি বাসমাচিও যদি এসে পড়ে, তাহলে আমাদের বরাতে কি ঘটবে, ভাবতেও পারি নে। আমাদের লাশে বোধহয় শকুন আর নেকড়েদের পেট ভরবে।

কিছুক্ষণের জন্যে তিনজনেই চুপ। শেষে এক সময় দৃঢ়কণ্ঠে জয়নাব বললে,—আত্মরক্ষা আমাদের করতেই হবে। আরো লোকজন নিয়ে আমরা ফৌজ তৈবি করবো।

আয়েশা সোৎসাহে তার কথায় সায় দেয়। মামাই জিজ্ঞেস করে,—কিন্তু রাইফেলের কি হবে?

ছিনিয়ে নেব।—জয়নাব বললে : যেমন আজ পর্যন্ত নিয়েছি। যারা পালাচ্ছে তাদের মধ্যে যাদের বিশ্বাস করা যায়, তাদের ফৌজে ভর্তি করে নেব সৈন্য হিসেবে।

ঠিক, ঠিক বাত।—মামাইয়ের কণ্ঠে আর সংশয় নেই ঃ কিন্তু আমাদের তাহলে এখানে থাকা চলবে না। গাঁ পেরিয়ে রাস্তার ধারে পর্বত-এলাকায় যেতে হবে।

জনহীন আদিম পর্বত-মুল্লুক যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাগাইয়ের দল ভারী করতে জমিদার ও মোল্লাদের নেতৃত্বে দলে দলে দস্যুর দল যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পুবে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী লোক পালাচ্ছে পুব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরে সোভিয়েত গ্রাম-গুলোর দিকে—সর্দারদের এখতিয়ার ও নাগালের বাইরে। পর্বত-এলাকায় তারা গা ঢাকা দিচ্ছে, সবচেয়ে দুর্গম জায়গায় যাবার চেষ্টা করছে আর শেষ পর্যন্ত পড়ছে গিয়ে সশস্ত্র নারীফৌজের হাতে।

জয়নাবের ফৌজ ষোলয় গিয়ে ঠেকলো। দলে তাজিক আছে, কিরঘিজ আছে, উজবেক আছে, এমন কি দুজন তুর্কোম্যানও আছে।

নানা অস্বস্তিকর খারাপ খবর আসে জয়নাবের কানে—কেল্লা নাকি হাতছাড়া হয়েছে, কজুবে ও জুরা মারা পড়েছে। কিন্তু যত আসে দুঃসংবাদ, জয়নাবের জেদ ও প্রতিহিংসা যেন ততই বাড়তে থাকে। তিন দিনের মধ্যে জয়নাবের ফৌজ দস্যুদের ছয়টি দলকে নিরস্ত্র করে ফেললে। নিজেদের জখম হলো মাত্র দুজন। কয়েদীদের মধ্যে যারা পশ্চিম দিকে ধরা পড়েছিল, তারা কসম খেয়ে বললে, পুবে তাগাইয়ের দলে যোগ দিতে তারা যাচ্ছে না, তারা পালিয়ে আসছে তাজিক পার্টিজানদের এলাকা থেকে। তাজিক পার্টিজানদের কাছে ভাল-মন্দ, নতুন-পুরনোর কোন বাচবিচার নেই।

মামাই এক দিন খবর দিলে, ফৌজের দুজন লোক জেনানা-শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে অন্যদের খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। জয়নাব তক্ষুণি তাদের নিরস্ত্র করতে হুকুম দিলে। কিন্তু মামাই তাদের শুধু নিরস্ত্রই করলে না, গুলি করে মারলে। তার যুক্তি হলো—পরগাছাদের বসে বসে খাওয়ানোর কোন মানে হয় না।

ফৌজ তেইশজনে গিয়ে দাঁড়ালো। দুই বা তিন জনের ছোট ছোট দলে ভাগ করা হলো তাদের।

এমন সময় সেদিন তারা এক তাজিককে বেঁধে নিয়ে এল জয়নাবের কাছে। বললে, পাকড়াও করার সময় ও খুব বাধা দিয়েছিল, কুকুরগুলো না থাকলে হয়তো পালিয়েই যেত।

তাজিক দৃঢ়কণ্ঠে বললে,—আমি ডাকাত নই, পার্টিজান।

তাকে জেরা করে বোঝা গেল, সে মিথ্যে বলছে না। জয়নাব পরামর্শ-সভা ডাকলো। আলোচনার পর ঠিক হলো, তারা ও তাজিক পার্টিজানরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্ল্যানমাফিক কাজ করবে। তাজিককে তারা ছেড়ে দিলে, বলে দিলে গোটা পার্টি-জান বাহিনীকে নিয়ে ফিরে আসার জন্যে।

তিন দিন পর সকাল বেলায় তাজিক পার্টিজানদের নায়ক আবদুল্লাজোন তার ফৌজ সমেত এসে পৌঁছলো। ফৌজে লোকসংখ্যা তেতাল্লিশ।

দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ তাজিক আবদুল্লাজোন—বয়সে যুবক, সুদর্শন, গায়ের রং আইভরির মতো ফরসা, কটা ডাগর চোখ, জোড়া ভ্রু পাতলা কোমল নাকের ওপর এসে মিশেছে। তাকে দেখে জয়নাবের ভালই লাগলো। বুঝলো, লোকটা বদমেজাজী বা খারাপ মতলবের মানুষ নয়।

নারীবাহিনী দেখে আবদুল্লাজোন তো থ। পরক্ষণে জয়নাবকে দেখেই সে হেসে

ফেললে, খোশমেজাজে বললে,—আরে বাপ্! এ যে আগুন! এত রূপ, আর তুমি কিনা রাইফেল পিঠে বেঁধে চাবুক হাতে দলের ওপর মোড়লি করে বেড়াচ্ছ? সর্বনাশ!

ভ্রূ উঁচিয়ে চোখ বড় বড় করে বিরসকণ্ঠে জয়নাব বললে,—থাম! একটা কথা শুনে রাখ চাঁদ, ও সব মর্দানি এখানে চলবে না। বেসামাল হয়েছে কি, সমুচিত সাজা পাবে, যেমন আরো কেউ কেউ পেয়েছে। বুঝলে সাহেব?

আরেব্বাপ্!—হাসতে হাসতে আবদুল্লোজোন বললে ঃ আবার যে রেগে আগুন! তাই হবে গো, তাই হবে। এখন মেহেরবানী করে বান্দার কসুর মাফ কীজিয়ে।

জয়নাব হেসে ফেললে। বলে,—বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কিন্তু কথা বেশীক্ষণ চললো না। সকালেই যাদের পাকড়াও করা হলো, তাদের কাছ থেকে জানা গেল, কেল্লার কাছে বাসমাচিদের বিরাট পরাজয় ঘটেছে। বন্দীরা একের পর এক যা বলে গেল, তার মূল কথা হলো—বাসমাচিরা এখন পালাচ্ছে। ছত্রভংগ হয়ে তারা পালাচ্ছে সব দিকে। তাদের জমানা শেষ!

ওরা বললে,—আমাদের রাইফেল দাও। তাদের দলকে দল আমরা পাকড়াও করছি।

মুচকি হাসলে আবদুল্লোজোন,—তার দরকার হবে না। সে ব্যবস্থা আমরাই করতে পারবো।

জয়নাবও তার সঙ্গে একমত হলো। কিন্তু পরে যা শুরু হলো, তাতে তাদের মত পালটাতে হলো।

বিজন এ গিরিরাজ্যে সেদিনের মতো এত লোক একসঙ্গে আর বোধহয় কখনো দেখা যায়নি। পলাতকেরা হিঁচড়ে ঠেলে খাড়া পর্বত বেয়ে উঠছে, পড়ছে গিয়ে অতল খাদে বা দুরন্ত ফেনিল নদীর বুকে, কিংবা হিমবাহ ও চিরতুষাররাজ্যে পড়ে জমে যাচ্ছে চিরকালের মতো। তবু তাদের আসার বিরাম নেই—আসছে তো আসছেই।

আবদুল্লোজোন ওদের জিজ্ঞেস করে,—তোমরা সব এদিক পানে ছুটছো কেন? উত্তরে, দক্ষিণে বা পূবে যাবার আর কি কোন পথ নেই?

না।—জবাব দেয় কয়েদীরা ঃ কোথাও আর যাবার জায়গা নেই। এইটেই একমাত্র পথ। লালফৌজ আসছে উত্তর থেকে, লালেরা আসছে পূবের সীমান্ত থেকে, দক্ষিণেও রয়েছে তারা। একমাত্র পথ ছিল এই পশ্চিমে—কঠিন পর্বত ডিঙিয়ে। কিন্তু এখন দেখছি, এখানেও রয়েছে তারা।

এই বিশেষ দিনটিতে যাদের বন্দী করা হলো, তাদের সংখ্যা প্রায় তিনশো। সন্ধ্যা হলো, তবু বন্দীদের নিয়ে আসার বিরাম নেই।

সন্ধ্যা উৎরে গেলে জয়নাব তার তাঁবুতে ডেকে পাঠালে আবদুল্লোজোন, মামাই ও আয়েশাকে। জিজ্ঞেস করলে,—ডাকাত কয়েদীদের সম্পর্কে এখন কি করা?

কিচ্ছু না,—জবাব দেয় আবদুল্লোজোন ঃ পার্টিজান কয়েদীদের সম্পর্কে ওরা যা করেছে, শুধু তাই করা। তফাৎ হলো, আমরা ওদের ওপর কোন অত্যাচার করবো না, শুধু গুলি করে মারবো।

কিন্তু ওদের মধ্যে এমন লোকও তো কিছু আছে, যারা মোটেই বাসমাচি নয়। তারা শুধু নামেই ডাকাত।—জয়নাব বললে।

—আমি গুনিন নই যে, বলতে পারবো, ওদের মধ্যে কে কালো আর কে লাল। তুমি মেয়েছেলে, মেয়েলী দিল তোমার। বেছে বেছে তোমাকে কেন যে ওরা রাইফেল দিলে, ভেবে পাইনে, ছোঁ!

জয়নাব খেঁকিয়ে উঠলো,—ওটা কেউ আমায় দেয়নি, আমিই তুলে নিয়েছি। যত রাইফেল দরকার পড়েছে, জোগাড় করে নিয়েছি, বুঝলে?

তাঁবুর মধ্যে চুল্লিতে আগুন জ্বলছে। সবাই চুপচাপ। জয়নাব অন্যমনস্ক। কি যেন ভাবছে আর চিমটে দিয়ে জ্বলন্ত পোড়া কাঠের গাদা নাড়াচাড়া করছে।

এমন সময় বাইরে হঠাৎ গোলমাল শোনা গেল। কে যেন হাম্বিতাম্বি করছে,—কী! জানিস নে, আমি কে? হেই, রাইফেল নামা, সরে যা! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরো সর! কাছে ঘেঁষবি নে! একটু নড়েছিস কি, গ্রেনেড ছুড়বো। গ্রেনেড কাকে বলে জানিস? দুম্ করে ওটা ফাটবে আর তোদের দলকে দল সব্বাইকে পাঠিয়ে দেবে আল্লার কাছে। চ' চ', তোদের ফৌজদারের কাছে আমায় নিয়ে চ'! খুব উঁচুদরের সিপাহ্‌শালার আমি, আমার পেছনে আছে বিরাট এক ফৌজ। তোদের সর্দারের আমি ওপরওলা।

পরক্ষণে ধাঁ করে তাঁবুর পরদা সরে গেল, ভেতরে ছুটে এল একজন সান্ত্রী, হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—ইস্, কী চেঁচানি রে বাবা! পার্টিজানদের বিরাট এক ফৌজ এসে হাজির হয়েছে। ফৌজদার নিজে এখানে হাজির। উঃ, কী সাংঘাতিক বদমেজাজী রাগী লোক!

বলতে বলতে সসম্ভ্রমে সে পরদা তুলে ধরলো। জয়নাব, আবদুল্লাজোন, মামাই ও আয়েশা উঠে দাঁড়ালো তাড়াতাড়ি। বাইরে শোনা যাচ্ছে ফোঁসফোঁসানি আর গজরানির আওয়াজ। তারপরেই ভেতরে ঢুকলো বেঁটেখাটো গাট্টাগোট্টা এক কিরঘিজ—গায়ে কালো কোট, কাঁধ থেকে এক মসার ঝুলছে, বাঁ হাতে রাইফেল, ডান হাতে একটা গ্রেনেড।

গ্রেনেডটাকে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে লুফতে লুফতে সে বললে,—যাক, মাতব্বরদের সঙ্গে তাহলে মোলাকাত হলো শেষ পর্যন্ত!

অন্যেরা ভয়ে পেছিয়ে গেল। মামাই হঠাৎ সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো,—আরে আরে! লম্বা-হেতো যে!

অ্যাঁ, কুচাক!—বিস্ময়ে ফেটে পড়লো জয়নাব ঃ অ্যাঁ তাই তো, কুচাকই তো!

তারপরেই 'কুচাক এসেছে! কুচাক এসেছে!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে খুশিতে ডগমগ জয়নাব ছুটে গিয়ে আনন্দে উত্তেজনায় এক চুমু খেলে কুচাককে।

কুচাকও হকচকিয়ে গেছে। বিষম বিস্ময়ে সে হেঁকে উঠলো,—আরে আরে, জয়নাব যে! অ্যাঁ আয়েশা! কী তাজ্জব কাণ্ড! তোমাদের এখানে দেখবো, ভাবতেই পারি নি।

পরক্ষণে সে ফেরে মামাইয়ের দিকে,—ক্-কী ব্যাপার! তুমিও এসে জুটেছ? ভাল, ভাল, খু-ব ভাল!

তারপরেই সে ফের তাকালে জয়নাবের দিকে, উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে,—আঃ কি খুবসুরৎ মেয়েই না হয়েছিস রে! জুরার কাছে শুনেছিলাম, সারিকল থেকে তুই পালিয়ে গেছিস। তার পর থেকে তোর আর কোন হদিস মেলে নি। জুরার ধারণা, তুই মারা গেছিস। বাঃ বাঃ তোফা!

হাসতে হাসতে জয়নাব বললে,—আমি মারা গেছি! এত তাড়াতাড়ি কোন্ দুঃখে? বাসমাচি শয়তানদের সংখ্যা বেশ কিছু না কমিয়ে আমি মরি কি করে?

ঠিক বলেছিস!—সোৎসাহে কুচাক বললে ঃ আচ্ছা, আমায় চিনতে তোদের কি অসুবিধা হয়েছে? আমার কোটটা দেখেছিস? হাত দিয়ে দ্যাখ্—রেশম, খাঁটি রেশম। আর এই বুটজোড়া? দ্যাখ্ দ্যাখ্! এ সবকিছু ইভাস্কোই আমায় দিয়েছেন। ভারী উঁচুদরের সিপাহ্‌শালার তিনি, আর আমি তাঁর ডান হাত, তাঁর দোস্ত। ওঃ, তোদের দেখে কী যে খুশী হয়েছি, তা আর কি বলবো!

ক্ষণেক দম নিয়ে কুচাক আবার বললে,—ভারী খিদে পেয়েছে রে! তাড়াতাড়ি কিছু খেতে দিতে পারিস? শীতের মারমটের মতো কাহিল অবস্থা। আর শোন্, নীচে ঐ

ওখানে আমার ফৌজ রয়েছে—একশো মরদের বাহিনী। লোকদের বল্ ওদের ডেকে আনতে। ওদেরও খানাপিনার ব্যবস্থা কর্।

করছি।—জয়নাব বললে ঃ কিন্তু একটা ব্যাপার আমরা বুঝতে পারছি নে। কয়েদীদের কেউ কেউ বলছে, কেল্লা দখল হয়েছে, জুরা ও কজুবে মারা পড়েছে। অথচ এ দিকে দেখছি, ডাকাতরা পালাচ্ছে ছত্রভঙ্গ হয়ে। কি ব্যাপার, বলো তো?

কে বলেছে, কেল্লা দখল হয়েছে?—চড়া গলায় কুচাক বললে ঃ তার জিব কেটে নে। সে পাক্কা বদমাশ। জ্যান্ত কজুবের সওগাত এই রাইফেলটা। আর জুরাই তো আমায় এখানে পাঠিয়েছে নিজেদের গ্রামটাকে রক্ষা করার জন্যে। তাই তো একশো সাহসী মরদ নিয়ে এসেছি। আমার সহকারী মুসা নীচে আছে পার্টিজানদের সংগে।

আবদুল্লাজোন জিজ্ঞেস করে,—আপনাদের ফৌজ কি প্রাক্তন ডাকাতদের নিয়ে তৈরী?

প্রাক্তন ডাকাত! মোটেই না। যুব কমিউনিস্টদের নিয়ে তৈরী। বাসমাচিদের আমরা দলে নিই নে। ওদের আমি যা চিনি, তেমন বোধহয় আর কেউ চেনে না।—বলতে বলতে অদূরে রান্না-করা মাংস ভরতি মস্ত এক ডেকের ওপর নজর পড়তেই কুচাক এগিয়ে গেল এবং বলা-কওয়ার তোয়াক্কা না করেই ডেকের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বড় একটা ভেড়ার পা তুলে নিয়ে বললে ঃ ডাকাতদের সবাইকে আমি চিনি। বাসমাচিদের আমিই ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছি।

তাই নাকি?—জয়নাব যেন হাঁফ ছাড়ে ঃ বেশ কিছু ডাকাত আমরা পাকড়াও করেছি। তাদের নিয়ে কি করি, বলো তো?

—একটা অংশকে ছেড়ে দাও, বাকী সবাইকে গুলি করে মারো।

কিন্তু আপনি কি গুনিন?—ঠাট্টার সুরে আবদুল্লাজোন বললে ঃ কি করে বুঝবেন, কে লাল আর কে কালো?

বট্টে!—ফোঁস করে উঠলো কুচাক ঃ তাহলে ডজনখানেক ডাকাতকে এখানে নিয়ে এস, তোমাদের তাজ্জব বানিয়ে দেব। আর আমার লোকদের খানাপিনা ঠিকমতো হলো কিনা দেখ।

আবদুল্লাজোন বেরিয়ে গেল। আর আনন্দে হল্লা করতে করতে তাঁবুতে ঢুকলো মেয়েরা। কুচাক মাদুরে বসে আছে। মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলো।

তোমরা ওর দম বন্ধ করে মারবে দেখছি।—হাসতে হাসতে জয়নাব বললে।

কুচাক তখনও খেয়ে চলেছে। খেতে খেতে বললে,—কুছ্ পরোয়া নেই। ওসবে আমি কিচ্ছু মনে করি নে।

পরক্ষণে মেয়েদের দিকে নজর পড়তেই সে অবাক চোখে জয়নাবকে বললে,—হ্যাঁরে, এসব কি তাজ্জব কাণ্ড দেখছি! এসব মন্দা ফৌজী জেনানার ব্যাপারটা কি? তুইও তো দেখছি হাতিয়ারে আষ্টেপৃষ্ঠে মোড়া! এসব দেখলে দোস্ত ইভাস্কো যে হেসে লুটোপুটি খাবে!

তা বটে!—জয়নাব বললে ঃ তবে ডাকাতদের অনেকেই ইতিমধ্যে ওদের দেখে দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে আছে। পর্বতের নীচে গিরিসঙ্কটে যেসব খুলি ও কঙ্কাল পড়ে আছে, সেগুলো একবার দেখে এস।

—তোরাই তাহলে ওদের গুলি করে মেরেছিস?

—তাছাড়া আবার কে?

ইতিমধ্যে আবদুল্লাজোন বেশ কিছু বন্দী ডাকাতকে তাঁবুর মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। ডান হাতে ছুরি আর বাঁ হাতে ভেড়ার পা-খানা মুখের কাছে ধরে কুচাক চটপট

মাংস কেটে চলেছে। খাচ্ছে আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে লোকগুলোকে। মুখে কথা নেই। মাথা হেঁট করে কয়েদীরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কারো কারো গায়ে রঙিন রেশমী কোট, মাথায় জমকালো জরির কাজ-করা টুপি। একটা লোক লুকিয়ে আছে অন্যদের আড়ালে। তার মাথায় সাদা রেশমের পাগড়ি, পাগড়িতে মুখের একটা অংশ ঢাকা। কুচাক বারবার চেষ্টা করেও মনে করতে পারছে না, লোকটাকে সে কোথায় দেখেছে।

আবদুল্লাজোন তাড়া দেয়,—কি হলো ?

সামনের প্রথম লোকটার দিকে হাড়খানা উঁচিয়ে কুচাক বললে,—ঐ যে লোকটা, ও একজন সাঁচি, মুরগাবের কাছে বাড়ি, খিদে ওর সবসময়, তাই বদরাগী। বড় সংসার ওর, জমিদারের কাছে বাঁধা পড়ে আছে। ওকে ছেড়ে দাও।

আর এই লোকটা,—ছুরি উঁচিয়ে কুচাক যাকে দেখালে, পাতলা রোগাটে তার গড়ন, মাথার চুল কালো ঃ এ তাজিক, কালাই-ই-খুম্ব্ থেকে এসেছে। ওকেও যেতে দাও।

আর ঐ যে দেখছো,—মোটাসোটা যে ডাকাতটাকে দেখিয়ে কুচাক মাথা নাড়লে, মোটা পুরু ঠোঁট তার ঝুলে পড়েছে পেন্ডুলামের মতো ঃ ওকে আমি চিনি। এক নম্বর বদমাশ পাতিশেয়াল। অন্যেরা কি বলে, তাই ও শুনতো আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটতো তাগাইকে খবর দেবার জন্যে। পাঁচটি নির্দোষ লোক খুন হয় ওর জন্যে। ওর মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দাও।

সাদাপাগড়িওলা লোকটাকে কুচাক এবার ভালো করে দেখার চেষ্টা করে। প্রথম লোক দুটো বেরিয়ে যাচ্ছে তখন। সাদাপাগড়িওলাকেও ওদের দুজনের মাঝ দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে যেতে দেখে সচকিত কুচাক হেঁকে উঠলো,—এই এই সাদাপাগড়ি, যাচ্ছিস কোথায় ?

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম লোক দুটোর একজন, সেই মুরগাবের সাঁচি সাদাপাগড়িওলার ঘাড় চেপে ধরলে। ভিড়ের ভেতর থেকে তাকে সে ঠেলে দিলে কুচাকের দিকে।

মুক্‌খু গরিব মানুষ আমি।—বিড়বিড় করে বললে সাদাপাগড়িওলা।

হঠাৎ কুচাক লাফিয়ে উঠলো। তার গলা ঢুকে গেছে কাঁধের মধ্যে, এখুনি বুঝি ঝাঁপ দেবে। মুখে কথা নেই। ছুরি ফেলে ঝটিতি সে হাত দিলে পিস্তলের খাপে।

ভয়ে কয়েদীরা পেছিয়ে গেল। কিন্তু তার চেয়েও তাড়াতাড়ি চোখের পলকে সাদা-পাগড়িওলা ডাকাতটা কয়েদীদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে তাদের চারদিকে ঠেলে ফেলে ছুটলো তাঁবুর বাইরে।

ধরো, ধরো ওকে!—চেঁচিয়ে উঠলো কুচাক। এক লাফে তাঁবু থেকে বেরিয়ে লোক-টার চলার পথ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে ছুড়তে সে ছুটলো চেঁচাতে চেঁচাতে,—পাকড়াও, পাকড়াও ! ধরো, ধরো !

লোকটাকে সে উৎরাই বেয়ে নীচের দিকে দৌড়তে দেখেছে। প্রাণপণ সে ছুটলো তার পেছনে। কুকুরের পাল নিয়ে জয়নাবও কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে ধরে ফেললে, বললে, —দাঁড়াও, গন্ধ শুঁকে ওকে আমরা ধরছি।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কুকুরগুলো হকচকিয়ে গেছে। পার্বত্য নদীটা পর্যন্ত গিয়েও কোন লাভ হলো না। কপাল চাপড়ে কুচাক বললে,—হায় রে, কী বদ নসীব! মুঠোর মধ্যে থেকেও ও ফসকে পালিয়ে গেল। জয়নাব, মিনতি করছি, ধর্ ওকে। দোস্ত ইভাঙ্কো তোকে যা চাইবি তা-ই দেবে।

বলতে বলতে দুঃখে ও হতাশায় সে অন্ধকারে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করলো—শেষ কার্তুজটি পর্যন্ত।

কিন্তু ও কে?—জয়নাব জিজ্ঞেস করে।

—চীর, দুঙ্ঘান চীর। তাগাইয়ের একজন প্রধান সাকরেদ। এক চীর আগেই মারা পড়েছে জুরার হাতে। এটা তার চেয়েও বিপজ্জনক ভয়ংকর দুশমন। দোস্ত ইভাস্কোই এটা আমায় বলেছে।

হঠাৎ অন্ধকারে এক গলা শোনা গেল,—হেই, গুলি ছুড়ছো কেন? গেছলেই বা কোথায়? গাইড হিসেবে তোমার সব সময় আমার সঙ্গেই থাকার কথা।

বলতে বলতে মুসা এগিয়ে এল অন্ধকার থেকে। কুচাক পরিচয় করিয়ে দেয়,—এই হলো, বুঝলে জয়নাব, আমার দোস্ত মুসা। ফৌজ নিয়ে আমরা একসঙ্গে এসেছি। আর মুসা, এই হলো জুরার বৌ জয়নাব যার কথা আগেও শুনেছ। যেমন জুরা, তেমনি জয়নাব—দুটিতে সমান। নিজে ও শুধু পার্টিজানই নয়, ফৌজদারও, একশো আশী-জন লোক ওর দলে।

তোফা, তোফা!—মহা খুশিতে জয়নাবের সঙ্গে মুসাপা বা করমর্দন করতে করতে মুসা বললে : কজুবে শুনে খুব খুশী হবেন, প্রাণভরে ধন্যবাদ দেবেন।

দুঙ্ঘান চীর হাত ফসকে পালিয়েছে শুনে মুসা যেন ক্ষেপে উঠলো কুচাকের ওপর। শাপ-শাপান্ত করতে করতে তক্ষুণি সে সব দিকে লোক পাঠালে চীরের খোঁজে।

এর পর সবাই এসে জড়ো হলো তাঁবুতে। জয়নাব, মুসা, কুচাক, আবদুল্লোজোন, মামাই ও মেয়েরা, কেউ বাকী নেই। সবাই ঘিরে বসেছে কুচাককে। জয়নাব বললে,—এবার বলো কুচাক, যা যা এ পর্যন্ত ঘটেছে। সবই আমরা শুনতে চাই। অবশ্যি কেল্লা দখলের লড়াইয়ের প্রথম দিককার খবর আর সেখানে বাসমাচিদের মধ্যে তোমার কাণ্ড-কারখানার কিছু কিছু আমরা আগেই শুনেছি মামাইয়ের কাছ থেকে।

বটেট্!—কপট রাগে কুচাক চোখ পাকিয়ে তাকালো মামাইয়ের দিকে : আগেভাগে এসে এ সব ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে! একে স্রেফ বেইমানি ছাড়া আর কি বলবো!

যাই হোক,—কুচাক শুরু করে : গোড়াতেই একটা কথা বলে রাখি। তা হলো, দোস্ত ইভাস্কোর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি, অনেক ভুলও আমার ভেঙে গেছে। কিন্তু সেইটুকুই সব নয়। নিজেও আমি দেখেছি অনেক। তাগাইয়ের বাসমাচি-দলে ঢুকে পড়ার জন্যে ইভাস্কো আমায় বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল। কেন জান? শরফের বাসমাচি-দলকে, বলতে গেলে, আমিই সাবাড় করেছিলাম। আমি না থাকলে, বলশয় গ্রাম আজো বাসমাচিদের দখলে থাকতো। তোমরা বোধহয় এ খবর আগেই পেয়েছ।

মেয়েরা মাথা নেড়ে সায় দেয়। কুচাক বললে,—ইভাস্কোর অনুরোধে আমি শেষ পর্যন্ত রাজী হলাম জানের পরোয়া না করেই। ইভাস্কো তখন কেল্লা-দখলের জন্যে জমায়েত বাসমাচি-দলের ভেতরকার নানা গোপন খবর আমায় বললে। শেষে জিজ্ঞেস করলে, এইসব বাসমাচিদের একটা বড় অংশ হলো পামীরের ইসমাইলী সম্প্রদায়ের লোক, এদের সম্বন্ধে তুমি কিছু জান? আমি কিছুই প্রায় জানতাম না। দোস্ত ইভাস্কো কিন্তু ভারী জ্ঞানবান ব্যক্তি। আমায় সে দিনের পর দিন তালিম দিয়ে সব শিখিয়ে দিলে, মায় ইসমাইলী ভাষাটাও। ইসমাইলীদের বারোটি বিধানও আমি শিখে ফেললাম। ইসমাইলীদের অখণ্ড প্রচণ্ড বিশ্বাস তাদের জ্যান্ত দেবতা আগা খাঁর ওপর। তাদের কাছে কেউ ঐ বারোটি বিধানের প্রথমটা বললেই যথেষ্ট, অমনি দেখবে তাদের দিল খুলে গেছে। যে বলবে, সঙ্গে সঙ্গে ওরা তাকে বিশ্বাস করবে, তার জন্যে ওরা তখন জান কবুল করতেও রাজী। কারণ তাদের স্থির বিশ্বাস, এইসব বিধান জানে শুধু

তাদের জ্যান্ত দেবতার অনুচর শিষ্যের দল আর ঐ সব অনুচর দীনদাররা তা খুব গোপন রাখে। এসব খবর তোমরা বোধহয় মামাইয়ের কাছ থেকে পাওনি?

না।—ঘাড় নেড়ে জয়নাব জানালে।

মুচকি হেসে কুচাক বললে,—জুরা বলতো, আমি নাকি আকাট মুর্খ, কিন্তু মানুষের এমন নিরেট গাধামি আমি দেখছি, যা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। কারাতেগিনের ঐ সব তাজিক ইসমাইলীরা দুনিয়ার এত ভূত-প্রেত দৈত্য-দানোয় বিশ্বাস করে যে, আমরা তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নে। আগেই বলেছি, এইসব ইসমাইলী রামখোকা, নাই পর্যন্ত যাদের কালো দাড়ি নেমেছে, বাসমাচি-দলের বেশির ভাগ তাদের নিয়েই তৈরী। তা না হলে, বাসমাচিদের আমরা এত তাড়াতাড়ি কাবু করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। নিজেদের দীন বা ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ওরা ভারী সতর্ক ও চালাক। ওটা সম্পূর্ণ গোপন রেখে শিয়া বা সুন্নীদের সঙ্গে তারা মেশে, যেন তাদেরই একজন। অথচ মনেপ্রাণে তারা অনুসরণ করে নিজেদের ধর্মগুরু পীরদের, আর পীররা অনুসরণ করে তাদের জ্যান্ত দেবতা আগা খাঁকে। দেবতাটি ভারতবর্ষে বাস করেন আর পামীরের ইসমাইলীদের কাছ থেকে প্রচুর সোনাদানা নজরানা পান। তাই স্বাভাবিক কারণেই সোভিয়েত-শাসন তিনি পছন্দ করেন না, সোভিয়েতের বিরোধী তিনি।

বলতে বলতে কুচাক তাকালে জয়নাবের দিকে, বললে,—এই, কি ভেবেছিস বলতো? তখন থেকে গলাটা চিড়বিড় করছে। কৌমিশ দিবি নে নাকি? যা, আগে কৌমিশ নে আয়, তারপর বলবো।

কৌমিশ এলে কুচাক শুরু করে,—আগা খাঁ প্রথমে ফতোয়া জারি করেন পীরদের ওপর। পীররাও অমনি তা জানিয়ে দিলে ইসমাইলী অনুচরদের, আর তারাও অমনি ভেড়ার পালের মতো সুড়সুড় করে ধর্মগুরু পীরদের পেছন পেছন আগাইয়ের দলে গিয়ে যোগ দিলে, নাম লেখালে ডাকাত হিসেবে। কারাতেগিনের এইসব বাসিন্দারা জিন্দিগি ভোর পাহাড়-পর্বতে নিজেদের গাঁ ছাড়া আর কিছু দেখে নি, তুঁতফলের গুঁড়ো ময়দা ছাড়া আর কিছু খায়নি। তাই তাদের যখন বুটের সোল বা তলার মতো যবের চ্যাপটা কেক খেতে দেওয়া হলো, তখন তাদের সে কী আনন্দ—যেন বেহেস্তে এসেছে!

কৌমিশের পাত্রে প্রচণ্ড এক চুমুক দিয়ে জামার হাতায় মুখ মুছতে মুছতে কুচাক আবার বলতে থাকে,—কারাতেগিনের এই বাসিন্দাদের মতো সাহসী লোক কিন্তু আমি জীবনে দেখিনি। অন্যদের মতোই 'চার-ঈয়ার' 'চার-ঈয়ার' বলে গলা ফাটাতে ফাটাতে তারা কেল্লার ওপর চড়াও হতো আর মারা পড়তো। তবু যারা বেঁচে থাকতো, তারা কিন্তু পেছু হটতো না, ছুটতো সামনের দিকে। মাতব্বররা যদি শুধু নিজেদের জান বাঁচানো নিয়েই ব্যস্ত না থাকতো, তাহলে কারাতেগিনের এই ইসমাইলীদের লাশের গাদার ওপর উঠে তারা কেল্লার দেয়াল টপকাতে পারতো। কিন্তু তা হবার নয়—জানের ভয় তাদের সবসময়, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। যাই হোক, ইভাস্কোর অনুরোধে আমি তো আগাইয়ের দলে ঢুকলাম। ওরা আমায় একটা রাইফেল দিলে। বুঝতেই পারছো, ওরা যদি একবারও সন্দেহ করতো আমি কে, তাহলে আর জান নিয়ে ফিরতে হতো না—সোজা সাবাড়।

আর এক চুমুকে বাকী কৌমিশটুকু সাবাড় করে কুচাক বললে,—আমি সব সময় মানাসের গান করতাম আর ফুসফাস করতাম এর-ওর সঙ্গে। আর বাসমাচি-দলে কতজন যোদ্ধা আছে, কি কি হাতিয়ার আছে, কে কে সর্দার, এইসব খবর জোগাড় করতাম। ডাকাতদের আস্তানার অদূরে এক গিরিসঙ্কটে ইভাস্কো তখন ফৌজ নিয়ে লুকিয়ে আছে। ডাকাতরা কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গও জানতো না। আমি গিয়ে ইভাস্কোকে ঐসব

খবর সরবরাহ করতাম। এর পর ইভাস্কো বললে, বাসমাচিদের মধ্যে তুমি ভয় ঢুকিয়ে দাও, আর ইসমাইলীদের সঙ্গে খুব ভাল করে মেশ। ওদের মধ্যে রটিয়ে দাও, আগা খাঁর কাছ থেকে নতুন ফরমান এসেছে যে, ইসমাইলী দীনদাররা সবাই যেন বাড়ি ফিরে যায় আর নতুন তাবিজ পরে। বলবে, কিন্তু এই ফরমানটা সর্দাররা মাঝপথে আটকে দিয়েছে।

কুচাক থামলে। নিস্তব্ধ তাঁবু। আগুনের চুল্লি ঘিরে বসে আছে সবাই—উৎকর্ণ। কেশে গলা সাফ করে নিয়ে কুচাক সবার মুখের ওপর দিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলে,—এই পরামর্শ দিয়ে দোস্ত ইভাস্কো আমায় একগাদা তিনকোণা তাবিজ দিলে, প্রত্যেকটায় পাঁচকোণা তারা বসানো। ইসমাইলীদের সঙ্গে আমি খুব ভাব করে ফেললাম। তাদের ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলতাম। বারোটা বিধানের প্রথম গোটা দুই আওড়াতেই তারা আমায় খুব বিশ্বাস করলে—ধরে নিলে, তাদের জ্যান্ত দেবতার আমি একজন বড়দরের অনুচর। দেবতার নতুন ফরমানের কথা বলে তাদের মধ্যে আমি তাবিজগুলো বিলি করলাম। মহানন্দে তাবিজগুলো তারা গলায় ঝোলালো। এবার একটা তাবিজ নিয়ে আমি গেলাম লিনেজার কাছে, বললাম, এই দেখুন কান্ড! কারাতেগিনের লোকেরা সবাই এই তাবিজ পরেছে। তারা নির্ঘাত বলশেভিক, আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটছে। তাবিজটা দেখে লিনেজার তো চোখ ছানাবড়া! আমায় সে খুব ধন্যবাদ জানালে, কিছু সোনাও বকশিশ দিলে। সেই রাতেই ইসমাইলীদের তল্লাশি করা হলো, রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হলো তাদের কাছ থেকে। সে এক মহা হুলুস্থুলু কান্ড! এই বেইজ্জতির জন্যে ইসমাইলীরা জানালে, তারা দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু ঠিক এই সময় ইমাম বলবক এসে হাজির। লোকটা মহা হারামজাদা, সাংঘাতিক পাজী। ইসমাইলী ভাষা সে-ও জানে। ওদের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত ব্যাপারটা সে ধরে ফেললে।

হঠাৎ মুসা জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা, ইমাম বলবক নাকি কানা, শুনেছি তার ডান চোখটা নকল?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে কুচাক বলতে থাকে,—হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। ইসমাইলীদের ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এবার আমি ওদের ছাউনি ছেড়ে অন্য সব বাসমাচি-ছাউনিতে কাজ শুরু করলাম। যারা সাঁচি, গরিব আর দলে নতুন এসেছে, তাদের সঙ্গে ফুসফাস করতাম। রটিয়ে দিলাম, আমি গুনিন। নানা দুর্লক্ষণ বলতাম, ভবিষ্যদ্বাণী করতাম। এইসব ঘটনা—আমার দুর্লক্ষণ বলা, ভবিষ্যদ্বাণী করা, কেল্লা দখলের জন্যে বাসমাচি-দের বারবার ব্যর্থ চেষ্টা, জল বিষিয়ে দেওয়া, পাথর থেকে জল বের করা, ইমাম বল-বকের সঙ্গে আমার ঘোরতর তর্কবিতর্ক, আমায় কয়েদ করার চেষ্টা—এ সব খবর তোমরা বোধহয় আগেই শুনেছ মামাইয়ের কাছ থেকে।

মেয়েদের একজন বললে,—হ্যাঁ, তার পরের ঘটনা বলো।

কুচাক বললে,—হুঁ। ইভাস্কো বলে দিয়েছিল, সাধারণ বাসমাচিদের মধ্যে রটিয়ে দাও যে, শীগ্‌গীরই ভয়ংকর দুর্লক্ষণ দেখা দেবে, ঝাড়েবংশে খতম হবে বাসমাচিরা, ওরা যেন আসমানের দিকে নজর রাখে। গুনিন হিসেবে ওদের মধ্যে তখন আমার প্রচন্ড খাতির। কারণ কেল্লা দখলের ব্যাপারে আমার ভবিষ্যদ্বাণীই বারবার ফলেছে, তাগাই কেল্লা দখল করতে পারে নি। ইভাস্কোর কথা মতো ভবিষ্যদ্বাণীটা আমি ভালভাবে রটিয়ে দিলাম বাসমাচিদের মধ্যে, আর তার ফলে ওরা বিষম ভয় খেয়ে গেল। যারা সাঁচি, গরিব ও নতুন ডাকাত হয়েছে, তারা দলে দলে পালাতে শুরু করলো। ওরা কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল, শুনবে? আসমানে হয়তো কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আমি ওদের

পাশে দাঁড়িয়ে তাকালাম ওপর দিকে, আর অমনি প্রথমে একজন, তারপর আরেকজন, তারপর একে একে অন্যেরাও মুখ তুললো ওপর মুখো। একটু পরেই দেখা গেল, সব্বাই কিছু একটা দেখবার আশায় ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে আসমানের দিকে। ইতিমধ্যে, তাগাইয়ের দলে আমার যোগ দেবার পর আট দিন কেটে গেছে, আর ইভাস্কো গিরিসঙ্কটে গা ঢাকা দেবার পর পার হয়েছে দু দিন।

কুচাক একটু থামতেই মামাই বললে,—এর পরেই বোধহয় আমাদের ঐ বৈঠকে মোল্লার সঙ্গে তোমার ঝগড়াটা হয়েছিল। আমার তো—

থাম।—হাত নেড়ে কুচাক বলতে থাকে অন্যদের উদ্দেশ করে ঃ মোল্লা মানে ঐ ইমাম বলবক। সেই ঝগড়ার পর তাগাইরা আমায় পাকড়ানোর জন্যে খুব তৎপর হয়ে উঠলো। দিনের বেলায় আমি থাকতাম ইভাস্কোর সঙ্গে আর রাতে যেতাম বাসমাচিদের আস্তানায়। ইভাস্কো এই সময় কয়েকটা উড়ন্ত তারা তৈরি করেছিল, ওরা সেগুলোকে বলতো রকেট। সে বললে, দরকার মতো এগুলোকে যখন আসমানে ওড়াব, তখন বাসমাচিদের মধ্যে কী অবস্থা ঘটে, দেখো। ডাকাতদের আস্তানায় আমি শুনেছিলাম, জুরা বাইরে সাহায্য আনতে গেছে। খবরটা আমি ইভাস্কোকে দেই। এই জন্যে সে কয়েক দিন অপেক্ষা করলে। তারপর শুনলে, গিরিপথে হিমানী-সম্প্রপাত ঘটেছে, তুষারে পথ বন্ধ। সে তখন বললে, আর দেরি করে লাভ কি? জুরা হয়তো বাসমাচিদের হাতে ধরা পড়েছে। এমন কি—

নিবিষ্ট মনে শুনছে সবাই। শুনছে জয়নাবও। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় হঠাৎ তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল—অসম্ভব! হতেই পারে না!

সবাই যেন চমকে উঠলো। পরক্ষণে দুষ্টুমির হাসি খেলে গেল কুচাকের মুখের ওপর দিয়ে। গাম্ভীর্যের ভান করে সে বললে,—কেন, বাপু? কি অসম্ভব, শুনি? জুরা ধরা পড়তে পারে না, তাই না রে? কেন, জয়নাব বলছে বলে না কি?

সবাই হেসে উঠলো—এক আয়েশা বুড়ি ছাড়া। নিষ্পলক চোখে সে তাকিয়ে আছে কুচাকের মুখের দিকে। উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার কালো মেঘে থমথম করছে সারা মুখ। আর জয়নাব? তার অবস্থা সঙ্গিন। লজ্জায় সে চোখ তুলতে পারছে না। সারা মুখে কে যেন আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। পরক্ষণে সে ছুটে পালালো অন্ধকারের দিকে।

কুচাক হাঁক ছাড়লে,—এই, পালাচ্ছিস কোথায়? কি ভেবেছিস! খেতে দিবি নে? এই আমি মুখ বন্ধ করে গ্যাঁট হয়ে বসলাম, রুটি-মাংস না আসা পর্যন্ত আর মুখ খুলছি নে।

অতঃপর খাবার এল সবার জন্যে। একখণ্ড রুটি ও মাংস মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে কুচাক বললে,—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ইভাস্কো বললে, জুরা যদি আমাদের লোকদের কাছে পৌঁছেও থাকে, তবু বরফের বাধা ডিঙিয়ে আমাদের ঐ ফৌজ এখানে ঠিক সময়ে হাজির হতে পারবে না। ওদিকে কিন্তু আর একটা কাণ্ড ঘটছে। বাসমাচিরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে—তাদের টহলদারী লোকগুলো সব গুম হয়ে যাচ্ছে বলে। গুম না হয়ে করবেই বা কি? ওদের কেউ গিরিসঙ্কটে গেলেই ধরা পড়তো ইভাস্কোর হাতে, আর সে যাতে কোন কিছু ফাঁস করবার সুযোগ না পায়, তার জন্যে বুঝতেই পারছো? সঙ্গে সঙ্গে তার দফা শেষ! শেষে ইভাস্কো একদিন ঠিক করলে, আর দেরি নয়, পরদিন রাতেই সে বাসমাচিদের আক্রমণ করবে। সেই মতো সে নিজের দলকে ভাগ ভাগ করে কাছের সব পর্বতে পাঠালে লুকিয়ে থাকার জন্যে। ইভাস্কোর নির্দেশ পেলেই তারা আক্রমণ করবে।

মস্ত বড় একখানা হাড় থেকে নিবিষ্ট মনে একখণ্ড মাংস কেটে মুখে পুরে কুচাক

তারপর ঢোকালে একখানা রুটি। সবাই হাঁ করে চেয়ে আছে তার দিকে। কিন্তু কুচাকের কোন তাড়া নেই। মুখগহ্বরস্থ বস্তু দুটিকে পরম তৃপ্তির সংগে চিবোতে চিবোতে সে বললে,—তারপরেই ঘটলো সেই কাণ্ড। পর দিন ছিল শুক্রবার। বাসমাচিরা সকাল বেলায় কেবল নামাজ শেষ করেছে, হঠাৎ কানে এল ভর্‌র্‌-ভর্‌র্‌-র্‌র্‌র্‌...আওয়াজটা ক্রমেই বাড়ছে। মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড একটা মাছি ভর্‌-ভর্‌ করে উড়ছে চারদিকে। বাসমাচিরা বাঁয়ে তাকায়, ডাইনে তাকায়, কিন্তু কিছুই নজরে পড়ে না। ইভাস্কো আমায় বললে, ওটা উড়োজাহাজ, কয়েকটা গ্রেনেড নিয়ে এক্ষুণি ঘোড়ায় চেপে ছুটে যাও বাস-মাচি-ছাউনিতে। চিৎকার করে বলবে আল্লার গজব এল বলে! সর্বনাশ ও ধ্বংস আসছে, তাই মৃত্যুদূত ফেরেশ্‌তো আজরাইল আমাদের হুঁশিয়ার করতে উড়ে এসেছেন! তুমি নিজে কিন্তু ভয় পেও না, লোহার পাখি এটা, আমাদেরই সাহায্যে এসেছে।

তাঁবুতে গভীর নিস্তব্ধতা। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে সবারই। ধীরেসুস্থে আর একখণ্ড মাংস মুখে পুরে কুচাক আবার শুরু করলে,—ঘোড়ায় চেপে আমি ছুটলাম। দেখতে দেখতে মস্ত এক বিরাট পাখি উড়ে এল পর্বতের পেছন থেকে। ভর্‌র্‌-ভর্‌র্‌ র্‌র্‌র্‌ করে সে হাঁক পাড়ছে। ঘোড়াটা ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠলো। পাখিটা ক্রমেই নীচে নামছে। বাসমাচি-ছাউনির মাঝখানে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে আমি চিৎকার করতে লাগলাম, পালাও! পালাও! আজরাইল নিজে উড়ে এসেছেন! জান বাঁচাতে চাও তো পালাও! সংগে সংগে বাসমাচিরা পালাতে শুরু করলে। কারাতেগিনের লোকেরা ছুটলো সবচেয়ে জোরে। কজিৎজ্‌কি চেঁচাতে লাগলো, হেঁই হেঁই, সব ঘাবড়াচ্ছ কেন? পালাচ্ছ কেন? ওটা উড়োজাহাজ, গুলি করে নামাও ওটাকে! কিন্তু কে শোনে কার কথা! রাইফেল ফেলে সবাই তখন ছুটছে পর্বতমুখো। তাদের খুব অল্পই রেহাই পেয়েছিল ইভাস্কোর ফৌজের হাত থেকে। পাখিটা এদিকে সমানে গর্জন করে চলেছে আর চক্কর খাচ্ছে মাথার ওপরে। ইভাস্কো এই সময় একটা রকেট ছুড়লে, চালিয়ে দিলে মেশিনগান। আর সংগে সংগে মাতব্বরদের মধ্যে সে কী আতঙ্ক! তুমুল হৈ-হল্লা শুরু হলো। কেউ চেঁচায় আমরা ঘেরাও হয়েছি, কজিৎজ্‌কি! কেউ গেঙায়, পর্বতে সরে যাওয়া দরকার! তাগাই চেঁচাচ্ছে, সীমান্ত পেরোতে হবে আমাদের! লিনেজা দেখলে, অবস্থা সঙ্গিন। কারো কথার কোন তোয়াক্কা না করে এক লাফে ঘোড়ায় উঠেই সে হাওয়া!

বলতে বলতে হা-হা করে হেসে উঠলো কুচাক, বললে,—সে কী দৃশ্য! বাসমাচিরা সবাই ছুটছে। ছোটার সে কী কায়দা! হা-হা-হা......ঠিক এই সময় আমি গ্রেনেড ছুড়-লাম। ব্যস্‌, আতঙ্কে বাসমাচিদের আক্কেল গুড়ুম, বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ! ওরা আর ওদের সর্দাররা ভাবলে, উড়োজাহাজ থেকেই বুঝি রকেট আর বোমা ফেলা হচ্ছে। পাঁই পাঁই ক'রে তারা ছুটলো পর্বতমুখো। ইভাস্কো ওদের অনেককেই বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিলে, মরলে বহু। সে এক তুলকালাম কাণ্ড!

তারপর জুরার কি হলো, বল্‌ তো?—বলতে বলতে কুচাক চোখ টেপে জয়নাবের দিকে। মুখে তার দুষ্টুমির হাসি।

আনন্দে উদ্ভাসিত জয়নাব, রাইফেল উঁচিয়ে ধরে বললে,—ভাল হবে না কিন্তু! ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!

সবাই হাসছে। আয়েশা বুড়ির চোখমুখও ঝলমল করছে হাসিতে।

জুরার কথা শোনার জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব, উৎকর্ণও বটে। হাসতে হাসতে কুচাক বললে,—ওরেব্বাস! রাইফেল দেখাচ্ছে রে! আচ্ছা শোন্‌ তাহলে উড়োজাহাজটা মাটিতে নামতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল জুরা, টীক ও একজন রুশ। কেল্লা থেকে কজুবে ছুটে এলেন, ছুটে এল পার্টিজানরা। তারপর সে কী কোলাকুলি! যে যাকে পাচ্ছে জড়িয়ে

ধরছে। টীকও বাদ গেল না। চেঁচিয়ে লাফিয়ে সে নাস্তানাবুদ। তার পরে আবার সবাই ঘোড়ার পিঠে মেশিনগান চাপিয়ে ছুটলো ডাকাতদের পেছনে। টীককে নিয়ে জুরাও ঘোড়ায় চেপে ছুটলো তাগাইকে ধরতে। তার সঙ্গে সঈদ, চাও, গোরা ও আরো সাত-জন যোদ্ধা। ঐ দিনই কিজিলওয়ালাদের বিরাট এক ফৌজ এসে পেঁছিলো। তাদের প্রত্যেকের টুপিতে লাল তারা। সবাই ঘোড়সওয়ার। গিরিপথ তুষারে বন্ধ হওয়ায় তাদের আসতে দেরি হয়েছিল। সেই রাতেই স্থানীয় চাষীদের নিয়ে তৈরী পার্টিজানদের আর একটা বাহিনীও এসে হাজির।

কুচাক থামলে। হাসি-ঠাট্টা-মস্করায় প্রাণবন্ত সান্ধ্য মজলিস। খাওয়া চলেছে। ডেক থেকে ভেড়ার একখানা দাবনা তুলে নিয়ে কুচাক শেষে বললে,—এর পর বাসমাচিদের খতম করার কাজে আমরা সবাই নেমে পড়লাম। উত্তরের পথ ধরে কজুবে রওনা হলেন। ইভাস্কো গেল দক্ষিণমুখো। কিজিলওলারা সীমান্তের কাছে পাকড়াও করলে বড় এক-দল ডাকাতকে। আর আমি ও মুসা রওনা হলাম এদিকে। নিজেদের গ্রামখানা রক্ষা করার ভার নিতে জুরা আমায় অনুরোধ করেছিল। দোস্ত ইভাস্কো বলেছিল, লোকজনদের তুমি জান, পথও চেন আর বাসমাচি-খতমের কাজে তোমার বুদ্ধি খোলে সবচেয়ে বেশী, সুতরাং কাজে নেমে পড়ো। আর কজুবে কি বলেছিলেন, জান? আমার সঙ্গে কোলা-কুলি করতে করতে বলেছিলেন, কুচাক, সত্যিই তুমি বীর সাহসী মরদ! লক্ষ্য করো, কত বড় তারিফ এটা। আমি যে সাহসী বীর, কজুবেই তা বলেছিলেন নিজের মুখে! এখা-নেই শেষ আমার কাহিনী। বাকিটুকু ঘটছে এখনও। হেই জয়নাব, কৌমিশ আন্!

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পর্ব ১

পামীরের বুকে শান্ত রাত্রি। নিস্তরঙ্গ স্তব্ধ প্রশান্তি। জমাটবাঁধা হিমেল আঁধারে বাতাসেও যেন ভেসে আছে নিথর হয়ে। কুলায় পাখি ঘুমোচ্ছে, ঘুমোচ্ছে বুনো জানোয়ার। আকাশে তারা জ্বলছে মিটিমিটি। তাদের ক্ষীণ স্বচ্ছ আলো পড়েছে হিমশীতল পামীরের বুকে।

পামীরের এই শান্তি ভঙ্গ করছে শুধু একদল মানুষ—অস্থির সচল একদল ঘোড়সওয়ার। তাদের চলার বিরাম নেই। তেমনি বিশ্রাম নেই তাদের ঘোড়াগুলোরও। শৈলশিরা বেয়ে সার বেঁধে তারা এগোচ্ছে সামনের দিকে।

দলটি নিঃশব্দে চলেছে। ক্লান্তিতে টলছে অবসন্ন ঘোড়াগুলো। ছোট ছোট পাথরেও হোঁচট খাচ্ছে তারা। বেশ কিছুদিন হলো. তাগাই ও কজিৎজ্‌কির চলার নিশানা ধরে তাদের পেছনে ধাওয়া করে চলেছে জুরা ও তার দলবল।

বাসমাচি-সর্দার তাগাই কুড়িজন অনুচর নিয়ে দক্ষিণ দিকে গেছে। অনুসরণকারীদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে সোজাসুজি সামনের দিকে না গিয়ে গিরিশ্রেণীর মধ্যে এ'কে-বে'কে ঘুর পথে এগোচ্ছে তারা, গিরিখাতে লুকিয়ে থাকছে মাঝে মাঝে।

পার্টিজান বাহিনীর সামনে জুরা। সে-ই নেতা। কালো এক তেজী ঘোড়ায় চলেছে। টীক ছুটছে পাশে পাশে। জুরার পেছনে সার বেঁধে ঘোড়ার পিঠে পর পর আসছে সঈদ, চাও, গোরা আর সাতজন যোদ্ধা।

তাগাইয়েব সঙ্গে আগামী যুদ্ধের চিন্তায় জুরা মশগুল. তেমনি উত্তেজিতও বটে। নিজের দেশের পর্বতমালার ভেতর দিয়ে মারাত্মক দুশমনদের ধাওয়া করে চলেছে সে—তার শিকারী প্রকৃতির কাছে এর চেয়ে আকর্ষণীয় আর কি থাকতে পারে? এখন সে, যাকে বলে, পরিপূর্ণ জীবন ভোগ করছে। বিমানের ভেতর গিয়ে যখন সে বসেছিল, তখন থেকে যে আনন্দ-উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসেছে, এখনো তার মাদকতা থেকে সে মুক্ত হয় নি। জীবনের এই সেই অন্যতম স্মরণীয় ঘটনার স্মৃতি এখনো তার দেহে মনে বারবার শিহরণ সৃষ্টি করছে—এখনো যেন আবার তা সে প্রত্যক্ষ করছে নতুন করে।

সাহায্যের জন্যে কেল্লা থেকে রওনা হবার পর, এত জোরে সে ঘোড়া ছুটিয়েছিল যে, সামনের প্রতিটি গ্রামে তাকে ঘোড়া পাল্‌টাতে হয়। গ্রামবাসীদের সহযোগিতাও ছিল চমৎকার। নতুন ঘোড়া নিয়ে সে ছুটেছে আলাই গিরিশ্রেণীর ওপারে বড় শহর লক্ষ্য করে।

শহরে পেঁছে কর্তৃপক্ষের কাছে সে অবরুদ্ধ কেল্লার খবর জানায় এবং কজুবের পত্র তাদের হাতে দেয়। তা ছাড়াও সে আবেদন জানায়, এখুনি একটা উড়োজাহাজ পাঠানো হোক আর তাতে করে তাকেও যাবার অনুমতি দেওয়া হোক। কথাবার্তা

সাধারণতঃ সে খুব কমই বলে। কিন্তু তার আর্জি অগ্রাহ্য হতে পারে মনে হতেই, জীবনে যা সে কখনো করে নি, তাই করেছিল, অর্থাৎ আবেগে উচ্ছ্বসিত এক লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছিল। বক্তৃতার শেষ দিকে তার কণ্ঠে আর আবেদন ছিল না, ছিল উড়োজাহাজের দাবি, এমন কি শাসানি পর্যন্ত। অথচ তার আবেদন অগ্রাহ্য করার কথা কারো কল্পনায়ও ছিল না।

লোহার পাখি তাকে না নিয়েই উড়ে যেতে পারে, এই আশংকায় জাহাজের মোটর চালু হবার অনেক আগে থেকেই সে ভেতরে গিয়ে জায়গা দখল করে বসেছিল, টীককে রেখেছিল পায়ের কাছে। টীককে নিয়ে অবশ্য চালকের সঙ্গে তাকে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা করতে হয়েছিল। সে আর এক ঝামেলা।

উড়োজাহাজটার হিংস্র ভয়ঙ্কর গর্জনের সঙ্গে তার জানা প্রকাণ্ড প্যান্থার বা অন্য কোন জানোয়ারের হাঁকডাকের কোন তুলনাই চলে না। এমন যে টীক, সে-ও পর্যন্ত বিষম ঘাবড়ে গিয়েছিল।

একটু পরেই বিমানটা সবচেয়ে উঁচু পপলার গাছ ছাড়িয়েও ওপরে উঠে গেল। দেখতে দেখতে গ্রামগুলোও তার কাছে মনে হতে লাগলো মাছির মতো ছোট। বিস্তার-ব্যবধানকে লোহার পাখি যেন গিলে খাচ্ছে। পথঘাট মাঠ নদনদী গিরিচূড়ো, সব ধাঁ ধাঁ করে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে সামনে থেকে। সুবিশাল সব আকাশছোঁয়া শিখরমালা, যেখানে মানুষের পায়ের চিহ্ন কখনো পড়ে নি, তারাও তখন জুরার পায়ের তলায়। নীচে দেখা যাচ্ছে মেঘের বিস্তার, পৃথিবীকে ঢেকে দিয়েছে। অত উঁচুতে বিরলীকৃত পাতলা বাতাসে যেন খাবি খাচ্ছে লোহার পাখিটা। আলাই পর্বতশ্রেণীর ওপর দিয়ে যাবার সময় অনেক অনেক নীচে একটা ঈগলকে উড়তে দেখেছিল জুরা। সে হেসে ফেলেছিল।

তারপর উড়োজাহাজটা কেল্লার ওপর আসতেই, তাকে দেখে বাসমাচিদের সে কী আতঙ্ক আর সে কী দৌড় ছত্রভঙ্গ হয়ে! এ ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে সব্বাই ছুটছে প্রাণের দায়ে। তাদের মধ্যে তাগাইও ছিল।

হ্যাঁ, একেই বলে জীবন! লোহার পাখি সে শুধু দেখেনি তাতে চড়েওছে!

পরক্ষণে, তাগাইয়ের কথা মনে হতেই, জুরার চোখের সামনে ভেসে উঠলো আর একখানা মুখ। জয়নাব! দুরন্ত নদীর মতো প্রাণোচ্ছলা জয়নাব—সত্যিকার যোগ্য সঙ্গিনী তার। কিন্তু কোথায় সে? বোধহয় হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো। জুরা তাকালে আকাশের দিকে ঃ আসমানের তারা হয়ে সে হয়তো ফুটে আছে. নির্নিমেষ চোখে দেখছে তাকে। জুরার ঘনঘন নিশ্বাস পড়তে থাকে, দেহের পেশীগুলো শক্ত হয়ে ওঠে ইস্পাতের মতো। বুকের মধ্যে কী এক অব্যক্ত তীব্র যন্ত্রণা। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বিড়বিড় করতে থাকে ঃ তাগাই! তাগাই!..... বদমাশ শয়তান, তোর রক্তে যদি জয়নাবের স্মৃতিতর্পণ করতে না পারি, তাহলে আখেরী জমানা অব্দি ভয়ঙ্কর দোজখে যেন পচে মরি!

চিন্তার গভীরে তলিয়ে গেছে জুরা। ছোট-বড় কত ঘটনার স্মৃতি জয়নাবকে নিয়ে! তার অন্তর-সমুদ্র তোলপাড়। হঠাৎ কে একজন তার ঘোড়ার লাগাম চেপে ধরতে সে যেন চমকে জেগে উঠলো ঘুম থেকে।

অত জোরে নয়।—শান্তকণ্ঠে চাও বললে ঃ ঘোড়াগুলো এত ক্লান্ত যে, তাদের শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষ হবার মতো। তোমার সঙ্গে সমান তালে আমরা ছুটতে পারছি নে। লোকজনের শক্তিতে কুলোলেও, ঘোড়াগুলোকে জিরান দেওয়া দরকার।

না, না, আমাদের খুব তাড়াতাড়ি এগোতে হবে।—ঘোড়া ছুটিয়ে জুরার কাছে

এগিয়ে আসে সঈদ ঃ টহল দিতে বেরিয়ে কয়েকজন বাসমাচিকে আমি দেখেছিলাম। এই পথেই তারা গেছে। তাদের ধরতে হবে। কিন্তু চাও, বাসমাচিদের পেছু নিতে তুমি কেন রাজী নও? এভাবে আমাদের বাধা দিচ্ছ কেন?

ঘোড়ায় তাড়া দিতে দিতে জুরা বললে,—ডাকাতদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর তবেই আমাদের বিশ্রাম।

কিন্তু ঘোড়াগুলো এত ক্লান্ত যে, তারা আর চলতে পারছে না।—চাও তবু আপত্তি জানায়।

তাহলে তাদের বোঝা কমিয়ে দেওয়া যাক।—সঈদ পরামর্শ দিলে।

ক্ষণেক চুপ করে থেকে জুরা বললে,—হ্যাঁ, বাড়তি যা কিছু সব ফেলে দাও! মাথা পিছু দুদিনের খাবার, পঞ্চাশটা কার্তুজ আর দুটো গ্রেনেড থাকবে। বাসমাচিদের আজই আমরা ধরে ফেলবো। তাদের কাছে খাবার ও সোনা আছে যথেষ্ট।

হতভম্ব চাও। বললে,—বলছো কি তুমি?

ইতিমধ্যে গোরা এসে হাজির হয়েছে। সে একটু পেছিয়ে পড়েছিল। সব শুনে সে চাওকে সমর্থন করলে। কিন্তু সঈদের এক গোঁ। আর জুরার মনপ্রাণ তখন উন্মুখ তাগাইয়ের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার জন্যে, তাই দ্রুত এগোতে চায় সে। ক্ষণেক চুপ করে থেকে সে বললে—যা বললাম, তাই করো। বাড়তি সবকিছু ফেলে দাও।

তাই হলো। বাড়তি কার্তুজ, গ্রেনেড, মাংস, কেক, পাউরুটি, বিস্কুট সব ফেলে দেওয়া হলো। বোঝা হালকা হতে ঘোড়াগুলো আবার দ্রুত রওনা হলো সামনের দিকে।

রাত্রির ঠাণ্ডা টাটকা সতেজ বাতাস জুরা টেনে নেয় বুক ভরে। তার স্থির দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত। চলতে চলতে পথের দু পাশের প্রতিটি চূড়ো ও পাহাড় সে পরীক্ষা করছে তীক্ষ্ন চোখে। একটা পাহাড় সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তার পাশে আসতেই টীক গোঁ গোঁ করে উঠলো। পরক্ষণে কানে এল উলারের হিসহিস শব্দ। টীককে দেখে কয়েকটা উলার ভয়ে হিসহিস করতে করতে কোটর থেকে বেরিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল রাতের কুয়াশায়।

ঘোড়া থামালে জুরা। সঈদকে সে চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলে,—বাসমাচিদের তুমি নিজের চোখে দেখেছিলে?

গোরা সারাক্ষণ জুরার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছে। রিভলবার নিয়ে সবসময় সে তৈরী। কজুবেরও নির্দেশ ঃ মনে রাখবে, সরলপ্রাণ উদারচেতা জুরাকে যেভাবে হোক রক্ষা করতে হবে।

অবশ্য কজুবে না বললেও গোরা এটা করতো। এটা তার নিজেরও অন্তরের কথা। সত্যি কথা বলতে কি, সঈদকে সে আজো ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি। এ পর্যন্ত যেটুকু পরিচয় তার পেয়েছে, তাতে ওকে তার মোটেই ভাল লাগেনি। অথচ জুরাকে তা বলার উপায় নেই। সে যখন কাউকে বিশ্বাস করে বা কিছু করার সিদ্ধান্ত করে তখন কোন বাদ-প্রতিবাদ বা বাধা বরদাস্ত করতে পারে না, এমনি একগুঁয়ে। সঈদের কথা-মতো ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম না দেওয়া বা দুদিনের রসদপত্র রেখে বাকী মাল ফেলে দেওয়া সে পছন্দ করেনি। আপত্তিও করেছে। কিন্তু ফল হয়নি। জুরার নির্দেশ সবাই মানতে বাধ্য। কারণ সে-ই অভিযানের নেতা।

জুরার চড়া গলা কানে যেতেই সে এগিয়ে এল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে,—তাজ্জব ব্যাপার!

সঈদও এগিয়ে এসেছে। দিব্যি কাটতে শুরু করলো সে,—আমার মাথায় বাজ পড়ুক! না দেখে থাকি তো আমি যেন মারা—

থামো!—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জুরা চেঁচিয়ে উঠলো : তুমি মিথ্যে বলেছ।

অ্যাঁ! কে? কে বলেছে আমি মিথ্যে বলছি? চাও?—রাগে সঈদ হিসহিস করে উঠলো।

জুরা যেন ক্ষেপে যায়। বললে,—কেন, চাও বলবে কেন? একটা বাচ্চাও এটা বুঝতে পারবে। ঝুঁকে-পড়া পাহাড়টার ওখানে একটু আগে এক তুষার-চিতা দেখলাম, এখন দেখলাম এই উলারগুলোকে। বাসমাচিরা যদি এ পথে যেত, তাহলে ঐ বুনো জানোয়ারটা বা পাখিগুলো কখনই এখানে থাকতো না। বুঝতে পারছো?

সঈদ নির্বাক। গোরা তাকিয়ে আছে তার চোখের দিকে। কিন্তু ট্যারা চোখের ভাবান্তর বোঝা দুষ্কর।

জবাব দাও!—জুরা মাথা ঝাঁকায় : এ তল্লাটের ধারে কাছেও বাসমাচিরা নেই।

তাহলে আমারই ভুল হয়েছে, দেখছি।—অনুতপ্ত নির্জীব কণ্ঠ সঈদের : সন্ধ্যার পড়ন্ত রোদে ভুল হওয়া হয়তো অসম্ভব নয়। বুনো ছাগলগুলোকে কি তাহলে বাসমাচি ডাকাত ঠাউরেছিলাম!

চাও বললে,—যাক, যা হবার হয়েছে। এখন তাহলে ঘোড়াদের দানাপানি দেওয়া যাক। নিজেরা আমরা টহল দিতে বেরুবো। সঈদ এখানে থাকবে।

সঈদ রাগে গোঁ গোঁ করে উঠলো,—চাও, আমায় তাহলে তুমি বিশ্বাস করো না, কেমন? কিন্তু কেল্লার ট্যাঙ্ক পাহারা দেবার দায়িত্ব ছিল কার ওপর? তোমারই ওপর। অথচ তার জল শেষ পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে গেল!

মুহূর্তের জন্য চাও যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তারপর মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে বললে,—তা বটে! তাই তো আমায় গুলি করে মারার জন্যে সবচেয়ে জোরে চেঁচিয়েছিলে তুমিই।

—না, সবচেয়ে জোরে চেঁচিয়েছিলাম তোমায় মাফ করার জন্যে!

সঈদ ভুল স্বীকার করায় জুরার রাগ ততক্ষণে জল হয়ে গেছে। বিরক্তির সঙ্গে সে খেঁকিয়ে উঠলো,—ছাতারে পাখির মতো কিচিরমিচির বকবকানি থামাবে তোমরা! সবাই আমরা টহলে বেরুবো। ঘোড়াগুলো এখানে থাকবে।

চাও আর সঈদ বিভিন্ন দিকে রওনা হয়ে গেল। পর্বতে ঘেরা নীচু একটা এলাকা সেখানে। কোন ছাউনি বা ছাউনির আগুন সেখানে নজরে পড়ে কিনা দেখার জন্যে জুরার হুকুমে অন্যেরা গিয়ে উঠলো বিভিন্ন পাহাড়ের মাথায়।

এক পাহাড়ী খাঁজে গিয়ে জুরা গা ঢাকা দেয়। সঙ্গে গোরা। জুরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা গোরা, এটা কি সত্যি যে, সঈদ চেয়েছিল চাওকে গুলি করা হোক?

গোরা বললে,—সে সময় আমি কেল্লার ভেতরে ছিলাম। চাও ট্যাঙ্কের পাহারায় ছিল সত্যি। সঈদকে আমি ট্যাঙ্কের কাছে যেতে দেখেছি, অন্যদেরও দেখেছি। চাওয়ের লক্ষ্য ছিল, অপরিচিত কেউ যেন ট্যাঙ্কের কাছে না যায়।

—জলে বিষ মেশানোর ব্যাপারে কাকে তোমার সন্দেহ হয়? চাওকে বা অন্য কাউকে?

না, চাওকে মোটেই নয়।—দৃঢ়কণ্ঠে গোরা বললে : পাথর থেকে জল বের করে চাওই তো কেল্লার সবাইকে বাঁচিয়েছিল, কেল্লাও রক্ষা পেয়েছিল। আর যেহেতু নিজের চোখে কাউকে আমি বিষ মেশাতে দেখিনি, তাই কারো নাম সোজাসুজি বলতে পারবো না। তবে সমস্ত অবস্থা—

জুরা হঠাৎ হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে ভেঙে-পড়া এক পাহাড়ের স্তূপের ওপর গিয়ে উঠলো। কি যেন শোনার ও বোঝার চেষ্টা করছে সে। একটু পরেই চাও ফিরে

এল, জুরার কাছে গিয়ে বললে,—না, কোথাও কোন ছাউনির আগুন নজরে পড়লো না।

চুপ!—জুরা হাত দিয়ে দূরে দক্ষিণ দিকে দেখিয়ে দিলে। উলারদের হিসহিস ডাক আসছে সেদিক থেকে।

চাও ফিসফিস করে বললে,—তুমি যা বলতে চাও, সেই বুনো জানোয়ার আর পাখিদের চিৎকার আমিও শুনতে পেয়েছিলাম। দূরে ঐ গিরিখাতটার দক্ষিণে ঐ যে পর্বতটা, ওখানে তিনটে আলাদা আলাদা জায়গায় উলাররা তিনবার হিসহিস করে ডেকে উঠেছিল ঃ প্রথমে ওখানে, তারপর ঐ ওখানে—

বলতে বলতে চাও, উলাররা কোথায় কোথায় ডেকেছিল, হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়,—ওখানে একটা ঝাঁক তো আমার মাথার ওপর দিয়েই উড়ে গেল। পাখিগুলো খুব ভয় পেয়ে গেছলো, কিন্তু তা বুনো জানোয়ারদের জন্যে মনে হয় না।

ওরা ওখানেই আছে!—দ্বিধাহীন কণ্ঠে জুরা বললে।

কিন্তু কিছুই তুমি খাচ্ছ না, জুরা,—চাও বললে ঃ এটা ঠিক নয়। এই নাও, এটা ধরো।

বলতে বলতে সে একখানা কেক এগিয়ে দেয়।

—না, খাওয়ার কথা এখন ভাবছি নে।

চাও ঠিক মেয়েদের মতো। সে জানে শুধু খাওয়া আর জিরনো।—সঈদের গলা শোনা যায়। পরক্ষণে ঝুঁকেপড়া পাহাড়টার পেছন থেকে তার মাথা বেরিয়ে এল।

আমরা এখন দক্ষিণ দিককার ঐ পর্বতটায় যাচ্ছি।—জুরা বললে। তার কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল, বাদ-প্রতিবাদ সেখানে প্রশ্নাতীত।

সবাই আবার রওনা হয়।

পর্বতে উঠতে উঠতে তিনটে ঘোড়া একেবারেই ক্লান্ত অশক্ত হয়ে পড়লো। তাদের ছেড়ে দিতে হলো, হযতো খেয়েদেয়ে জিরিয়ে আবার তারা চাঙা হয়ে উঠতে পারে, সেই আশায়। এখানে ঘাস-জল যথেষ্ট।

ভোরের দিকে পর্বতটার ওপাশে এক সরু গুহায় কিছু টাটকা পোড়া কাঠ তাদের নজরে পড়লো।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি নে।—চিন্তিত কণ্ঠে জুরা বললে ঃ বাসমাচিদের যাওয়ার রাস্তায় তিনবার আমরা এলাম, লুকিয়েও রইলাম তাদের জন্যে, এমন কি দুবার তাদের নাগালও প্রায় ধরে ফেলেছিলাম। অথচ ফি বারই তারা জানতে পারছে, আমরা কোথায় আছি। লড়াই না করেই সরে পড়ছে। আশ্চর্য!

হতে পারে তাদের কাছে দুরবীন আছে,—গোরা মন্তব্য করলে ঃ তা-ই দিয়ে পাহাড়-পর্বতের একশো মাইল পর্যন্ত তারা দেখতে পাচ্ছে। তা ছাড়া আরো কত কিছু হতে পারে! সেসব একটু ঠাণ্ডা মাথায় ধীর চিত্তে ভাবা দরকার।

শেষ পর্যন্ত একটা বিষয়ে সবাই একমত হলো—বাসমাচিদের ভাল টহলদারী ব্যবস্থা আছে, তাই অনেক কিছুই তারা জানতে পারছে আগে থেকে।

থোড়াইকেয়ারী চালে সঈদ চলেছে। ওসব ছেলেমানুষী গবেষণায় তার রুচি নেই—এমনি নির্লিপ্ত ভাব।

হঠাৎ জুরা ফুঁসে উঠলো,—সঈদ!

বারবার তাদের বোকা বনতে হচ্ছে, তাই ভেতরে ভেতরে ক্রমেই গরম হয়ে উঠছে সে। তার কণ্ঠ কানে যেতেই সঈদের হাবভাব মুহূর্তে পাল্টে গেল। তিক্ত কণ্ঠে জুরা বললে,—তুমি কসম খেয়ে বলেছিলে, এসব পাহাড়-পর্বত তোমার নখদর্পণে। তুমি পথ দেখিয়ে

নিয়ে গেলে তিন দিনের মধ্যেই আমরা বাসমাচিদের নাগাল ধরতে পারবো, বলেছিলে। তিন দিন কেটে গেছে। আর একদিন সময় দিচ্ছি তোমায়......

তারপর?—দাঁতে দাঁত এঁটে মুখ দিয়ে বাতাস টেনে নিয়ে সঈদ হিসহিস করে উঠলো ঃ তার মধ্যে যদি না পারি?

জুরা জবাব দেয় না।

—তাগাইয়ের মাথার জন্যে আমায় তুমি কত দিতে রাজী?

ওটা আমি নিজেই নেব!—জুরার নিরুত্তাপ কণ্ঠ।

ওঃ, তাই নাকি!—ক্ষণেক চুপ করে থেকে সঈদ কঠিন গলায় আবার বললে ঃ বেশ, আমি টহলে বেরোচ্ছি। আমার জন্যে সবুর করো এখানে। আর একটা কথা, আমার পেছনে যেন কেউ না আসে। তার অসতর্কতার জন্যে আমার জীবন বিপন্ন হতে পারে।

তারপর বুটজোড়া পালটে রাইফেল পরীক্ষা করে সঈদ রওনা হলে দক্ষিণমুখো।

তার হাবভাব কথাবার্তা গোরার মোটেই ভাল লাগে নি। বিশেষতঃ ওর শেষ কথা কয়টিতে কি যেন এক গভীর সন্দেহ উঁকি মারছে তার মনের কোণে।

সঈদ চলে যেতে শান্ত নীচু গলায় সে বললে,—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি নে, জুরা। টাকা পেলে ও তাগাইয়ের মাথা আনতে পারে বলছে, আবার ওর পেছনে কাউকে যেতেও বারণ করছে।

জুরার পাশে চাও দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন ভাবছে। গোরার কথা সে পুরোপুরি সমর্থন করে বললে,—আমিও ঠিক এই কথাটা ভাবছিলাম। সঈদ কি জানে, বাসমাচিরা কোথায় আছে? ওর পেছনে গোপনে কাউকে পাঠালে হতো না?

গোরা চাওযের এ কথায় জোরের সঙ্গে সমর্থন জানালে। কিন্তু জুরা নিরুত্তর। সামনের দিকে দৃষ্টি মেলে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে সে।

দিন ভোর দলটি সেখানে অপেক্ষা করে সঈদের জন্যে। আগের মতোই নীরবে ও নির্দ্বিধায় চাও সবার জন্যে সব কিছুরই ব্যবস্থা করে দেয়। চিরকালই সে বিনয়ী ও স্বল্পবাক্। জুরাকে বিপদ থেকে আড়াল করার জন্যে সবসময় তার চেষ্টা জুরার কাছে কাছে থাকা, কিন্তু এমনভাবে যাতে কেউ বুঝতে না পারে।

শিবির-জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপারে জুরার কোন আকর্ষণ নেই। ওসবে মন দিতে সে কোন দিনই পারে না। তেমনি গোরা ও চাওয়ের অভিযোগ ও আশঙ্কায় কান দিতেও সে রাজী নয়। তার ধারণা হয়েছে, তাকে কে কত ভালবাসে, তাই নিয়ে রেষারেষি চলেছে দোস্তদের মধ্যে। আর তার ফলে বিরাট এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধা পড়ছে বারবার।

এই পর্বত-মুল্লুকের অন্ধিসন্ধি সত্যিই সঈদের নখদর্পণে। ঘণ্টা সাতেক চলার পর বাসমাচিদের সে ধরে ফেললে। ঘণ্টা খানেক পরে তাকে দেখা গেল তাগাই ও বলবকের সঙ্গে। সামনে খাবারের চাদর বিছানো, তাতে ভুরিভোজের উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে, আর তার তিন পাশে বসে আছে তিনজন—সে, তাগাই ও বলবক। উলারের পালক দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে সে শুনছে ওদের কথা।

তাগাই বলছে,—তুমি ওদের দেরি করাতে পার না, এটা আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না। ওদের বিপথে নিয়ে যাও, আরো দূরে পর্বত-মুল্লুকের মধ্যে নিয়ে ফেল। যে কোন ভাবে হোক, দেরি ওদের করাতেই হবে।

কি বলছো তুমি!—দাঁত খোঁটা বন্ধ করে সঈদ বললে ঃ তোমাদের গন্তব্য পথের

ঠিক উল্টো দিকে ওদের আমি নিয়ে গেছলাম। এত উঁচু পর্বতের মাথায় ওদের তুলেছিলাম যে, আমার নিজের কলজেই ফেটে যাবার জোগাড়। রসদ ও কার্তুজের বড় একটা অংশ তাদের আমি ফেলে দিতে বাধ্য করেছি, ফি ঘোড়ায় চড়িয়েছি দুজনকে। কত আর শুনবে! শ্বেত পর্বতের মাথায়ও টেনে নিয়ে গেছলাম তাদের। কিন্তু সেখানে অত উঁচুতেও জুরা ধরে ফেললে, তোমরা কোথায় আছ। কি করে যে সে এসব পারে, আমার মগজে আসে না। সে মানুষ নয়—আস্ত শয়তান!

কিন্তু তাগাইয়ের কণ্ঠে তবু অবিশ্বাসের সুর। মাথা দোলাতে দোলাতে সে বলে, —একটা কথা স্পষ্ট বলো সঈদ, যা তোমাকে দিয়েছি আর যা দেব বলে হলফ করেছি, তাতে কি তোমার মন ওঠে নি? আর কত চাও, পষ্টাপষ্টি বলো। না কি জুরার কাছে তুমি নিজেকে বেচে দিয়েছ?

জুরার এক দানা সোনা নেই যে আমায় কিনবে। সোনা তার হবেও না কোন দিন। একটা—শুধু একটা চিন্তায়ই সে ডুবে আছে। কাফেলার লোকদের কাছ থেকে সামান্য একশোটা টাঙা নিয়েছিলাম বলে আমায় প্রায় খুন করার জোগাড় করেছিল, এমনি নোংরা কুত্তার বাচ্চা!—বলতে বলতে সঈদ থেমে যায়। তারপর বলে: তুমি অবশ্যি মনেও স্থান দিও না যে, যা দিয়েছ তাতে তার হাত থেকে তুমি রেহাই পাবে। না, অত সহজে পার পাবে না। যদি বেঁচে থাকতে চাও তো আরো দিতে হবে, নয়তো তার হাতে তোমার জান যাবে।

ইমামের দিকে একনজর তাকিয়ে তাগাই বললে,—এমন লোকও আছেন যিনি ওর মাথার জন্যে তিরিশ হাজার মোহরও দিতে রাজী।

বলবক নীরবে মাথা নাড়লেন।

ওর মাথা?—সঈদ যেন গোঙিয়ে উঠলো: বদমাশ পাজী চীনেটা তার মাথা পাহারা দিচ্ছে, হিন্দুস্থানের ঐ ভিনদেশী গোরা ছোঁড়াটাও তাকে ছেড়ে এক পা এদিক-ওদিক নড়ে না। তারপর আছে ঐ ভালুকের মতো কুকুরটা—মূর্তিমান চিতাবাঘ যেন! সে থাকতে তার মনিবের লাশ থেকে কেউ মাথা কাটবে, তা ভাবতেও পারা যায় না। তার জন্যে কুত্তাটাকে খুন করতে হয় প্রথমে, আর তা করতে হলে গোটা দলটাকেই সাবাড় করতে হবে। সুতরাং ওসব ছাড়। তোমাদের খুঁজে বের করতে জুরা চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছে। তার মধ্যে না পারি তো আমায় পালাতে হবে। তারপর বড় জোর দু দিন—তার মধ্যেই সে তোমাদের নাগাল পাবে। তার কাছ থেকে তোমাদের পালানো অসম্ভব।

চিন্তিত কণ্ঠে তাগাই বললে,—সবই তো বুঝলাম। কিন্তু হাতে এমনি একটা গুরুতর জরুরী কাজ রয়েছে যে, ওদের সঙ্গে লড়াই করার ঝক্কি নেওয়া চলে না। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, দক্ষিণে একটা জায়গায় আমাদের পৌঁছতেই হবে। লড়াই করতে—

না, লড়াই নয়।—সঈদ বাধা দিলে: অন্য কিছু ভাব, উঁচুদরের কোন বুদ্ধির খেল। বন্দুকে জুরা অব্যর্থ, তাই লড়াই করার মানে হয় না। আচ্ছা, ওত পেতে থাকার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? তার জন্যে জনা বারো লোকের মায়া অবশ্যি ছাড়তে হবে।

পর্বতের মাথায় ওত পাতার ব্যবস্থা?—তাগাই মাথা নাড়ে: ও দিয়ে জুরার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করা বোকামি। শয়তানের মতোই ওর চোখের দৃষ্টি। তাছাড়া কুত্তাটাও আছে।

ইমাম বলবক চুপ করে শুনছিলেন। এবার বাধা দিলেন। একটা ম্যাপ খুলে সামনে বিছিয়ে ধরে বললেন,—শুনুন, আমার একটা প্ল্যান আছে। এই দেখুন, এখান দিয়ে একটা নদী গেছে। নদী বরাবর ঝোপঝাড় নলখাগড়ার জঙ্গল, তার পরেই একটা খাড়া পর্বত। এই পর্বত থেকে নামার দুটো পথ: একটা হলো সোজা খাড়া পাশ বেয়ে, যা

পাগলে ছাড়া কেউ ভাবতেও পারে না, আর অন্যটা হলো এদিকে, এই দেখন, সরু একটা পথ বেয়ে। পথটা নীচে এসে পাথরের গাদার মধ্যে আরো সরু হয়ে গেছে। আমার প্ল্যান হলো—

বলতে বলতে তাগাই ও সঈদের গলা জড়িয়ে ধরে বলবক তাদের মাথা নিজের মুখের কাছে টেনে এনে কানে কানে ফিসফিস করে বললেন তাঁর মতলবটা।

সঈদ ফিরলো সন্ধ্যা পার করে।

পেয়েছি! পেয়েছি!—বলে সোল্লাসে চেঁচাতে চেঁচাতে সে এগিয়ে এল : বাসমাচিদের নিশানা পেয়েছি! ওরা তখন আগুন জেবলেছিল। ওদের বোধহয় ধারণা হয়েছে, আমরা ওদের নিশানা হারিয়ে ফেলেছি, আর ভয় নেই।

কোথায় দেখলে তাদের?—জুরা জিজ্ঞেস করলে।

দক্ষিণ দিকে হাত তুলে সঈদ বললে,—ঐ ওখানে। তোমাদের নিয়ে যাব সেখানে। চলো রওনা হওয়া যাক।

—ব্যাপারটা খুলে বলো।

—ব্যাপার হলো, ওখানে ছোট একটা নদী যেখানে বড় এক নদীতে গিয়ে পড়েছে, সেখানে নলখাগড়ার জঙ্গলের মধ্যে বাসমাচিরা ঘাঁটি গেড়েছে। দূর থেকে তুমি গিয়েও ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখতে পাবে। ডান পাশ দিয়ে ডাকাতদের আমরা বেড় দিয়ে যাব, তারপর ভোর নাগাদ ওদের খেল খতম।

বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি করে সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে গোরা নিবিষ্ট মনে সঈদের কথা শুনছে আর ধীরে ধীরে মাথা দোলাচ্ছে। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা সঈদ, বাসমাচিরা তোমার উপস্থিতি কোনভাবে টের পায় নি তো?

সচমকে সঈদ চকিত দৃষ্টি হানলে গোরার মুখে। তারপর মুখ বেঁকিয়ে থুথু ফেললে সশব্দে। কোন জবাব দেয় না।

চাও জুরার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নির্বাক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সঈদের মুখের দিকে। গোরার প্রশ্নে তার চমকে ওঠাটা তার দৃষ্টি এড়ায় নি বটে, কিন্তু শুধু ঐটুকুই, সঈদের মুখে আর কোন ভাবান্তর নেই। তার ট্যারা চোখের দৃষ্টি নাকের ডগায় আটকে আছে মনে হয়। চাও দীর্ঘকাল যাবৎ সঈদের অপকর্ম সব খুলে ধরার সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু কোন সূত্র পাচ্ছে না। আপাত দৃষ্টিতে সঈদ মিথ্যে বলছে না। যতদূর মনে হয়, বাসমাচিরা সত্যিই নলবনে আড্ডা গেড়েছে। কিন্তু বাসমাচিদের ধরিয়ে দেবার কাজে সঈদের মতো লোক তো কখনই থাকতে পারে না! এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। নির্ঘাৎ সে কোন ফাঁদ পেতেছে। কিন্তু কি সেটা?

চাও হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে সঈদের কাঁধে অন্তরঙ্গভাবে চাপড় মেরে বললে,—সত্যি সঈদ, এখন বুঝতে পারছি, খাঁটি দোস্ত তুমি!

সঈদ এবার সত্যিসত্যিই হকচকিয়ে যায়। পরক্ষণে সামলে নিয়ে মুখে হাসি টেনে শুকনো গলায় বললে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, চাও তোমার মতো দোস্ত লাখেও একটা মেলে কিনা সন্দেহ। তোমার জন্যে আমি জান দিতেও রাজী।

পার্বত্য নদীটার পাড় ধরে পর্বতের গা ঘেঁষে দলটি এগিয়ে চলেছে। চাও আর সঈদের মধ্যে নতুন করে আবার দোস্তি বিনিময় হতে দেখে জুরা খুব খুশী।

সঈদ সবার আগে। চাওয়ের এই নতুন করে দোস্তির প্রকাশ দেখে সে কিন্তু মোটেই

খুশী হতে পারছে না। তার মনে সন্দেহ উঁকি মারছে ঃ ধড়িবাজ চীনেটা কি তাহলে তার ফন্দি কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে! ইস্ জুরাকে একটাবারও যদি কোনভাবে নীচে নলবনের দিকে নেওয়া যায়! কাসমাচিরা ওর জন্যে ডাইনে ও বাঁয়ে ওত পেতে থাকবে, কথা আছে।

দলটি এগিয়ে চলে। ঘোড়াগুলোও যেন সওয়ারদের উত্তেজনা আঁচ করতে পারছে। তাদের গতি দ্রুততর হয়।

চাও চলেছে জুরার ঠিক পেছনে। তার মনে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। সঈদ ফাঁদ পেতেছে, সে বুঝতে পারছে। কিন্তু জুরাকে তা বলে লাভ নেই। এমন কিছু কি করা যায় না, যাতে সঈদ নিজের ফাঁদে নিজেই আটকা পড়ে! কিন্তু কিভাবে? আকাশ-পাতাল ভেবেও চাও সঈদের মতলবটা ধরতে পারছে না। নিজের ওপরই তার রাগ হয়।

চাওয়ের পেছনে গোরা। উদ্বিগ্ন সে-ও। ব্যাপারটা কেন যেন তারও ভাল ঠেকছে না। কিন্তু ধরতেও পারছে না কিছু। শুধু সজাগ সতর্ক থাকছে সবসময়। সঈদের ওপর তার কড়া নজর।

প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় মগ্ন। তারার আলোয় সঈদের চোখ চকচক করছে। তা থেকে তার ভেতরের উত্তেজনা কতর্কটা আন্দাজ করা যায়।

প্রথম পর্ব ২

পূব আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। তারাদের ঝিলিমিলি আর নেই। দলটি তখনো এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ টীক থমকে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে জুরার ঘোড়াও।

দাঁড়িয়ে যায় পেছনের ঘোড়াগুলোও।

জুরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সামনের দিকে। পর্বতে ঘেরা বড় এক উপত্যকা। একটা নদী বয়ে চলেছে। ওরা যে পর্বতটায় দাঁড়িয়ে আছে, প্রথম দিকে সেটা কিছুটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, কিন্তু তার পরেই খাড়াই, নীচে গিয়ে নেমেছে সোজা খাড়াভাবে। একেবারে নীচে বালি আর রাশিরাশি পাথরের চাঁই। তার পরেই শুরু হয়েছে নলখাগড়ার জঙ্গল—ঘন ও অন্ধকার। জঙ্গলের পরে দেখা যাচ্ছে নদীটার চকচকে আঁকাবাঁকা রেখা।

জনপ্রাণী বা আগুনের চিহ্ন নেই কোথাও।

সজোরে কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে ঘোড়া থেকে নামতে নামতে জুরা ধরা গলায় বললে,—এসে গেছি আমরা।

সবাই নেমে পড়লো ঘোড়া থেকে।

পর্বতের ঢাল বেয়ে সরু একটা সুঁড়িপথ এঁকেবেঁকে গেছে তলা পর্যন্ত, আর ডাইনে কিছু দূরে সঙ্কীর্ণ একটা খাত নেমে গেছে নদীর পাড় অবধি।

সুঁড়িপথটা দেখিয়ে সঈদ বললে,—আমাদের দুজন এই পথে যাবে।

আর ঐ পথে,—চাওয়ের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে সে খাতটা দেখিয়ে দিলে ঃ ঐ পথে যাবে অন্য সবাই। দু দিক থেকে তাহলে ওদের আমরা ঘিরে ফেলতে পারবো।

কয়েক লহমা জুরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে শুকনো গলায় বললে,—বেশ, তাই হোক। চাও আমার সঙ্গে থাকবে।

তারপর সঈদ ও গোরার দিকে ফিরে খাতটা দেখিয়ে সে বললে,—আর তোমরা দুজন বাকী লোকদের নিয়ে ডাইনে ঐ পথে যাবে। পথটা পরখ করার জন্যে আগে টহলদারী লোক পাঠিয়ে দেখ।

গোরা এগিয়ে গেল জায়গাটা নিজের চোখে ভাল করে দেখার জন্যে।

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা চাওয়ের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সঈদের মতলব বুঝতে পেরে সে শিউরে উঠলো। জুরা সমেত গোটা দলটাকে নিশ্চিহ্ন করার এর চেয়ে চমৎকার শয়তানী ফাঁদ আর হতে পারে না।

কী সাংঘাতিক! মনে মনে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

এখন কি করা? জুরার কাছে এসব বলা নিরর্থক। গর্তের মধ্যে সেই যে সে ঐ ভাগ্যান্বেষী বদমাশটার সংগে দোস্তি পাতিয়েছে, তা থেকে তাকে এক চুল নড়ানো যাবে না, যতক্ষণ না সে নিজে কঠিন আঘাত খেয়ে বুঝবে।

দুঃসহ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় চাওয়ের অন্তরাত্মা ছটফট করতে থাকে। এত অসহায় সে জীবনে বোধ করেনি। এই শেষ মুহূর্তে এত বড় বেইমানি সে রোধ করবে কিভাবে?

হঠাৎ তার চিন্তায় বাধা পড়লো।

'এস চাও।' বলে জুরা এগোনোর জন্যে পা বাড়াতেই, চাও আর ভাববার সময় পেল না, নিরুপায়ের মতো ছুটে গিয়ে জুবার জামার আস্তিন চেপে ধরলো।

জুরা অবাক, সপ্রশ্ন দৃষ্টি তার চোখে।

চাও বললে,—একটু দাঁড়াও। যেও না।

তারপর সুঁড়িপথটা দেখিয়ে বললে,—ভাল করে একটু তাকিয়ে দেখ, ও পথে নামলে আমরা কোথায় গিয়ে পেঁাছবো? সোজাসুজি ডাকাতদের খপ্পরে গিয়ে নয় কি? পর্বতটা নীচের দিকে গিয়ে কিভাবে খাড়াভাবে নেমেছে দেখছো, একবার নামলে আর পেছিয়ে আসার উপায় থাকবে না। অন্ধকার রাত্রি বলেই এসব ন্যাড়া পর্বতে আমরা এখনো কারো নজরে পড়ছি নে।

বাজে কথা রাখ!—সঈদ খেঁকিয়ে উঠলো ঃ বলো যে, ভয় পেয়ে গেছ, তাই পেছিয়ে যাচ্ছ। এসব ব্যাপারে নাক গলানোর মতো কতটুকু হিম্মৎ আছে তোমার? কি জান তুমি? যে জানে, সে হলো জুরা—বীর জোয়ান। দরকার পড়লে গোটা দলের সংগে সে একাই মহড়া দিতে পারে। ঠিক আছে, তোমার যেতে হবে না, আমিই যাব।

ধীর স্থির শান্ত যে লোক চিরকাল, সঈদের কথা শুনে সে বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

ও প্রশ্ন ওঠে না।—সঈদের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে, কঠিন গলায় চাও বললে, আবেগে উত্তেজনায় তার গলা কাঁপছে ঃ মোটেই ও প্রশ্ন ওঠে না! জুরা, একটু ভেবে দেখ, নিছক ফাঁদ ছাড়া এটা আর কিছু নয়।

চাওয়ের কথার ন্যায্যতা জুরা উপলব্ধি করে। কিন্তু দুশমনদের সঙ্গে পাঞ্জা কষার জন্যে সে অধীর হয়ে পড়েছে। ভোর হবার আর খুব দেরি নেই, তখন আর কিছুই করার থাকবে না। তাই দৃঢ়কণ্ঠে সে বললে,—ফাঁদ হোক আর যাই হোক, এই পথেই আমরা নামবো। সঈদ, তোমরা ঐ পথে যাও। নীচে গিয়ে আমরা মিলিত হবো। চলো, রওনা হওয়া যাক।

জুরার কথায় খোশমেজাজে সঈদ মাথা নাড়ে। চোখ দুটো তার চকচক করে ওঠে সাফল্যের আনন্দে।

চাও কি করবে ভেবে পায় না। ডান দিকটা দেখিয়ে মিনতিভরা কণ্ঠে আবার সে বললে,—জুরা, দোস্ত আমার, আবার বলছি, তাকিয়ে দেখ, নীচের দিকে পথটা কি

রকম কুয়োর মতো সরু হয়ে গেছে। কি করে আমরা যাব? বাসমাচিরা হয়তো ওখানেই ওত পেতে আছে। কয়েক লহমা একটু দেরি করো ভাই, আগে কাউকে পাঠিয়ে পরখ করে দেখা যাক।

জুরার চোখে ভ্রূকুটি। বললে,—তুমি ভয় পেয়েছ, মনে হচ্ছে!

চাও এবার ভাষা হারিয়ে ফেলে। জুরার জামার আস্তিনটা তার মুঠি থেকে ধীরে ধীরে আলগা হয়ে গেল। আর বলার কিছু নেই। যাই সে বলুক, জুরাকে এখন আর কোনভাবেই নিরস্ত করা যাবে না। শেষে ফিসফিস করে সে বললে, ক্ষোভে দুঃখে হতাশায় তার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে,—ভয়! ভয় কাকে বলে আমি জানি নে, জুরা। আমার এত দিনের জীবনই বোধহয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ভয় শুধু তোমাকে নিয়ে, যা তুমি কোন দিনই বুঝতে পারবে না—

বলতে বলতে তার কণ্ঠে জাগে এক নতুন সুর, যা এর আগে কেউ শোনে নি,—ভেবেছিলাম, এত কাল পরে জীবনে একটা জায়গায় এসে বুঝি নোঙর ফেললাম...... যাক গে, চুলোয় যাক ও সব......চলো, যাচ্ছি। তোমার সঙ্গেই মরবো। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবো, মরেও যদি তোমায় বাঁচাতে পারি।

নির্বাক সঈদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ অদূরে গোরাকে এগিয়ে আসতে দেখেই সে চঞ্চল হয়ে উঠলো। গোরা এলে আবার নতুন করে কোন্ ঝামেলা বাধবে কে জানে, তাই সঙ্গে সঙ্গে সে দলবল নিয়ে এগিয়ে গেল গোরার দিকে, বললে,—চলো, ডান দিকে যাওয়া যাক্।

না, সবুর করো একটু!—গোরা মাথা ঝাঁকায়ঃ জুরাকে একটা কথা বলার আছে।

সঈদ সচকিত। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বাধা দিলে,—কোন দরকার নেই। দেখছো না, জুরা চাওকে নিয়ে সুঁড়িপথটার দিকে রওনা হয়ে গেছে?

সত্যিই তাই। অসহায় চোখে গোরা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেদিক পানে আর নিজের মনে বিড়বিড় করে,—এটা কি ঠিক হলো! এটা কি ঠিক হলো!

শেষে সে ফিরলে সঈদের দিকে। গুরুতর আশঙ্কায় মন তার অন্ধকার।

সঈদ আগে আগে চলেছে। গোরা পেছনে রওনা হলো। ততক্ষণে সে অনেকটা সামলে নিয়েছে। নীচু গলায় এক সময় সে হাঁক ছাড়ে,—হেই সঈদ, পথটা ভাল করে আবার পরখ করার জন্যে আগে কাউকে পাঠানো যাক। জুরাও তাই বলে দিয়েছে।

সঈদ কিন্তু থামে না ক্ষণেকের জন্যেও। যেতে যেতে বিষম বিরক্তির ভান করে বলে,—কেন বলো তো? অনর্থক দেরি ছাড়া ওতে আর কোন্ লাভটা হবে শুনি! ভয়ের তো কিছুই দেখছি নে।

বলতে বলতে সে একটা দিশী সিগারেট ধরালে। বাসমাচিরা কোথায় ওত পেতে আছে, সে জানে। ওরা যাতে তার দিকে গুলি না চালায়, তারই সঙ্কেত এটা।

এদিকে সরু সুঁড়িপথ ধরে জুরা নামছে। টীক ছুটছে আগে আগে। কিছু দূরে কতকগুলো ঝোপ—জমাটবাঁধা অন্ধকার যেন। হঠাৎ গুলির শব্দ! গুলির পর গুলি। গুলি খেয়ে ঘোড়াটা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেই পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়লো। জুরাও পড়ে গেল ঘোড়া থেকে। কিন্তু সেই চরম বিপদের মুহূর্তেও উপস্থিত বুদ্ধি সে হারায় নি। মরার ভান করে সে গড়িয়ে নেমে চলে ঘোড়াটার পিছু পিছু।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে গোলাগুলি থেমে যায়।

প্রথমেই যে পাথরের ঢিবিটা সামনে পড়ে, তাই ধরে জুরা টাল সামলায়। মাথা তুলে তাকায় এদিক-ওদিক। চাও কোথায় গেল? ওপরের ঢালে বা নীচে কোথাও

তার পাত্তা নেই। হঠাৎ টীক ছুটে এল। শত্রুর নজর এড়িয়ে পাহাড়গুলোর গা ঘেঁষে ঘেঁষে সে এসেছে। গোঁ গোঁ করতে করতে সে জুরাকে শোঁকে আর তার বাহুটা চাটার চেষ্টা করে—সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে জুরা ফিসফিস করে বললে,—ভাল আছি রে, মরিনি! ভয় নেই, বুলেটটা শুধু একটু আঁচড় কেটে গেছে।

কনুইয়ের কাছে বাহুতে বুলেট লেগেছে। কোমরবন্ধ থেকে এক টুকরো কাপড় ছিঁড়ে সে বাহুটা বেঁধে ফেললে। কোন যন্ত্রণা-বোধ নেই।

ঝোপগুলোর কাছে চারটে পাথুরে-ঢিবির পেছন থেকে আবার গুলি আসছে। জুরা টীককে গড়িয়ে পাশের এক ঢিবির পেছনে টেনে এনে ফিসফিস করে বললে,—শুয়ে থাক, নড়বি নে!

তারপর রাইফেলটা ঢিবির মাথায় রেখে সে তাক করতে যাবে, অমনি আবার গুলি! তার টুপিটা উড়ে গেল।

ইস্, একচুলের জন্যে বেঁচে গেলাম! রাইফেলে ওস্তাদ দেখছি!—নিজের মনে সে বললে। বিপদের ভয়ঙ্করত্ব বুঝতে তার দেরি হয় না।

হঠাৎ বাঁ দিকের এক ঢিবির পেছন থেকে এক পশমী টুপি জেগে উঠলো। জুরা গুলি ছুড়লো। সঙ্গে সঙ্গে পশমী টুপিটা অদৃশ্য। তার মানে গুলি ফসকে গেছে। আরেকটা ঢিবির পেছনে আবার দেখা গেল আরেকটা বাসমাচির মাথা। আবার গর্জে উঠলো জুরার রাইফেল। কিন্তু এবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট।

তাড়াহুড়ো করো না! তাড়াহুড়ো করো না!—নিজের মনে বারবার সে আওড়ায় কথাটা। সবচেয়ে দূরের ঢিবিটার পেছনে একটা বাসমাচি নজরে পড়ছে। জুরা সাবধানে রাইফেল তাক করলে। ঢিবির ওপর বসানো ছিল বাসমাচির রাইফেলটা। জুরা গুলি ছুড়তেই তার চোঙ ওপরমুখো উঠে গেল, সেই ভাবেই থেকে গেল অনড় অবস্থায়। তার মানে—ওটা খতম!

পাঁচটা কার্তুজ আছে, মাত্তর পাঁচটা!—জুরা মনে মনে হিসাব করে। কাঁধ থেকে খালি কার্তুজের বেল্টটা নিয়ে সে টীকের গলায় বেঁধে ওপর দিকে দেখিয়ে বললে,—যা, ছুটে যা চাওয়ের কাছে, কার্তুজ নে আয়!

টীক ছুট দিতেই, জুরা ঢিবির পেছন থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে এবং পরক্ষণে যেন গুলি লেগেছে এমনি ভান করে টলতে টলতে পড়ে গেল ঢিবির পেছনে। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতদের গুলি ছোড়া বন্ধ।

যাক, টীক এতক্ষণে নিরাপদে ওপরে উঠে গেছে।—জুরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

ওপর থেকে গুলির আওয়াজ আসছে। দুজন বাসমাচি পাহাড়ের পেছন থেকে বেরিয়েই ঝোপের দিকে ছুটে গেল। তৃতীয় জন উঠে দাঁড়াতেই পড়ে গেল জুরার গুলি খেয়ে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ছুটে এল টীক। জুরা তার গলা থেকে কার্তুজের বেল্টটা খুলে নিলে।

দলের অন্য সবাইকে নিয়ে সঈদ যেদিকে গেছে, সেদিক থেকেও গুলির আওয়াজ আসছে। ঢিবির মাথায় বন্দুক রেখে জুরা ছুটন্ত বাসমাচিদের তাক করে আবার গুলি চালায়। আরেকজন ডাকাত পড়লো।

সামনের দিকে ঝোঁকা পাহাড়টার পেছন থেকে হঠাৎ চাও বেরিয়ে এল। জুরার দিকে ছুটতে ছুটতে চাপা গলায় চেঁচাচ্ছে সে,—জুরা, জুরা! আঃ তুমি আছ! তোমায় আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম!

রাগতকণ্ঠে জুরা জিজ্ঞেস করলে,—কিন্তু তুমি গুলি চালাও নি কেন?

কি করে চালাবো?—চাও বললে ঃ আমার রাইফেলটা কেউ অকেজো করে দিয়েছে। ভেবে পাচ্ছি না, সঈদ ছাড়া এ কাজটা আর কে করতে—

জুরা বাধা দেয়,—শুনতে পাচ্ছ ঐ গুলির শব্দ? আমাদের লোকদের ওরা গোপন জায়গা থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করেছে। দৌড়ে চলো।

ঘাসের জমিতে নেমে তারা ছুটে পার হয়ে গেল খাড়া পাহাড়টা। জুরা খোঁড়াচ্ছে। ঘোড়ার সঙ্গে গড়িয়ে পড়ার সময় হাঁটুতে চোট খেয়েছে।

ডাইনে পর্বত-ঢালের ওপাশ থেকে গুলি ও বোমার আওয়াজ আর হল্লা আসছে।

সহসা দূর থেকে আর্ত চিৎকার ভেসে এল,—বাঁচাও! বাঁচাও!

চলো, চলো, বাঁচাতে হবে।—বলতে বলতে জুরা লাফ দিতে যেতেই, পেছন থেকে চাও তাকে টেনে ধরলো, আর্তকণ্ঠে বললে,—না, না, কক্‌খনো ওটা করো না। বুঝতে পারছো না, ওরা সামনেই গোপনে ওত পেতে আছে? তাছাড়া কে সাহায্য চাইছে, তা-ও আমরা জানি নে। ভাল করে—

তার কথা শেষ হয় না। তার আগেই ঝুঁকে-পড়া পাহাড়টার পেছন থেকে সঈদ বেরিয়ে এল, চিৎকার ছাড়লে,—বাঁচাও! বাঁচাও!

সঙ্গে সঙ্গে জুরা আবার লাফ দেবার চেষ্টা করতেই, চাও তাকে জাপটে ধরলো। আপ্রাণ চেষ্টা করে সে জুরাকে পাহাড়ের আড়ালে আটকে রাখতে।

সঈদ হাত নেড়ে আবার হাঁক ছাড়লে,—শীগ্‌গীর, শীগ্‌গীর! শীগ্‌গীর এস এই পথে!

বাসমাচিরা সঈদের দিকে প্রায় সোজাসুজি গুলি চালাচ্ছে। কিন্তু তাজ্জব কাণ্ড! বুলেট তাকে স্পর্শও করছে না!

ওরা তোমায় খুন করবে!—হাঁপাতে হাঁপাতে চাও বললে ঃ নির্ঘাৎ খুন করবে! এটা ওদের ফাঁদ। শোন জুরা, শোন, একটু স্থির হও।

কিন্তু জুরা যেন ক্ষেপে গেছে। তার নিজের লোকেরা বিপদে পড়েছে, দোস্ত সাহায্য চাইছে, আর চাও কিনা তাকে আটকে রাখছে! এ কী অনাসৃষ্টি! চাওকে সে ঠেলে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু চাও পা দিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে তার দুই বাহু আঁকড়ে ধরে আছে।

টীকও বিষম উত্তেজিত। ওদের ঘিরে সে লাফালাফি করছে, লড়াই দেখছে, কিন্তু বাধা দেবার চেষ্টা নেই। দুজনের ধস্তাধস্তি চলে পাহাড়টার পেছনে। শেষ পর্যন্ত জুরা পড়ে গেল।

চাওয়ের মুখের বিরাম নেই। দারুণ হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে চলেছে,—কক্‌খনো যেও না! শোন জুরা, এটা করো না! সঈদ আর তোমাকে ওরা খুন করবে......না, না, সঈদকে খুন করবে না। নিজের চোখে কি দেখতে পাচ্ছ না, ওদের বুলেট তাকে স্পর্শও করছে না? আমাদের লোকজন মারা পড়েনি, তারা পাহাড়ের পেছনে আছে।

ততক্ষণে একটা হাত জুরা ছাড়িয়ে নিয়েছে। চাওয়ের বুকে সে এক ঘুষি বসিয়ে দিলে। ক্ষীণ আর্ত স্বর বেরিয়ে এল চাওয়ের কণ্ঠ থেকে। তবু সে জুরাকে ছাড়ে না, একটানা বলে চলে,—জুরা, ভেবে দেখ, সঈদ বেঁচে আছে। তার গায়ে গুলি লাগছে না। এটা ওদের ফাঁদ—

আমরা একসঙ্গেই মরবো!—জুরার কণ্ঠে বিজাতীয় আক্রোশ।

চাও গোঙাচ্ছে। গোঙাতে গোঙাতে বললে,—কিন্তু আমাদের লোকেরা যদি জেতে, এখান থেকে তারা আমাদের উদ্ধার করবে। উঃ! জুরা যেও না...উঃ! আমার পাঁজরা ......ইঃ! তুমি মরলে কি লাভ হবে? তাগাই তখনো বেঁচে থাকবে...আঃ—আঁ—আঁ—

ফাঁদে চাও তার মতো একজন জোয়ানকে কিনা এইভাবে আটকে রাখতে পারছে! —রাগে জুরা তাই বুঝি পাগল হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর গলায় ফিসফিস করে সে বললে, —তোমায় খুন করবো! কেন কি জন্যে আমায় আটকে রাখছো? ছাড়ো, ছাড়ো বলছি!

সঈদ এদিকে পাহাড়টার ধারে নিশ্চল দাঁড়িয়ে গেছে—যেন গেঁথে আছে পাহাড়ের সংগে। গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো,—আসছি জুরা, আমি আসছি, তোমায় সাহায্য করছি।

এত বড় অপমান জুরার সহ্যের বাইরে। দু হাতে এবার সে চাওকে পিষতে শুরু করে। চাওয়ের মনে হয়, পাঁজরার হাড়গুলো বুঝি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। আঙুলগুলো অসাড় হয়ে পড়ছে। তবু দুই আঙুল দিয়ে সে জুরার গলার মহাধমনী জুজুৎসুর প্যাঁচে চেপে ধরে আছে। শেষে জুরা এক সময় নিস্তেজ হয়ে পড়তে, তাকে সে ছেড়ে দিলে। তার নিজেরও একচুল নড়ার ক্ষমতা নেই।

অসাড় নিশ্চল চাও চিৎ হয়ে পড়ে রইল এক পাশে।

জুরাও পড়ে আছে নিস্তেজ হয়ে। কি যেন বলছে বিড়বিড় করে। একটু পরে সে চোখ খোলে। সঈদ ছুটে এসে তাকে উঠে বসতে সাহায্য করে।

জুরা ফিরে তাকায় চাওয়ের দিকে। অন্ধকার সে চাউনিতে দাবনীয় জ্বলন্ত ক্রোধ—পাহাড়ী কাঁকড়াবিছের উন্মত্ত প্রতিহিংসা যেন লকলক করছে।

সঈদের তা নজর এড়ায় না। চাও! চাও তার সবচেয়ে বড় দুশমন! ওর জন্যে জুরা এবারও বেঁচে গেল। দুনিয়া থেকে চাওকে সরাতে হলে এই তার মোক্ষম সুযোগ।

হঠাৎ সে হায় হায় করতে করতে চাওয়ের পাশে শুয়ে পড়ে তার মাথা ও টুপি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে,—এই, এই, তোমার বিচার হবে! বিচার হবে! এত বড় সর্বনাশ ঘটিয়ে এখন কিনা এই ভাবে পড়ে থেকে পার পেতে চাইছ—

বলতে বলতে সঈদ থেমে যায়, যেন কথা বলতে পারছে না। তার পরেই চিৎ হয়ে পড়ে গোঙাতে শুরু করলো। মুখ দিয়ে এমনভাবে সে নিশ্বাস নিচ্ছে, যেন দম আটকে আসছে।

দক্ষ অভিনেতা সঈদ! এমনিভাবে ছটফট করতে করতে হঠাৎ একসময় উঠে বসে চাওয়ের দিকে তাকিয়ে সে হাহাকার করে উঠলো,—বেইমান, বেইমান তুমি! অতর্কিতে আমরা বাসমাচিদের ফাঁদে গিয়ে পড়লাম, গোটা দলটাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল! আমাদের সাহায্যে গেলে না কেন? কেন আটকালে জুরাকে? কত চিৎকার করলাম! প্রচণ্ড রাগে ও দুঃখে আমি হাউমাউ করে কেঁদেছি। ঐ ওখানে, ওখানে—

বলতে বলতে সঈদ যেন অসহায় আক্রোশে নিজের কোট-শার্ট ছিঁড়তে শুরু করে: ঐ ওখানে! গোটা দলটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ঐ ওখানে—

প্রচণ্ড রাগে জুরার মাথা আবার আগুন হয়ে উঠলো। তার মনে হলো, দলটা নিশ্চিহ্ন হওয়ার ফলে তার কাজ ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে। গোরাও মারা পড়েছে। আর এজন্যে চাওই দায়ী। সে তাকালে চাওয়ের দিকে। দুঃসহ অন্তর্যাতনা আর বিজাতীয় ঘৃণা উপচে পড়ছে সে দৃষ্টি থেকে।

এই যে! দেখ জুরা, দেখ!—সঈদ ছোঁ মেরে চাওয়ের মাথা থেকে টুপিটা ছিনিয়ে নিয়ে হিসহিস করে উঠলো: এই দেখ!

টুপির ভেতর থেকে সে টেনে বের করলে ছোট্ট একটা মোড়ক। বললে,—এটা কি জান? বিষ! কেল্লা যাতে আত্মসমর্পণ করে তার জন্যে জলের ট্যাঙ্কে ও-ই বিষ মিশিয়েছিল। গত কালই শুধু ধরতে পেরেছি, ওর কাছে বিষ আছে। তোমাকেও সে বিষ খাইয়ে

মারতে চেয়েছিল। কিন্তু তুমি দলের সবার সঙ্গে মিলে মিশে খাও বলে খাবারে বিষ মেশাতে পারে নি।

কাতরাতে কাতরাতে চাও উঠে বসলো। বুকে পিঠে দারুণ ব্যথা। কিন্তু মন নিরুদ্বিগ্ন—শান্ত নির্বিকার। কারণ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, জুরো বেঁচে গেছে। সঈদের মিথ্যা অভিযোগ, নিজের দুষ্কর্ম তার ঘাড়ে চাপানোর এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে সে কিছু উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু অবাক হয় নি, বিচলিতও নয়। সঈদের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার চরম মুহূর্তটি এসে গেছে, সে বুঝতে পারে। কিন্তু রাগে ও বিদ্বেষে জুরোর এখন যা অবস্থা, তাতে তার কোন কথা কি ওর কানে ঢুকবে? না ঢুকুক, তবু সে বলবে। বলা দরকার। তার মনে এখন আর কোন শঙ্কা নেই।

দূর থেকে নদীর কলধ্বনি ভেসে আসছে। শান্ত প্রকৃতি।

ক্ষীণকণ্ঠে চাও বললে,—ষড়যন্ত্র জুরো, সমস্তটাই আগাগোড়া মিথ্যা ষড়যন্ত্র। ওসব কিছুর জন্যে সঈদই দায়ী। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার হাতে আছে। হাতেনাতে প্রমাণ করতে পারি। এত দিন বলিনি, আজ সঈদই বলতে বাধ্য করলো। তুমি খুব রেগে আছ, জুরো। তবু অনুরোধ করছি, একটু স্থির হয়ে শোন। কেল্লার জলের ট্যাঙ্কে—

বিদ্যুদ্বেগে সঈদ লাফিয়ে ওঠে, যেন সাপে কামড়েছে। চোখের পলকে ছোঁ মেরে জুরোর রিভলবারটা ছিনিয়ে নিয়ে সে তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো,—বটে! বটে! দলটাকে খতম করে আবার কথা! বেইমানের শাস্তি মৃত্যু, গুলি। এই নে—

গুলির শব্দ হতেই জুরো চমকে উঠে সঈদের হাত চেপে ধরলো। টলতে টলতে সরে গেল সঈদ।

অদূরবর্তী ঝোপ-জঙ্গল থেকে আবার সাঁ সাঁ শব্দে বুলেটের ঝাঁক আসতে শুরু করে। পাহাড়ে হেলান দিয়ে আগের মতোই চাও বসে আছে। চোখের দৃষ্টি ঘষা কাচের মতো। মাথাটা আস্তে আস্তে তার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়লো। ধীরে ধীরে একসময় কাত হয়ে পড়ে গেল সে।

জুবা যেন বজ্রাহত। চিন্তাশক্তি অসাড়।

মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। ঘন ঝোপ থেকে ভেসে আসছে পাখির কূজন। বাতাসে ধীরে মাথা দোলাচ্ছে পত্রপল্লব ডালপালা।

শোকে দুঃখে জুরো মুহ্যমান। দেহমন ব্যথায় বিকল। কি এক যাতনায় তার গলা যেন বুজে আসছে—তীব্র অব্যক্ত যাতনা।

সাপের মতো আঁকুপাঁকু করে সঈদ এগিয়ে এল একসময়। এখন বাকী শুধু জুরো আর ঐ কুত্তাটা। খুশির হাওয়ায় তার চিত্ত দোদুল। বললে,—আমায় ঐ বেইমান চাও-টাকে গুলি করতে দিয়ে কাজের মত কাজ করেছ, জুরো!

আঘ্!—চমকে গর্জে উঠলো জুরো। সঈদকে লক্ষ্য করে এমন প্রচণ্ড রাগে ঘুষি ছুড়লো যে, সঈদ চোখের পলকে এক ডিগবাজি খেয়ে দূরে সরে গেল হামাগুড়ি দিয়ে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিস্ময়ে আনন্দে জুরো সহসা চেঁচিয়ে উঠলো,—গোরা! গোরা!

হাত, কনুই আর হাঁটুতে ভর দিয়ে গোরা অদূরবর্তী পর্বতটা থেকে নেমে আসছে।

গোরা বেঁচে আছে! গোরা বেঁচে আছে!—আনন্দের আবেগে জুরো চেঁচায় পাগলের মতো।

জুরোকে দেখতে পায় গোরা। পর্বত থেকে নেমেই সে ছুটে এল। চাওয়ের মৃত্যুতে জুরো এমনই বিচলিত বিপর্যস্ত যে, সমবেদনার একটু উষ্ণ স্পর্শের জন্যে মন তার কাঁদছে। গোরাকে সে দু বাহু দিয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে চেপে ধরলে।

কিছু দূরে উঁচুতে বড় বড় কতকগুলো পাথরের ঢিবি। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়তেই গোরা সোল্লাসে লাফিয়ে উঠলো,—ট্যাগ! ট্যাগ! ট্যাগ বেঁচে আছে!

আনন্দের আবেগে জুরাও চেঁচিয়ে ওঠে।

একটু পরে টিলা-ঢিবির আড়ালে আড়ালে ট্যাগ এসে হাজির। বলে,—ঘোড়াটা মরে আমায় বাঁচিয়েছে। গুলি খেয়ে সে লাফিয়ে উঠতেই আমি ছিটকে পড়েছিলাম একটা ঢিবির পেছনে। সে সময় আমার হাত থেকে রাইফেলটা যে কোথায় ছিটকে পড়লো, সারাক্ষণ তার আর পাত্তা পেলাম না। একটু এদিক-ওদিক যে খুঁজবো, তারও উপায় ছিল না। বাসমাচিরা সমানে বোমা আর গুলি চালাচ্ছে। এই এখন আসার সময় ওটাকে পেলাম।

কলকল করে ট্যাগ বলে চলেছে। আর কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সঈদ। গোরা ও ট্যাগ বেঁচে আছে দেখে, মুখ তার কালো হয়ে গেছে। অন্ধকার চোখের দৃষ্টি।

অন্যেরা সব কোথায়?—জুরা একসময় জিজ্ঞেস করে।

হতাশায় গোরা হাত নাড়লে, তার কণ্ঠে বাজে বিষাদ-করুণ সুর,—সব মারা পড়েছে। ভেবেছিলাম, ট্যাগও বুঝি বেঁচে নেই। পাহাড়গুলোর কাছে যেতেই আমাদের ওপর বোমা পড়তে শুরু করলো। সঈদও এই সময় কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি পিছলে দুই পাথর-ঢিবির মাঝখানে পড়ে গেলাম। একটা মরা ঘোড়ার লাশ এসে পড়লো আমার ওপর। তার লাশটা আমায় বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু বাঁ হাতটা মচকে দিয়ে গেছে। আমাদের অন্য দুজন সংগী দুশমনদের ঠেকানোর চেষ্টা করছিল, কিন্তু পেছনের ও পর্বতের তলা থেকে বাসমাচিদের যুগপৎ আক্রমণে ওরা মারা পড়লো। নিজের চোখে সব আমি দেখেছি। বাসমাচিরা চলে গেলে আমি উঠে বসলাম। সামনের পথ বন্ধ। তাই গোপনে আবার পর্বতে উঠে যাই, তারপর তোমার কাছে নেমে এসেছি।

সঈদ এবার এগিয়ে এল, বললে,—ঘোড়াটা যখন তোমার ওপর পড়লো, তখন আমি তো তোমার পাশেই ছিলাম।

সন্দেহ ও অবিশ্বাস ভরা চোখে গোরা তাকায় সঈদের দিকে। সে দৃষ্টি জুরারও নজর এড়ায় না। গোরা বললে,—তোমায় আমি কোথাও দেখিনি।

ট্যাগ ফুঁসে উঠলো,—মিথ্যে কথা বলো না, সঈদ! আমি তোমায় আগাগোড়া দেখেছি, ঝুঁকে-পড়া ঐ পাহাড়টার পেছনে বসে সারাক্ষণ উঁকিঝুঁকি মেরেছো, আর—

সন্ত্রস্ত কণ্ঠে সঈদ বাধা দিলে,—বাজে কথা। বুঝলে গোরা, দুশমনদের তখন আমি গুলি করছিলাম।

—তোমার গুলি আমি একবারও শুনি নি।

ট্যাগ আবার কি বলতে যাচ্ছিল। সন্ত্রস্ত বিপন্ন সঈদ তার আগেই চেঁচিয়ে উঠলো,—আমি কিন্তু তোমাদের রক্ষার জন্যে তখন দুশমনদের রুখছিলাম।

জানি নে, জানি নে!—হাত নেড়ে তিক্ত উত্তেজিত কণ্ঠে গোরা বলে। হঠাৎ তার নজর পড়ে চাওয়ের ওপর। চাও মাটিতে পড়ে আছে, মাথায় জমাট-বাঁধা রক্ত। বিস্মিত সচকিত গোরা জিজ্ঞেস করে,—চাওয়ের কি হয়েছে?

চুপ চুপ! কথা বলো না!—ফিসফিস করে জুরা বললে। তারপর যা যা ঘটেছিল, আদ্যোপান্ত সব সে বলে গেল।

বিস্ময়ে বেদনায় গোরা স্তব্ধ নির্বাক। শেষে একসময় ধীরে ধীরে বলে,—কিন্তু চাও তোমায় বাধা দিয়ে তো ঠিক কাজই করেছিল!

ধীরে ধীরে জুরার মাথা নত হয়ে আসে। এবার বুঝি বাঁধ-ভাঙা চোখের জল সে আর রোধ করতে পারবে না! প্রাণের দোস্তের জন্যে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলবে

মেয়েদের মতো! জীবন দিয়ে দোস্ত তাকে রক্ষা করে গেছে। দোস্ত তাকে ভালবেসেছিল নিজের ছেলের মতো।

অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। সঈদ বললে,—শোন গোরা, চাও যে কত বড় বেইমান, তার প্রমাণ—

চোপ্! খবরদার সঈদ!—গোরা গর্জে উঠলো। চোখে তার অগ্নিদৃষ্টি।

সঈদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। আবার সে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে। মিনতিভরা কণ্ঠে বললে,—শোন গোরা, একটু স্থির হয়ে শোন ভাই। চাওয়ের ব্যাপারটা এত দিন—

খবরদার—স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠলো গোরা, রিভলবারের খাপে হাত দিয়ে দু পা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো, তারপর ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললে : নাঃ! তোমার বিচারের ভার আমি নিজের হাতে নেব না, আইন ভঙ্গ হবে। তোমার ক্ষেত্রে অবশ্য আইন ভাঙাই হয়তো উচিত ছিল। চাওয়ের মৃত্যু আর গোটা দলটাকে নিশ্চিহ্ন করার অপরাধে কজুবেই তোমার বিচার করবেন। বিশ্বাসঘাতক বেইমানের বিচার যেভাবে হয়, তেমনি ভাবেই হবে। শেষবারের মতো তোমায় হুঁশিয়ারি দিচ্ছি সঈদ, আমার ধৈর্যের পরীক্ষা করো না, চাও সম্পর্কে আর একটা কথাও মুখে আনবে না।

গোরার অগ্নিমূর্তি দেখে ভয়ে সঈদ কুঁকড়ে গেছে। গোরার এ চেহারা সে কোন-দিন কল্পনাও করে নি। একপা একপা করে পেছনে হটে কিছু দূরে এক পাথরের চাঁইয়ের পেছনে সে বসে পড়লো।

মাথা হেঁট করে জুরা বসে আছে। কেন জানি, গোবার হাতে সঈদের এই লাঞ্ছনায় সে বড় আরাম বোধ করছে। কিন্তু গোরা কি বলছে? সঈদ বেইমান! তা হয় কি করে? দোস্ত কি কখনো বেইমানি করতে পারে? জুরা উদ্‌ভ্রান্ত। পর্বত-মুল্লুকে মানুষ সে, মানব-চরিত্রের কুটিল খেলা চিরকালই তার ধরা-ছোঁয়ার বাইবে থেকে গেছে! বিহ্বল বিপর্যস্ত মন তার শিশুর সাবল্য নিয়ে শুধু অন্ধকারে মাথা কুটে মরে।

গোরা এদিকে চাওয়ের কাছে এগিয়ে গেছে। চাওয়ের গায়ে হাত দিয়েই সে চমকে উঠলো। চাও এখনো বেঁচে আছে! তার অস্ফুট কণ্ঠ থেকে কথাটা বেরিয়ে যেতেই, চকিতে সে তাকালো জুরা ও সঈদের দিকে। না, ওরা শুনতে পায়নি। ইশারায় ট্যাগকে কাছে ডেকে তাকে কি যেন সে বললে ফিসফিস করে। তারপর নিবিড় ভালবাসায় চাওকে সন্তর্পণে কোলে তুলে নিলে। ক্ষীণ কণ্ঠে কাতরে ওঠে চাও। আরো একটু ভেতরের দিকে বড় দুটো ঢিবির আড়ালে নিয়ে চাওকে সে শুইয়ে দিলে ঠিকমতো। তারপর সে ও ট্যাগ দুজনে মিলে কয়েকটা ঘাস-পাতা-শ্যাওলা খুঁজে পেতে এনে চিবিয়ে মাকড়সার জাল দিয়ে পটি বেঁধে দিলে চাওয়ের মাথায়। ওর বাঁচার আশা খুবই কম। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, বুকের ধুকপুকানি কখন বন্ধ হয়ে যাবে, ঠিক নেই। যাই হোক, মনে মনে তার সঙ্কল্প স্থির, চাও সম্পর্কে কোন কথাই সে ওদের বলবে না। ট্যাগকেও সেইমতো সতর্ক করে দিলে।

প্রথম পর্ব ৩

সারা দিন কেটে যায়। পর্বতের ওপরে জুরা, গোরা, ট্যাগ আর সঈদ। আর নীচে নলখাগড়ার জঙ্গলে বাসমাচি-দল। দু পক্ষই ওত পেতে আছে।

শেষ রাত। গোরা, ট্যাগ ও সঈদ ঘুমোচ্ছে। এক টিলার পেছনে নিশ্চল হয়ে লুকিয়ে নজর রাখছে জুরা। হঠাৎ অল্প দূরে একটা ছায়া দেখা গেল। কোন বাসমাচি হয়তো গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। গুলি করার জন্যে জুরা তৈরী হয়।

কিন্তু টীক উঠে বসে নিঃশব্দে দাঁত খিঁচিয়ে উঠতেই তার ভুল ভাঙে। না, অন্য কিছু নয়, ডাকাতদের কুকুর একটা, এদিক-ওদিক ঘুরছে। বেওয়ারিশ কুকুর হওয়াও বিচিত্র নয়। কারণ যে কুকুরের মালিক থাকে, খাওয়ার খোঁজে তাকে ছোঁকছোঁক করে বেড়াতে হয় না।

জুবা টীকের মাথায় হাতের চাপ দিতেই, টীক অনুগতভাবে শুয়ে পড়লো। কুকুর-টাকে দেখামাত্র অদ্ভুত এক মতলব জুরার মাথায় এসেছে। রাইফেল পাশে রেখে, সে কোমরবন্ধ খুলে কেকের কয়েকটা টুকরো বের করে নিলে। বাসমাচিদের নজরে পড়ার ভয়ে, এত অন্ধকারেও ঢিবির পেছনে উঠে দাঁড়াতে তার ভরসা হচ্ছে না। শুয়ে পড়ে এক টুকরো কেক সে ছুড়ে দিলে কুকুরটার দিকে। তারপর কনুইয়ে ভর রেখে তীক্ষ্ন চোখে তাকিয়ে রইল। কুকুরটা প্রথমে এগোতে ভরসা পায় না। কিন্তু যখন দেখলে ভয়ের কিছু নেই, সে ছুটে এসেই কেকের টুকরোটা মুখে পুরলো।

পরবর্তী কেকের টুকরোটা জুরা অল্প দূরে ছুড়ে দিলে। তৃতীয়টা ফেললে আরো কাছে।

গোরা জেগে গেছে। ব্যাপারটা সে বোঝার চেষ্টা করছে। শেষে জিজ্ঞেস করে,—করছো কি? আমাদের খাবারের অভাব জান, তবু বেওয়ারিশ একটা কুকুরকে খাবার দিচ্ছ? তার চেযে টীককে দাও।

চুপ!—জুরা বললে: কথা বলো না। এক্ষুণি বুঝতে পারবে।

কুকুরটা তখন ঢিবি দুটোর মাঝখানে চলে এসেছে। টীককে কনুইয়ের গুঁতো মেরে জুরা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললে,—কিশ, কিশ—

টীককে তাড়া দেবার দরকার ছিল না। মনিবের কাণ্ডজ্ঞান দেখে এমনিতেই সে চটে আছে: কোথাকার এক হতভাগা নচ্ছার, মনিব কিনা তাকে কেকের টুকরো খেতে দিচ্ছে! মনমাতানো কী ভুরভুরে গন্ধই না ওগুলোর! দু লাফে সে কুকুরটার ওপর গিয়ে পড়লো, তাকে চিৎ করে ফেলে উঠে দাঁড়ালো তার বুকের ওপর।

জুরা চার হাত-পায়ে গুড়ি মেরে এগিয়ে গেল কুকুরটার কাছে। তারপর নিজের কোমরের কাপড় দিয়ে তার মুখ ও থাবা চারটে বেঁধে ফেললে। করুণ কণ্ঠে একটু কেঁউ কেঁউ করা ছাড়া কুকুরটা বাধা দেবার কোন ফুরসুৎই পেল না। কৌতূহলী গোরা গুড়ি মেরে এগিয়ে এসেছে। জিজ্ঞেস করে,—এ সবের মানে কি?

বাড়তি খাবারের টিন একটা খোল।—জুরা বললে।

ক্‌কী?—গোরা ফুঁসে উঠলো: কুত্তাটাকে আমাদের খাবারের শেষ টিনটাও খয়রাত করতে হবে নাকি?

—যা বলি, চটপট করো। একটু পরেই দেখতে পাবে মজা।

এবার ট্যাগ ও সঈদও জেগে উঠে এসেছে। জুরার মেজাজ দেখে সঈদ কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায় না। তীক্ষ্ন চোখে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে।

টিন থেকে মালপত্র বের করে নিয়ে জুরা নিজের কোমরের কাপড় থেকে সরু এক ফালি কাপড় ছিঁড়ে নিলে। ফালিটার একটা দিক সে টিনের ঢাকনির সঙ্গে বাঁধলে, অন্য দিকটা বাঁধলে কুকুরটার কাটা খাটো লেজের সঙ্গে। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে সঈদের রেশমী কোমরবন্ধের একপ্রান্ত কেটে নিলে।

ক্রুদ্ধ সঙ্গীদ গোঙিয়ে উঠলো,—অ্যাঁ! এটা কি হলো! কি করলে তুমি? জান, এটা রেশমের?

চোপ, চোপ! তাহলে তো আরো ভাল!—জুরার কণ্ঠে কড়া ধমকের সুর : কতক-গুলো কার্তুজের মুখ খুলে বারুদ বের করো তাড়াতাড়ি।

গোরা প্রতিবাদ করে,—কার্তুজ খুব কমই আছে, কেন তা নষ্ট করছো?

কিন্তু সঙ্গীদ ততক্ষণে ঝটপট কার্তুজের মুখ খুলে মহা-উৎসাহে বারুদ বের করতে শুরু করেছে। বিনা আয়াসে যত কার্তুজ নষ্ট করা যায়, ততই লাভ!

তিরিশটা কার্তুজ খালি হতেই জুরা বলে,—থাক, যথেষ্ট হয়েছে।

বারুদটা তিন ভাগ করে প্রত্যেকটা ভাগ নিয়ে সে রেশমের কাপড়ে একটা করে ছোট পুঁটলি বাঁধে। তারপর পুঁটলি তিনটে সরু ফিতে দিয়ে আঁট করে বেঁধে দেয় কুকুরটার লেজের সঙ্গে।

কাজ শেষ করে সে বললে,—এইবার শোন। ভোরের আগে থেকে 'তাজিক' হাওয়া বইতে শুরু করবে। বাসমাচিরা তখন থাকবে ঘুমে অচেতন। সেই সময় বারুদে আগুন দিয়ে কুকুরটাকে আমরা ছেড়ে দেবো। সোজা ও ছুটবে নলখাগড়ার জঙ্গলের দিকে। শুকনো নলখাগড়ার জঙ্গলে আগুনের ফুলকি কি চিজ, বুঝতেই পারছো!

মুগ্ধ বিস্ময়ে গোরা ক্ষণকাল কথা বলতে পারে না। তারপরেই আনন্দের আবেগে জড়িয়ে ধরে জুরাকে, মুখে তার কথার তুবড়ি : অদ্ভুত! অদ্ভুত বুদ্ধি তোমার! হা—হা—হা— নলখাগড়ায় আগুন! ধোঁয়া আর আগুন দিয়ে ডাকাতদেব বুনো শুয়োরের মতো তাড়িয়ে বের করা! এই ট্যাগ, সাবধান, মাথা তুলো না! হা—হা—হা—খাসা! খাসা মতলব! তা আমাদের কি করতে হবে? হা—হা—হা—

ট্যাগের অবস্থাও কাহিল। ব্যাপারটা সে যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে, আর হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ফুর্তির চোটে দু-একবার সে উঠেও দাঁড়িয়েছে—খুব সম্ভব নাচার মতলবে।

চুপ, চুপ! আচ্ছা পাগল রে বাবা!—গোরা ও ট্যাগকে জুরা থামানোর চেষ্টা করে। শেষে গোরাকে বললে,—তুমি, ট্যাগ আর সঙ্গীদ রাইফেল নিয়ে তৈরী হও। নলখাগড়ায় আগুন লাগতেই ডাকাতরা নদীর দিকে ছুটবে। ওস্তাদ শিকারীর কাছে সেটা হবে কাজের মতো কাজ।

সঙ্গীদের চোখমুখ আঁধার কালো। জুরাকে নিরস্ত করা যাবে না, সে জানে। তবু শেষ চেষ্টা। সে ঘুরিয়ে শুরু করলে,—ফন্দিটা ভালই ঠেকছে। কিন্তু অন্য দিকটাও ভেবে দেখা দরকার। আগুন যদি আমাদের দিকে ধাওয়া করে? তাহলে সব ভেস্তে তো যাবেই উপরন্তু ঘটবে উল্টো বিপত্তি। তাই বলছিলাম কি—

থাম বলছি!—কঠোর কণ্ঠে জুরা ধমকে উঠলো : মনে থাকে যেন, কজিৎজ্‌কি আর তাগাইকে প্রথমে গুলি করবে, তারপর অন্যদের।

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীদের সুর পালটে যায় : আলবৎ, আলবৎ! সে আর বলতে!

রুদ্ধ নির্বাক চোখে গোরা তাকিয়ে আছে সঙ্গীদের দিকে। সেদিকে নজর পড়তেই, সঙ্গীদ মুখে হাসি টেনে অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বললে,—সত্যি জুরা আমার মতোই তুমি পয়লা নম্বরের ধড়িবাজ!

কিছুক্ষণ পরে পুব আকাশ ফরসা হতেই পশ্চিমী 'তাজিক' বাতাস শুরু হয়। জুরা কুকুরটার বাঁধন খুলে দিলে। পুঁটলিগুলো কুকুরের লেজের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা আছে কিনা, গোরা তা আরেকবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে। তারপর তার পরামর্শ-মতো দিয়াশলাই দিয়ে সেগুলোর আগুন ধরিয়ে দিতে হলো সঙ্গীদকেই।

কুকুরটাকে এক চাবুকের ঘা মেরে জুরা হাঁক ছাড়লে,—যা—যা—!

আতঙ্কে ঘাঁউ-মাউ করতে করতে কুকুরটা সোজা ছুটলো নলবনের দিকে। তার পেছনে আসছে টিনটা, ঠন্‌ঠন্‌ করে পাথরে ধাক্কা খেয়ে তার পায়ে এসে গুঁতো মারছে বারবার। নলবনের ওপর দিয়ে হাওয়া বইছে ঝিরঝির করে।

দেখতে দেখতে ক্ষিপ্ত কুকুরটা নলখাগড়ার শুকনো ঝোপঝাড়ে ছুটোছুটি জুড়ে দেয়। নলখাগড়ার ঘন জঙ্গল, মাটিতে শুকনো পচা নলের গাদা। এক সময় ছোট একটা পুঁটলি ছিঁড়ে পড়লো এক শুকনো নলের গাদায়। সেটা জ্বলতে শুরু করতেই আতঙ্কে পাগল কুকুরটা ছুটলো সামনের দিকে।

নিদারুণ ভয়ে বাসমাচিরা হকচকিয়ে গেছে। আগুনের চড়বড়-চড়বড় আওয়াজে বাতাস ভারী। আগুন ধেয়ে আসছে তাদের দিকে। ওদিকে ঝোপঝাড় বরাবর এত ধোঁয়া যে, শত্রুদের দেখা যাচ্ছে না। আতঙ্কে দিশেহারা বাসমাচিরা দৌড়লো ঘোড়া নিতে। কিন্তু ঘোড়াগুলো তখন ছুটছে মরিবাঁচি করে। জানের তাড়ায় ডাকাতরা বাধ্য হয়ে পায়দলেই দৌড়তে শুরু করলো।

নলখাগড়ার মধ্যে চারজন বাসমাচি লুকিয়ে পার্টিজানদের ওপর নজর রাখছে। হঠাৎ দেখে, সঙ্গীদের কাছ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অগ্নি-সমুদ্রের পটভূমিতে তাদের অন্ধকার চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

চালাও গুলি!—বলতে বলতে জুরাব রাইফেল গর্জে উঠলো। গর্জে উঠলো গোরা, ট্যাগ ও সঈদের রাইফেলও। কয়েক মুহূর্তে চারজনই খতম।

সহসা একজন লোক মশালের মতো দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে তীক্ষ্ন আর্ত চিৎকার ছেড়ে আগুনের দেয়াল টপকে বাইরে লাফিয়ে পড়লো।

জুরা চেঁচিয়ে উঠলো,—শীগ্‌গীর, শীগ্‌গীর গা থেকে কোট খুলে ফেলো!

লোকটা তখন একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে কেবল। জুরা ছুটে গিয়ে তার কোমরের কাপড় ধরে টান মারতেই, জ্বলন্ত অবস্থায় সেটা খুলে এল। তার কোটটাও জুরা খুলে ফেললে এক টানে।

লোকটা বুড়ো, কিন্তু জোয়ান। কালো দাড়ি তার ঝলসে গেছে। আতঙ্কে বিহ্বল লোকটা পোড়া ঘায়ের যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে সহসা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। জুরার পায়ে সে চুমু খেতে চায়।

অবজ্ঞার সঙ্গে জুরা বাধা দিলে,—রাখ্‌, রাখ্‌, দরকার নেই! বাসমাচি তুই?

—না বাপ! না বাপ! সাধারণ একজন মোল্লা!

দূর থেকে বুড়োকে দেখেই সঈদের চোখ কপালে উঠে গেছে: সর্বনাশ! তাগাইয়ের চাচা! কিছু ফাঁস করে ফেললেই গেছি!

চেঁচাতে চেঁচাতে সে ছুটে এল,—জুরা, জুরা! এ লোকটাকে আমি চিনেছি। ও তাগাইয়ের চাচা। গুলি করো ওকে, তোমার কসম তাহলে পূরণ হবে! ওর রক্তই তাগাইয়ের রক্ত! বাসমাচিদের এখন শেষ অবস্থা। ওকে খতম করলে তোমার কাজ শেষ!

সঈদের কথা শুনে গোরা থ। সঈদ বলছে কি, তাগাইয়ের চাচাকে গুলি করতে চায়! সমস্ত ব্যাপারটা তার মাথায় তালগোল পাকিয়ে যায়। কিছুই বুঝতে পারে না। ট্যাগ অবশ্য সঈদকেই সমর্থন করছে।

শান্ত কণ্ঠে জুরা বললে,—না সঈদ, ভুল করছো। বুড়ো লোকটার জান নিয়ে আমার কি লাভ? না, ও বেঁচে থাক্‌।

কি বলছো তুমি?—সঈদের দুই ট্যারা চোখ বনবন করে ঘুরতে থাকে: ও বেঁচে

থাক্! তুমিই কি সেই জুরা—বাসমাচিদের আতঙ্ক? তোমার সে জবান কি ভুলে গেলে?

চোপ্ রও!—চাপা রাগে জুরা গর্জন করে ওঠে: চাষী সমাজ জেনে রাখুক, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। বিরোধ তাগাই ও আর সব বাসমাচিদের সঙ্গে। আমার এক জবান: তাগাইকে জান দিতে হবেই। বছর তিনেক আগে হলে তাগাইয়ের চাচাকে হয়তো গুলি করতাম। কিন্তু এখন......যাক্, শোন বুড়ো, এবার বাড়ি যাও, এ এলাকায় থেক না।

ভয়ে যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে বুড়ো উঠে দাঁড়ালে।

দূরে তাগাইয়ের বন্দুকের শব্দ অস্পষ্ট শোনা যায়। আগুন জ্বলছে দুর্দান্ত ঝঞ্ঝার মতো। তার গর্জনে সব কিছু ডুবে গেছে। পাখির ঝাঁক উড়ছে মাথার ওপর। আর বুনো জানোয়ারের পাল দূরের নলবন থেকে বেরিয়ে ছুটছে পর্বতের দিকে।

নির্জীব কণ্ঠে সঈদ বললে,—দূরে শুনতে পাচ্ছ তাগাইয়ের বন্দুকের শব্দ? তবু তুমি তার চাচাকে ছেড়ে দিচ্ছ! তাজ্জব কাণ্ড!

বুড়ো তখন পালাতে পারলে বাঁচে। সে পা বাড়ায়।

দাঁড়াও!—জুরা হুকুম করে।

বুড়ো হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

তোমায় ছেড়ে দেব, যদি একটা কথা বলতে পার।—চড়া গলায় জুরা বললে: তাগাই আর কজিৎজ্কি কোথায় যাচ্ছে, বলো তো?

ওরা সবাই,—বুড়ো হাউমাউ করে উঠলো: তাগাই, কজিৎজ্কি আর ইমাম বলবক যাচ্ছে বার্তাং নদীর দিকে, সারেজ হ্রদের ধারে।

—ইমাম বলবকও আছে?

—হ্যাঁ।

—ডান কোটরে যার কাঁচের চোখ, সেই লোক?

—হ্যাঁ।

যাও বুড়ো।—খোশমেজাজে জুরা বলে: বেঁচে গেলে তুমি। এক্ষুণি পালাও এ মুল্লুক থেকে।

বুড়ো চলে যেতেই সে বললে,—গোরা, তুমি ও ট্যাগ এদিকে থাক। সঈদকে নিয়ে আমি ওদিকে যাচ্ছি।

সঈদের সঙ্গে জুরা একলা কোথাও যায়, গোরার তাতে নিতান্ত অনিচ্ছা। অতি-সম্প্রতি সঈদের হাবভাব কথাবার্তা সব কিছু যৎপরোনাস্তি সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। মনে হয়, কি এক সাংঘাতিক মতলব ঘুরছে তাঁর মাথায়। কিন্তু এসব কথা জুরাকে কে বোঝাবে! তাই নির্লিপ্ত শান্ত কণ্ঠে সে বললে,—তা আমার এখানে থেকে কি লাভ? চলো, আমিও যাই। ট্যাগ থাক্ এখানে।

না না, তুমিও থাক।—বলতে বলতে জুরা সঈদকে নিয়ে ডাইনে খাড়া পাহাড়টার কাছে নদী যেখান দিয়ে বয়ে চলেছে, সেই দিকে দ্রুত পা বাড়ায়।

আগুনের দেয়াল এখন সামনে অনেক দূরে চলে গেছে, পেছনে ফেলে গেছে স্তূপা-কার জ্বলন্ত পোড়া কয়লা আর ছাই।

জুরা বললে,—দেখছো, বাঁয়ে ওদের সামনে রয়েছে নদী আর সোজা ঐ খাড়া পর্বতটা। ওদের তাই নদী বরাবর ডাইনে যেতে হবে। ওদের পালানোর পথ বন্ধ কর-বোই। ঘোড়া ছাড়া ওরা নদী পার হতে পারবে না, কিন্তু ঘোড়া সব পালিয়েছে...... ছোটো, চলো তাড়াতাড়ি।

প্রথম পর্ব 8

বাসমাচিদের অপেক্ষায় জুরা ওত পেতে আছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। কিন্তু সময় কেটে যায়, তবু তাদের দেখা নেই। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেবার জন্যে জুরা উঠে দাঁড়ালো।

তারপর সঈদকে নীচে রেখে, খাড়া পর্বত বেয়ে সে ওপরে উঠে গেল। বাতাসের তোড়ে আগুন পুব দিকে সরে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর আগুনে ঝড়ের শব্দ আর চড়বড় আওয়াজ অত ওপর থেকেও শোনা যায়। পুব দিকের খাড়া পর্বত সব ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। নদীর ধারে কেউ নেই। কিন্তু ওপারে একজন লোক রাইফেলে ভর দিয়ে খাড়া পর্বত বেয়ে ওপরে উঠছে। জুরা অবাক হয় ঃ ওপারে যাবার মতো এমন হিম্মৎ কার হলো?

ছটফট করে জুরা ঃ বসে বসে সময় নষ্ট করা ছাড়া করার কিছু নেই!

প্রচণ্ড আগুন দুরন্ত স্রোতের মতো পুব দিকে ধেয়ে চলেছে। কিন্তু বাতাস এবার দিক্ পাল্‌টাচ্ছে। ধোঁয়া সরে যেতেই উপত্যকার সঙ্কীর্ণ অংশে নলখাগড়ার নিবন্ত আগুন জুরার চোখে পড়লো। উপত্যকাটির এক দিকে পর্বত, অন্য দিকে দুরন্ত নদী। দূরের খাড়া পর্বতটার গা বেয়ে একদল লোক ওপরে উঠছে। নিরুপায় জুরা ছটফট করতে করতে নেমে এল সঈদের কাছে।

দিনটা অপয়া! দুটো দিনই অপয়া! কাজের কাজ কিছু হলো না।—কণ্ঠে তার ব্যর্থ আক্রোশ।

ওরা দুজনে নদীর পাড়ে নেমে এল। সঈদ বললে,—বড্ড ক্লান্ত লাগছে, জুরা। একটু জিরনো যাক্। নরম বালি এখানে। এস, বালির ওপর বসে একটু জিরিয়ে নেই।

সহসা দেখা গেল, জুরা যে পর্বতটার মাথায় উঠেছিল, গোরা এসে সেখানে দাঁড়িয়েছে। মাথার টুপিটা রাইফেলের আগায় বসিয়ে দোলাচ্ছে সে অর্থাৎ সঙ্কেত জানাচ্ছে। তার পাশে আর একটা লোক।

চলো, চলো!—জুরা ছুটতে থাকে।

সঈদ তাকে অনুসরণ করে নিতান্ত অনিচ্ছায় সঙ্গে। একটু পরেই তারা পর্বতের মাথায় উঠে এল। কালো কোট-পরা একজন লোক একটা ঢিবির ওপর বসে আছে। গোরা তাকে দেখিয়ে বললে,—ওকে ধরেছি। আর একটু হলেই আমায় ও খাড়া পর্বত থেকে সোজা নীচে ফেলে দিত। লোকটা পাক্কা বদমাশ।

ভুরুর তলা দিয়ে বাসমাচিটা ওদের দেখছে, ক্রূর চোখে রাগ ও বিদ্বেষ।

আমায় চেন?—জুরা জিজ্ঞেস করলে।

দস্যু মাথা নাড়ে,—না, চেনে না।

—আমি জুরা। আমার নাম হয়তো শুনে থাকবে।

আর বলতে হলো না। বাসমাচি সঙ্গে সঙ্গে ঢিবি থেকে লাফিয়ে পড়লো। দৃষ্টি তার আতঙ্কবিহ্বল।

মৃদু হেসে রাইফেলের বাঁটে হাত বোলাতে বোলাতে জুরা জিজ্ঞেস করে,—কি, মুখ কি খুলবে?

আলবৎ, আলবৎ!—বাসমাচি কঁকিয়ে উঠলো ঃ সব কবুল করবো।

—বেশ। আর সব বাসমাচিরা কোথায়?

—কিছু খুন হয়েছে, কিছু নদীতে ডুবে মরেছে। ইমাম বলবকের হুকুম ছিল, তাঁর সঙ্গে আমাদের নদী পার হতে হবে।

ইমাম বলবক?—সচকিত কণ্ঠে জুরা জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ, ইমাম বলবক!—বাসমাচি ঘাড় নেড়ে সায় দেয়ঃ ঘোড়াগুলো আগুনের ভয়ে পালিয়েছিল। সাঁতার বলতে গেলে কেউই প্রায় জানতো না, অথচ বয়া বা বাতাস-ভরতি চামড়ার থলি ছিল মাত্তর একটা। তা, ইমাম তো সাঁতরে পার হলেন, কিন্তু একটা মাত্র চামড়ার থলি নিয়ে বাকী সবাই পারবে কি করে?

তাগাই কোথায়?—সঈদ জিজ্ঞেস করে।

আর কজিৎজুকি?—যোগ করে গোরা।

ঐ যে ওখানে।—দূরে পর্বত ও নদীর মাঝখানে যেখানে নলখাগড়ার জঙ্গল পড়েছে, বাসমাচি সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। পর্বতের খাড়া গা বেয়ে কতকগুলো লোক হিঁচড়ে টেনে অতিকষ্টে ওপরে উঠছে। দূর থেকে বেশ ছোট দেখাচ্ছে তাদের।

চোখে দূরবীন লাগিয়ে জুরা এবার পর্বতটার দিকে তাকায়ঃ হ্যাঁ, ঠিকই বলছে লোকটা, বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাসমাচিদের। এবড়োখেবড়ো পাথর আঁকড়ে ধরে তাগাই উঠছে সবার আগে। দেখলে মনে হয়, পশ্চাদ্ধাবনের ভয় করছে সে, তাই বারবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। রাইফেলটা তার গলায় ঝোলানো। কজিৎজুকি তার পেছনে—হাতে রিভলবার। তাদের পেছনে আরো কয়েকজন বাসমাচি।

তাগাই তাহলে ওখানে! জুরা উত্তেজিত। যাকে সে খুঁজছে এত কাল ধরে, এত দুঃখ কষ্ট বেদনা যার জন্যে, সেই তাগাই ওখানে!

জুরা দূরবীন ঘোরায় ডান দিকে নদীর ওপারে। কয়েক মুহূর্তেই নিঃসঙ্গ পথচারী একজন তার চোখে পড়লো।

ইমাম বলবক—কোমরে রিভলবার—বার্তাং নদীর উদ্দেশে দক্ষিণ দিকে ধেয়ে চলেছে। এই সেই ইমাম বলবক, কজুবে যার সম্বন্ধে বলতেন,—যখন যেখানে যে অবস্থায় তাকে পাবে, তক্ষুণি পাকড়াও করবে। তাহলে শুধু আমার-তোমার নয়, তামাম কিরঘিজ দুনিয়ার পক্ষে সেটা হবে খুব মস্ত বড় একটা কাজ।

চোখের পলকে জুরা রাইফেল তুলে নিলে। বার শো গজে রাইফেলের পাল্লা বেঁধে সে তাগাইকে তাক করে গুলি ছুড়তে শুরু করলো।

গোরা ও সঈদ তার সঙ্গে যোগ দিতেই, জুরা ধমকে উঠলো,—থাম! এটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

জুরা বুঝতে পারছে না, বুলেট তাগাইয়ের গায়ে লাগছে কিনা। যতদূর মনে হয়, তার চারপাশেই শুধু ধুলোর মেঘ উড়ছে।

জুরা শেষ পর্যন্ত রাইফেল নামিয়ে রাখে। দূরবীনের ভেতর দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে আবার পরীক্ষা করে অনেকক্ষণ। তাগাই বারবার ডান হাতটা দোলাচ্ছে। জুরার মনে হয়, বাসমাচিদের সে ইশারা করছে।

আবার রাইফেল তুলে নেয় জুরা। খুব মনোযোগের সঙ্গে তাক করে আবার সে গুলি ছুড়তে শুরু করে। তারপর আবার সে তুলে নেয় দূরবীন। হঠাৎ দেখে, তাগাই বাঁ হাত দিয়ে কাঁধ চেপে ধরেছে, এলোমেলো তার পদক্ষেপ, পাথরে হোঁচট খাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে বারবার।

জুরার দৃঢ় ধারণা হয়, তাগাই জখম হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার নিজের কথা মনে

পড়ে ঃ দুশমনদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে সে-ও তো কতবার মরার ভান করেছে। তাগাইও কি তাই করছে?

কয়েক মুহূর্ত পরে ঝুঁকে-পড়া একটা পাহাড়ের পেছনে তাগাই অদৃশ্য হলো। তার পেছন পেছন অদৃশ্য হলো আর সব বাসমাচিরাও।

জুরার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ধরা-পড়া বাসমাচিটা। আড়চোখে একবার সে নদীর দিকে তাকায়। পরক্ষণে তাকায় আর একবার। মুহূর্তে তার কর্তব্য স্থির, নতুন করে তার হারানোর কিছুই নেই। তার পরেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। জলের শব্দে জুরা ফিরে দাঁড়াতেই তাকে দেখতে পেল- স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। পর মুহূর্তে ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে জলের তোড়ে কোথায় সে হারিয়ে গেল!

জুরা বললে,--ও যদি জ্যান্ত ওপারে পেঁছে বলবককে হুঁশিয়ার করে দেয়, তাহলে ইমামকে একবার ঐ যা দেখেছি, আর তার কোন পাত্তা পাব না।

কিন্তু ইমামকে দিয়ে আমাদের কি দরকার?—সঈদ বললে ঃ অজানা দুর্লঙ্ঘ্য বরফ-ঢাকা পর্বত-মুল্লুকে সে যদি যেতে চায়, যাক্। তার পক্ষে এটা মারাত্মকই হবে। আমাদের এখন তাগাইয়ের খোঁজে যাওয়া দরকার। বলবকটা কে? কিচ্ছু না। তাই আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, মনে হয়।

চাওয়ের মৃত্যুর পর থেকে সঈদ সম্পর্কে এক ধরনের বিতৃষ্ণা ও বিরুদ্ধ মনোভাব জুরাকে পেয়ে বসেছে। তাই সঈদ তাগাইয়ের খোঁজে বেরোবার তাড়া দিতেই সে মন স্থির করে ফেললে। বললে,—না বলবকের খোঁজেই আগে যেতে হবে।

সঈদ তবু নাছোড়বান্দা। বলে,—তোমার নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়েছে। ভেবে দেখ, ওখানে ঐ পর্বতে তাগাইয়ের নাগাল পাবে, কজিৎজ্কিকে পাবে, পাবে তাদের ধন-দৌলতও। আর বলবকের পেছনে গেলে কি পাবে, তার ছেঁড়া বুটজোড়া ছাড়া?

জুরা নীরব। তার মন দুলছে। সঈদ বলার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাগাইয়ের পেছনে যাবার কথাই সে ভেবেছে, কিন্তু.....

মিনতি-ভরা চোখে সঈদ এবার তাকালে জুরার মুখের দিকে, বললে,—শোন জুরা, চটো না, আমায় একটু বলতে দাও। গারদে একসঙ্গে আমরা কয়েদ ছিলাম, একই সঙ্গে তকলিফ ভোগ করেছি—

চোপ্ রও!—জুরা গর্জে লাফিয়ে উঠলো, তাবপর ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর চাপা কণ্ঠে বললে ঃ চাও-ও আমাদের সঙ্গে কয়েদ ছিল, কিন্তু কি ঘটলো তারপর?

বলতে বলতে সে ফেরে গোরার দিকে। নীরবে দাঁড়িয়ে আছে গোরা। জুরার শেষ কথায় তাব অন্তর ভরে উঠেছে তৃপ্তিতে।

জুরা বললে,—শোন ভাই গোরা, আমি বলবকের খোঁজে যাচ্ছি, তোমরা যাবে তাগাইয়ের খোঁজে। পথে কোন পার্টিজানের দেখা পেলে, তাদেরও ওর পেছনে পাঠাবে। এখন সবচেয়ে সেরা ঘোড়াটা নিয়ে এস তো।

গোরা কি বলতে যায়, কিন্তু তার আগেই সঈদ বললে,—আমায় তোমার সঙ্গে নাও, জুরা।

কণ্ঠে তার কাকুতি। সে বুঝেছে, জুরার মত আর পাল্টানো যাবে না।

অবজ্ঞায় মুখ বেঁকিয়ে জুরা জিজ্ঞেস করে,—কেন?

শোন ভাই,—মিনতি ও অন্তরঙ্গতায় মেশানো সঈদের গলা ঃ একটা গুপ্ত খবর আমি জেনেছি, খবরটা যেমন জরুরী তেমনি সাংঘাতিক।

—এক্ষুণি বলে ফেল।

—না। চলো ওখানে ঐ ঝোপের তলায় বালির ওপর গিয়ে বসি। বেশ ছায়া ওখানে। বড্ড ক্লান্ত বোধ করছি।

জুরা নীরবে তার সঙ্গে নদীর ধারে গিয়ে গরম বালির ওপর বসে পড়ে। সঈদ বসে তার পাশে। তারপর বললে,—হ্যাঁ, যা বলছিলাম জুরা, আমার দোস্ত তুমি, তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ। চাও যে বেইমান ছিল—

রূঢ় কণ্ঠে জুরা বাধা দিলে,—চাও সম্পর্কে কোন কথা নয়। খবরটা বলো।

সঈদের ট্যারা চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, শক্ত হয়ে ওঠে দুই চোয়াল। পরক্ষণে সামলে নিয়ে মিষ্টি গলায় সে বললে,—ভাই জুরা, ঈগল যখন আকাশে ওড়ে, চিলের ঝাঁক তাকে অনুসরণ করে। খাওয়ার পর ঈগল কিছু না কিছু অবশিষ্ট রাখে চিলদের জন্যে। কিন্তু তোমার কাছ থেকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ছাড়া এ পর্যন্ত কি পেয়েছি আমি? এমন কি চাবুকের মারও বাদ যায়নি। কিন্তু কেন?

বড় অদ্ভুত ধরনে তুমি কথা বলছো, সঈদ। কি চাও, বলো তো?—জুরার কণ্ঠে বিস্ময় ও বিরক্তি।

—বলছি, বলছি। ঐ আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখ জুরা, দুটো ঈগল ভেসে চলেছে। আমি ও তুমি ঠিক ওদেরই মতো, অন্ততঃ আমি তাই মনে করি। দেখ দেখ, কিভাবে ওরা দুটিতে জোট বেঁধে চলেছে।

জুরা মুখ তুলে তাকায় আকাশের দিকে : শ্যামল তৃণভূমির ওপরে অনেক উঁচুতে পাখা ছড়িয়ে ভেসে চলেছে একজোড়া ঈগল। কয়েক মুহূর্ত মাত্র—

অকস্মাৎ তার পাশ থেকে এল এক অমানুষিক তীক্ষ্ন চিৎকার। জুরা সোজা লাফিয়ে উঠলো : কি—কি হয়েছে? পরক্ষণে সে সবিস্ময়ে দেখে, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সঈদ লাফাচ্ছে আর সমানে চলেছে তার চিৎকার আর দু হাতের খিচুনি। তার পায়ের তলায় লম্বা কালো একটা জিনিস পড়ে আছে, মোটা একটা চাবুক মনে হয়। সঈদের মাথা নিশ্চিত বিগড়ে গেছে, নযতো চাবুকটার ওপর ওভাবে লাফাচ্ছে কেন?

সঈদের দিকে ছুটে যেতেই, হঠাৎ দারুণ আতঙ্কে জুরা লাফ মেরে পেছিয়ে এল। সঈদের পায়ের তলায় মরণ-আক্ষেপে মোচড় খাচ্ছে একটা সাপ—ভয়ঙ্কর বিষধর এক কালসাপ! মারাত্মক তার দংশন! সাপ দেখলে জুরার গা ঘিনঘিন করে ওঠে, মনে জাগে বিজাতীয় ঘৃণা ও আতঙ্ক, সর্বাঙ্গ যেন শিরশির করতে থাকে। এক টানে সে ছোরা বের কবে চোখের পলকে সাপটাকে দু টুকরো করে ফেললে। দুটো খণ্ডই মোচড় খেতে খেতে পালানোর চেষ্টা করে।

অন্ধ হিংস্র আক্রোশে সঈদ তখন পাথরেব পর পাথর তুলে সাপটাকে মারতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত পাথরের গাদার নীচে ওটা চাপা পড়ে গেল। কিন্তু সঈদের তবু থামার লক্ষণ নেই। ক্ষিপ্তের মতো পাথর-গাদার ওপর উঠে সে অকথ্য গালিগালাজ ও শাপ-শাপান্ত করে চলে আর সমানে লাথি মারতে থাকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঈদকে শান্ত হতে হলো। তার ডান হাতে তীব্র যন্ত্রণা। দুই চোখ বিস্ফারিত। আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে হাতটার দিকে। আঙুলে দু ফোঁটা রক্ত।

সহসা পাগলের মতো সে চেঁচিয়ে উঠলো,—কেটে ফেল! কেটে ফেল! শীগ্‌গীর কেটে ফেল এটা!

বলতে বলতে হাতটা সে বাড়িয়ে দেয়। এত জোরে হাতটা কাঁপছে যে, অন্য হাত দিয়ে সেটাকে ধরে রাখতে হচ্ছে।

সঈদকে বাঁচানোর আর কোন পথ নেই। অসঙ্কোচে জুরা আঙুলটাকে পাথরের

ওপর রেখে ছোরা দিয়ে এক কোপে কেটে ফেললে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। সঙ্গীদের চোখমুখ আগেই ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, এখন ছাইয়ের মতো হয়ে গেল। যন্ত্রণায় সে ঘামছে।

বিষ কোন্ পর্যন্ত উঠেছে, জানা নেই। তাই ক্ষত স্থান বাঁধারও তাড়া নেই জুরার। তার আগে, রক্তের সঙ্গে বিষ বেরিয়ে যাক্। রক্ত গরম বালির ওপর পড়ে গাজলা তুলে জমাট বেঁধে যাচ্ছে।

রক্ত-মোক্ষণের পর জুরা নিজের কোমরের কাপড় দিয়ে সঙ্গীদের কনুইয়ের ওপর সজোরে তাগা বেঁধে দিলে। তারপর ব্যাণ্ডেজ করলে আঙুলটা। রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে ব্যাণ্ডেজটা।

কাতর আর্তনাদ করে সঙ্গীদ ধপাস করে বালির ওপর শুয়ে পড়লো। যন্ত্রণায় সে আঁকুপাঁকু করছে। হাত ফুলে উঠেছে, নীল হয়ে গেছে নখগুলো। কানের মধ্যে ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ এবং তা বেড়েই চলেছে, সেই সঙ্গে সামান্য বমির ভাব। হঠাৎ বুকে এক তীব্র যন্ত্রণায় সঙ্গীদের সারা দেহ কেঁপে উঠলো, সে চিত হয়ে পড়লো।

দাঁতের চাপে তার ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে, মুখের দু পাশে শুকনো গাজলা' শ্বাস-প্রশ্বাসেও কষ্ট। সে হাহাকার করে উঠলো,—মরে গেলাম! মরে গেলাম!

আতঙ্কবিস্ফারিত তার চোখের তারা বন্‌বন্ করে ঘুরছে। শেষে একসময় তা এসে জুরার মুখের ওপর স্থির হলো। সে চেঁচিয়ে উঠলো,—মরে যাচ্ছি! মরে যাচ্ছি! কিন্তু জুরা, তুই! তোকেও সঙ্গে নিয়ে যাব!

বলতে বলতে সে রাইফেল তুলতে গেল। জুরা পা দিয়ে চেপে ধরলে সেটা। ধাঁ করে সঙ্গীদ রিভলবার টেনে নিলে। কিন্তু জুরা হাতে লাথি মারতেই রিভলবারটা ছিটকে বেরিয়ে গেল হাত থেকে।

জুরা কিন্তু এ সবে চটে নি। তার ধারণা, সঙ্গীদের মাথা বিগড়ে গেছে। কিন্তু আচমকা সঙ্গীদের কথা কানে যেতেই সে যেন পাথর হয়ে গেল। স্তব্ধ নিস্পন্দ সে। দম বন্ধ করে শোনে ভয়ঙ্কর কথাগুলো। শুনতে শুনতে তার বুকের স্পন্দন যেন থেমে আসতে চায়।

থেমে থেমে বিড়বিড় করে সঙ্গীদ বলছে,—আমি তোকে ঘেন্না করি! ঘেন্না করি তোকে নরকের কৃমির মতো!...আমি মরতে চলেছি!......আর তুই কিনা বেঁচে থাকবি! ...যাবার সময় তোকে কয়েকটা কথা বলে যাব......জীবনভোর তা সাপের বিষের মতো তোর কলজে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে!......চাওয়ের কোন দোষ ছিল না বুঝলি.... . তুই-ই আমাকে তোর রিভলবার দিয়ে বিনা বাধায় তাকে খুন করতে দিয়েছিলি..... হ্যাঁ, তুই নিজেই চেয়েছিলি সেটা!......

সব কথা বলার সময় হয়তো না-ও জুটতে পারে, সেই ভয়েই যেন সঙ্গীদ দ্রুত বলে যায় কথাগুলো। বলতে বলতে যন্ত্রণায় সে হাঁপায়, মোচড়াতে থাকে সাপের মতো।

ঘটনার আকস্মিকতায় আর সঙ্গীদের অবিশ্বাস্য কথাগুলোয় জুরার বাক্‌শক্তি বুঝি লোপ পেয়ে গেছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে। তারপরেই আর্তনাদ করে ওঠে,—মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে! তুমি মিথ্যে বলছো, সঙ্গীদ! আমার বিশ্বাস, আমায় রাগানোর জন্যেই বলছো!

না, আল্লার কসম, আমি মিথ্যে বলছি নে!......সব বলবো, সমস্ত কিছুই...তুই যাতে বেঁচে থেকেও জিন্দিগিভোর ছটফট করে মরিস......শুনে রাখ্ শয়তান, তোকে আমি বিক্রি করে দিয়েছি...একটু আগেই ঠিক করেছিলাম, যখন তুই আসমানের দিকে তাকিয়ে ছিলি, তোর চোখে বালি ছিটিয়ে দেব, তারপর মাথাটা কেটে নিয়ে তাগাইয়ের

কাছে বিক্রি করবো...কিন্তু...আঁ...আঁ...আঁ...যে হাতে বালি তুলতে গেলাম, সেই হাতেই সাপটা ছোবল মারলো!......আমার দিকে ওভাবে তাকাস নে! চোখ বন্ধ কর্......টীককে আমার ভয় ছিল...ভয় ছিল গোরাকেও......উঃ......উঃ......মারা গেলাম! মারা গেলাম!—হিংস্র উন্মাদ কণ্ঠে আর্তনাদ করতে করতে সঈদ মাটির ওপর গড়াগড়ি দিতে থাকে।

দুঃসহ রাগে ও ঘৃণায় জুরা ছুটে গেল তার কাছে। তার গলা চেপে ধরে বললে,—বল্, কথা বল্!

পরক্ষণে সে সামলে নেয় নিজেকে। ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললে,—না, না! এভাবে তোকে মরতে দেব না!

সঈদের গলা ছেড়ে সে ছুটলো নদীতে। টুপিতে করে জল এনে কিছু জল সঈদের মুখে দিলে, তারপর তার চোখেমুখে জলের ঝাপ্টা দিতে দিতে বললে,—বাঁচাতে তোকে হবেই। অত সহজে তোকে আমি মরতে দেব না!

বলতে বলতে সে সঈদের আঙুল থেকে ব্যান্ডেজটা ছিঁড়ে ফেলে রক্ত চুষতে শুরু করলো। কিন্তু হাতটা ততক্ষণে ফুলে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সঈদের মুখে হঠাৎ বিকৃত পৈশাচিক হাসি ফুটে ওঠে। ঘড়ঘড় করতে করতে সে বললে,—চোষ্, চোষ্...ভাল করে চোষ্...আমার সঙ্গে তুইও মরবি...এ সাপের বিষ সাংঘাতিক...চুইয়ে একটু মুখের মধ্যে যাবে, আর মরবি তুই......ভালই হবে, দুজনে একসঙ্গে দোজখে যাব......

পাগলের মতো জুরা চেঁচিয়ে উঠলো,—বল্, মিথ্যে বলছিস! কবুল কর্, যা বলেছিস, সব মিথ্যে, চাও সম্বন্ধে তুই মিথ্যে বলেছিস! বল্, বল্, তার টুপির মধ্যে কি বিষ ছিল?

সঈদ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তার গলার ঘড় ঘড় শব্দটা এত বেড়ে গেছে যে, কোন কথা স্পষ্ট বোঝা যায় না। জুরা তার মুখের কাছে কান নিয়ে শোনে, সে ঘড়ঘড় করতে করতে বিড়বিড় করে বলছে,—না, না,...আমিই তাগাইকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম...জলের ট্যাঙ্কে বিষ মিশিয়েছিলাম......আর......আর তোর দলকে ওদের লুকনো ফাঁদে নিয়ে ফেলেছিলাম.....আমিই বিষ রেখেছিলাম চাওয়ের টুপির মধ্যে...আর তুই হাবা আহাম্মক বেকুব......তা বিশ্বাস ক-রে-ছি—

এই, এই!—দুঃসহ জ্বালায় জুরা তোতলাতে থাকে : তোকে বাঁচতে হবে, পরে যাতে তোকে মারতে পারি...আমরা...আমরা...আমরা তোর বিচার করবো......এই, শোন্ বেইমান! শুনছিস, বদমাশ বিষাক্ত কুত্তা—

বলতে বলতে সঈদের আঙুল থেকে সে একভাবে রক্ত চুষে চলে। সঈদ যে অসাড় হয়ে গেছে, সেদিকে হুঁশ নেই।

টীক ছুটে এসে তার বগলের তলা দিয়ে নাক ঢুকিয়ে দিতেই সে মুখ তুলে তাকায়। দেখে, সঈদ মারা গেছে। পেছনে ছিটকে পড়ে সে উন্মাদের মতো লাফিয়ে উঠলো। এক টানে পিস্তল বের করে সঈদের লাশের ওপর গুলি চালাতে লাগলো নির্বিচারে।

সঈদের কথাগুলো যেন ক্রুদ্ধ পাগলা ভিমরুলের ঝাঁক হয়ে তার সারা গায়ে হুল ফোটাচ্ছে। সঈদ সম্বন্ধে কজুবে বিভিন্ন সময়ে তাকে যা বলেছেন, চাও আর গোরা যা বলেছে, সে সব মনে পড়ছে তার, আর ততই বাড়ছে জ্বালা। ওদের ওসব কথা সে কখনো কানেও তোলে নি। নিজের বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে কত উচ্চ ধারণাই না তার ছিল! আর তার ফল কি হলো! এই এত বড় ভুল সে করলে! ভাগ্যান্বেষী বর্বর ওই শয়তানটার হাতের পুতুল হবার মতো এত বড় নিদারুণ ভুল করলে সে!

কলধ্বনি তুলে নদী বয়ে চলেছে। মর্মর শব্দ আসছে ঝোপঝাড় থেকে। টীক বসে

আছে একপাশে। আর বালুচরে দাঁড়িয়ে দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছে জুরা —কিছুকাল আগের সেই দর্পিত জুরা।

ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক এই মুহূর্তগুলিতে নিজেকে তার বড় ছোট মনে হয়। নিজেকে সে যেভাবে চাবুক মারছে, তার চেয়ে বড় শাস্তি বোধহয় আর নেই। কজুবের অনেক কথা—জীবন, কর্তব্য, সংগ্রাম এবং আরো যেসব কথা তিনি বলেছেন—সে সবের অর্থ তার কাছে এখন যেন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে। শেষ পর্যন্ত সে মন স্থির করে : বলবকের খোঁজেই সে যাবে। এটা শুধু কজুবের হুকুমই নয়, প্রচন্ড মানসিক ঘূর্ণিঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে একজন মানুষের সত্যোপলব্ধি এবং গভীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতা লব্ধ সংকল্প।

জুরার জন্যে ঘোড়া নিয়ে ছুটতে ছুটতে গোরা এসে পৌঁছয়। সঙ্গীদের দিকে নজর পড়তেই সে চমকে উঠলো। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে,—ওর কি হয়েছে? গুলির শব্দ শুনে ছুটতে ছুটতে এসেছি।

কয়েক মুহূর্ত জুরা কথা বলতে পারে না। শেষে শুকনো গলায় ছটফট করতে করতে বললে—ও মারা গেছে। কুকুরের মতো সাপের কামড়ে মরেছে। জান গোরা, সঙ্গীদ ছিল বেইমান নিমকহারাম......

বলতে বলতে সে তীব্র মনের জ্বালায় থেমে যায়। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থাকে সঙ্গীদের বিকৃত মুখের দিকে।

বিস্ময়ের ধাক্কা গোরা তখনো পুরো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। বললে,—কি ঘটেছিল বলো তো? সঙ্গীদ যে বেইমান ছিল, হঠাৎ তা তুমি জানলে কি করে? একটু শান্ত হও ভাই, ঘটনাটা খুলে বলো।

নিদারুণ মনস্তাপে জুরা জ্বলছে। আর্ত কণ্ঠে বললে,—ও-ই, ও-ই মারার আগে নিজে সব বলে গেছে। ও-ই তাগাইকে মুক্ত করেছিল, কেল্লার জল বিষিয়ে দিয়েছিল, আর আমাদের ফাঁদের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে খুন করা তার পক্ষে যাতে সোজা হয়, তার জন্যেই চাওকে সে গুলি করেছিল।...এখন দেখছো, একটা সাপ আর একটা সাপকে কামড়েছে। আর তার ফলে আমি বেঁচে গেছি......

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে দীনহীন নির্জীব কণ্ঠে সে বললে,—ভাই গোরা, আজ এই মুহূর্তে বুঝছি, নিজের বুদ্ধিমতো চলতে গিয়ে ক্ষমার অযোগ্য কত অপরাধ আমি করে ফেলেছি। সমস্ত ঘটনা তুমি আমার হয়ে কজুবেকে বোল। আমার কথাটাও বুঝিয়ে বোল। বলবে তো?

জুরার কণ্ঠের এই আকুতি ও অস্থিরতা গোরার কাছে নতুন। সে একটু বিচলিত বোধ করে। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললে,—একটু স্থির হও, ভাই। সঙ্গীদ বেইমান, এটা কোন নতুন কথা নয়। আমি জানতাম, না শুধু আমি নই, আমি, কজুবে, চাও, আমরা সবাই জানতাম, সঙ্গীদ আমাদের কেউ নয়। একথা তোমাকে বিভিন্ন সময় বলেও কোন লাভ হয় নি। তাই চাও এক সময় দুঃখ করে বলেছিল, তিক্ততম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জুরা এক দিন এটা বুঝবে। আজ—

জুবা আর বুঝি সহ্য করতে পারে না, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অস্থির আর্ত কণ্ঠে বললে,—ভাই গোরা, থামো থামো! ও কথা থাক! নিজের ভয়ঙ্কর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমায় নিজেকেই করতে হবে। কয়েকটা কথা তোমায় বলে যাচ্ছি। এটাই আমার শেষ অনুরোধ, জানবে। চাওয়ের মৃতদেহ ঘোড়ায় করে কেল্লায় নিয়ে যেও। কজুবে যেন ওর স্মরণে কিছু বলেন, পার্টিজানরা যেন ঝান্ডা তুলে কামান দেগে ওকে সম্মান দেখায়। পার্টিজানের মতো, বীরের মতো যেন কবর দেওয়া হয় ওকে—

বলতে বলতে জুরার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

গোরা হকচকিয়ে গেছে। বিস্মিত কণ্ঠে সে বললে,—এসব কি বলছো তুমি? তুমি কোথায় যাচ্ছ?

কিছুক্ষণ জুরা কথা বলতে পারে না। তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করে বললে,—আমি যাচ্ছি বলবকের পেছনে। রাইফেলগুলো কুড়িয়ে পাথরের নীচে লুকিয়ে রেখো। কজুবেকে বোল, জুরা বলবকের পেছনে গেছে। জ্যান্ত হোক, মরা হোক, বলবককে সে পাকড়াও করে আনবেই। আর আমি যদি জ্যান্ত না ফিরি, কজুবেকে আমার হয়ে অনুরোধ জানিও, আমাকে তিনি যেন ভুল না বোঝেন, অপরাধী না ভাবেন। আমার কাছে তিনি ছিলেন বাবার মতো। তাঁর কাছে আমার শেষ কথা—

জুরা বক্তব্য শেষ করতে পারে না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উদ্গত অশ্রু গোপনের চেষ্টা করে।

গোরা হতভম্ব। জুরার এ রকম বিচলিত অবস্থা সে আগে কখনো দেখে নি। বললে,—না, না, এটা হয় কি করে? আমি যাব তোমার সঙ্গে। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

গোরার দিকে না তাকিয়ে বাষ্পরুদ্ধ গলায় জুরা বললে,—না দোস্ত, তা হয় না। আমি একলাই যাব। চাওয়ের লাশ নিয়ে তুমি ও ট্যাগ ফিরে যাও। কমরেড কজুবেকে বোল, জুরা যদি জ্যান্ত ফিরে আসে, তাহলে তাগাইকে সে পাকড়াও করবেই। চললাম। বিদায়, বন্ধু, বিদায়!

বলতে বলতে সঙ্গীদের কার্তুজের থলিটা কাঁধে ঝুলিয়ে একখণ্ড শুঁটকী মাংস বের করে কোমরের কাপড়ে জড়িয়ে নিয়েই সে লাফিয়ে উঠলো ঘোড়ার পিঠে।

গোরা তখনো ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। মিনতিভরা কণ্ঠে বললে,—শোন জুরা, শোন ভাই, এভাবে একলা তোমাকে আমি ছাড়তে পারি নে। আমি তোমার সঙ্গে যাব। কমরেড কজুবে—

জুরা বাধা দিলে। তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললে,—লাগাম ছাড়, বাধা দিও না। ভুলে যেও না, আমিই এ অভিযানের নেতা, আমার হুকুম তোমাকে মানতে হবে।

বিমূঢ় গোরা। লাগামের মুঠো তার শিথিল হয়ে আসে। পরক্ষণে জুরা শিস দিতেই ঘোড়টা ছুটলো নদী লক্ষ্য করে। পেছন ফিরে ধরা-গলায় জুরা বললে,—আমায় ভুল বুঝো না, ভাই। বিদায়!

বালুচরে গোরা দাঁড়িয়ে থাকে—একলা নির্বাক। চোখের জলে সব কিছুই বারবার ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে। অন্তর আকুলি-বিকুলি করছে জুরার সঙ্গী হবার জন্যে। নিদারুণ আঘাতে জুরা আজ দেহে মনে চরম বিপর্যস্ত। এ সময় তার পাশে থাকা বড় দরকার। কিন্তু তা হবার নয়। সঙ্কল্প থেকে জুরাকে একচুলও নড়ানো গেল না। জুরাই এ অভিযানের নায়ক, তাই নায়কের নির্দেশ মানতে সে বাধ্য।

গোরা তাকিয়ে আছে জুরার ছুটন্ত ঘোড়াটার দিকে। চোখের জল গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়ছে শুকনো বালুচরে। অশ্রুসিক্ত চোখে সে দেখলে, ঘোড়াটা নদী পর্যন্ত গিয়েই ভয়ে পেছিয়ে এল। জুরা আবার তাকে চালিয়ে দিলে নদীর দিকে। ঘোড়াটা এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো দুর্বার ফেনিল স্রোতে। কিছুক্ষণ পরে গোরা দেখে, জুরা ওপারে গিয়ে উঠেছে। ঘোড়াটা নেই, রাইফেল আছে।

ধীরে ধীরে দূর থেকে আরো দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে জুরা ও টীক। গোরা যেন পাথরের মূর্তি। কোথায় কত দূরে কত দুর্লঙ্ঘ্য গিরিদরি-নদনদী পেরিয়ে তার চোখের

সামনে তখন ভেসে উঠেছে সবুজ-শ্যামল সাধের বাংলাদেশ। দেশপ্রেমের দুর্বার আকর্ষণে এক দিন সে ঘর ছেড়েছিল। স্নেহ মমতা ভালবাসার কোন বন্ধনই তাকে আটকে রাখতে পারে নি। কিন্তু পাহাড়ী দেশের এই দুরন্ত সুন্দর সোনালী ঈগল কি এক অদৃশ্য জালে তাকে যেন আটকে ফেলেছে। আকুল কান্না গোরার বুক ঠেলে উঠে আসতে চায়। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে আপন মনে সে বলে,—না, বিদায় নয় বন্ধু, সুস্থ দেহে সুস্থ মনে আবার তুমি ফিরে এস সোনালী ঈগল......তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে থাকবো.. ...

প্রথম পর্ব ৫

দুনিয়ার সর্বোচ্চ গিরিশ্রেণী ও চিরতুষারের রাজ্য। আগে কোন দিন সেখানে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। পৃথিবীর সেই ছাদ সোজাসুজি অতিক্রম করে জুরা চলেছে। চলেছে ইমাম বলবকের পালানোর পথ রোধ করতে।

উটের মোটা রুক্ষ লোমের তৈরী বাদামী রঙের ছেঁড়া কোট তার গায়ে—কোটের ভেতরে প্যাড দেওয়া। পাজামাও তৈরী ঐ দিয়ে। প্রচণ্ড হিমেল ঠাণ্ডা। কোট ও পাজামার ছেঁড়া-ফাটার ভেতর দিয়ে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে তার সর্বাঙ্গ যেন জমিয়ে দিচ্ছে, খোলা বুকে বিঁধছে ছুঁচের মতো।

ছেঁড়া বুটজোড়া পায়ে বিঁধছে। কাঁচা চামড়া জড়িয়ে তা পায়ের সঙ্গে বাঁধা—জমে গেছে শক্ত পাথরের মতো। মাথায় খসখসে ভেড়ার লোমের শতচ্ছিন্ন টুপি। টীকের গা থেকে একগোছা চুল কেটে নিয়ে জুরা তা ঝুলিয়ে দিয়েছে টুপির সামনে। রোদ থেকে চোখ বাঁচানোর জন্যে চুলের গোছা সমেত টুপিটা নামানো চোখের ওপর।

প্রায় উপোস চলেছে—বলতে গেলে প্রায় একটানা অনশন। পর্বতে বুনো ছাগল-ভেড়ার অভাব নেই। তাই কার্তুজ থাকলে এ রকম উপোস চলতো না। কিন্তু কার্তুজ আছে মাত্র একটা। নদী পার হবার সময় সঙ্গীদের কার্তুজের থলিটা হাত ফসকে ভেসে গেছে।

জুরার কাঁধ ও বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে মেশিনগান-বেল্টটা ঝুলছে। ওটা সে আবার একবার দেখে ভাল করে। নাঃ, কোন কার্তুজ নেই! সে কোমরবন্ধ খোলে, তার প্রতিটি ভাঁজ পরীক্ষা করে তন্নতন্ন করে। কিন্তু নাঃ, একটাই মাত্র কার্তুজ! দ্বিতীয় আর একটাও নেই।

কিন্তু ইমাম বলবকের জন্যে কি একটার বেশী কার্তুজ দরকার হবে? অবশ্যি তার জন্যে বলবককে ঠিক মতো বাগে পাওয়া দরকার, আর তা পেতে হলে আগে থেকেই তার পথের পাশে উপযুক্ত জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকতে হবে।

আর সেইজন্যই তো গিরিসঙ্কট ও গিরিখাতের ভেতর দিয়ে বলবকের পথ ধরে না গিয়ে, তাকে পেছনে ফেলার মতলবে সে সোজা পর্বতের মাথায় গিয়ে উঠেছে।

একের পর এক তুষারধবল গিরিশ্রেণী পড়ছে। একটা শেষ হতেই আর একটা। তার পরেই আসছে আর একটা। সেটা দেখা যাচ্ছে আরও দুর্ধর্ষ, আরও দুর্গম ভয়ঙ্কর। সময় সময় জুরার মনে হচ্ছে, সে বোধহয় শেষ পর্যন্ত বেহেশ্‌তে গিয়ে পৌঁছবে।

সেই কখন থেকে সামনে দেখা যাচ্ছে তুষার ও বরফে ঢাকা এক মহাপর্বত, অন্য সবার চেয়ে উঁচু, চুড়ো তার রোদে ঝলমল করছে। জুরা চলেছে সেই পর্বত লক্ষ্য

করে। তার বিশ্বাস, ওটা পার হতে পারলে ইমাম বলবকের পালানোর পথ রোধ করা যাবে। তাই দিন নেই রাত নেই, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে সে চলেছে।

নিদারুণ কঠিন বন্ধুর পথ—দুঃসহ অশেষ কষ্টদায়ক। কোথায় কোন্ দিক দিয়ে গেছে বার্তাং নদী, জুরা জানে। নদীটা সম্পর্কে কজুবের কাছ থেকেও শুনেছে অনেক কিছু। কেল্লা মুক্ত করে তারা যখন বাসমাচিদের পেছনে ধাওয়া করার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, তখন ইভাস্কোকেও বলতে শুনেছে সারেজ হ্রদ ও এই নদীটা সম্পর্কে।

একটা মাত্র কার্তুজ সম্বল। গোড়ার দিকে কার্তুজটা সে বের করছিল মাঝে মাঝে, এখন বের করছে ঘন ঘন। আর কার্তুজটার দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকছে নির্নিমেষ চোখে। তার ফলে, ওটার গায়ে কোথায় কোন্ আঁচড়ের দাগ আছে, সেটা পর্যন্ত তার মুখস্থ হয়ে গেছে। কার্তুজটার তামার খোল ম্যাটমেটে রঙের, খোলের মুখের ঢাকনিটা ঘিরে পাতলা মরচের একটা বেড়। শেষ পর্যন্ত কার্তুজটাকে সে ন্যাকড়ায় জড়ালে। কিন্তু কোথায় রাখা যায়? প্রথমে রাখলে কোমরে কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে। কিন্তু নাঃ, স্বস্তি বোধ হচ্ছে না কাজেই কোমরবন্ধ থেকে নিয়ে ওটা সে লুকিয়ে রাখলে বুকের নীচে। এবার নিশ্চিন্ত।

পর্বত থেকে পর্বতে সে উঠে চলে, পার হয়ে যায় একের পর এক আকাশছোঁয়া তুষারমৌলী গিরিশ্রেণী। দিনের পর দিন বিরামবিহীন তার এই এগিয়ে চলা। শেষে তার লক্ষ্য সেই মহাপর্বতের ঢালে এসে এক দিন সে পৌঁছলো। তবু কিন্তু বিশ্রাম নেই। মুহূর্তের সময় নষ্ট করতেও সে রাজী নয়—সোজা উঠতে থাকে পর্বত বেয়ে।

তুষার ও বরফে ঢাকা অন্য সব গিরিশ্রেণী দূরে সরে গেছে। চার পাশে তাদের চূড়োগুলোকে দেখা যায় নীচে। বহু-বহু নীচে গিরিসঙ্কটগুলো যেন এঁকেবেঁকে গেছে মাকড়সার জালের মতো।

হিমবাহের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া জুরার গালের হাড় জমিয়ে দিচ্ছে যেন। উত্তেজনায় তার দুই চোখ জ্বলছে গুরুতর বিকারগ্রস্তের মতো। সম্বল শুধু প্রচণ্ড মনের জোর। সেই জোরে জীর্ণশীর্ণ অবসন্ন ক্লান্ত দেহ সে টেনে নিয়ে চলেছে কোন রকমে। হাড়ে ও পেশীতে ব্যথা, তেল-না-দেওয়া গাড়ির চাকার মতো শব্দ হচ্ছে গাঁটে গাঁটে।

এতক্ষণ কার্তুজটা সে দেখছিল প্রতি শখানেক গজ অন্তর, এখন দেখছে দশ গজ যেতে না যেতেই। আলগোছে হাত দিয়ে দেখছে ওটা ঠিক আছে কিনা। সবচেয়ে ভাল হতো, কার্তুজটা যদি রাইফেলে ভরে রাখা যেত। তাহলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। কিন্তু তুষারের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ছোঁয়ায় নেতিয়ে যাবার ভয়ে তা করতে ভরসা পাচ্ছে না। নেতিয়ে গেলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? ক্লিক করে একটু শব্দ হবে শুধু, গুলি বেরোবে না। ব্যঙ্গের অট্টহাসি হাসবে বলবক। এটা সহ্য করা তো দূরের কথা, জুরার পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব।

কার্তুজের চিন্তা তাকে যেন অস্থির করে তুলেছে। স্বস্তি নেই এক মুহূর্তও। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করলে—নাঃ, কোটের নীচে বুকের কাছে নয়, ওটাকে হাতের মুঠোয় রাখাই প্রশস্ত।

অসাড় হাত। চলতে চলতে একসময় হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়লো, উত্তেজনায় ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছে। মুঠোর মধ্যে কার্তুজটার স্পর্শ তো পাচ্ছে না! সর্বনাশ! কি হলো? কিন্তু নাঃ, এই তো ঠিক আছে! ন্যাকড়াটা সে খুলে ফেললে, ম্যাটমেটে রঙের কার্তুজটা রোদে চকচক করছে। মমতাভরা চোখে সে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ওটার দিকে, খুশি যেন উপচে পড়ছে দু চোখ থেকে। আবার ওটাকে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে মুঠোয় চেপে ধরে সে পর্বতে উঠতে শুরু করলো।

আকাশ ঘন নীল। উজ্জ্বল সবুজ দেখাচ্ছে তুষারের রঙ। জুরা উঠে চলেছে—উঁচু থেকে আরো উঁচুতে। এত উঁচুতে সে জীবনে কখনো ওঠেনি। চুড়োটা আর দূরে নয়, তার মাথায় এসে গেছে প্রায়।

চিরাচরিত সেই নিষ্প্রাণ বরফ আর তুষারের আচ্ছাদন তার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। একমাত্র শুধু পর্বতের খাড়া নীলাভ পাশগুলোয় এসে দৃষ্টি যেন কিছু স্বস্তি ও বৈচিত্র্য বোধ করে।

শব্দহীন স্তব্ধতা সর্বত্র। সে নৈঃশব্দ্য এত নিঃসীম যে, কানে তালা লাগে, কান ঝাঁ ঝাঁ করে।

হঠাৎ জুরা চমকে ওঠে—ও কী!

ভয়ে সে কয়েক পা পেছিয়ে গেল। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। গিরিচুড়োগুলো সব হঠাৎ লেলিহান আগুনের শিখায় ছেয়ে গেছে! পর্বতগুলো জ্বলছে! কী ব্যাপার!

বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে থাকে। ব্যাপারটা দুর্বোধ্য অবিশ্বাস্য হলেও নিজের চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে, আগুনের শিখাগুলো বিরাট বিরাট ফুলেব মতো লকলক করে যেন লাফিয়ে উঠছে, পরক্ষণে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে শুকিয়ে-যাওয়া ঝরনার মতো। সর্বত্র শুধু লকলকে অগ্নিশিখা। বাঁযে তাদের রঙ নীল, ডাইনে সবুজ, সামনে লাল আর পেছনে বেগুনী। প্রখর দীপ্তি আর প্রচণ্ড তেজে তারা শয়ে শয়ে জ্বলছে। মহা-ভয়ংকর এক অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়েছে পর্বতে পর্বতে!

সহসা সমস্ত শব্দ থেমে গেল। জুরা মুখ তুলে তাকালে। পরক্ষণে সেই নিঃসীম স্তব্ধতার মধ্যে তার কানে এল ছোট্ট রুপোর ঘণ্টার টুং-টাং রুনুঝুনু বাজনা। নীলাভ-সবুজ অগ্নিশিখার সেই ঝরনাধারা থেকে কোমল মধুর এক মায়াবী সঙ্গীত কেঁপে কেঁপে ভেসে আসছে, জুরার সমস্ত চেতনা মথিত করে ধাপে ধাপে তা উঠছে উঁচু থেকে আরো উঁচু পরদায।

বাতাসের লেশ নেই কোথাও। অথচ আগুনের শিখাগুলো যেন ঝোড়ো হাওয়ায় এদিক-ওদিক নাচানাচি ছুটোছুটি করছে, অসংখ্য আঁকাবাঁকা কম্পমান সুতোর মতো মোচার আকারে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে ওপর দিকে।

জুরা সম্মোহিত নিস্পন্দ। হঠাৎ নিজের পায়ের দিকে নজব পড়তে সে একটু অবাক হলো—অনেক-অনেক নীচে তার পা দুখানা নেমে গেছে। ভেতরে জাগছে কি এক অব্যক্ত অনুভূতি—মনে হচ্ছে, সে যেন অসীম আকার পেতে চলেছে। একটা মানুষেব সুবিশাল ছায়ায় ঢাকা অর্ধেক আকাশ। রাইফেলে ভর দিয়ে নিস্পন্দ ছায়াটা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে তারই দিকে!

কে তুমি?—জুরা চিৎকার করতে গেল, হাত তুললো। নির্বাক ছায়াটাও হাত তুললো তেমনি।

মধুর সেই মায়াবী সঙ্গীতেব কাঁপা-কাঁপা ঝঙ্কার কিন্তু সমানে চলেছে, এক মুহূর্তও থেমে নেই। জুরার মনে হয, হিমানী-সম্প্রপাতে সে যেন ভেসে চলেছে।

সুমধুর সে সঙ্গীতে আলোড়িত মথিত হচ্ছে তার অন্তস্তল পর্যন্ত। নীরবে এক-সময় সে ধীরে ধীরে তুষারের ওপর এলিয়ে পড়লো। অপরূপ এ সঙ্গীত-ঝঙ্কার সে অনন্তকাল ধরে শুনতে চায়। এ ঝঙ্কারে তার অন্তরে জাগছে হালকা আনন্দের শিহরণ। তার মনে হচ্ছে, আগুনের বৃত্তের মধ্যে নৃত্য করছে সে। আঃ, কী আরাম! সে ঘুমোতে চায়। আর কোন কামনা-বাসনা নেই। ক্লান্তিতে পা ছড়িয়ে তুষারের ওপর শুয়ে পড়লো সে। বেশ গরম লাগছে। সঙ্গীত ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে তাকে।

হঠাৎ এক সময় তার মনে হলো, কে যেন তাকে টানছে আস্তিন ধরে। নিদারুণ মনের জোরে অনেক কষ্টে সে চোখ মেললে। ও কী! আগুনের শিখাগুলো যে দূরে তুষারে মিলিয়ে যাচ্ছে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে সঙ্গীতের শেষ রেশটুকু! দেখতে দেখতে সবই মিলিয়ে গেল। শুধু অর্ধেক আকাশজোড়া সেই ছায়াটার পাশে আর একটা ছায়া তার দিকে ঝুঁকে আছে—কুকুরের ছায়া সেটা। পরক্ষণে জুরার চেতনায় প্রবেশ করলো টীকের গর্-গর্ গর্জন।

সে চোখ মেললে। চারদিকে শুধু নিষ্প্রাণ তুষারের আস্তরণ আর নিস্তব্ধ খাড়া সব পর্বত। চূড়োর প্রায় কাছে সে পৌঁছে গেছে, কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে শুয়ে আছে তুষারের ওপর। পরক্ষণে অগ্নিশিখা ও সঙ্গীতের কথা তার মনে জাগলো আবছা স্মৃতির মতো।

ধীরে ধীরে সে উঠে বসে। আবারও টীক তাকে বাঁচালে চিরনিদ্রার হাত থেকে।

হঠাৎ নিজেব খালি হাতের দিকে নজর পড়তেই সে দারুণ আঁতকে উঠলো ঃ কার্তুজ! কার্তুজটা গেল কোথায়? হায় হায়, একটাই যে মাত্র কার্তুজ! তা-ও সে হারিয়ে ফেললে!

সে ঝাঁপিয়ে পড়লো তুষারের ওপর। হামাগুড়ি দিয়ে নরম তুষারের মধ্যে ওটা খুঁজতে শুরু করলো পাগলের মতো।

খোঁজ্! খোঁজ্!—টীককেও সে তাড়া দেয়।

মচ্মচে তুষার চাপ লাগতেই গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডায় অসাড়-হযে-যাওয়া হাতে সেই তুষার সরানোরও শক্তি নেই জুরার।

টীক কিন্তু ঝড়ের বেগে থাবা দিয়ে তুষার খুঁড়ে চলেছে। কয়েক মিনিট পরেই সে মুখ তুললে, তার দাঁত থেকে ন্যাকড়াটা ঝুলছে।

জুরা টীককে বুকে চেপে ধরলে।

প্রথম পর্ব ৬

জুরা ঠিক করেছিল, ইমাম বলবককে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গিয়ে ওত পেতে থেকে তাকে ঘায়েল করবে, তারপর আবার ছুটবে তাগাইয়ের পেছনে। কিন্তু তা হলো না।

সেদিন সকালে সামনের দিকে তাকাতেই ইমামের সাদা পাগড়িটা তার নজরে পড়লো। সারেজ হ্রদ থেকে জায়গাটা খুব দূরে নয়। বলবক পেছনে তাকাচ্ছেন না, দ্রুত হেঁটে চলেছেন সামনের দিকে। আকাশছোঁয়া পর্বত থেকে কেউ যে তাঁকে অনুসরণ করতে পারে, এটা তাঁর কল্পনার বাইরে।

জুরা তাড়াতাড়ি ন্যাকড়াটা খুলে রাইফেলে গুলি ভরে নিলে, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে রাইফেল তাক করলে বলবকের দিকে। তার হাত-পা কাঁপছে।

একটাই মাত্র কার্তুজ! যদি ভেস্তে যায়!—কথাটা মনে হতে সে রাইফেল নামিয়ে নেয়। ভাবতে থাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। গিরিসঙ্কট ধরে ইমাম দ্রুত সরে যাচ্ছে, পেছনে লক্ষ্য নেই। হ্রদটা যে কোথায়, জুরা ঠিক জানে না। তার সামনে আর একটা শৈলশিরা। হ্রদটা সেখানে হতে পারে না। ইমামকে তাই আঁকাবাঁকা গিরিসঙ্কট ধরে ঐ পর্বতটা বেড়

দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সে যদি সোজাসুজি পর্বতটা ডিঙিয়ে যায়, তাহলে পথ নিশ্চয়ই কম হবে।

জুরা আবার তাড়াতাড়ি পর্বতে গিয়ে উঠলো। বুকের ধুকপুক শব্দটা যেন গলার কাছে উঠে এসেছে, ঝাপ্‌সা কুয়াশা যেন চোখের সামনে। ঠোঁটও শুকিয়ে গেছে। দম নেবার জন্যে খাবি খাচ্ছে সে।

বলবক কি শেষতক সরে পড়বে? হ্রদের ধারে গিয়ে যোগ দেবে অন্য বাসমাচিদের সঙ্গে?—কথাটা ঘূর্ণির মতো মাথায় পাক খেয়ে যেতেই মনের ওপর যেন চাবুকের ঘা পড়লো, বেগে ছুটলো সে।

পর্বতটা ডিঙিয়ে ঢাল বেয়ে ছুটতে ছুটতে আবার সে দেখতে পেল বলবককে—এবারও তার সামনে, তবে অনেক কাছে।

কাঁধের ওপর রাইফেল রেখে জুরা তাক করলে।

প্রাণপণ জোরে দৌড়তে দৌড়তে পর্বতে ওঠার ফলে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে বুক এত জোরে ওঠানামা করছে যে, ইমামের ওপর চোখ ঠিক রাখতে পারছে না। একটু একটু করে বলবক দূরে সরে যাচ্ছে আর তার ফলে জুরার উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে চরমে গিয়ে ঠেকছে।

শেষ পর্যন্ত প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে সে এক পাহাড়ের মাথায় গিয়ে উঠলো।

সামনের প্রসারিত থাবার ওপর মাথা ঠেকিয়ে শ্রান্ত টীক তার পাশে শুয়ে আছে।

—টীক! টীক!

টীক লাফিয়ে উঠলো। জুরা তাকে কাছে এনে বলবককে দেখিয়ে দিলে আর হাত দিয়ে শূন্যে বৃত্ত এঁকে এঁকে কি যেন বলতে লাগলো ফিসফিস করে। টীক ছুটলো নিঃশব্দে।

দেখতে দেখতে টীক অদৃশ্য হয় পাহাড়-ঢিবিগুলোর পেছনে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর জুরা এক ঢিবির ওপর রাইফেলটা বসালে। তখনো সে নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না।

গিরিসংকট ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে বাঁকটা ছাড়ালেই সেই ধস্‌টা চোখে পড়ে, যা অতীতে বাঁধ সৃষ্টি করেছিল, আর তার ফলে তৈরী হয়েছিল সারেজ হ্রদ। যতদূর মনে হয়, সেই বাঁধের পেছনে রয়েছে ইমামের লোকজন।

জুরা সাবধানে রাইফেল তাক করলে। কিন্তু হঠাৎ তার খেয়াল হয়, আরে রাই-ফেলের পাল্লা তো বাঁধা হয়নি! সর্বনাশ! সে ঘেমে উঠলো।

আস্তিনে ঘাম মুছে, চোখের হিসাবে দূরত্ব ঠিক করে ছশো গজে সে পাল্লা বাঁধলে। রাইফেলের দৃষ্টিযন্ত্রের রন্ধ্রটা ইমামের পায়ে গিয়ে পড়েছে। খুব ছোট্ট দেখাচ্ছে তাকে। ধীরে অকম্পিত হাতে জুরা ট্রিগার টিপলে।

তার প্রত্যাশার আগেই কিন্তু গুলির আওয়াজ হয়। রাইফেল কাঁধে পাথরের মূর্তির মতো সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে, চোখ তার ইমামের ওপর।

ক্ষুদে মূর্তিটা থমকে দাঁড়িয়েছে। দেখে মনে হয়, গুলির আওয়াজে সে যেন অবাক হয়েছে। পরক্ষণে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দ্রুত ছুটলো টিলা-ঢিবিগুলোর পেছনে। প্রতি পদক্ষেপেই তার খোঁড়ানো বাড়ছে।

পালালো, ও পালালো!—বলতে বলতে জুরা রাইফেল চেপে ধরে ছুটলো ইমামকে লক্ষ্য করে।

এবার বলবকও দেখতে পায় তাকে। থমকে দাঁড়িয়েই সে গুলি ছুড়লে। আর ঠিক

সেই মুহূর্তে পাহাড়-টিলার পেছন থেকে লাফিয়ে পড়লো টীক। ইমামকে সে পেড়ে ফেললে মাটিতে।

জুরা যখন গিয়ে পেঁাছলো, ইমাম তখন মাটিতে চিত হয়ে পড়ে চিৎকার করছে আর দু হাত দিয়ে টীকের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। টীক তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে কামড়ে কামড়ে তার হাত ক্ষতবিক্ষত করছে আর চেষ্টা করছে তার টুঁটির নাগাল পাবার। কাছে একটা মসার পড়ে আছে।

টীক, টীক! থাম্ থাম্! সর্ সর্!—হাঁপাতে হাঁপাতে আর ছুটতে ছুটতে জুরা হাঁক ছাড়লে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! টীকের সেদিকে গ্রাহ্যই নেই। এই হারাম-জাদা নচ্ছার কিনা তার মনিব-দোস্তের ওপর গুলি চালিয়েছে! এত বড় আস্পদ্দা! ওর দফারফা না করা পর্যন্ত সে শান্ত হবে না। ইমাম তাই যত হাত নাড়ছে, টীকও তত প্রাণপণ জোরে কামড় বসাচ্ছে তার হাতে আর গর্জাচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে।

সন্ধ্যা নামে। আকাশে তারার দলের ঝিলিমিলি জাগে একে একে। পরিত্যক্ত এক ছাউনির নিবে-যাওয়া আগুনের পাশে নিদারুণ ক্লান্তি ও অবসাদে জুরা মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে। টীক মুখ দিয়ে তার পাঁজরে গুঁতো মেরে চলেছে, কিন্তু মনিবের হুঁশ নেই।

অস্থির ব্যাকুল টীক ছটফট করে, কেঁউ কেঁউ করতে করতে দাঁত দিয়ে জুরার কোটের কিনারা কামড়ে ধরে টানাটানি করতে থাকে। কিন্তু কি মুশকিল! মনিবের তবু ঘুম ভাঙছে না।

টীক এবার জুরার হাত চাটতে চাটতে দাঁত দিয়ে তাতে আস্তে চাপ দিলে। এবার যেন জুরার হুঁশ ফিরে আসে, কাতরানির শব্দ বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। কিন্তু চোখ মেলতে পারে না। চোখে যেন ছোরা বসিয়ে দেবার মতো যন্ত্রণা। সে পাশ ফিরে শুতে গেল। কিন্তু টীক তার গালে নাক দিয়ে গুঁতো মারছে। এতক্ষণে বুঝি জুরার হুঁশ হয়। অনুরক্ত প্রভুভক্ত টীক অজানা লোকের উপস্থিতি সম্বন্ধে তাকে হুঁশিয়ার করতে চাইছে।

অসাড় দেহটা সে তোলার চেষ্টা করলে, কিন্তু সংগে সংগে চিত হয়ে পড়ে গেল। কয়েক পা দূরে জনা কয়েক লোক দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু জুরার কাছে তা যেন অস্বাভাবিক, অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ঠেকে না। একটু আগেই সে এক স্বপ্ন দেখেছে, তার কাছে ওটা অবশ্যি স্বপ্ন নয়—সত্যি। সে দেখেছে, মৃত সর্দার ইস্কান্দার একটা লাল ঘোড়া নিয়ে এখানে এই আগুনের পাশে নীরবে বসে আছে।

জুরা পলকের জন্যে একবার চোখ মেললে, তারপর সহজ কণ্ঠে বললে,—কে, ইভাস্কো? তুমি?

দলের সামনের লোকটা চমকে উঠলো, এগিয়ে আসতে আসতে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলে,—কে তুমি?

আমি জুরা। কেন, আমায় চিনতে পারছো না?—তেমনি আচ্ছন্নের মতো চোখ বুজে সহজ কণ্ঠে জুরা বললে।

—অ্যাঁ, একশো শয়তানকেও পরোয়া করি নে! আরে, শয়তানের বাচ্চা, তুমি এলে কোথা থেকে? অ্যাঁ, কিভাবে এলে এখানে?

ঘুমুতে দাও।—কাত হয়ে শুতে শুতে জুরা বলে। পরক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

চালাকি ছাড়ো!—ইভাস্কো হেঁকে উঠলো : বলো, কি করে তুমি এখানে এলে? পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা আমরা এখানে এসেছি, ক্ষমতার অতিরিক্ত ছুটেছিল ঘোড়াগুলো, অথচ তার আগেই তুমি হাজির এখানে!

জুরা অনেকটা জেগে যায়।

ইভাস্কো জানে, জুরা তাগাইকে ধরার জন্যে বেরিয়েছিল, তাই জিজ্ঞেস করলে,—তাগাইকে ধরেছ ?

না। পূব দিকে সে সরে পড়েছে। আমার ধারণা, বিলিয়াণ্ড-কীকের পর্বত-এলাকায় লুকিয়ে আছে। সে আমার নিয়তি, আমার শরম-অপমান। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তার কথাই শুধু ভেবেছি, তার চিন্তায় ছটফট করেছি মানসিক যন্ত্রণায়। অথচ এখন সে ওখানে পালিয়েছে আর আমি পড়ে আছি এখানে!—বলতে বলতে মনের দুঃখে হাত নেড়ে জুরা আবার টানটান হয়ে শোয়। অমানুষিক পরিশ্রমে ও অবসাদে সে এখন এতই দুর্বল যে, নিজেকে সংযত করার বা মনের ভাব গোপন করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। পরক্ষণে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ে।

ইভাস্কো তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে,—শোন, আর একটু সবুর করো। এখানে তুমি কেন এসেছ ? আর এলেই বা কি করে ?

ঐসব গিরিপর্বত ডিঙিয়ে এসেছি।—নিদ্রাচ্ছন্ন জুরা বিড়বিড় করে বলে ঃ ওখানে তুষারে বরফে আগুন জ্বলে, গানবাজনা হয়।

প্রলাপ বকছে।—পার্টিজানদের একজন মন্তব্য করে।

আরেকজন জিজ্ঞেস করে,—কিন্তু ও ওরকম কালো হয়ে গেছে কেন, কমরেড ক্যাপ্টেন ? দেখছেন, গায়েব রঙ কি দাঁড়িয়েছে ?

তৃতীয় আরেকজন জবাব দেয়,—ঐ অবস্থায় পড়লে তুমি নিগ্রো বনে যেতে। সুদূর ঐ আসমানে ও উঠেছিল। কী সাংঘাতিক ব্যাপার! তার ওপর ক্লান্তও হয়েছিল সেই রকম। নিদারুণ পরিশ্রমে, অবসাদে আর ঠাণ্ডায় ওর রঙ ঐরকম কালো হয়ে গেছে।

জুরাকে একটু তুলে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ইভাস্কো আবার জিজ্ঞেস করলে,—কই, বললে না তো, এখানে তুমি কেন এসেছ ?

ইভাস্কোর ঝাঁকানিতে টীক গোঁ গোঁ করে উঠলো, জুরাও জেগে গেল কিছুটা। ঘুমজড়ানো গলায় বললে.—কজুবেকে কথা দিয়েছিলাম, পালের গোদা বাসমাচিটাকে ধরবো—

তার কথাগুলো এত অস্পষ্ট যে, প্রায় শোনাই যায় না। বলতে বলতে আবার সে ঘুমিয়ে পড়লো।

ইভাস্কো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আবার জিজ্ঞেস করে,—ধরেছ তাকে ?

হ্যাঁ, ঐ ওখানে...পাহাড়-টিলার পেছনে...—ঘুমজড়ানো তেমনি অস্পষ্ট কণ্ঠ জুরার। তার ধারণা, মাথা নেড়ে জায়গাটা সে দেখিয়ে দিলে, আসলে কিন্তু মাথাটা ঝুঁকে পড়লো বুকের ওপব। তারপর আবার সেই টানা ঘুম।

ইভাস্কো লাফিয়ে উঠলো স্প্রিংয়ের মতো, তারপর ছুটলো। টিলা-ঢিবিগুলো পার হতেই দেখতে পেল কয়েদীকে। তার হাত-পা বাঁধা, এক পা ব্যাণ্ডেজ করা। লোকটা মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে।

ইভাস্কো তার মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলতেই আবারও লাফিয়ে উঠলো স্প্রিংয়ের মতো। তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল সোল্লাস চিৎকার,—বলবক! ইমাম বলবক!

ভয়ানক চমকে উঠলো পার্টিজানরা। চমকে উঠলো টীক। গোঁ গোঁ করতে করতে ছুটে গেল সে। মনিব তাকে এই কয়েদীটার পাহারায় রেখেছে। সেখানেও কিনা ঝামেলা! রা-রা করে সে রুখে গেল পার্টিজানদের হটিয়ে দেবার জন্য।

বলবককে ঘিরে পার্টিজানদের তখন ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে, এ ওর ঘাড়ে পড়ছে, এ ওর পা মাড়িয়ে দিচ্ছে।

তার মধ্যে শোনা গেল একাধিক কণ্ঠ,—কি তাজ্জব কাণ্ড! বিশ্বাস করা কঠিন। জান কবুল করে আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে এলাম, আর ও কিনা ইমামকে পাকড়াও করলে! আর কিনা একাই!

ইভাস্কো ততক্ষণে আগুনের পাশে ছুটে গিয়ে জুরাকে জড়িয়ে ধরেছে,—দানব, তুমি দানব! হেই জুরা, একবার চোখ মেলো, জাগো! শোন, ইমাম বলবককেই তুমি পাকড়াও করেছ। আর আমরা কিনা তার পেছনে মরিবাঁচি করে ঘোড়া ছুটিয়েছি! ইমাম বলবকের মতলব কি ছিল, জান? সারেজ হ্রদের বাঁধ উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। হেই জুরা, বুঝতে পারছো, হাজার হাজার মানুষের ধনপ্রাণ তুমি বাঁচিয়েছ চিরকালের মতো? ইমাম বলবককেই তুমি পাকড়াও করেছ, বুঝতে পারছো?

জুরা আবার কিছুটা জেগে যায়, বিড়বিড় করে বলে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলবক! শুধু নজর রেখ, ও যেন পালিয়ে না যায়, তাহলে কজুবে বড় রাগ করবেন।

তাই হবে, জুরা তাই হবে!—জুরাকে আবার ঠেলতে ঠেলতে ইভাস্কো বলে ঃ এত বড় কাজটার গুরুত্ব ওর মগজেই ঢোকে নি।.. .. এই জুরা, শোন, শোন। জান, তুমি কে? কি বিরাট কাজ তুমি করেছ? ভয়ঙ্কব এন. বি. ১২৩ নম্বর গুপ্তচরকে তুমি পাকড়াও করেছ। সত্যিই, ও বাসমাচিদের পালের গোদা। জুরা, হেই জুরা, শোন, শোন ....

রেগেমেগে ইভাস্কোকে ঠেলে ফেলে জুরা চেঁচিয়ে উঠলো,—কি, হচ্ছে কি অ্যাঁ? আমায় ঘুমুতে দাও।

বলতে বলতে আবার সে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে পাথরের ওপর।

আর উল্লাসে আবেগে ইভাস্কো যেন ফেটে পড়ে। এই হাসে, এই নাচে আর এক-একবার ছুটে গিয়ে জুরাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচায়,—মানুষ না, তুমি মানুষ না! দৈত্য, দৈত্য! মহাকায় দৈত্য! না না, পর্বত-মুলুকের তুমি দুরন্ত সোনালী ঈগল! দোস্ত, হেই দোস্ত, শুনছো? জানো, তুমি কি করেছ? খেল খতম! বাসমাচিদের খেল একেবারে খতম!

ইভাস্কোব হুকুমে লোকজন জুরাকে ধরাধরি করে সারেজ হ্রদের ধারে সেই ধসে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল বলবককেও। তাঁবু খাটানো হলো। তারপর শুরু হলো জুরার পরিচর্যা। কেউ তার ফোলা পা থেকে বুটজোড়া কেটে বের করে স্পিরিট ঘষতে লেগে যায়, কেউ তাব দু হাতে লেপে ভেসলিন, কেউ কেউ সারা গা টেপে আর দলাইমলাই করে, আর ইভাস্কো নিজের ওভারকোট খুলে জুরার মাথার নীচে দিয়ে দেয় বালিশের মতো। এমনি করে চলে জুরার সেবা-যত্ন। জুরা তবু ঘুমোয—ঘুমোয় অঘোরে।

দীর্ঘ রাত শেষ হয়ে আসে। সারেজ হ্রদের মাথায় ঘুমে ঢুলুঢুলু সাদা মেঘপুঞ্জ। ভোরের সোনালী আলো তাদের কিনারা রাঙিয়ে তুলছে। দিগন্তবিসারী হ্রদের নীল জলরাশি শুভ্র কুয়াশার ভেতর থেকে জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। পৃথিবী জাগছে। কিন্তু জুরা ঘুমোচ্ছে তখনও।

দ্বিতীয় পর্ব ১

সে রাতে জয়নাবের তাঁবুতে মুসা ছুটতে ছুটতে ঢুকেছিল বললে কম বলা হবে, ঝড়ের মতো আবির্ভূত হয়েছিল বললেই বোধহয় ঠিক হবে।

আগুনের ধারে বসে জয়নাব তখন বড় এক ছোরার খাপের ওপর ছুঁচ দিয়ে সোনা ও রুপোর জরির কাজ করছে, এমন সময় মুসার ঐ আবির্ভাব। সেলাইটা সে তড়িঘড়ি কোনরকমে পেছনে লুকিয়ে ফেললে। কারণ কার জন্যে এটা সে করছে, মুসাকে তা সে আঁচ করতে দিতে চায় না।

মুসার কিন্তু ওদিকে লক্ষ্যই নেই। জয়নাবের পাশের মাদুরের ওপর বসে পড়ে সে তার কাঁধে হাত রাখলে।

বলো তো, জয়নাব......—মধুঢালা কণ্ঠে কেবল সে শুরু করেছে, হঠাৎ হাতখানা ছিটকে পড়তেই সচকিত হয়ে উঠলো ঃ কী কাণ্ড! জয়নাবের অগ্নিদৃষ্টি আর তার হাতের রিভলবারটা ওর মুখের দিকে নিবদ্ধ।

এ সবের মানে কি?—বিস্মিত আহত কণ্ঠে সে বললে, মধুমাখা কণ্ঠ তার কোথায় উবে গেছে ঃ ছ্যাঁ ছ্যাঁ! কোথাকার বোকা মূর্খ মেয়ে! চুলোয় যাক—এটাই যদি আদব-কায়দা হয় তো হোক, তাহলে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করি, বড় কোন ব্যাপারে কুচাককে কি বিশ্বাস করা যায়? তাকে—

কুচাককে বিশ্বাস? আলবৎ! নিজেকে তুমি যে রকম বিশ্বাস করো, তাকেও তাই করতে পার।—রিভলবার খাপে পুরতে পুরতে জয়নাব জবাব দেয়, চোখে তার বিভ্রান্ত দৃষ্টি ঃ কিন্তু ওসব ছলাকলা রাখো, স্পষ্ট করে বলো, কি ব্যাপার।

—বটে! তাহলে শোন, কুচাকের সঙ্গে আমার দলের যে পার্টিজানটি বিলিয়ান্ড-কীকে গেছলো, ঘোড়া ছুটিয়ে সে ফিরে এসেছে, কিন্তু অকারণে নয়—জবর কিছু খবর নিয়ে। তোমার কি মনে হয়?

অধীর কণ্ঠে জয়নাব বললে,—চটপট বলে ফেল। তারপর?

না, যা ভাবছো, জুয়ার খবর নয়,—মুসার কণ্ঠে রাগ ও ব্যঙ্গ ঃ এখান থেকে সে জায়গাটা আধ দিনের পথ, কুচাক সেখানে কজিৎজ্কির সঙ্গে সমানে নেশা করছে আর হুল্লোড় করছে। দুজন দুজনের সঙ্গে চিরকালের দোস্তি পাতাচ্ছে আর তাগাইয়ের স্বাস্থ্য পান করছে।

আগাই!—আচমকা জয়নাবের মুখে যেন চাবুকের ঘা পড়লো। চোখ তার কপালে উঠে গেছে ঃ তাগাই?

—হ্যাঁ, তাগাই!

জয়নাব লাফিয়ে উঠলো, বললে,—বলো কি?...বটে!...আচ্ছা, আচ্ছা...ওঠো, শীগ্‌গীর চলো, এক্ষুণি সেখানে পৌঁছতে হবে। এ দুনিয়ায় জন্মেছে বলে কুচাককে এবার অনুতাপ করতে হবে। চলো চলো. ....

তখনো ভোর হয়নি, পূব আকাশে ভোরের আভাস। গত রাতের নেশার ঘোর

কুচাকের তখনো কাটেনি, দু পায়ে ভর দিয়ে ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না। কজিৎজ্‌কি ঘোড়ায় চেপে বসেছে। কুচাক তার কোটের কোনা ধরে টানছে আর ঘোড়াগুলোর স্বাস্থ্য পান করে যাবার জন্যে কাকুতিমিনতি করছে। শেষ পর্যন্ত কজিৎজ্‌কিকে সে মাটিতে টেনে নামালে।

বেশ তাই হোক, এই তিনবারের বার ঘোড়াগুলোর স্বাস্থ্যই পান করা যাক।—কজিৎজ্‌কি বললে। সে-ও নেশায় বুঁদ হয়ে আছে।

হঠাৎ পিঠে ও কাঁধে চাবুকের ঘা পড়তেই কুচাক লাফিয়ে উঠলো। ফিরে দেখে, কতকগুলো লোক হাজির সেখানে। আবার চাবুকের ঘা পড়তে সে চেঁচিয়ে উঠলো যন্ত্রণায়।

তারপরেই দারুণ রাগে সে যেন ক্ষেপে গেল। জয়নাবের হাত থেকে চাবুকটা ছিনিয়ে নিয়ে এলোপাথাড়ি চাবুক মারতে শুরু করলো পাগলের মতো। চাবুক থেকে গা বাঁচানোর জন্যে একটু দূরে সরে গেল সবাই।

কজিৎজ্‌কিব দিকে রিভলবার উঁচিয়ে মুসা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো,—বাসমাচি! শয়তান!

তাঁবুর আগুনের পাশে কজিৎজ্‌কি দাঁড়িয়ে আছে, বুকের ওপর দুই হাত ভাঁজ করা, ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে আছে মুসার দিকে।

খবরদার! এত সাহস দেখিয়ো না, দেখিয়ো না বলছি!—বলতে বলতে কুচাক ঘুষি মেরে মুসার ঘোড়াটাকে হটিয়ে দিয়ে কজিৎজ্‌কিকে আড়াল করে দাঁড়ালো।

জয়নাব চেঁচিয়ে উঠলো,—খবরদার, কুচাক! মরবে, তুমিও মরবে! তুমিও বাসমাচি। দুশমন বেইমানকে তুমি পালাতে সাহায্য করছো, তার সঙ্গে খানাপিনা করছো, তাই তুমিও দুশমন বাসমাচি!

অ্যাঁ আমি?—হতভম্ব কুচাক গোঙিয়ে উঠলো ঃ আমি দুশমন বাসমাচি?

পরক্ষণে লাফিয়ে উঠলো সে,—দাঁড়াও, একটু সবুর করো। কজিৎজ্‌কিকে বেঁধো না। সে দোস্ত, আমাদের দোস্ত! কিছু বুঝতে পারছো না, না? এক্ষুণি বুঝবে!

টলতে টলতে সে কজিৎজ্‌কির ঘোড়ার কাছে গিযে হেঁচকা টানে ব্যাগটা টেনে নামালে জিন থেকে। সেটাকে আগুনের দিকে টেনে আনতে আনতে বললে,—এই দেখ! ভাল করে দেখ সবটা!

ব্যাগটা সে এবার ঝাড়তে শুরু করে। দম আটকে সবাই অপেক্ষা করছে। একটা রক্তমাখা বাণ্ডিল পড়লো ব্যাগ থেকে। কম্পিত হাতে বাণ্ডিলটা তুলে নিয়ে ন্যাকড়া-গুলো খুলতে থাকে কুচাক। রক্তে মাখামাখি একটা মানুষের মুণ্ডু ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে। আগুন ঘিরে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। মুণ্ডুটা গড়াতে গড়াতে আগুনের পাশে গিয়ে স্থির হলো। মুখটা তার আশমানের দিকে।

সেদিকে নজর পড়তেই আতঙ্কে তীক্ষ্ন চিৎকার করে দু পা পেছিয়ে গেল জয়নাব ঃ আধবোজা চোখে তাগাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাগাইয়ের পাতলা দুই ঠোঁট আর ছোট কালো গোঁফ জোড়া রাগে বেঁকে আছে মনে হয়। জয়নাবের সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠলো। কয়েক মুহূর্ত বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে, ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় জয়নাব মুখ ফেরালে অন্য দিকে উঃ, কী কুৎসিত শয়তান!

এই সেই দুশমন! এই-ই ছিল সেই দুশমন!—মুণ্ডুটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কুচাক বললে, তারপর কজিৎজ্‌কির দিকে মাথা নেড়ে যোগ করলে ঃ এই সেই লোক, যে ওকে খুন করেছে। ওর মাথা কেটে নিয়ে সে এখন যাচ্ছে সোভিয়েত নেতাদের দেখানোর জন্যে। এবার কি মনে হয়, ও কি দুশমন?

ঘটনার পর ঘটনায় কুচাক তখন ক্লান্ত অবসন্ন। আগুনের পাশে সে বসে পড়ে।

কারো মুখে কথা নেই।

একটু পরে জয়নাব কজিৎজ্ কিকে জিজ্ঞেস করে,—এখন আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

উদাসীনভাবে কজিৎজ্ কি কাঁধ ঝাঁকায়,—বাসমাচিদের দুশমন আমি আগাগোড়াই, তারা জোর করে আমায় আটকে রেখেছিল। কিন্তু তাদের এখন চিরকালের মতো খতম করে দিয়েছি। আমার প্রধান শত্রু তাগাইকে আমি নিজের হাতে গুলি করি, তার-পর ছোরা দিয়ে মাথাটা কেটে ফেলি। আমি যে সোভিয়েত সরকারের অনুগত, তার প্রমাণ হিসেবে এটা সোভিয়েত শহরে নিয়ে যাচ্ছি। তাঁরাই সিদ্ধান্ত করবেন, আমি কি।

সোল্লাসে কুচাক বললে,—ঠিক, ঠিক!

চিৎকার করে পার্টিজানরাও সমর্থন জানালে। জয়নাব বললে,—বেশ, তাই যান।

মুসা এ পর্যন্ত কথা বলে নি। এবার জিজ্ঞেস করলে,—বাসমাচিদের রাইফেলগুলো সব কোথায়?

সোকসাই নদীর দিকে হাত নেড়ে কজিৎজ্ কি বললে,—সেগুলো ওখানে শিকারীর গুহায় ফেলে এসেছি, তোমরা পরে কুড়িয়ে নিতে পারবে।

কুচাক ইতিমধ্যে তাগাইয়ের মুন্ডুটা আবার ন্যাকড়ায় জড়িয়ে থলির মধ্যে পুরে দিয়েছে। কজিৎজ্ কি ঘোড়াব বেকাবে পা রাখলে ঃ এবার রওনা হবে।

হঠাৎ প্রচন্ড এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুসা বললে,—সত্যি, আমারই ভুল হয়েছে। বিরাট লোক আপনি, আপনি বীর। আপনাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা উচিত এবং তা হবেও। আমি এবং জনা দুয়েক পার্টিজান আপনাকে সসম্মানে নিয়ে যাব শহরে। আট দিন লাগবে সেখানে পৌঁছতে। পথে অনেক গ্রাম পড়বে। সেখানকার চাষীরা সবাই বাসমাচিদের ওপর সাংঘাতিক খাপ্পা এবং তাদের অনেকেই আপনাকে চেনে। আপনি একা গেলে, তাগাইয়ের মুন্ডুও আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমি সঙ্গে থেকে নিরাপদে নিয়ে যাব আপনাকে।

কজিৎজ্ কি জবাব দেয়,—সেজন্য ভেব না। আমি একাই যেতে পারবো।

নেশাজড়ানো গলায় কুচাক বললে,—হাঁ হাঁ, ওসবের দরকার হবে না। উনি এখন কারাতেগিন যাচ্ছেন।

কারাতেগিন! কেন?—মুসা অবাক ঃ তেংগিজবাই তো অনেক কাছে। বড় একজন কর্মকর্তাও সেখানে আছেন। না না, কজিৎজ্ কি সাহেব, আপনাকে আমি সোজা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

ধন্যবাদ। ওজন্যে তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই।—মাথা ঝাঁকিয়ে কজিৎজ্ কি বললে ঃ তোমার এই অকারণ কষ্ট-স্বীকারে আমি সায় দিতে পারছি নে।

—কি যে বলেন! এ ধরনের কাজে আমি আনন্দই পাই। চলুন, চলুন, একসঙ্গে যাওয়া যাক।

মুসা কজিৎজ্ কিকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উপরন্তু ওর কারাতেগিন যাওয়ার মতলব শুনে সে মতি স্থির করে ফেলেছে। সম্মান দেখানোব অছিলায় তাকে সে নিজের জিম্মায় মুঠোর মধ্যে রাখতে চায়।

আট দিন পরে এক কিরঘিজ শহরের রাজপথে চারজন ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল।

সূর্য যেন আগুন ছড়াচ্ছে। চারদিকে মাছির ভন্ ভনানি। ধুলোয় বাতাস ভারী। ঘোড়সওয়ার তিনজনের পিঠে রাইফেল ঝুলছে।

বেড়া দিয়ে ঘেরা এক বাড়ির সামনে এসে থামলে আগন্তুকরা। মুসা ভেতরে গেল

এবং একটু পরেই বেরিয়ে এল লালফৌজের একজন সৈনিককে নিয়ে। কজিৎজ্‌কির সঙ্গে তখন পার্টিজান দুজনের তর্কাতর্কি চলেছে। তাদের একজন কজিৎজ্‌কিকে দেখিয়ে বললে,—উনি জল খেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার পরেই পালানোর চেষ্টা করেন।

পার্টিজানটির এই বক্তব্যে মুসা অবশ্য অবাক হয় না। কেননা পথেও কজিৎজ্‌কি সূক্ষ্ম নানা ফন্দিফিকির খাটিয়েছে পালানোর মতলবে।

সৈনিকটি কজিৎজ্‌কিকে বললে,—প্রধান কর্মকর্তা কমরেড কুজমিন এখন অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর সহকারী অফিসে আছেন। আপনি ভেতরে যান।

ঘরটা প্রায় অন্ধকার। জানালায় জানালায় পুরু পরদা ঝুলছে। দেয়ালের গা ঘেঁষে টেবিলের ধারে বসা এক ব্যক্তির অস্পষ্ট চেহারা নজরে পড়ে। কজিৎজ্‌কি একটু ইতস্ততঃ করে ভেতরে পা বাড়ায়।

অনুতাপে দগ্ধ হয়ে এবং নিজের ক্ষতিকর অতীত কাজকর্ম স্বীকার করে এখন প্রায়শ্চিত্তের আকাঙ্ক্ষায়...—বক্তৃতার ঢংয়ে কথাগুলো বলতে বলতে কজিৎজ্‌কি ভেতরে ঢোকে। এটা সে পথে আসতে আসতে তৈরি করেছিল। কিন্তু টেবিলের ধারের ব্যক্তিটিকে হঠাৎ চিনতে পেরেই নিদারুণ চমকে উঠে সে চুপসে গেল মাঝপথে।

গাও, সোয়ালো, গাও!—মুচকি হেসে বললেন কজুবে ঃ বুঝলে হে, শেয়াল যত জোরেই ছুটুক, শেষ পর্যন্ত শিকারীর খপ্পরে তাকে আসতেই হবে।

কজিৎজ্‌কির হাত থেকে ব্যাগটা খসে পড়লো, তাগাইয়ের মাথাটা মেঝের ওপর পড়লো ধপাস করে।

দ্বিতীয় পর্ব ২

তিন দিন পরে কুচাক ঘোড়ার পিঠে ছুটতে ছুটতে শহরে এসে হাজির। চাবুক ও বুটের নাল দিযে ঘর্মাক্ত ঘোড়াটাকে সে তাড়া মারছে প্রাণপণে আর দুই কনুই ফাঁক করে পাখার মতো ঝাপ্‌টাতে ঝাপ্‌টাতে জিনের ওপর নাচছে মনে হয। জিন থেকে এক-একবাব শূন্যে লাফিয়ে উঠছে, আবার পড়ছে, আবার উঠছে আবার পড়ছে, আর উদ্বিগ্ন চোখে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক।

ঘণ্টা দুয়েক পরে তাকে অফিসে দেখা গেল ঃ আরামকেদারায় হাঁটু মুড়ে বসে ঝড়ের বেগে বক্তব্য বলে চলেছে। সুগন্ধ সবুজ চায়ের কাপ তার সামনে, কিন্তু তা ছোঁয়ওনি তখনো।

কজুবে তার সামনে টেবিলের ওধারে বসে মাথা নাড়তে নাড়তে কাগজে কি যেন টুকছেন মাঝে মাঝে।

কুচাক বলছে,—তারপর বুঝলেন, সকালে যখন ঘুম ভাঙলো, নিজের মনেই বললাম, 'হেই কুচাক, যা বিলিয়ান্ড-কীকের গুহাটা থেকে বাসমাচিদের সেই রাইফেলগুলো সব নে আয়, যার কথা কজিৎজ্‌কি বলে গেছে। ওগুলো ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না, জুরা শুনলে রেগে যাবে।' আমি তাই রওনা হলাম ঘোড়ার পিঠে।

তারপর ঘোড়াটার উচ্চতা, রঙ, স্বভাব ইত্যাদি নিয়ে কুচাক সাড়ম্বর বর্ণনা শুরু করতেই কজুবে বাধা দিলেন,—আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। এখন আসল কথায় আসা যাক, কি বলো?

গুম হয়ে থেকে কুচাক কি একটু ভাবলো, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে,—বেশ, তাহলে আসল কথাটা শুনে রাখুন, কজিৎজুকি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক দুশমন, আগাগোড়া সে মিথ্যে বলেছে, এখনও বলছে। তার সব কথাই ডাহা মিথ্যে। বুঝে দেখুন, আমার সঙ্গে ও দোস্তি পাতিয়েছে, চুমু খেয়েছে, বলেছে চিরকালের এ দোস্তি কক্ষনো ভাঙবার নয়, আর তারপর কিনা...হুঃ, লালদেড়ের মুখে সবটা শুনে আমি তো তাজ্জব।

লালদেড়ে! কে সে?—কজুবে জিজ্ঞেস করেন।

—সেটাই তো বলছি। ঘোড়ায় চেপে আমি গুহার কাছে যেতেই একপাল কুকুর চিৎকার জুড়ে দিল। একটু ঘাবড়ে গেলাম। ঘোড়া থেকে নেমে রাইফেল হাতে ঢুকলাম গুহার মধ্যে। গুহার ভেতরে একেবারে ও পাশে শেষ দিকে কে যেন নড়াচড়া করছে। 'কে ওখানে? বেরিয়ে এস!' আমি হাঁক ছাড়লাম। কিন্তু সে গোঙিয়ে উঠলো।

কে গোঙিয়ে উঠলো?—কজুবে প্রশ্ন করেন।

আহা, আমিও তো তাই ভাবলাম, গোঙাচ্ছে কে?—কুচাক চায়ে এক চুমুক দিয়ে বললে : গুহার ছাদ তাক করে গুলি ছুড়তে ছুড়তে আমি আবার হাঁকলাম, 'কে ওখেনে? সব্বাই বেরিয়ে এস। তোমাদের ঘিরে ফেলেছি। বেরিয়ে এস, নয়তো গ্রেনেড ছুড়বো।' কুকুরগুলো চিৎকার করছিল, তাদের চাবকে ঠাণ্ডা করলাম। এমন সময় ভেতর থেকে আবার এল সেই গোঙানি : উঃ বড় তেষ্টা...একটু জল...মারা গে-লা-ম—! প্রথমে ভাবলাম, স্রেফ চালাকি, কিন্তু তার পরেই আবার গলা শুনে বুঝলাম, না, সত্যিই লোকটা মরতে বসেছে। ভেতরে ঢুকে দেখি, এক লালদেড়ে বাসমাচির প্রায় শেষ অবস্থা। তাকে জল এনে খাওয়ালাম।

এর পর কুচাক আবার লালদেড়ের চেহারার বৈশিষ্ট্য হাবভাব কথাবার্তার বিবরণ শুরু করতেই বাধা পেল কজুবের কাছ থেকে।

আর এক চুমুকে বাকী চাটুকু শেষ করে কুচাক এবার কাজের কথায় এল,—লালদেড়ের তখন মর-মর অবস্থা। সে বললে, জুরার বুলেটে তাগাই সাংঘাতিক জখম হয়। পিঠের দিক থেকে গুলি ঢুকে বুকটা ঝাঁঝরা করে দেয়। পর্বত পার হবার পর কজিৎজুকি তার ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে দেয়, খুব যত্নআত্তিও করে। বাসমাচিদের তখন মহাসংকট। তাগাইয়ের হাঁটার ক্ষমতা নেই, তাকে বয়ে নেওয়া মুশকিল, কারণ ওজনে সে যথেষ্ট ভারী। এ সময় তারা বিলিয়াণ্ড-কীকে প্রায় পেঁৗছে গেছে। হঠাৎ তাজিক পার্টিজানদের একটা দল তাদের আক্রমণ করলে। ওরা ভাবলে জুরার দল। কিন্তু আমি জানি, ওটা আবদুল্লোজোনের দল।

কাগজে কি সব লিখতে লিখতে কজুবে মুখ তুলে বললেন,—তারপর? থেম না, বলে যাও।

—তারপর দিনভোর বাসমাচিরা আত্মরক্ষা করলে। রাত্রিবেলায় চেষ্টা করলে সরে পড়ার। তাদের মধ্যে তখন বেঁচে আছে শুধু কজিৎজুকি, তাগাই আর ঐ লালদেড়ে। তাগাই তো মরতে বসেছে। কজিৎজুকি কেঁদে ফেললে, দিব্যি কেটে বললে, জুরার ওপর তাগাইয়ের মৃত্যুর বদলা সে নেবেই নেবে আর বলবকের হুকুম মতো রওনা হবে সারেজ হ্রদের পথে।

জুরাই তাহলে তাগাইকে মেরেছে?—কজুবে জিজ্ঞেস করেন।

—আলবৎ! লালদেড়ে বললে, জুরার বুলেটেই তাগাই মারা পড়েছে। তাগাই মারা যেতে, কজিৎজুকি ছোরা দিয়ে তার মুণ্ডুটা ধড় থেকে কেটে নিয়ে ব্যাগে পুরে বললে, এই মাথার জোরে সমস্ত বাধাই আমরা টপকে যাব, কেউ আমাদের বাধা দেবে না, সবাই আমাদের বিশ্বাস করবে।

পয়লা নম্বরের ধড়িবাজ শয়তান!—শান্ত কণ্ঠে কজুবে বললেন।

হ্যাঁ!—কুচাক বলে চলে : এর পর তারা রওনা হলো, কিন্তু গুহার কাছে আসতেই আবার পড়ে গেল পার্টিজানদের সামনে। লালদেড়ে জখম হলো। তাকে ফেলে পালালো কজিৎজ্‌কি। এবং যাবার সময়, লালদেড়ে যাতে এসব ঘটনা ফাঁস করতে না পারে, তার জন্যে তাকে গুলি করে গেল। কজিৎজ্‌কি এবার নিশ্চিন্ত। তার ধারণা, লালদেড়ে খতম হয়েছে, গুহ্য রহস্য ফাঁস করার আর কেউ নেই। কিন্তু না, মৃত্যুপথযাত্রী লাল-দেড়েই এ সব আমায় বলে গেছে।

একটু থেমে কুচাক শেষে সক্ষোভে মন্তব্য করে,—কত বড় ধড়িবাজ বদমাশ দেখুন! [illegible]াইয়ের কূলে যখন কজিৎজ্‌কির সঙ্গে আমার দেখা হয়, তার সব কথাই আমি বাস—

জানি। সবই শুনেছি।—বলতে বলতে কজুবে উঠে দাঁড়ালেন।

কুচাকও উঠে দাঁড়ায়। তারপর অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে,—দুশমনের সঙ্গে খাতির-দোস্তি করেছি বলে আমার ওপর রাগ করবেন না, কমরেড সিপাহ্‌শালার। কাফেলার লোকের কাছ থেকে কোটটা নিয়েছিলাম বলেও আমি মাফ চাইছি।...এই দেখুন—

পাশেই মেঝের ওপর একটা বাণ্ডিল রয়েছে। বলতে বলতে কুচাক বসে পড়ে তাড়া-তাড়ি ওটা খুলতে শুরু করে। খান দুয়েক ন্যাকড়া খোলার পর পাথরবসানো সুন্দর একটা রুপোর কাস্কেট বের হলো। সযত্নে সেটা কজুবের হাতে দিয়ে সে বললে,—এটা আপনি নিন।

বাক্‌সটার গড়ন ও কারুকাজ দেখে কজুবের বুঝতে অসুবিধা হয় না, জিনিসটা পুরনো আমলের। টেবিলের ওপর ওটা রাখতে রাখতে তিনি জিজ্ঞেস করেন,—কি এটা?

—অনেক দিন আগে, তা বেশ কয়েক বছর হলো, জুরা ও আমি বিলিয়াণ্ড-কীকের এক হিমবাহে খুব বড় একটা গর্তের মধ্যে অনেক সোনাদানার সঙ্গে এটাও পেয়ে-ছিলাম। সোকসাইয়ের কাছে ঐ শিকারীদের গুহায় এক গর্তের মধ্যে সেসব লুকিয়ে রেখেছিলাম। আর সব সোনাদানা বাসমাচিরা লুঠ করে নিয়ে গেছে। কজিৎজ্‌কির কথামতো এবার রাইফেলগুলো আনতে গিয়ে সেই গর্তটা হাতড়াতেই এটা বেরিয়ে পড়লো। তাড়াতাড়িতে বাসমাচিরা হয়তো ফেলে গেছে...সে অনেক কথা। আপনার কখনো ফুরসৎ হলে জানাবেন, বলবো।

কজুবে ততক্ষণে বাক্‌সটা খুলে ফেলেছেন। ভেতরটা লাল মখমলে মোড়া। তার মধ্যে লাল রেশমী সুতোয় বাঁধা গোল করে পাকানো অনেকগুলো হাতে-লেখা পার্চ-ম্যাণ্ট পুঁথি, হাঁসের পালকের তিনটে কলম আর একশিশি কালো কালি।

এইয্‌ঝাঃ! সাত তাড়াতাড়িতে নোংরা আবর্জনাগুলো ফেলতে ভুলে গেছি!—বলতে বলতে কুচাক খামচা মেরে বাক্‌স থেকে একটা পুঁথি তুলে নিয়ে মেঝেয় ছুড়ে ফেলে দিলে। তারপর আবার নেবার জন্যে হাত বাড়াতেই কজুবে তার হাত চেপে ধরে বললেন,—আরে, করো কি! করো কি! তুমি যাকে নোংরা আবর্জনা বলছো, সেগুলোই হয়তো সবচেয়ে দামী জিনিস। মেঝে থেকে ওটা তোল।

কুচাক থতমত খেয়ে যায়। এইসব নোংরা ময়লা কাগজ রুপোর কাস্কেটটার চেয়ে কি করে দামী হতে পারে, সে ভেবে পায় না।

পার্চম্যাণ্ট পুঁথিগুলো সযত্নে পাকানো, সাবধানে খোলেন কজুবে। পুঁথিতে লাল ও সবুজ গালার বড় বড় সীল আর প্রচুর হাতে-লেখা হরফ।

মনে হচ্ছে, সব ল্যাটিন হরফ!......হ্যাঁ, তাই।—বিড়বিড় করতে করতে কজুবে কুচাকের

দিকে ফিরলেন : ধন্যবাদ কুচাক, তোমার সওগাত আমি গ্রহণ করছি, কিন্তু নিজের জন্যে নয়, জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছে পাঠানোর জন্যে।' তাঁরাই এইসব পুঁথির পাঠোদ্ধার করবেন। একজন জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে একসময় শুনেছিলাম, বহু-বহু কাল আগে মার্কো পোলো নামে একজন বণিক দলবল সহ পামীরের ঐ এলাকা পার হয়েছিলেন। হতে পারে, তাঁর কাফেলার একটা অংশ হিমবাহে তলিয়ে গেছলো, এটা হয়তো সেই কাফেলারই জিনিস। যাই হোক, বাক্সটা আমি মস্কোয় পাঠাবো। সেখানে অনেক বড় বড় জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত আছেন, তাঁরা সব জানেন। এইসব লেখা তাঁরা নির্ঘাৎ পড়তে পারবেন।

চোখ বড় বড় করে কুচাক তাকিয়ে আছে কজুবের দিকে। বিহ্বল কণ্ঠে বললে, এ-তো কাণ্ড—!...কি জানি!...যাক্, আমার ওপর আপনার আর রাগ নেই তো না বুঝে যেসব গুরুতর দোষ করেছি, তার জন্যে মাফ চা—

মুচকি হেসে কজুবে বাধা দিলেন,—আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে। ওসব মাপামাপি রাখ। একটা কথা বলে রাখছি, তড়িঘড়ি তোমার বাড়ি ফেরা চলবে না। তুমি আমার মেহমান। আগে কখনো বড় কিরঘিজ শহরে এসেছ? আস নি? বেশ, তাহলে অনেক মজার মজার জিনিস তোমায় দেখাব। তাছাড়া এমন কয়েকজন ব্যক্তি আছেন এখানে, যাদের সঙ্গে তোমায় পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কুচাক বললে,—আপনি রাগ করেন নি দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় আপনাকে আমি গান শোনাব, মজার মজার গল্পও অনেক বলবো। কিন্তু কজিৎজ্কি সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকদের গিয়ে কি বলবো? ওর সম্বন্ধে ঠিকমতো কিছু না বলতে পারলে জয়নাব আমায় তিষ্ঠোতে দেবে না।

—কজিৎজ্কির জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। আমাদের হেপাজতেই সে আছে। অনেক কিছুই এখনো তার ফাঁস করতে বাকি। বাসমাচিরা এই যে এতসব কাণ্ড করেছে বা করছে, তা তারা স্বেচ্ছায় আপনা থেকে করে নি। তাদের এক বড় মাতব্বর আছে, নাম ইমাম বলবক। বলতে পার, লোকটা কে? উজবেক? কিরঘিজ?

কিরঘিজ।—কুচাক বললে।

না, কিরঘিজ নয়,—কজুবে মাথা নাড়েন : উজবেকও নয়। নীল দরিয়ার ওপারে দূর সাগরপারের এক দেশ থেকে সে এসেছে। তারই হুকুমে বাসমাচিরা আমাদের গ্রামে জনপদে লুটপাট, খুনখারাবি ও ধ্বংসের কাজ চালাতো। কিন্তু তারও খেল খতম। ইভাস্কোর কাছ থেকে সুখবর পেয়েছি, জুরা সারেজ হ্রদের ধারে এই ইমামকে পাকড়াও করেছে। ভয়ঙ্কর দুশমন এই লোকটা। সে ঠিক করেছিল, হ্রদের বাঁধ উড়িয়ে দিয়ে এলাকার পর এলাকার গ্রাম-ফসল সব বন্যায় ভাসিয়ে দেবে, নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সবাইকে ডুবিয়ে মারবে।

কী সাংঘাতিক! আঙুল দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে কুচাক দম বন্ধ করে শোনে।

কিন্তু সে ভয় আর এখন নেই।—শান্ত ধীর কণ্ঠে বললেন কজুবে : তুমি তো ওস্তাদ গল্প-বলিয়ে। গাঁয়ের লোকদের বলো, বাসমাচিরা কিভাবে মনিবদের স্বার্থে কাজ করে। যেমন মনিব, তেমনি গোলাম—সবগুলোই অমানুষ হিংস্র দানব। ওদের পক্ষে অকরণীয় কিছু নেই।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কিছুটা আত্মগতভাবে বিষণ্ণ কণ্ঠে কুচাক বললে,—বাসমাচি আর দুশমন যে কি চিজ, তা আমি হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি।

জানি কুচাক।—কজুবে মাথা নাড়েন তার কথার সমর্থনে : আমার মেহমান হিসেবে তোমাকে কিন্তু থেকে যেতে হবে। শুনেছি, গল্প বলায় আর গানে তুমি ওস্তাদ। আজ

সন্ধ্যায় তোমার ওস্তাদি আমাদের দেখাতে হবে। রাইফেল ছেড়ে তোমার এখন বীন হাতে নেবার সময় এসেছে। সময় সময় গল্প ও গান বুলেটের চেয়েও অব্যর্থ ও শক্তিশালী হয়। তুমি কি মনে করো, শরফের দলে আর পরে তাগাই-কজিৎজ্‌কির বাসমাচিদের মধ্যে তুমি যেসব প্রচার-আন্দোলন চালিয়েছিলে, তা আমি শুনিনি বা ভুলে গেছি? সে সময় তুমি যে বিরাট উপকার করেছিলে, আমরা তা কখনই ভুলবো না।

শুনতে শুনতে কুচাকের তখন বিষম দুঃখ হচ্ছে—কজুবের এসব কথা শোনার জন্যে জুরা, জয়নাব, মুসা বা অন্যেরা কেউই উপস্থিত নেই।

দ্বিতীয় পর্ব ৩

ইমাম বলবক ও কজিৎজ্‌কি ধরা পড়ার পর দু মাস কেটে গেছে। ফসল কাটার সময়ও শেষ হতে চললো।

উঁচু গিরিসঙ্কট ধরে, নদ-নদী পেরিয়ে, গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে নিঃসঙ্গ এক ঘোড়-সওয়ার চলেছে। কালো এক প্রকাণ্ড কুকুর ছুটছে তার আগে আগে। মিন-আরখার গাঁয়ের দিকে তারা চলেছে। কিন্তু গন্তব্যস্থল যত এগিয়ে আসছে, সওয়ার তার কালো ঘোড়ার গতি ততই কমিয়ে দিচ্ছে।

ঘাসের মাঝে ঝিরঝির করে হাওয়া বইছে। কাশের গুচ্ছের ধূসর ডগা হেঁট হয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে মুসাফিরকে।

কিন্তু ক্লিষ্ট চিন্তার ভারে জুরা বিষণ্ণ। ঘোড়ার গতি আরো কমিয়ে দিয়েছে। তাগাই সম্বন্ধে গোষ্ঠীর লোকদের সে কি বলবে? তাদের মারাত্মক দুশমন খতম হয়েছে বটে, কিন্তু যে তাকে খতম করেছে, সে আর যেই হোক জুরা নয়। তারা ওকে আমল দেবে না, বরং ঠাট্টা করবে।

তার মানে, ওদের সঙ্গে তাকে ঝগড়া-বিবাদ করতে হবে। ঝগড়ার জন্যে এই ফিরে আসার কোন অর্থ হয়?

তারপর জয়নাব? প্রায় তিন বছর কেটে গেছে। এবারই সে প্রথম শুনলো, সে বেঁচে আছে। ইতিমধ্যে হয়তো আবার বিয়েও করে ফেলেছে। জোর গুজব, সে নাকি পার্টি-জান হয়ে গেছে। কিন্তু লোকে কত কথাই তো বলে!

আর কুচাক? মানাসের গায়ক কি জুরাকে সমর্থন করবে? না, গাঁয়ের কেউই তার অবস্থা ঠিকমতো বুঝতে পারবে না।

তার পর চাওয়ের মৃত্যু! চাও—তার জীবনের সবচেয়ে বড় দোস্তদের একজন। সেই দোস্তকে কিনা জান হারাতে হলো তারই জন্যে!

সত্যি কথা বলতে কি, চাওয়ের মৃত্যুই জুরার এই বিষণ্ণতার মূল কারণ। কালো কলঙ্কের ক্ষতচিহ্নের মতো এটা তার মনের মধ্যে অবিরাম বিঁধছে খচ্‌খচ্‌ করে। তীব্র তার জ্বালা। ঘৃণ্য সঈদ! বেইমান ঠিক কথাই বলে গেছে। সত্যিই, চাওয়ের চিন্তা তার অন্তরকে সাপের কামড়ের মতো বিষিয়ে তুলেছে।

ধীর কদমে জুরা এগিয়ে চলে।

দূরে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে পরিচিত পর্বতমালা। নীরব শান্ত সব কিছু। ছোট এক পাহাড়ী স্রোতস্বিনীর মৃদু কুলকুল ধ্বনি কানে আসছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জুরা গিরিসঙ্কটের মধ্যে পেঁাছে গেল। এগিয়ে চলে সে টিবি-টিলার ভেতর দিয়ে। এই গিরিসঙ্কটের মাথায় তার গ্রাম। মনে প্রশ্নের ঝড় আর অন্তহীন উদ্বেগ। বুকের স্পন্দন আরো বেড়ে গেছে। টীক ছুটছে আগে আগে।

অদূরে দেখা যায় শৈলশিরাটা। জুরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। ঘোড়াটাকে নীচে রেখে যাওয়াই সে ঠিক করে। কারণ ঋজু পর্বত-পাশের এই শৈলশিরাটা যেমন খাড়া তেমনি সঙ্কীর্ণ। টীকের পেছু পেছু সে ওপরে উঠতে থাকে। ঘোড়াটাও কিন্তু দাঁড়িয়ে নেই, পেছনে আসছে।

পর্বতের ওপরে মিন-আরখার গ্রাম। কিন্তু কই, ক্লান্ত মুসাফিরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে কেউ তো এগিয়ে আসছে না! ঠাসাঠাসি-করা নীচু জরাজীর্ণ কুঁড়েগুলোর চুল্লি থেকে কোথায় সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সাদর হাতছানি!

ওহো-ও-ও!—জুরা হাঁক ছাড়ে। তার চিৎকারে পর্বতে পর্বতে প্রতিধ্বনি জাগে। কিন্তু কই, কেউই তো বেরিয়ে এল না! বাতাসে যে মড়ার গন্ধ!

সবাই কি তাহলে মারা পড়লো?—যেদিক থেকে দুর্গন্ধ আসছে, সেদিকে যেতে যেতে আপন মনে জুরা বলে। তড়িঘড়ি-খোঁড়া কবরগুলোর ওপরে কঙ্কাল, মাথায় খুলি ছড়ানো, নেকড়ে ও শেয়ালের পাল কবর খুঁড়ে সেগুলো বের করেছে।

জুরা পা চালালো কুঁড়েগুলোর দিকে......কেউ নেই। দ্রুতপায়ে সে এঘর-ওঘর করে। অন্ধকার পরিত্যক্ত জনশূন্য সব কিছু।

টর্চের আলোয় দেখা গেল, ছাইয়ের গাদা বৃষ্টির জলে মেঝেয় সেঁটে আছে, ঘরের কোণে কোণে মাকড়সার জাল, দরজা সব কব্জা থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে।

জুরা বেরিয়ে এল। টীক লাফালাফি করছে, কেঁউ কেঁউ করতে করতে এক-একবার কোথায় যেন ছুটে যাচ্ছে, তারপর ফিরে আসছে আবার। কুঁড়ের বাইরে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে, ক্লান্ত মাথা তার নুয়ে পড়েছে। কুঠরিগুলো ঘিরে আগাছার জঙ্গল, কিন্তু ঘোড়ার খাওয়ার অনুপযুক্ত। জুরা শিষ দিতে কালো ঘোড়াটা তার পেছনে নেমে চললো অনুগতের মতো।

ভাল এক চারণভূমি জুরার জানা আছে—এখান থেকে বেশী দূরে নয়। সেখানেই সে রাত কাটাবে স্থির করে। স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে সে ঃ কেউ নেই, সব শেষ...... কুচাকই বা গেল কোথায়?

বিষণ্ণ ক্লিষ্ট জুরা চারণভূমির দিকে চলেছে, কোন দিকে খেয়াল নেই। অতীতের কত মধুর স্মৃতিই না ধাক্কা মারছে মনের মণিকোঠায়!

টীক আগে আগে ছুটছে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো ঃ গোঁ গোঁ করছে। জুরার রাইফেল বাগিয়ে তৈরী হবার পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট।

ওপরে দূরে এক টিলার পেছন থেকে রাইফেলধারী কে একজন হঠাৎ লাফিয়ে উঠে 'জুরা! জুরা!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ধেয়ে আসছে নীচের দিকে। টীকও দৌড়াচ্ছে আগন্তুকের দিকে। লোকটা দোস্ত, না দুশমন, জুরা বুঝতে পারে না। কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে। আর তার পরেই সোল্লাসে বিস্মিত চিৎকার বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ থেকে ঃ অ্যাঁ তুমি! গোরা তুমি!

বলতে বলতে সে ছুটে যায় গোরার দিকে।

জুরা ও গোরা গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে পরস্পরকে।

ধীরে ধীরে জুরা একসময় নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে গোরার আলিঙ্গন থেকে। গম্ভীর কণ্ঠে বললে,—কিন্তু গোরা, আমার সঙ্গে তোমার এ চালাকি করার মানে কি? কেল্লায় থাকার সময় শুনলাম, আমার অনুরোধ তুমি রাখ নি। চাওকে যাতে পার্টি-

জানদের মতোই কবর দেওয়া হয়, তার জন্যে তার মৃতদেহ তুমি কেল্লায় কজুবের কাছে কেন পোঁছে দাও নি? বন্ধু হিসেবে তোমাকে না আমি বিশ্বাস করে এটা করতে বলে-ছিলাম? শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছিলাম আর এক বন্ধুকে। আর তুমি—তুমি—তুমি কিনা—

আবেগে উত্তেজনায় জুরার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। আর দুষ্টুমির হাসি খেলে যায় গোরার মুখে। সে বললে,—হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে ঠিকই, আর আমিও চাওয়ের লাশ কজুবের কাছে নিয়ে যাইনি তাও ঠিক। তা কি করবো, বলো! ব্যাপারটা শুনলে তুমিও হয়তো ঘাবড়ে যাবে।

বলো, আমি শুনতে চাই।—চাপা গলায় জুরা বললে। তার কণ্ঠে ক্ষোভ ও ব্যথা [illegible] উথলে উঠছে।

[illegible]ভেবেছিলাম, একটু মজা করবো,—দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোরা বললে ঃ কিন্তু তোমার মতো বেরসিকের সঙ্গে তা করতে যাওয়ায় যে বিপদ আছে, তা তোমার গলার স্বরেই মালুম হচ্ছে। তা, তুমি কি বলো, জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে কবর দেব?

—জ্যান্ত মানুষ! মানে?

—মানে, চাও বেঁচে আছে।

অ্যাঁ, বলো কি, চাও বেঁচে আছে?—আনন্দোচ্ছ্বাসে কয়েক মুহূর্ত জুরা বাক্‌হারা, তার পরেই চেঁচিয়ে উঠলো ঃ অ্যাঁ, বেঁচে আছে! চাও বেঁচে আছে! আঃ বেঁচে আছে দোস্ত!......কিন্তু ব্যাপারটা কি? সে যে মারা গিয়েছিল?

—না, যায়নি। বুলেটে তার মাথা জখম হয়েছিল। অন্য কেউ হলে হয়তো মারা পড়তো, কিন্তু চাও সেরে উঠছে।

—আঃ, সেরে উঠছে! কোথায়? সে কোথায়? ওঃ, চাও বেঁচে আছে!

—গাঁয়ে।

—কোন্ গাঁয়ে?

কোন্ গাঁয়ে আবার?—গোরা ঝাঁঝিয়ে উঠলো ঃ মিন-আরখারে। হাঁদার মতো কথা বলছো কেন?

—মিন-আরখারে? সে গ্রাম তো ফাঁকা। কেউ নেই।

ওহো, তাই তো!—গোরা বললে ঃ তোমার তো জানার কথা নয়। ওরা এর মধ্যে নতুন আর এক জায়গায় মিন-আরখার গ্রামের পত্তন করেছে। জায়গাটা ভারী চমৎকার। খুবই কাছে। চলো, চটপট যাওয়া যাক। আমার সঙ্গীটি ঘোড়া নিয়ে আগেই গাঁয়ে ছুটেছে। ও তোমায় চিনতো না। আমি 'জুরা' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই, ও পড়িমরি করে গাঁ মুখো ছুটেছে খবরটা দেবার জন্যে।

খাড়া উঁচু পর্বতের ওপর দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে দুই ঘোড়সওয়ার বন্ধু রওনা হয়। টীক ছুটছে আগে আগে। কিছুদূর যাবার পর পথ এঁকেবেঁকে নীচে নেমে আবার উঠে গেছে এক পাহাড়ের মাথায়। বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে সেখানে।

পাহাড়ের মাথা থেকে কুচাক আওয়াজ তুললো ঃ বীর নেতা জিন্দাবাদ!

পাহাড়ের মাথায় জনতার চাপ ক্রমেই বাড়ছে, ছুটে আসছে সবাই। জনতার সোল্লাস কণ্ঠের জয়ধ্বনি ফেটে পড়ে ঃ বীর নেতা জিন্দাবাদ!

না, না! থামো, থামো!—হাত তুলে জুরা চেঁচিয়ে উঠলো। ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামতে নামতে উঁচু পরিষ্কার গলায় বললে ঃ না না, ওসব নয়। আমি সাংঘাতিক ভুল করেছি। চাওয়ের কাছে আমি গুরুতর অপরাধী। এক বেইমান সাপকে বিশ্বাস করে প্রাণের দোস্তকে হারাতে বসেছিলাম। চাওয়ের কাছে আগে আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

সে মনেপ্রাণে মাফ না করলে তোমাদের মাঝে আমি সহজ সরল মন নিয়ে ফিরে যেতে পারবো না।

তারপর গোরার দিকে ফিরে সে বললে,—শোন ভাই গোরা, আমায় চাবুক মারতে মারতে চাওয়ের কাছে তাড়িয়ে নিয়ে চলো। তুমি আমার আর এক সত্যিকারের প্রাণের দোস্ত। যদি সত্যিই তাই হও, তাহলে দোস্তকে পুরোপুরি প্রায়শ্চিত্ত করতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। চাও ক্ষমা না করা পর্যন্ত আমার ওপর চাবুক চালাবে যত জোরে পার, এতটুকু কমতি করবে না।

জনতা নীরব।

গোরা স্তব্ধ। চাবুক চালাবে! ও বলছে কি! তার প্রাণের একমাত্র দোস্ত যে, সেই দুরন্ত সোনালী ঈগলের ওপর সে চাবুক চালাবে এবং সর্বশক্তি দিয়ে! জুরা! জুরা আজ শুধু এই গাঁয়েরই নয়, সারা দেশের গর্ব ও গৌরব। তাকে সে চাবুক মারবে! ওর কি মাথা খারাপ হলো!

পাহাড়ের মাথায় জনতার মধ্যে চাওয়ের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথা ইতিমধ্যে জুরার নজরে পড়েছে। চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে বারবার সে তাড়া দিচ্ছে,—কই এস, গোরা! মারো, যত জোরে পার চাবুক মারো আমায়!

গোরার কাছে এটা কল্পনারও অতীত। কিন্তু জুরার তাড়নার শেষ নেই। তার পরেই হঠাৎ যেন এই ক্ষণটির মহিমা গোরা সর্ব অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে : হ্যাঁ, এই তো জুরা!

সে মন শক্ত করে নাঃ, ও যখন এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে, তখন তাই হোক।

গোরা চাবুক তুললো। তারপর জুরার কাঁধ বরাবর চাবুকের ঘা পড়তে লাগলো একের পর এক।

মাথার টুপি হাতে নিয়ে জুরা চড়াই বেয়ে উঠছে। জনতা নিস্তব্ধ। কিন্তু সে নৈঃশব্দ্য কথার চেয়েও বাঙ্ময়। গোরার চাবুকের শব্দ শুধু কানে আসছে। জুরার দেহে তা পড়ছে হিসহিস শব্দে।

হঠাৎ গোরার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে জুরা বললে,—না বন্ধু, হচ্ছে না। আরো জোরে, আরো জোরে।

জুরা আবার চড়াই বেয়ে উঠতে থাকে। আর গোরা ঠোঁটে ঠোঁট এঁটে ঘোড়ার পিঠে পাশে চলতে চলতে তাকে চাবুক মেরে চলে। চাবুকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে মারছে সে জুরাকে।

এই ক্ষণটির মতো এত অধীর, উত্তেজিত ও অভিভূত চাও আর কখনো হয় নি—না অতীতে, না বর্তমানে। নিদারুণ পোড়-খাওয়া নির্ভীক মানুষটি আবেগে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে—হাসতে চাইছে, কাঁদতেও চাইছে।

যার অনমনীয় আত্মমর্যাদা-বোধের তুলনা নেই, সেই জুরা সারাক্ষণ কী কষ্টভোগ করছে, চাও তা সর্ব অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারছে। সর্বসাধারণের চোখের সামনে প্রকাশ্যে জুরাই শুধু পারে এমনি ভাবে নিজের ভুলের এই মহত্তম প্রায়শ্চিত্ত করতে। এ সততা ও সারল্যের তুলনা নেই।

চাও ছুটে যেতে চায় জুরার কাছে। কিন্তু উপায় নেই—দুর্বল দেহ ও মাথার জখমের জন্যে সে শক্তি তার নেই। অস্থির উদ্বেল মন নিয়ে সে পায়ে পায়ে টলতে টলতে নামতে থাকে উৎরাই বেয়ে।

কিন্তু জয়নাব—জয়নাব কোথায়?

লোকসমক্ষে সে নেই, ঘরেও নেই। পাহাড়ের মাথায় এক ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে

জয়নাব কাঁদছে। জুরা এসেছে শুনেই আলুথালু বেশে সে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু পাহাড়ের নীচে জুরাকে দেখেই তার হাত-পা অবশ হয়ে গেল। হঠাৎ দুনিয়ার সমস্ত লজ্জা এসে যেন তাকে জড়িয়ে ধরলো। পার্টিজান দলের সুযোগ্যা নেত্রী কোথায় সেই শক্তিময়ী জয়নাব! প্রকাশ্যে সর্বজনসমক্ষে জুরার কাছে ছুটে যাবার মতো শক্তিটুকুও তার অবশিষ্ট নেই।

তাই বড় একটা ঢিবির পেছনে সে বসে পড়েছিল। সেখান থেকে দেখছিল জুরাকে। চোখে যেন পলক পড়ে না। জুরা! তারই জুরা! সারা সোভিয়েত দেশের সে আজ গর্ব ও গৌরব হতে পারে, তবু সে তার—একান্তভাবে তারই। আঃ কী সুন্দর জোয়ান হয়েছে সে!

একটু পরেই গোরার চাবুক যখন পড়তে শুরু করলো জুরার ওপর, শিউরে উঠলো জয়নাব। প্রাণপণে সে চেষ্টা করে নিজেকে সংযত রাখার। শেষে কেঁদে ফেললে ঝরঝর করে। চাবুকের ঘায়ে তারই বুক যেন ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, রক্ত ঝরছে। অসহ্য ব্যথায় বুক চেপে ধরে জয়নাব ছটফট করে আর ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর সহ্য করতে পারলো না। মুহূর্তে ভুলে গেল লজ্জা-শরম, ভুলে গেল পারিপার্শ্বিক অবস্থা, উৎরাই বেয়ে পাগলিনীর মতো 'না না!' করতে করতে ছুটলো সে নীচের দিকে। ঝড়ের মতো গিয়ে চাবুক থেকে আড়াল করে জুরাকে জড়িয়ে ধরলো। বারেক তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল,—জুরা!

জুরা!—একটি মাত্র শব্দ, কিন্তু কি সরব ও অর্থবহ! এত দিনের প্রতীক্ষার বেদনা, আশা ও আনন্দ, সব যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো ঐ একটি কথার মধ্যে।

এর পর গোরাও আর পারলো না। চাবুকটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়েই উৎরাই বেয়ে ছুটলো সে নীচের দিকে। এতক্ষণ সে নিজেকে চেপে রেখেছিল, জয়নাবের অবস্থা দেখে আর পারলো না।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে জুরা কথা বলতে পারছে না। ভেতরের আবেগ চোখে ঝরে পড়ছে। সে আবেগ বুঝি ভাষায় প্রকাশ করার নয়। মুগ্ধ নির্নিমেষ চোখে সে তাকিয়ে আছে অশ্রুমুখী জয়নাবের মুখের দিকে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার দুঃখ-বেদনা আর তাগাইয়ের বিরুদ্ধে নিরলস লড়াইয়ের কষ্ট জয়নাবকে কতখানি বইতে হয়েছে, তার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে তার ছাপ স্পষ্ট।

চাও ততক্ষণে প্রায় এসে গেছে। তার দিকে নজর পড়তেই জুরা দ্রুত এগিয়ে গেল, বললে,—বন্ধু, দেখ আমি এসেছি...হ্যাঁ, শোন...আমি ভুল করেছিলাম...গুরুতর ভুল করেছিলাম......আমায় কি তুমি এবারের মতো ক্ষমা করতে পারবে? শুধু এবারের মতো?

জনতা দম বন্ধ করে আছে, অসীম শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে বীর নায়কের দিকে।

জুরার দিকে দু হাত প্রসারিত করে চাও তাকে বুকে চেপে ধরলো নিবিড় আলিঙ্গনে। ভাষা সে হারিয়ে ফেলেছে, মুখ থেকে শুধু বেরিয়ে এল—বন্ধু! প্রাণের দোস্ত!

উদগ্র চোখে দম আটকে কুচাক তাকিয়ে ছিল। উল্লাস আর সে চেপে রাখতে পারে না, দু হাত তুলে নেচে উঠলো। নাচতে নাচতে জনতাকে উদ্দেশ করে হাঁক পাড়লে,—জয়ধ্বনি দে, ওরে তোরা জয়ধ্বনি দে! ইর-মানাসের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী জিন্দাবাদ! সারা দেশের শ্রেষ্ঠ বীর নায়ক জিন্দাবাদ!

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি উঠলো,—জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ! বীর নায়ক জিন্দাবাদ!

অনেক নীচে একলা গোয়া শুধু চোখ মুছে চলেছে।

আলিঙ্গন থেকে মুক্ত চাও ও জুরা—তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে। একটু পরে ধীরে ধীরে চাও বললে,—জুরা, আমার এই পড়ন্ত বয়সে তোমায় দেখেছি আমি নিজের ছেলের মতো। তোমায় হারাতে চলেছি, এই উপলব্ধি খারাপ আবহাওয়ায় সমুদ্রের যে অবস্থা হয়, আমার মনকেও তেমনি সেদিন অস্থির চঞ্চল করে তুলেছিল। রক্তের ভেতর দিয়ে আজ আমাদের স্নেহ-ভালবাসা ও বন্ধুত্বের বনিয়াদ পাকা হলো। খোঁড়া কখনও ভুলতে পারে না সেদিনের কথা যখন সে হাঁটতে পারতো, অন্ধও তেমনি ভুলতে পারে না তার অতীতের সেই অভিজ্ঞতা যখন তার দৃষ্টিশক্তি ছিল। সঙ্গীদের স্মৃতিতে আমাদের বন্ধুত্বের বুনিয়াদ আরো পাকা হোক, আরো দৃঢ় হোক।

জুরা কথা বলতে পারে না, চাওয়ের ডান হাতখানা নিজের দু মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে শুধু বলে,—একই পাথরে আমি দুবার কখনো হোঁচট খাব না।

কুচাক ছুটে গিয়ে জুরাকে জড়িয়ে ধরলে। বললে,—বর্তমানে তোমার মধ্যে যে গভীর চিন্তা-ভাবনা চলেছে, তোমার চোখে তার স্পষ্ট ছাপ দেখতে পাচ্ছি, জুরা।

অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেছি।—মৃদু কণ্ঠে জুরা জবাব দেয় ঃ ভুলের জন্যে মানুষ অনুতাপের যে জ্বালা ভোগ করে, তেমন আর কিছুতে নয়। হাজার অবিশ্বাসী অনুচরের চেয়ে একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর দাম অনেক বেশী।

মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বর্ষীয়সী যিনি, নীচু গলায় বললেন,—বাপের অন্তঃকরণই তুমি পেয়েছ, জুরা।

আনন্দ-মিলনের মধ্যে জুরা এতক্ষণ কোন কিছুই ঠিকমতো ভাবতে পারে নি, এবার জনতার মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে,—ভাইকে দেখেছি কেল্লায়। কিন্তু মা, আমার মা কোথায়? তাকে যে দেখছি নে?

জুরাব পাশে জয়নাব দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ জলে ভরে এল। জুরার বাঁ হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নত মস্তকে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ফিসফিস করে বললে, —মা নেই! যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। শেষক্ষণ অবধি রাইফেল চালিয়ে গেছেন।

জুরা দাঁড়িয়ে থাকে। জয়নাবের হাতের মধ্যে তার বাঁ হাতখানা কাঁপছে। নীরব জনতা। জয়নাব কাঁদছে। তেমনি নত মস্তকে ধীরে ধীরে মৃদু কণ্ঠে আবার সে বললে, —মায়ের কতই না আশা ছিল, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। সেই সুখের আশায় তিনি ঐ বয়সেও লড়াই করতেন নির্ভীকভাবে। কিন্তু এক বাসমাচি দস্যুর বুলেটে তার আশার আলো চিরতরে নিভে গেল। তোমার নাম করেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি। চলো, মা যেখানে ঘুমিয়ে আছেন।

পাথরের মতো ভারী পা দুখানা টেনে টেনে জুরা এগোয়। পর্বতের ধারে আয়েশার কবরের পাশে এসে হেঁট মাথায় দাঁড়ায় সে ও জয়নাব। একটু পরেই কুচাকের গলা শোনা গেল ঃ হে বীরাঙ্গনা আয়েশা! খাঁটি বীরের মতো রাইফেল হাতে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছ তুমি। তোমাকে নমস্কার করি। কিন্তু জুরা, তুমি বেঁচে আছ। তুমি খ্যাতিমান, তুমি মহান, তুমি—

বাষ্পরুদ্ধ চাপা কণ্ঠে জুরা ধমক দেয়,—চুপ! চুপ!

নিস্তব্ধ সব কিছু—যেন নিথর হয়ে আছে।

পেছনে জনতা হেঁটমাথা—ভাষাহীন।

মিনিটের পর মিনিট পার হয়। জুরা তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ফেরে একসময়।

সবাই রওনা হয় গ্রামের দিকে। জনতা পরিবৃত হয়ে জুরা ও জয়নাব এগিয়ে চলেছে। তাদের ঘিরে ঢাঁকের লম্ফঝম্পের বিরাম নেই।

কেমন আছ, জুরা?—মুসা এগিয়ে এসে তার সঙ্গে করমর্দন করলে : আমার ফৌজ নিয়ে এখানকার পর্বতে পর্বতে তল্লাশি চালাচ্ছি, খোঁজ করছি দস্যুদের।

বীর নেতা ঘরে ফিরছে, তাই চারদিকে শুধু প্রীতিসম্ভাষণের ছড়াছড়ি। সবারই মুখে এক কথা—কেমন আছ, জুরা?

নতুন গ্রামখানার পত্তন হয়েছে গোটা পর্বত-উপত্যকা ধরে। একতলা সাদা বাড়ি সব, বড় বড় জানলা ও চিমনি, দরজা খোলা, যেন সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে জুরাকে।

জুরার চোখে বিস্ময় ও আনন্দ।

ভেড়ার বড় বড় পাল পর্বত-ঢালে বিশ্রাম করছে। ঝুঁকে-পড়া উঁচু পর্বতের ঘাস-জমিতে চরছে ছাগল ও ইয়াকের পাল। গাঁয়ের অস্বাভাবিক চঞ্চলতায় দড়ি-বাঁধা মাদী ঘোড়াগুলো সন্ত্রস্ত। তাদের বাচ্চারা ঘাসজমিতে খেলায় ব্যস্ত। মায়েরা ডাকছে তাদের।

দূরে দেখা যায় হলুদ রঙের জমি। জুরা সেদিকে তাকিয়ে আছে দেখে একজন বললে,—ওটা যবের খেত।

গরুর পাল চরছে। জুরার নজর তাদের ওপর পড়তে আর একজন বললে,—আমাদেরই গরু ওসব।

বড় ঘরখানা লোকে ঠাসাঠাসি। কুচাক জুরাকে এনে গালিচায় বসালে। নীচে দিলে নরম গদি।

গোরা টানতে টানতে জয়নাবকে এনে বসিয়ে দিলে জুরার পাশে।

মুগ্ধ চোখে সবাই তাকিয়ে আছে দুজনার দিকে। তাকিয়ে আছে চাও ও গোরা। আবদুল্লাজোন বললে,—সত্যি, কী চমৎকার মানিয়েছে দুজনাকে!

সোৎসাহে ঘাড় নেড়ে মুসা সমর্থন জানায়।

কৌমিস এল। মুসার হাত থেকে কৌমিস ভরতি বিরাট কাঠের কাপটা দু হাত দিয়ে নিয়ে জুরা তাকালে সবার দিকে। পার্টিজানদের মুখে অন্তরঙ্গ প্রীতির হাসি ফুটে ওঠে, বন্ধুর মতো মাথা নাড়ে চাষীরা।

ইতিমধ্যে কুচাক জুরাকে বলেছে, তাগাইয়ের মৃত্যু হয়েছে কিভাবে। জুরার চোখে দুনিয়া আজ তাই বড় রঙিন। আনন্দময়। জয়নাব তার পাশে। কৌমিসের কাপটা তুলে সে বললে,—উপস্থিত বন্ধু সব, আমি তোমাদের স্বাস্থ্যপান করছি, প্রার্থনা করি সুন্দর সুখী হোক তোমাদের জীবন।

এক চুমুকে সে নিঃশেষ করলে কাপটা।

এবার কুচাকের দিকে তাকিয়ে মুসা বললে,—কুচাক, সোভিয়েত-তন্ত্রের চারণ-কবি তুমি, আজ আমরা তোমার গান শুনবো।

কুচাক তার আগেই দোতারাটা হাতে তুলে নিয়েছে। তুমুল হর্ষধ্বনির মাঝে বীনের তারে ঝঙ্কার তুলে সে শুরু করে গান :

গান—
গানের লহরি জাগে দূর আসমানে,
গানের লহরি ওঠে দুনিয়ার প্রাণে।
মেঘলোক নীচে, দূর আসমানী পথে
গান ভেসে যায় আর সুরের ঝরনায়
খুশির আবেশ নামে পাহাড়ে পর্বতে।

পাখা মেলে গান উড়ে যায়—
ওড়ে নিরুদ্দেশ ঃ
কোথা ঘর ? যাত্রা তার কোথা হবে শেষ ?
রাত্রি নামে—অবসন্ন বিবশ সঙ্গীত
খোঁজে নীড়।
পামীরের শান্ত পল্লী বহু নীচে জানায় ইশারা ঃ
গান আত্মহারা,
নেমে আসে প্রাণময় কিরঘিজি গাঁয়ে
চুল্লি ঘিরে আগুনের উষ্ণ পরিবেশে।
নির্ভীক কিরঘিজি প্রাণের উল্লাসে
ভিড় করে অপরূপ মেহমান পাশে—
সাদরে বরণ করে তাকে তুলে নেয়
আর পুলকে আবেশে শোনে গান,
শোনে আর শোনে।
গান গাথা হাজারে হাজারে
চিরতরে জমা হয় কিরঘিজি গাঁয়ে—
গান সেথা বাঁধে নীড় চিরদিন তরে।
বাতাস মোহিত যেথা দোতারা ঝঙ্কারে,
গান বাঁধে নীড় সেই পামীর ওপরে
বাঁধে নীড় গ্রীষ্মের মরকত চারণপ্রান্তরে।
নির্ভীক কিরঘিজি গান গায় যবে,
মোহময় সঙ্গীত-নির্ঝরে
আনন্দ-লহরী জাগে বিশ্বচরাচরে. ....

নিস্তব্ধ ঘর। নিস্তব্ধ সবাই—মোহাবিষ্ট যেন। মাঝে মাঝে গানের ফাঁকে কানে আসে পাহাড়ী ঈগলের ডাক আর দূর নির্ঝরের কলকল-ছলছল মধুর ঐকতান।

সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি ঘোবে পর্বতে পর্বতে। একসময় তাব শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যেতে জুরা তাকালে গোরার দিকে। বললে,—দোস্ত, এবার তুমি গাও। কেউ জানে না, তুমি গাইতে পারো। কেউ শোনে নি তোমার সেই অপূর্ব মিষ্টি গলা।

সবাই সমস্বরে হৈহৈ করে উঠলো,—হ্যাঁ হ্যাঁ, গাও গোরা, গাও। তোমার এ ক্ষমতা আছে, জানতাম না তো! তোমার গান আমরা শুনতে চাই।

বেশ,—গোরা উঠে দাঁড়ালো ঃ আজ এই আনন্দের দিনে আনন্দময় পরিবেশে আমারও লোভ হচ্ছে আমার বন্ধুদের নিজের দেশের গান শোনাতে। তাম্বুরা হাতে নিইনি বহু-কাল, অনভ্যাসের ফলে তাই যদি কোন ত্রুটি ঘটে, সে দোষ কিন্তু সম্পূর্ণ আমার, আমার দেশের নয়। আরো একটা কথা—কুচাকের মতো আমি চারণ-কবি নই। আমার এ গান আমারই দেশের এক বড় কবির।

বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে সে নিয়ে এল তানপুরাটা।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যায়। তানপুরার তারে জাগে মৃদু ঝঙ্কার। গুনগুন সুরে গোরা শুরু করে গান। দূরে তুষারে ঢাকা গিরিশ্রেণী রোদে ঝলমল করছে। সেদিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে গোরার চোখে নামে আবেশ, মনে জেগে ওঠে স্বপ্ন—হিমালয়ের স্বপ্ন। তারপর এক সময় সতেজ ভরাট কণ্ঠে সে কিরঘিজ ভাষায় গেয়ে ওঠে ঃ

ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;—
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমনধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধুম্র-পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।

সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। শব্দহীন বিশ্বে যেন জেগে আছে শুধু গান। জুরার চোখে নেমেছে স্বপ্ন-মায়া, মন তার চলে গেছে কোথায় কোন্ সুদূরে, গুনগুন করে সে বলে,—আঃ কী সুন্দর অপরূপ!

শুনতে শুনতে চাওয়ের চোখে জল এসে গেছে। আর হেঁট মাথায় কুচাক নীরবে মাথা দুলিয়ে চলেছে।

গোরার কিন্তু খেয়াল নেই কোন দিকে। স্বপ্ন দেখছে সে। তার সতেজ সুরেলা কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে স্বদেশবন্দনার অমৃতনির্ঝর। সে গাইছে ঃ—

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ!
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি।
